প্রাক্‌কথন

নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে-পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পাঠ্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখা ও পরিমার্জনের কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষয়ত্রীদের সাহায্য এ-কাজে সম্ভব হয়েছে। যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিষয় বিন্যাস সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদার্হ। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনও শিক্ষার্থী এই পাঠোপকরণের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার যাবতীয় সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

শিক্ষার্থীরা এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

অষ্টম পুনর্মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি, 2019

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় : বাংলা **স্নাতকোত্তর পাঠক্রম**

পাঠক্রম : পর্যায় : PGBG - 06 : 01

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1(a) (b)	ড. অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়	অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত
একক 2	রুণা চট্টোপাধ্যায়	অধ্যাপক পুলিন দাশ
একক 3	ড. অয়ন্তিকা ঘোষ ও রুণা চট্টোপাধ্যায়	ড. মনন কুমার মণ্ডল

পাঠক্রম : পর্যায় : PGBG - 06 : 02

	রচনা	সম্পাদনা
একক 4	ড. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়	অধ্যাপক পুলিন দাশ
একক 5	ড. চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত	অধ্যাপক পবিত্র সরকার
একক 6	ড. শ্রাবণী পাল	অধ্যাপক পুলিন দাশ

পাঠক্রম : পর্যায় : PGBG - 06 : 03

	রচনা	সম্পাদনা
একক 7	ড. মীনাক্ষী সিংহ	অধ্যাপক পুলিন দাশ
একক 8	ড. অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়	অধ্যাপক পুলিন দাশ
একক 9	ড. অপুর্ব কুমার দে	ড. মনন কুমার মণ্ডল

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনোও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

PGBG – 6

[স্নাতকোত্তর পাঠক্রম]

পর্যায় 1

একক 1(a)	❑	বাংলা মঞ্চাভিনয়ের ইতিহাস ১৭৯৬-১৮৭২	7 – 27
একক 1(b)	❑	বাংলা মঞ্চাভিনয়ের ইতিহাস ১৮৭২-১৯১২	28 – 52
একক 2	❑	মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রো'	53 – 61
একক 3	❑	মালিনী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	62 – 86

পর্যায় 2

একক 4	❑	সাজাহান : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	89 – 112
একক 5	❑	ছেঁড়া তার : তুলসী লাহিড়ী	113 – 134
একক 6	❑	তপস্বী ও তরঙ্গিণী : বুদ্ধদেব বসু	135 – 173

পর্যায় 3

একক 7	❑	অঙ্গার : উৎপল দত্ত	177 – 185
একক 8	❑	চাঁদ বণিকের পালা : শম্ভু মিত্র	186 – 197
একক 9	❑	গল্প হেকিম সাহেব : মনোজ মিত্র	198 – 243

একক ১ক ☐ বাংলা মঞ্চাভিনয়ের ইতিহাস ১৭৯৬-১৮৭২ ☐ প্রথম পর্ব

পর্যায় ১ একক ১ক

১.১ মুখবন্ধ

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ সংস্কৃত নাটক ও নাট্যমঞ্চ

১.৪ যাত্রা

১.৫ নাট্যমঞ্চের সূচনাপর্ব ও বিদেশি নাট্যমঞ্চ

১.৬ লেবেডেফ ও বেঙ্গালি থিয়েটার

১.৭ সৌখিন নাট্যমঞ্চ বা সখের নাট্যমঞ্চ

১.৮ সখের নাট্যমঞ্চের বিকাশ

১.৯ সখের নাট্যমঞ্চের পরিণতি

১.১০ অনুশীলনী

১.১ মুখবন্ধ

বাংলা নাটকের পাঠে, তার তাৎপর্য বিশ্লেষণে এবং বাংলা নাটকের সমালোচনার ক্ষেত্রে বাংলা নাট্যমঞ্চ সম্পর্কে বিশেষ ধারণা থাকা একান্ত জরুরি। কেননা নাটক শেষপর্যন্ত অভিনেয়। যেকোনো একটি নাটক যখন রচিত হয় তখন তার আলোচনায় যদি অভিনয়ের বিভিন্ন দিক বা অভিনয়যোগ্যতার ব্যাপারটি আলোচিত না হয় তাহলে তার পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন ঘটে না।

বস্তুত একথা ভুলে গেলে চলবে না যে নাটক মূলত সাহিত্য হলেও তার অতিরিক্ত কিছু নাটকে নিহিত থাকে। নাটকের সঙ্গে যুগরুচি, নাট্যমঞ্চের ভূমিকা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। একারণে শুধুমাত্র সাহিত্যনীতির মাপকাঠিতে নাটকের বিচার সম্পূর্ণতা পায় না,—দর্শক-অভিনেতা-প্রযোজক সমৃদ্ধ নাট্যমঞ্চের সাপেক্ষে নাটকের যথার্থ স্বরূপটি উপলব্ধি করা যায়।

১.২ প্রস্তাবনা

বাংলা নাট্যমঞ্চের সঙ্গে বাংলা নাটকের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এককথায় উভয়ের সম্বন্ধ অনেকাংশেই আত্মিক। নাট্যকার জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নিজস্ব অনুভবকে অবলম্বন করে নাটক রচনা করেন একথা যেমন সত্য, কিন্তু নাটক যে দৃশ্যকাব্য এবং নাট্যমঞ্চে অভিনীত হবার অপেক্ষা রাখে একথাও তেমনই সত্য। ফলে নাটক বিচারের সময়

তার সাহিত্যমূল্য ও অভিনয়মূল্য এই দুদিকেই লক্ষ্য রাখতে হয়। জার্মান নাট্যতাত্ত্বিক শ্লেগেল বলেছিলেন,— "A dramatic work must always be regarded from a double point of view—how far it is poctical and how far it is theatrical" ('A Course of Lectures on Dramatic Art and Literature' : Translated by John Black ; 1840 ; Page 31)।

১.৩ সংস্কৃত নাটক ও নাট্যমঞ্চ

ভারতীয় নাটকের যে কোনো আলোচনার মুখপাতে সুপ্রাচীন ঐতিহ্যশালী সংস্কৃত নাটকের কথা বলতেই হয়। সংস্কৃত নাটক মূলত প্রথম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। আমরা ঋগ্বেদের মধ্যে নাটকের মৌলিক উপাদান লক্ষ্য করেছি। 'পুরূরবা ও উর্বশী', 'যম ও যমী', অথবা 'সরমা ও পনি' ইত্যাদি সূক্ত বা গাথা পরবর্তী সময়ে নাট্য রচনায় প্রভাব বিস্তার করেছিল একথা বলা যায়। এমনকি যজ্ঞের অনুষ্ঠানে উদাত্ত-অনুদাত্ত উচ্চারণের মধ্যেও নাট্যাভিনয়ের বীজ লুকিয়ে ছিল একথা যদি বলা হয় তাহলে অত্যুক্তি হয় না।

সংস্কৃত নাটক ও সংস্কৃত নাটকের অভিনয় সম্পর্কে আমরা তথ্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছি যে পাশ্চাত্যের সমালোচকরা এ বিষয়ে একমত নন। আমরা আলোচ্য অধ্যায়ের সূচনাতেই যে মত প্রকাশ করেছি সেই মতের সমর্থক Sylvan Levy ও Hartel। কিন্তু Sten Konow, Pischel অথবা Keith ঐ মত মেনে নেননি।

আচার্য ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে বৈদিক যুগের পরে মহেন্দ্র প্রমুখ দেবতাদের অনুরোধে ব্রহ্মা পঞ্চমবেদ রূপে নাট্যের সৃষ্টি করেন। 'নাট্যশাস্ত্র' থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে মহেন্দ্রর বিজয়োৎসব অথবা ইন্দ্রোৎসবকে কেন্দ্র করে সংস্কৃত ভাষায় প্রথম নাটক 'দেবাসুর যুদ্ধ' অভিনীত হয়েছিল এবং তারপরে হিমালয়ে ব্রহ্মা তাঁর সঙ্গীসাথীদের নিয়ে 'ত্রিপুরদাহ' অভিনয় করেন। প্রথম নাটকের অভিনয় অসুরদের উপদ্রবে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে 'নাট্যবেশ্ম' তৈরির আদেশ দেন। এই 'নাট্যবেশ্ম' থেকেই নাকি 'নাট্যগৃহ'-এর উৎপত্তি। তারপর থেকেই নাট্যমঞ্চে অভিনয়ের রীতি প্রবর্তিত হয়।

সংস্কৃতে লিখিত নাটকের যে পরিচয় আমরা পাই তার মধ্যে যে প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় তা হলো অশ্বঘোষ রচিত 'শারিপুত্রপ্রকরণ'। এই নাটকটি পূর্ণাঙ্গরূপে পাওয়া যায়নি। এছাড়াও সুবন্ধুর স্বপ্নবাসবদত্তা, ভাসের প্রতিমা নাটকসহ তেরোটি নাটক, শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক, কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, ইত্যাদি নাটক ষষ্ঠ শতকের মধ্যেই রচিত হয়েছিল। সপ্তম শতকে হর্ষের রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা, অষ্টম শতকে ভবভূতির মালতীমাধব, উত্তরচরিত, মহাবীরচরিত, নবম শতকের গোড়ায় বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস, ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার, দশম শতকে মুরারির অনর্ঘরাঘব, রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরী, বালরামায়ণ, ক্ষেমীশ্বরের চণ্ডকৌশিক ইত্যাদি নাটকের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সময়ে আমরা সংস্কৃত নাটকের অবক্ষয় লক্ষ্য করি, তবু বিক্ষিপ্তভাবে বিশ শতক পর্যন্ত সংস্কৃত নাটক রচনার প্রবণতা লক্ষ্য করি।

আচার্য ভরত প্রাচীন ভারতের নাট্যমঞ্চের যে পরিচয় দিয়েছেন তা অত্যন্ত উন্নত শিল্পস্থাপত্যের অভিজ্ঞান বহন করে। কিন্তু কালিদাস, ভবভূতি বা শূদ্রকের নাটক এই ধরনের নাট্যমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল কি-না তা আমরা সঠিকভাবে জানতে পারি না। এমনকি একাদশ শতকে ভরতের টীকাকার অভিনবগুপ্তও ভারতীয় নাট্যমঞ্চ সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা দিতে পারেননি।

বাংলাদেশে নবাবী শাসনকালেও বেশ কিছু সংস্কৃত নাটক রচিত হয়েছিল। এর মধ্যে রূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধব

ও ললিতমাধব নাটক, কবি কর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয়, রায় রামানন্দের জগন্নাথবল্লভ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই সমস্ত নাটকগুলি আচার্য ভরত-কথিত ভারতীয় নাট্যমঞ্চের আদর্শে, নির্মিত কোনো নাট্যমঞ্চে অভিনীত হয়নি। অধিকন্তু চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের সপার্ষদ কৃষ্ণলীলার অভিনয়ের যে বিবরণ আমরা পাই, তার অভিনয়রীতি প্রচলিত যাত্রী রীতিরই উন্নততর সংস্করণ হিসেবে উপস্থিত হয়েছে।

১.৪ যাত্রা

সংস্কৃত বিশ্বকোষ-এ উল্লেখ আছে, "যাত্রাতু যাপনোপায়েগতৌ দেবার্চনোৎসবে"। উৎসব অর্থেই 'যাত্রা' শব্দটি সংস্কৃত অভিধানে গৃহীত হয়েছে,— যা + ত্র (ভাবে) + আ (স্ত্রীং) = যাত্রা।

অনেকের মতে 'পাঁচালি' থেকে যাত্রার উদ্ভব ঘটেছে। মধ্যযুগে আখ্যানমূলক রচনা পাঁচালিরূপে চিহ্নিত হতো। আবার উনিশ শতকে 'ভাসান যাত্রা'-র উল্লেখ পাই। তবে যাত্রা শব্দটি-র মধ্যে 'যা'—ধাতু 'গমন' অর্থে ব্যবহৃত। মধ্যযুগে বৈষ্ণবধর্মের প্রসার এবং ষোড়শ শতক থেকে চৈতন্যপ্রভাবে তার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। তারই ফলে কৃষ্ণকে উপলক্ষ করে 'কৃষ্ণযাত্রা' গড়ে উঠেছিল। একইভাবে গড়ে উঠেছিল দোলযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা, আবার কৃষ্ণের জায়গায় জগন্নাথ,—তার ফলে রথযাত্রা।

যাই হোক, পাঁচালি থেকে যাত্রার উৎপত্তি এই মত পরবর্তী সময়ে আর মান্যতা পায়নি। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে পাঁচালি-র পাঁচটি অঙ্গ (পা-চালি, বৈঠকি, লাচাড়ি, ভাব-কালি ও দাঁড়াকবি) একজন গায়েকের পক্ষে যথাযথভাবে পরিবেশন করা সম্ভব হয়নি বলেই অনেক সময় সহায়ক নেওয়া হতো। ফলে অনেকাংশে যাত্রার গান ও অভিনয় অংশ ফুটে উঠতো।

কেউ কেউ মনে করেন যে 'নাটগীত' থেকে যাত্রার উৎপত্তি। মধ্যযুগের বাংলায় দেবতার উৎসব উপলক্ষে যে নৃত্যগীত পরিবেশিত হতো তাকেই 'নাটগীত' বলা হতো। জয়দেবের গীতগোবিন্দ অথবা বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এই ধরনের 'নাটগীত'। সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'অভিনয়' অর্থে যাত্রা শব্দটির ব্যবহার আমরা লক্ষ্য করি না। চৈতন্যভাগবত-এ উল্লেখ আছে, 'অঙ্কের বিধানে নৃত্য'। এপ্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে মধ্যযুগের শ্রীচৈতন্যদেবের অভিনয়ের যে বিবরণ আমরা পাই তাতে যাত্রার সাদৃশ্য আছে। বিস্ময়ের কথা এই যে ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' না মেনে শ্রীচৈতন্যদেব মুক্তমঞ্চে, অনেকটা যাত্রার মতন অভিনয় করতেন। বহুসংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে যাবার অভিপ্রায়ে শ্রীচৈতন্যদেব উন্মুক্ত মঞ্চে অভিনয় করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব যাত্রাধর্মী এই উন্মুক্ত মঞ্চে রুক্মিণীহরণ ও ব্রজলীলা অভিনয় করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের অভিনয়ের প্রভাবে সেই সময়ে বেশ কিছু যাত্রাপালা লেখা হয়েছিল। এর মধ্যে কবি কর্ণপুর, রায়রামানন্দ, রূপগোস্বামী, দেবীনন্দন সিংহ প্রমুখদের পালাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

অষ্টাদশ শতকেও কৃষ্ণযাত্রা ছিল, যার নাম ছিল কালীয়দমন। বীরভূমের কেন্দুবিল্ব গ্রামের শিশুরাম ছিলেন এ যাত্রার জনক। শিশুরামের শিষ্য পরমানন্দ অধিকারী কালীয়দমন যাত্রায় ব্যাসদেবকে যুক্ত ক'রে বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা করেন। এরপরে শ্রীদাম, সুবল এবং তাঁর শিষ্য বদনের দান, মান ও মাথুর লীলাশ্রয়ী যাত্রাপালা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। নৌকাবিলাস পালার প্রথম রচয়িতা গোবিন্দ অধিকারীও লোচনের পরে অত্যন্ত জনপ্রিয় যাত্রাপালাকার হয়ে ওঠেন। এছাড়া রাধাকৃষ্ণ দাস, পীতাম্বর অধিকারী, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় প্রমুখও প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। গোবিন্দ অধিকারীর সমকালীন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য যাত্রাপালায় বিশেষ সুনামের অধিকারী ছিলেন। কৃষ্ণকমলের রাইউন্মাদিনী, স্বল্পবিলাস ইত্যাদি পালাগান এবং মধুসূদনের ঢপকীর্তন, অক্রূরসংবাদ ও কলঙ্কভঞ্জন ইত্যাদি সেকালে প্রবল আলোড়ন তৈরি করেছিল। এপ্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে এই সময়ে কৃষ্ণযাত্রার বেশি প্রচলন থাকলেও চণ্ডীযাত্রা, রামযাত্রা,

মনসার ভাসানযাত্রাও প্রচলিত ছিল। অষ্টাদশ শতকের উন্নত যাত্রা গণশিক্ষার বাহনরূপে প্রচুর দর্শকদের সামনে গণভূমিতে মঞ্চস্থ হতো। উনিশ শতক বাংলার নবজাগরণের যুগ। বিশেষ করে নগরকেন্দ্রিক নবজাগ্রত বাঙালির ভাবজগতে বিপুল পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। যাত্রাপালা সংস্কারের কাজে এগিয়ে এলেন শ্রীদামদাস, সুবলদাস অধিকারী এবং পরমানন্দ অধিকারী। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে কলিরাজার যাত্রা, নলদময়ন্তী, কামরূপযাত্রা, নন্দবিদায়যাত্রা, রাজা বিক্রমাদিত্যযাত্রা ইত্যাদির অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়। কলকাতায় ও তার আশেপাশে ধনী বাঙালিদের বাড়িতে ঐ সমস্ত যাত্রাপালা মঞ্চস্থ হবার সংবাদ পাওয়া যায়। শ্যামসুন্দর সরকারের বাড়িতে ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের ৯ মার্চ কামরূপ যাত্রা, ভূকৈলাস মুখুজ্জ্যের বাড়িতে ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মে রাজা বিক্রমাদিত্যযাত্রা এবং শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাড়িতে ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ এপ্রিল নন্দবিদায়যাত্রা অভিনীত হয়েছিল।

কৃষ্ণযাত্রার ভক্তিবিহ্বলতা দূরে সরে গিয়ে নৃত্যে-গীতে, সস্তা সংলাপে, সঙের উপস্থিতিতে—সর্বোপরি খেম্‌টা নাচের সহযোগে নতুন যে যাত্রাপালা এসময়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল,—সেই ক্ষেত্রে গোপাল উড়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গোপাল উড়ের যাত্রাপালার জনপ্রিয়তা এতই ব্যাপক ছিল যে শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে নতুন রীতিতে 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনীত হয়েছিল। সে যুগে গোপাল উড়ে এবং 'বিদ্যাসুন্দর' পালা অস্বীকার করার ক্ষমতা কারোর ছিল না। গোপাল উড়ের শিষ্য কৈলাস বারুই গুরুর পথ অনুসরণ করেন। একই পথে লোকোধোপা নামে পরিচিত লোকনাথ দাস সেই সময় গোপাল উড়ের মত ও ভাব অনুসরণ করে রচনা করেন বিদ্যাসুন্দর, নলদময়ন্তী, শ্রীমন্তের মশান এবং কলঙ্কভঞ্জন যাত্রাপালা।

এই সময়ে দেশের বিশৃঙ্খল সমাজ-মানসের সঙ্গে যোগরক্ষা করতে গিয়ে এবং কবিগান, পাঁচালি, তর্জা, হাফ আখড়াই, বুলবুলির লড়াই ইত্যাদির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে যাত্রার মধ্যে অশ্লীলতা, নীতিহীনতা, প্রশ্রয় পেয়েছিল। মানুষের আদিম প্রবৃত্তির বিকৃত চিত্রের মাধ্যমে জনগণের মনোহরণের চেষ্টা চলেছিল। কিন্তু বেশিদিন এই স্থূলরুচির যাত্রাপালা মানুষকে প্রলুব্ধ ক'রে রাখতে পারেনি।

১.৫ নাট্যমঞ্চের সূচনাপর্ব ও বিদেশি নাট্যমঞ্চ

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাংলা নাটকের অভিনয় ও নাট্যমঞ্চ ইংরেজদের দ্বারা পরিচালিত নাট্যমঞ্চের কাছে অনেকাংশে ঋণী। একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, অষ্টাদশ শতকে ইংলন্ডে যেমন নাট্যমঞ্চ ছিল, তারই আদলে এখানে নাট্যমঞ্চ তৈরি হলো। তিনদিক ঘেরা, একদিক খোলা, সেখানে কার্টেন বা পর্দা। এই কার্টেন বা পর্দা সরে গেলে মঞ্চের ভেতরটা দেখা যেত। মঞ্চের দুধারে উইংস দিয়ে নাটকের পাত্রপাত্রীরা মঞ্চে প্রবেশ-প্রস্থান করতেন। মঞ্চের পেছনে পর্দায় দৃশ্য আঁকা, এই দৃশ্যপটের সামনে হতো অভিনয়। তেল বা গ্যাসের বাতিতে মঞ্চকে আলোকিত করা হতো। নাট্যমঞ্চের সামনে তৈরি হল দর্শকদের আসন। নাটকের পাত্রপাত্রীদের সাজসজ্জা, যন্ত্রানুষঙ্গ, সঙ্গীত, অভিনয়রীতি ইত্যাদি সহযোগে এখানে ইংলন্ডের থিয়েটারের আদলে তৈরি হল 'থিয়েটার হল',—বাংলায় নাট্যমঞ্চ বা রঙ্গালয়। যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'প্রসেনিয়াম থিয়েটার'।

একেবারে সূচনাপর্বে ইংরেজদের প্রবর্তিত থিয়েটারের সব কিছুই ছিল বিদেশি। নাট্যমঞ্চের ব্যবস্থা ছিল বিদেশি, নাটক এবং নাট্যকার বিদেশি, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বিদেশি, পৃষ্ঠপোষক ও মালিক বিদেশি, অভিনয়রীতি বিদেশি, —সর্বোপরি দর্শকও ছিল বিদেশি। একারণেই বাংলা নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে এই নাট্যমঞ্চগুলিকে 'বিদেশি রঙ্গালয়' নামে

চিহ্নিত করা হয়। যদিও পরবর্তীকালে এর সবটুকু বিদেশি ছিল না।

এবার আমরা এদেশে প্রতিষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য বিদেশি নাট্যমঞ্চের পরিচয় নেবার চেষ্টা করব :

ক. **ওলড্ প্লে হাউস (Old Play House) :**

অধুনা কলকাতার লালবাজার স্ট্রিটের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সেন্ট এন্ড্রুজ গির্জার উল্টোদিকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে 'ওল্ড প্লে হাউস' নামক নাট্যমঞ্চ কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম বিদেশি নাট্যমঞ্চে হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই নাট্যমঞ্চ ঠিক কবে নির্মিত হয়েছিল তার সঠিক তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে মিস্টার উইলের আঁকা ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দের কলকাতার মানচিত্রে এই নাট্যমঞ্চের ও সংলগ্ন নাচঘরের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই হিসেবে আমরা অনুমান করতে পারি যে ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দের পূর্ববর্তী কোনো সময়ে 'ওল্ড প্লে হাউস' নামক নাট্যমঞ্চ নির্মিত হয়েছিল। এই নাট্যমঞ্চের অভিনয়ে যুক্ত সকলেই অপেশাদার বা 'অ্যামেচার' ছিলেন। ইংলন্ডের বিখ্যাত শিল্পী ডেভিড গ্যারিকের কাছ থেকে অভিনয় সংক্রান্ত পরামর্শ ও সাহায্য এঁরা পেতেন। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে নবাব সিরাজদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণে এই নাট্যমঞ্চের ওপর আঘাত নেমে আসে এবং এই নাট্যমঞ্চে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই নাট্যমঞ্চে অভিনয়ের কোনো সংবাদ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

খ. **ক্যালকাটা থিয়েটার (The New Play House) :**

ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যমঞ্চের অনেককাল পরে 'ক্যালকাটা থিয়েটার' বা 'দি নিউ প্লে হাউস' বড়লাট হেস্টিংসের আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা জর্জ উইলিয়ামসন। অধুনা কলকাতার মহাকরণ বা রাইটার্স বিল্ডিং এর পেছনে লায়ন্স রেঞ্জের উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রায় পাঁচ বিঘা জমির ওপর ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয়েছিল এই 'ক্যালকাটা থিয়েটার'। বড়লাট হেস্টিংস ও ইলাইজা ইম্পে ছিলেন এই নাট্যমঞ্চের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। প্রায় এক লক্ষ টাকায় তৈরি এই নাট্যমঞ্চের দৃশ্যপট নির্মাণের জন্য ডেভিড গ্যারিকের সহায়তায় শিল্পী বার্নাড মেসিংককে কলকাতায় আনা হয়। এই নাট্যমঞ্চের মাঝখানে ছিল 'পিট' এবং এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত 'পিট'-কে ঘিরে ছিল 'বক্স'। এই 'ক্যালকাটা থিয়েটার'-এ প্রথমদিকে ভারতীয় দর্শকদের প্রবেশাধিকার ছিল না। কলকাতায় প্রথম সংবাদপত্র ইংরেজিভাষায় প্রকাশিত 'হিকি'জ বেঙ্গালি গেজেট'-এর কোনো-কোনো সংখ্যায় (১৭৮০) প্রথম পৃষ্ঠার বাঁদিকে এই 'ক্যালকাটা থিয়েটার'-এর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল। এই থিয়েটারে প্রবেশ মূল্য ছিল বক্সের জন্য 'এক মোহর' এবং পিট-সিট-এর জন্য আট সিক্কা টাকা। এই 'ক্যালকাটা থিয়েটার'-এ সর্বপ্রথম 'Subscription Performance' প্রথা চালু হয়। বস্তুত স্বল্পসংখ্যক ইংরেজ দর্শকের কারণে টিকিট বিক্রি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে অভিনয়ের পূর্বেই সদস্য-দর্শক নির্দিষ্ট ক'রে নেওয়ার যে পদ্ধতি তা 'Subscription Performance' নামে চিহ্নিত। 'ক্যালকাটা থিয়েটার'-এ ১২০ টাকার টিকিটে একজন ইংরেজপুরুষ ও তাঁর বাড়ির মহিলারা মোট ছয়টি অভিনয় দেখার সুযোগ পেতেন। 'ক্যালকাটা থিয়েটার' চালু হবার কিছুদিন পরে ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় নাট্যমঞ্চ হিসেবে এটি 'দি নিলে লর্ড কর্নওয়ালিসের নির্দেশে এই থিয়েটারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোনো কর্মচারী অভিনয়ে অংশগ্রহণের অনুমতি পেতেন না। ফলে এই থিয়েটারের অভিনেতারা সকলেই ছিলেন অপেশাদার বা অ্যামেচার। প্রথমদিকে নারীচরিত্রে পুরুষরা অভিনয় করতেন। পরে কোম্পানির আইন শিথিল হওয়ায় মহিলারা অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন।

'ক্যালকাটা থিয়েটার' বা 'দি নিউ প্লে হাউস'-এর উদ্যোক্তারা সমস্ত শ্রেণীর দর্শকদেরই আকৃষ্ট করার চেষ্টা করতেন। তারই ফলশ্রুতিতে এই নাট্যমঞ্চে শেক্সপীয়র থেকে শুরু করে বেন জনসন, জন ফ্রেচার, ফ্রান্সিস ব্যুমন্ট, কনগ্রিভ, ফিলিপ ম্যাসিঞ্জার, টমাস অটওয়ে, হেনরি ফিল্ডিং, শেরিডান প্রমুখের লেখা নাটক মঞ্চস্থ করার চেষ্টা হয়েছিল। এই নাট্যমঞ্চে

যেসমস্ত নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : শেক্স পীয়রের দি মার্চেন্ট অফ ভেনিস, ম্যাকবেথ, ওথেলো, হ্যামলেট, টমাস অটওয়ের ভেনিস প্রিজার্ভড্ এবং শেরিডানের স্কুল ফর স্ক্যান্ডাল। এই নাট্যমঞ্চে ক্যাপ্টেন কল নামক এক ব্যক্তি অভিনয়ের মাধ্যমে এমন খ্যাতি অর্জন করেন যে সেই সময় তাঁকে 'গ্যারিক অফ দি ইস্ট' বলা হতো।

একটানা তেত্রিশ বছর নাট্যমঞ্চে অভিনয় চালিয়ে ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে 'ক্যালকাটা থিয়েটার' বা 'দি নিউ প্লে হাউস' বন্ধ হয়ে যায়। এই মঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমে ক্যাপ্টেন কল ছাড়াও ব্যাণ্ডেল, পোলার্ড, ফ্রিট উড, রবিনসন, জেমস ব্যাটল প্রমুখ অভিনেতা এবং মিসেস হিউগেস, মিসেস হ্যারিটো, মিসেস বেসেট প্রমুখ অভিনেত্রী প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে এই নাট্যমঞ্চ বন্ধ হয়ে যাবার পর রাজাগোপীমোহন ঠাকুর এই নাট্যমঞ্চ কিনে নিয়ে সেখানে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন।

গ. মিসেস ব্রিস্টোর প্রাইভেট থিয়েটার (Mrs. Bristwo's Private Theatre) :

ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত নাট্যমঞ্চে 'মিসেস ব্রিস্টোর প্রাইভেট থিয়েটার' স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখযোগ্য। সেই সময়ের অসামান্য সুন্দরী ও নৃত্যকুশলী এমা র‍্যাংহাম কলকাতার সিনিয়ার মার্চেন্ট জন ব্রিস্টোকে বিবাহ করায় মিসেস ব্রিস্টো নামে পরিচিত হন। বিবাহের পর তিনি নৃত্যের অঙ্গন ছেড়ে নাট্যমঞ্চে আসেন। তিনি তাঁর চৌরঙ্গির বাড়িতে একটি ছোট্ট নাট্যমঞ্চ (১৭৮৯) প্রতিষ্ঠা করেন। এই ছোট্ট সুন্দর নাট্যমঞ্চটি সেই সময়ের ইংরেজদের প্রধান আকর্ষণের ক্ষেত্র ছিল। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ১ মে মিসেস ব্রিস্টোর থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। ঐদিন সঙ্গীতবহুল জনপ্রিয় নাটক পুওর সোলজার মঞ্চস্থ হয়।

মিসেস ব্রিস্টোর প্রাইভেট থিয়েটার একটি স্বতন্ত্র নাট্যমঞ্চ হিসেবে একটি অসামান্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল : মহিলা পরিচালিত প্রথম থিয়েটার।

আমরা 'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকা থেকে জানতে পারি যে এই নাট্যমঞ্চে পুওর সোলজার ছাড়া সুলতান ও প্যাডলক নাইট নাটক দুটি অভিনীত হয়। তবে এই নাট্যমঞ্চ ছিল ক্ষণস্থায়ী। প্রতিষ্ঠার পরের বছরই (১৭৯০) মিসেস ব্রিস্টোর প্রাইভেট থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়।

ঘ. হোয়েলার প্লেস থিয়েটার (Wheler Place Theatre) :

উচ্চবিত্ত অভিজাত ইংরেজদের জন্য ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি হোয়েলার প্লেস থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। ওয়ারেন হেস্টিংসের কাউন্সিলের সদস্য এডওয়ার্ড হোয়েলার এর নামে কলকাতায় একটি রাস্তা ছিল। যার নাম ছিল হোয়েলার প্লেস। এই রাস্তার ওপর ১৭৯৭ সালে নির্মিত হয় হোয়েলার প্লেস থিয়েটার।

১৭৯৭-র ২১ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার দি ড্রামাটিক প্রহসন দিয়ে এই রঙ্গামঞ্চের উদ্বোধন হয়। এরপরে এই মঞ্চে একের পর এক অভিনীত হয় সেন্ট প্যাট্রিকস ডে, থ্রি উইকস আফটার ম্যারেজ, দি মোগল টেল, দি মাইনর, দি ডেফ লাভার, দি লায়ার, দি ক্রিটিক ইত্যাদি নাটক, অপেরা ও প্রহসন। তবে স্থায়িত্ব ছিল না এই নাট্যমঞ্চের, ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে এই নাট্যমঞ্চটি বন্ধ হয়ে যায়।

ঙ. এথেনিয়াম থিয়েটার (Athenium Theatre) :

আমরা লক্ষ্য করেছি যে ক্যালকাটা থিয়েটার বা দি নিউ প্লে হাউস প্রতিষ্ঠার পরে দুটি নাট্যমঞ্চ যথাক্রমে মিসেস ব্রিস্টোর প্রাইভেট থিয়েটার ও হোয়েলার প্লেস থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হলেও সেগুলি ছিল স্বল্পস্থায়ী। ক্যালকাটা থিয়েটার-ই ছিল দীর্ঘস্থায়ী। ক্যালকাটা থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাবার পরে (১৮০৮) মিস্টার মরিস নামক এক ব্যবসায়ীর উদ্যোগে

১৮ নং সার্কুলার রোডে দুশো দর্শকাসন বিশিষ্ট একটি নাট্যমঞ্চ ১৮১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। যার নাম ছিল এথেনিয়াম থিয়েটার।

১৮১২ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মার্চ সোমবার আর্ল অফ এসেক্স এবং রেজিং দি উইণ্ড-এর অভিনয়ের মধ্য দিয়ে এথেনিয়াম থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। এখানে প্রবেশ মূল্য ছিল এক মোহর। পরে শেক্সপীয়রের কয়েকটি ট্র্যাজেডি মঞ্চস্থ হলেও তা সাফল্য পায়নি উপযুক্ত অভিনেতা-অভিনেত্রী না থাকায়। বারবার মঞ্চটির মালিকানা বদল হয়। শেষে ১৮১৪ সালে মি. মরিস আবার নতুন উদ্যমে চেষ্টা করেন এবং ঐ বছর ২৮ ফেব্রুয়ারি এই মঞ্চে 'হ্যামলেট' মঞ্চস্থ হয়। তৎসহ ছিল একটি প্রহসন, 'লাইং ভালেট'। কিন্তু উপযুক্ত শিল্পীর অভাবে দুটি প্রযোজনা-ই ব্যর্থ হয়। আবার ঐ বছরের ২৪ নভেম্বর দি ম্যাজিক পাইপ ও ড্যানসিং ম্যাড নামক দুটি প্রহসন মঞ্চস্থ হয়। কিন্তু সেগুলিও দর্শকদের প্রশংসা পায় না। ফলে মাসখানেক বাদেই এথেনিয়াম থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়।

চ. চৌরঙ্গি থিয়েটার (Chowringhee Theatre) :

বেশকিছু অভিজাত ও শিক্ষিত ইংরেজরা কলকাতায় একটি স্থায়ী ভালো নাট্যমঞ্চের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন। বিশেষত ক্যালকাটা থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাবার পর। ফলে প্রয়োজনের তাগিদে এগিয়ে এলেন এমেচার ড্রামাটিক সোসাইটির সভ্যরা। নাট্যরসিক শিক্ষিত ইংরেজদের এই সোসাইটি আবার বিফস্টিক সোসাইটি নামেও পরিচিত ছিল। এই ক্লাবের সদস্যদের ঐকান্তিক চেষ্টাতে চৌরঙ্গি ও থিয়েটার রোডের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এটি তৈরি হয়েছিল। ১৮১৩ সালে ২৫ নভেম্বর চৌরঙ্গি থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। প্রথম থেকেই ব্যক্তিগত সদস্য চাঁদায় নাট্যমঞ্চটি পরিচালিত হত। প্রত্যেক সদস্যই এই থিয়েটারের অংশীদার বা শেয়ারহোল্ডার ছিলেন।

চৌরঙ্গি থিয়েটারের সঙ্গে বহু বিখ্যাত মানুষ যুক্ত ছিলেন। সংস্কৃত পণ্ডিত ও ভারতবিদ এইচ. এইচ. উইলসন থেকে শুরু করে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন, ইংলিশম্যান কাগজের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক জে. এইচ. স্টোকলার, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ চৌরঙ্গী থিয়েটার-এর সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। এই মঞ্চের উদ্বোধন হয় ক্যাসল্ স্পেকটার নামক একটি বিয়োগান্ত নাটক ও সিক্স টি থার্ড লেটার নামক একটি অপেরার মঞ্চায়নে। বড়লাট লর্ড ময়রা, তাঁর স্ত্রী এবং বহু নাট্যরসিক ব্যক্তি সেদিন উপস্থিত ছিলেন।

সেকালের বেশকিছু খ্যাতিমান অভিনেতা ও অভিনেত্রী এই মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে স্টোকলার, পার্কার, মিসেস লিচ প্রমুখ ছিলেন উল্লেখ্য। খ্যাতনামা গায়ক উইলিয়াম লিন্টন, কর্নেল ডয়েলি, ডি. প্লেফেয়ার প্রমুখের যোগদানে এই মঞ্চটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এর অভিনেত্রী মিসেস লিচকে এদেশে সেসময় 'ইণ্ডিয়ান সিডনস' নামে অভিহিত করা হতো। ইংলন্ডে মিসারা সিডনস ছিলেন সেযুগের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী।

এই চৌরঙ্গি থিয়েটারে শেক্সপীয়র থেকে শুরু করে শেরিডান, গোল্ডস্মিথ, কোলম্যান, নোয়েলস, ফ্লেচার প্রমুখের নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। যেসমস্ত নাটক এখানে প্রবল জনসমাদর পেয়েছিল সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : স্কুল ফর স্ক্যান্ডাল, লাভ এ লা মোড, সি স্টুপস টু কঙ্কার, কোরিওলেনাস, জেলাস ওয়াইফ, দি আয়রন চেস্ট, হানিমুন, ম্যাট্রিমনি, বিজি বডি, দি অ্যাক্ট্রেস অফ স্মল ওয়ার্কস ইত্যাদি।

চৌরঙ্গি থিয়েটার তাদের অভিনয়ের জন্য বিপুল জনসমাদর ও খ্যাতি পেলেও নাট্যমঞ্চটির পরিচালন ব্যবস্থার ত্রুটিতে কিছুদিনের মধ্যে বিপুল ঋণের বোঝা ঘাড়ে চাপলো। প্রতিষ্ঠার বছরেই অর্থাৎ প্রথম বছরেই এর ঋণের পরিমাণ দাঁড়াল সতের হাজার টাকা। ফলে ক্রমশ আর্থিক অনটন চরম আকার ধারণ করায় ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে কর্তৃপক্ষ এই নাট্যমঞ্চ ভাড়া দিতে বাধ্য হলেন। ইতালির একটি অপেরা কোম্পানিকে মাসিক এক হাজার টাকায় ভাড়া দেওয়া হল। তারপরে

আর এক ফরাসি কোম্পানিকে ভাড়া দেওয়া হয়। এভাবে দু বছর চলার পর ১৮৩৫ নাগাদ দেখা গেল চৌরঙ্গি থিয়েটার ঋণের ভারে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। আয় প্রায় শূন্য অথচ ঋণ পর্বতপ্রমাণ। ফলে দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রস্তাব মতো চৌরঙ্গি থিয়েটার বিক্রির জন্য নিলাম ডাকা হল। ১৮৩৫ সালের ১৫ আগস্ট এই নিলামে ত্রিশহাজার একশো টাকার সর্বোচ্চ দর দিয়ে চৌরঙ্গি থিয়েটার কিনে নিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। নিলামের অর্থে সমস্ত ঋণ শোধ করা হয়। পার্কার, ক্লার্ক এবং কার এই তিন অভিনেতার হাতে থিয়েটার পরিচালনার ভার দেওয়া হলো। বিলেত থেকে আবার অভিনেত্রী নিয়ে আসা হল। এলেন ড্রুরি লেন থিয়েটার থেকে মিসেস চেস্টার। এভাবেই ১৮৩৯ পর্যন্ত চলল। এর মধ্যে মিসেস লিচ অসুস্থ হয়ে লন্ডন চলে যান। হঠাৎ ৩১ মে ১৮৩৯ রাতে বিধ্বংসী আগুনে থিয়েটার একেবারে ভস্মীভূত হয়ে যায়,—এভাবেই ইণ্ডিয়ান ড্রুরি লেন থিয়েটার অবলুপ্ত হয়ে গেল।

ছ. দমদম থিয়েটার (Dum Dum Theatre) :

কলকাতায় চৌরঙ্গি থিয়েটার যখন দারুণভাবে জনপ্রিয়, সেই সময় দমদম অঞ্চলে দমদম থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৭ সালে দমদমের মিলিটারি ব্যারাকের কাছেই এই থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। দমদম থিয়েটার খুব একটা বড়ো মাপের ছিল না। কিন্তু অভিনয়ের গুণে এই থিয়েটার অল্প সময়েই খ্যাতি অর্জন করে। এমনকি চৌরঙ্গি থিয়েটারের সোনায় মোড়া দিনগুলিতেও কলকাতা থেকে প্রচুর মানুষ দমদম থিয়েটারে নাটক দেখতে যেত। এসব কারণে দমদম থিয়েটারকে বলা হতো ইণ্ডিয়ান লিটিল ড্রুরি লেন থিয়েটার।

দমদম থিয়েটারে অভিনেত্রী হিসেবে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে মিসেস লিচ, মিসেস ব্ল্যান্ড, মিসেস গাটলিয়ার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তবে দমদম থিয়েটারের প্রাণপুরুষ চার্লস ফ্র্যাঙ্কলিং ছিলেন একজন ব্রিটিশ সৈনিক। এই চার্লস ফ্র্যাঙ্কলিংই ছিলেন দমদম থিয়েটারের পরিচালক ও প্রধান অভিনেতা। তাঁর উদ্যোগ ও পরিশ্রমে কলকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত এই থিয়েটার এমন এক উচ্চতায় পৌঁছেছিল যে চৌরঙ্গি থিয়েটার থাকা সত্ত্বেও এখানে দর্শকদের নিয়মিত আগমন ঘটত। তবে চার্লস ফ্র্যাঙ্কলিং ১৮২৪ সালে মারা যাবার পর দমদম থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়। ইণ্ডিয়া গেজেট পত্রিকায় চার্লস ফ্র্যাঙ্কলিঙের মৃত্যুর খবর শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখিতও হয়েছিল। এখানে যেসমস্ত নাটক অভিনীত হয়েছিল, তার মধ্যে পেজেন্ট বয়, দি উইল, দি ওয়াটারম্যান, রাইভ্যালস, ব্রোকেন সোর্ড, দি হানিমুন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

জ. বৈঠকখানা থিয়েটার (Boithakkhana Theatre) :

দমদম থিয়েটারের মতোই বৈঠকখানা থিয়েটার স্বকীয়তায় নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। ১৮২৪ সালের ২৪ মে এই বৈঠকখানা থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। কলকাতার বৈঠকখানা অঞ্চলের এই থিয়েটারের মঞ্চব্যবস্থা ছিল নাট্যপ্রযোজনার পক্ষে দারুণ উপযোগী। এখানেও বেশ কিছু প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী অভিনয় করতেন। তাঁদের মধ্যে মিসেস কোহেন এবং মিসেস ফ্রান্সিস ছিলেন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

১৭৭ বৈঠকখানা রোডে অবস্থিত এই থিয়েটারে যেসমস্ত নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল তার মধ্যে দি লাইং ভ্যালেট, এ ট্রিপ টু ক্যালে, ফিউরিওসো, স্লিপিং ড্রাফট, মাই ল্যান্ডলেডিজ গাউন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এগুলি ছিল নৃত্যগীতময় অপেরাধর্মী কমেডি।

১৮২৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ নামকরা অভিনেত্রীরা বৈঠকখানা থিয়েটার ছেড়ে চলে গেলে এটি ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়।

ঝ. সাঁ সুসি থিয়েটার (Sans Souci Theatre) :

সেই সময়ের প্রথমশ্রেণীর বিদেশি রঙ্গালয় চৌরঙ্গি থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাবার (১৮৩৯-এর ৩১ মে) আশি দিনের

মধ্যে কলকাতার গভর্নমেন্ট প্লেস ইস্ট ও ওয়াটারলু স্ট্রিটের এক কোণে থ্যাকার স্পিংক কোম্পানির বইয়ের দোকানের নীচের বাড়িতে চালু হল সাঁ সুসি থিয়েটার। ১৮৩৯-এর ২১ আগস্ট এই থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী সন্ধ্যায় এখানে অভিনীত হয় ইউ কান্ট ম্যারি ইওর গ্র্যাণ্ডমাদার নামক নাটক। তৎসহ দুটি প্রহসন, যথাক্রমে বাট হাউএভার এবং মাই লিট্‌ল এডপটেড।

প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী মিসেস লিচকে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে অভিনেতা ও সাংবাদিক স্টোকলার এই সাঁ সুসি থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাকালে এই থিয়েটারের দর্শকাসন ছিল চারশো। এই রঙ্গালয়ে টিকিটের মূল্য ছিল যথাক্রমে ছয় টাকা, পাঁচ টাকা ও চার টাকা। রঙ্গালয়টি নির্মাণের দায়িত্বে ছিলেন মিস্টার বলিস ও মিস্টার বার্টলেট। সুদৃশ্য এই রঙ্গালয়ে যে সমস্ত নাটক অভিনীত হয়েছিল তার মধ্যে ইউ কান্ট ম্যারি ইওর গ্র্যাণ্ডমাদার, মাই লিট্‌ল এডপটেড, দি ওয়েদার কক, দি ওরিজিনাল, প্লেজেন্ট ড্রিমস, দি লেডি অফ লায়ন্স, দি আইরিশ লায়ন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সাঁ সুসি থিয়েটারের এহেন অভাবনীয় সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে মিসেস লিচ স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী হলেন। স্থায়ী থিয়েটারের জন্য অর্থদানের আবেদন জানানো হলে বড়লাট অকল্যান্ড ও দ্বারকানাথ ঠাকুর এক হাজার টাকা করে দান করেন। আরও অনেকের অর্থদানের বিনিময়ে কলকাতার পার্ক স্ট্রিটে জমি সংগৃহীত হল। মিসেস লিচ ও স্টোকলারের উদ্যোগে নবকলেবরে স্থায়ী মঞ্চ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মঞ্চ স্থপতি ছিলেন মি. কলিনস। তৎসহ ছিলেন ইংলন্ড থেকে আগত জেমস ব্যারি ও মিসেস ব্যারি। শিল্পী হিসেবে ইংলণ্ড থেকে এলেন মিসেস ডিকল্ ও মিস কাউলি। এঁরা দুজনেই লন্ডনের অ্যাডেলফি থিয়েটারে যুক্ত ছিলেন। অত্যন্ত সুপ্রশস্ত, সুরম্য এই থিয়েটারে অর্কেস্ট্রার ব্যবস্থা ছিল। এই থিয়েটারে প্রবেশ মূল্য ছিল যথাক্রমে ছয় টাকা, তিন টাকা। এই সাঁ সুসি থিয়েটার-এ যন্ত্রসঙ্গীত পরিচালনার জন্যে এসেছিলেন মিস্টার ডেলমার এবং মঞ্চযবনিকা তৈরি করেন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী মিস্টার পোট।

২০ নং পার্ক স্ট্রিটে অবস্থিত এই স্থায়ী রঙ্গামঞ্চের উদ্বোধন হল ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দের ৬ মার্চ। উদ্বোধনী সন্ধ্যায় মঞ্চস্থ হয় নাটক দি ওয়াইফ। এই নাটকে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন মিসেস লিচ, ক্যাপ্টেন সিউয়েল, স্টোকলার, হিউম, হাওয়ার্ড প্রমুখেরা। এরপর শুরু হল সাঁ সুসি থিয়েটারের জয়যাত্রা। অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত অভিনেত্রী মাদাম দেরস্যাঁভিয়ে, লন্ডনের ড্রুরি লেন থিয়েটারের বিখ্যাত অভিনেতা জেমস্ ভাইনিং এই সাঁ সুসি থিয়েটারে যোগ দেওয়ায় এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল।

সাঁ সুসি থিয়েটারে মঞ্চস্থ দি মার্চেন্ট অফ ভেনিস-এর অভিনয় কলকাতায় তুমুল আলোড়ন তুলেছিল। বিশেষত মিসেস পোর্শিয়া, জেসিকা ও নেরিসা-র ভূমিকায় যথাক্রমে মিসেস ডিকল, মিসেস লিচ এবং মিস্ কাউলির অভিনয় খ্যাতি লাভ করে। এই সময়ে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক মঞ্চসফলতা পায়। তার মধ্যে উল্লেখ করতে পারি দি আইরিশ লায়ন, হ্যামলেট, দি ওয়াইফ, স্কুল ফর স্ক্যাণ্ডাল, রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট ইত্যাদির নাম।

১৮৪১ সালের ৮ নভেম্বর মার্চেন্ট অফ ভেনিস অভিনয় চলাকালীন মিসেস লিচের কাপড়ে আগুন লাগে। অগ্নিদগ্ধ হয়ে শেষপর্যন্ত তিনি মারা যান ১৮ নভেম্বর ১৮৪১ তারিখে। মৃত্যুর আগে মিসেস লিচ সাঁ সুসি থিয়েটারের মালিকানা দিয়ে যান একজন অভিনেত্রীকে। তাঁর নাম নিনা ব্যাক্স টার।

নিনা ব্যাক্স টার প্রচুর অর্থের বিনিময়ে ইংলন্ড থেকে মিস্টার ও মিসেস অরমণ্ডকে নিয়ে এলেন ও মঞ্চসফল পুরোনো নাটকগুলি আবার মঞ্চস্থ করলেন। কিন্তু মিসেস লিচের অভাব পূর্ণ হল না। আর্থিক দায়ভার ক্রমশ বাড়তে থাকল। এই অবস্থায় মিসেস ডিকল ও চার্লস ভাইনিং দল ছেড়ে দিলেন। মিসেস অরমণ্ড কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। সাঁ সুসি থিয়েটারকে টিকিয়ে রাখার জন্য ঘোড়ার খেলা থেকে শুরু করে সার্কাসসুলভ দড়ির ওপর নৃত্য ইত্যাদি কোনো

কিছুই আর তেমনভাবে দর্শক টানতে পারলো না। নিনা ব্যাক্সটারের সময়ে সাঁ সুসিতে মঞ্চস্থ নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল : ম্যাকবেথ, রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট, শি স্টুপস টু কঙ্কার, রেজিং দি উইণ্ড ইত্যাদি।

নিনা ব্যাক্সটার অবশেষে সাঁ সুসি থিয়েটার দিয়ে দিলেন দলের অভিনেতা জেমস ব্যারিকে। জেমস ব্যারি সাঁ সুসি থিয়েটার বাঁচানোর জন্য ইংলন্ড থেকে মিসেস লিচের কন্যা মিসেস অ্যাণ্ডারসনকে নিয়ে এলেন। ওথেলো নাটকে ডেসডিমোনার ভূমিকায় মিসেস অ্যাণ্ডারসনের অভিনয় দরুণ খ্যাতি অর্জন করেছিল। বিশেষত ১৮৪৮-এর ১৬ আগস্ট ওথেলো নাটকের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন রাধাকান্ত দেব, মহারাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, মহারাজা বৈদ্যনাথ রায় প্রমুখ। এই নাটকে নাম ভূমিকায় বৈষ্ণবচরণ আঢ্য' নামক এক বাঙালির অভিনয় সাড়া ফেলেছিল। ১৮৪৮-এর ২১ আগস্ট সংবাদ প্রভাকরের পাতায় এর বিবরণ পাওয়া যায়। ঐ বছরই ১২ সেপ্টেম্বর বৈষ্ণবচরণ আঢ্য ও মিসেস অ্যাণ্ডারসন অভিনীত ওথেলো আবার মঞ্চস্থ হয়। কিন্তু তবুও সাঁ সুসির অবস্থার উন্নতি ঘটল না। মিসেস অ্যাণ্ডারসন দল ছেড়ে দেবার পর ১৮৪৯-এর ২১ মে জেমস ব্যারির বিদায় সম্বর্ধনা উপলক্ষে সাঁ সুসি থিয়েটারে শেষবারের মতো ওথেলো মঞ্চস্থ হয়। এরপর সাঁ সুসি থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়।

চৌরঙ্গি থিয়েটারের সঙ্গে তুলনীয় সাঁ সুসি থিয়েটার দশ বছরেরও বেশি স্থায়ী হয়েছিল ও ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ থিয়েটার হিসেবে আজও চিহ্নিত হয়ে আছে।

অন্যান্য থিয়েটার :

সাঁ সুসি থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাবার পরও বেশ কিছু বিদেশি থিয়েটার চলেছিল। এগুলির স্থায়িত্বকাল ছিল অল্প কিন্তু থিয়েটার চর্চা যে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি তার সাক্ষ্য দেয় এসব থিয়েটার। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সেন্ট থিয়েটার, মিসেস লিউসের থিয়েটার রয়্যাল, ফোর্ট উইলিয়াম থিয়েটার, গ্যারিসন থিয়েটার ইত্যাদি। এছাড়াও কিছু নাট্যদল থিয়েটার রয়াল ও করিন্থিয়ান থিয়েটার ভাড়া নিয়ে কিছুদিন নাট্যচর্চা করেছিল। এই নাট্যদলগুলির মধ্যে হাডসন ড্রামাটিক কোম্পানি, দি এমেচার ড্রামাটিক সোসাইটি, এক্লিপস্ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এদের অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে রবিনসন ক্রুশো, মিকাডো, আলিবাবা, রবিনহুড, এ কান্ট্রিগার্ল, অ্যান আইডিয়াল হাজব্যাণ্ড, অর্কিড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১.৬ লেবেডেফ ও বেঙ্গালী থিয়েটার

বাঙালির আত্মিক ক্ষুধা যখন যাত্রাভিনয়ের রসে পরিতৃপ্তি খুঁজছে, সেই সময়ে বাঙালির কাছে হাজির হলেন গেরাসিম স্টেপানোভিচ লেবেডেফ। ইনি জাতিতে বাঙালি নন, ইংরেজও নন। অধুনা ইউক্রেনের বাসিন্দা লেবেডেফ (১৭৪৯-১৮১৮) ভাগ্যান্বেষণে ও ভারতীয় ভাষা-সংস্কৃতি দর্শন সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে মাদ্রাজে আসেন। পরে কলকাতায় এসে বাংলাভাষায় আগ্রহী হন। গোলকনাথ দাসের কাছে বাংলাভাষা শিক্ষা করেন। কলকাতায় ২৫ নম্বর ডোমটোলা-য় (ডোমতলা নয়) (যা বর্তমানে ৩৭ নম্বর এজরা স্ট্রিট) জগন্নাথ গাঙ্গুলি নামক এক ব্যক্তির বাড়ি ভাড়া নিয়ে লেবেডেফ তৈরি করেন একটি নাট্যশালা,—লেবেডেফ এই নাট্যশালার নাম দেন দি বেঙ্গালি থিয়েটার (The Bengally Theatre) (১৭৯৫)।

গোলকনাথ দাসের সাহায্যে লেবেডেফ দি ডিজগাইজ এবং লাভ ইজ দি বেস্ট ডক্টর নামে দুটি গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেন। লেবেডেফ তাঁর তৈরি দি বেঙ্গালি থিয়েটারে ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর মঞ্চস্থ হয় 'কাল্পনিক সংবদল' (দি ডিজগাইজের বাংলা অনুবাদ)। ঐ একই নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় হয় ১৭৯৬-র ২১ মার্চ। আবার তৃতীয়

অভিনয়ের জন্যে যখন লেবেডেফ প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ঠিক তখন দুর্ভাগ্যবশত বেঙ্গালি থিয়েটার-এর মঞ্চ আগুনে পুড়ে যায়। এরপর আর কোনো নাটক এখানে মঞ্চস্থ হয়নি।

লেবেডেফের অনূদিত দুটি নাটক কৌতুকরসের নাটক। দি ডিজগাইজের রচয়িতা ছিলেন অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ নাট্যকার রিচার্ড পল জড্রেল এবং অন্য নাটকটি রচনা করেন মলিয়ের। কিন্তু দ্বিতীয় নাটকটির অভিনয়ের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। লেবেডেফের মঞ্চ পরিকল্পনায় ইংরেজি ও রুশ মঞ্চরীতির পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায়। গোলকনাথ দাস অভিনেতা-অভিনেত্রী সংগ্রহ থেকে অভিনয় সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে লেবেডেফকে সাহায্য করেছিলেন। লেবেডেফ তাঁর নাটকের জন্যে যে প্রথম বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, সেটাও ছিল অভিনব, "Mr. Lebedeff's New Theatre in the Doomtullah, Decorated in the Bengalee style will be opened very shortly, with a play called 'The Disguise'. The character to be supported by performers of both sexes. to commence with vocal and instrumental Music called, The Indian Serenade'. (CALCUTTA GAZETTE, NOV. 5, 1795)। প্রথম রজনীতে লেবেডেফের থিয়েটারে প্রবেশ মূল্য ছিল গ্যালারির জন্য চার সিক্কা টাকা এবং বক্স ও পিটের জন্য আট সিক্কা টাকা।

লেবেডেফের বেঙ্গালি থিয়েটারে মাধ্যমে আমরা বাংলা নাট্য ঐতিহ্যের সাথে যুক্ত হতে দেখলাম কতকগুলি অনিবার্য গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। নাট্যশালা তথা থিয়েটারের নাম-ই হলো বেঙ্গালি থিয়েটার অর্থাৎ বাঙালিকে গুরুত্বদান। বিজ্ঞাপনে তিনি জানালেন, decorated in the Bengalee style। যদি লোক দেখানো মঞ্চের কথাও বলা হয় তবু বলবো মঞ্চসজ্জায় বাহিরঙ্গে অন্তত বাঙালিয়ানার ছাপ ছিল। অভিনয়ের ক্ষেত্রে বাঙালি অভিনেতা ও অভিনেত্রীর অংশগ্রহণ ছিল আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এবং শেষপর্যন্ত অভিনয় হয়েছিল মূলত বাংলাভাষাতে। ফলে 'কাল্পনিক সংবদল'-এর অভিনয় বাংলা নাট্য ঐতিহ্যে একটি উল্লেখ্য দিক। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, লেবেডেফের বেঙ্গালি থিয়েটারের 'কাল্পনিক সংবদল'-এর মঞ্চসফল অভিনয় তৎকালীন ইংরেজ পরিচালিত 'ক্যালকাটা থিয়েটার' কর্তৃপক্ষকে ঈর্ষান্বিত ও বিচলিত করে তোলে। তাই লেবেডেফের প্রতিদ্বন্দ্বী টমাস রোওয়ার্থের ষড়যন্ত্রে দৃশ্যপটশিল্পী জোসেফ ব্যাটল লেবেডেফের দলে ঢুকে একে একে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ভাঙিয়ে নিয়ে যান। চুক্তিভঙ্গ করে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা দল ছেড়ে যাওয়ায় লেবেডেফ আদালতে মামলা করেন। কিন্তু সেখানেও সুবিচার পেলেন না লেবেডেফ। কোনো ইংরেজ আইনজীবী লেবেডেফের হয়ে মামলা চালাতে রাজি হলেন না। তবু উদ্যম হারাননি তিনি। কিন্তু ১৭৯৭-র ৬ মে টমাস রোওয়ার্থের চক্রান্তে ঈর্ষাকাতর ইংরেজ ব্যবসায়ীরা লেবেডেফের বেঙ্গালি থিয়েটারে আগুন দিলে তা সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। আর্থিক দিক দিয়ে প্রভূত ক্ষতির মুখে পড়েন লেবেডেফ। এরপরেও কোনোক্রমে মঞ্চ খাড়া করে দি ডেজার্টার নামে একটি অপেরা মঞ্চস্থ করার চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু সেটাও ব্যর্থ হয়। ফলে উপায়হীন অবস্থায় লেবেডেফ তাঁর বেঙ্গালি থিয়েটারের সমস্ত উপকরণ বিক্রি করে দিয়ে একেবারে নিঃস্ব ও বিমর্ষ চিত্তে দেশে ফিরে যান। সেখানেই ১৮১৮-র ১৫ জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়।

১.৭ সখের নাট্যমঞ্চ

উনিশ শতকের তিরিশের দশক থেকেই অভিজাত, ধনী সম্প্রদায়ের মানুষদের নিজস্ব বাগানবাড়িতে বা নিজের জায়গায় মঞ্চ নির্মাণ ও নাট্যাভিনয়ের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত কলকাতায় বিদেশিদের, বিশেষত ইংরেজদের থিয়েটার ও অভিনয় দেখে বাঙালিরা আধুনিক থিয়েটারের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাছাড়া কলকাতার ধনী সম্প্রদায়ের বহু মানুষ—যেমন

দ্বারকানাথ ঠাকুর, মতিলাল শীল, রমানাথ ঠাকুর, প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রমুখ চৌরঙ্গি, সাঁ সুসি ইত্যাদি থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কলকাতার ধনী সম্প্রদায়ের এই উদ্যোগের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মতন : (১) ধনী সম্প্রদায়ের মানুষেরা নিজেদের বৈভব দেখাবার সুযোগ পেলেন; (২) নব্য ভাবনার পরিচয় দিয়ে ধনী সম্প্রদায়ের মানুষেরা উন্নত রুচির পরিচয় দিলেন; (৩) ধনী সম্প্রদায়ের মানুষরা প্রমাণ করতে চাইলেন যে থিয়েটার তাঁদের কাছে অর্থোপার্জন নয়, থিয়েটারের মধ্য দিয়ে নিছক প্রমোদ ও মনোরঞ্জন করাই তাঁদের লক্ষ্য; (৪) ইংরেজ সাহেবদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টাও ছিল তাঁদের মধ্যে।

বস্তুত বিদেশি রঙ্গালয়ের অভিনয় দেখে ধনী-অভিজাত সম্প্রদায়ের উদ্যোগে তৈরি হলো সখের নাট্যশালা। সমাচারচন্দ্রিকা পত্রিকা ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে এই ধরনের নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে। এর পাঁচ বছরের মধ্যেই শুরু হল সখের নাট্যশালার নির্মাণ ও অভিনয় :

ক. **প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার :**

বাঙালির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা প্রসন্নকুমারের হিন্দু থিয়েটার। প্রসন্নকুমার ঠাকুর ১৮৩১ সালের আগস্ট থেকে নভেম্বর এই চার মাসের অক্লান্ত চেষ্টায় তাঁর নারকেলডাঙ্গার বাগানবাড়িতে নির্মাণ করলেন একটি নাট্যশালা। এর নাম দিলেন হিন্দু থিয়েটার। প্রতিষ্ঠা পর্বে ১৮৩১-এর ১১ সেপ্টেম্বর প্রসন্নকুমার একটি পরিচালন কমিটি তৈরি করেন। এই কমিটিতে ছিলেন কৃষেণ সিং, কিষেণ দত্ত, গঙ্গাচরণ সেন, মাধবচন্দ্র মল্লিক, তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং হরচন্দ্র ঘোষ।

১৮৩১-এর ১৪ ডিসেম্বর হিন্দু থিয়েটার-এর দ্বারোদ্ঘাটন হয়। প্রথম সন্ধ্যায় অভিনীত হয় ভবভূতির উত্তররামচরিতের প্রথম অঙ্ক এবং শেক্স পীয়রের জুলিয়াস সিজারে পঞ্চম অঙ্ক। উত্তররামচরিতের অনুবাদ করেন সংস্কৃতজ্ঞ ইংরেজ পণ্ডিত এইচ. এইচ. উইলসন। উইলসন শুধু অনুবাদই করেননি তিনি নিজে অভিনয়েও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে জুলিয়াস সীজারে পঞ্চম অঙ্ক ইংরেজিতেই অভিনীত হয়েছিল। প্রথম অভিনয়ে দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্যার এডওয়ার্ড রায়ান, কর্নেল ইয়ং, রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ।

এরপরে প্রায় তিন মাস পরে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মার্চ একটি প্রহসনের অভিনয় হয় হিন্দু থিয়েটারে। প্রহসনটির নাম নাথিং সুপারফ্লুয়াস। এই প্রহসনের অভিনয়ে ছিলেন সুলতান, সালিন গফর, সাদি ও সুন্দরী জুলনেয়ার। হিন্দু থিয়েটারে ঐতিহাসিক স্বাতন্ত্র্য উল্লেখ্য : (১) বাঙালির প্রতিষ্ঠিত প্রথম থিয়েটার এই হিন্দু থিয়েটার। (২) ইংরেজি মডেলে নির্মিত বাঙালির থিয়েটার এই হিন্দু থিয়েটার। (৩) বাঙালির প্রতিষ্ঠিত প্রথম থিয়েটারে প্রথম অভিনয় ইংরেজি ভাষাতে ঘটে এখানে (জুলিয়াস সিজার, পঞ্চম অঙ্ক)। (৪) বাঙালির প্রতিষ্ঠিত প্রথম থিয়েটারের নাট্যশিক্ষক হিসেবে একজন বিদেশি—এইচ. এইচ. উইলসন। (৫) হিন্দু থিয়েটারের দর্শক ছিলেন বাঙালি ও ইংরেজ উভয়পক্ষই। (৬) হিন্দু থিয়েটারের সময়ে বাঙালির মধ্যে থিয়েটারের উদ্দীপনা দেখা দিলেও বাংলায় নাটক রচনা শুরু হয়নি তখনও।

সাধারণ দর্শকদের কাছে হিন্দু থিয়েটার তেমন জনপ্রিয় হল না। তাই এক বছরের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেল হিন্দু থিয়েটার।

শেষে আমরা হিন্দু থিয়েটার সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করতে পারি, যা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—"Prasanna Kumar Tagore's theatre was hardly anything more than the enlarged edition of a college dramatic club....Its appeal was both artificial and restricted. It is no wonder, therefore, that it was very short lived"—(বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৮)।

খ. **নবীন বসুর নাট্যশালা :**

অধুনা কলকাতার যেখানে শ্যামবাজার ট্রাম ডিপো সেখানে নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয় একটি নাট্যশালা। তৎকালীন ধনী নবীনচন্দ্র বসুর এই শ্যামবাজারের নাট্যশালায় বছরে চার-পাঁচটি বাংলা নাটকের অভিনয়ের সংবাদ জানা যায়। তবে সব কটি অভিনয়ের বিস্তৃত তথ্য আমরা পাইনি।

বস্তুত প্রসন্নকুমারের হিন্দু থিয়েটারের মঞ্চ নির্মাণে উৎসাহিত হয়ে নবীনচন্দ্র বসু শ্যামবাজারে একটি নাট্যশালা নির্মাণ করেন। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ৬ অক্টোবর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাহিনির নাট্যরূপ অভিনয়ের মধ্য দিয়ে এই নাট্যশালার উদ্বোধন হয়। এই নাটক ঐ দিন রাত ১২টায় শুরু হয়ে শেষ হয় পরদিন সকাল ৬টায়।

নবীনচন্দ্র বসু বিলিতি ধাঁচে নাট্যশালা নির্মাণ করে সেখানে কিন্তু মঞ্চস্থ করলেন প্রথম বাংলা নাটক। লেবেডেফও ১৭৯৫-এ তেমন চেষ্টা করলেও বাঙালি হিসেবে নবীনচন্দ্রই প্রথম। এই নাট্যমঞ্চে নবীনচন্দ্রের উদ্যোগে নারীচরিত্রে অভিনেত্রীদের গ্রহণ করা হয়েছিল। এই নাট্যমঞ্চের জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করেন নবীনচন্দ্র। বিলেত থেকে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে বিদেশি যন্ত্র এনে নতুন ধরনের আলোর ব্যবস্থা করা হয়। দেশীয় যন্ত্রের সাহায্যে অর্থাৎ সেতার, বেহালা, পাখোরাজ, সারেঙ্গি ইত্যাদির সাহায্যে ঐকতান বাদন হয়েছিল। লক্ষণীয় যে বাদকগণের অধিকাংশই ছিলেন ব্রাহ্মণ। পরমেশ্বর বন্দনার মধ্য দিয়ে নাটক আরম্ভ করা হতো। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২২ অক্টোবর পাইওনীয়র পত্রিকায় নবীন বসুর নাট্যশালা, তার মঞ্চ-দৃশ্যপট-আলো সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করা হয়। বিশেষত বাস্তব পটভূমি ব্যবহার ছিল এই নাট্যমঞ্চের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ছড়ানো মঞ্চে বীরসিংহ রাজার ঘর, মালিনীর কুঁড়ে, সুড়ঙ্গপথ ইত্যাদি সবই দৃশ্যমান ছিল বাস্তবিকভাবে।

থিয়েটারের অনুষঙ্গ ব্যবহারে এক অভিনবত্ব সৃষ্টি ও বাংলা নাটকের অভিনয় এই দুইয়ে মিলে নবীনচন্দ্র বসুর নাট্যশালা ইঙ্গ-বঙ্গ দর্শকদের দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। এই নাট্যমঞ্চে বিদ্যাসুন্দর নাটকে সুন্দরের ভূমিকায় অভিনয় করেন শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদ্যার ভূমিকায় ষোল বছরের কিশোরী রাধামণি ওরফে মণি অভিনয় করেন। রানি ও মালিনী এই দুই চরিত্রেই অভিনয় করেন জয়দুর্গা নামক এক প্রৌঢ়া মহিলা। স্বয়ং নবীনচন্দ্র বসু কালুয়া চরিত্রে এবং রাজা বৈদ্যনাথ রায় ভুলুয়া চরিত্রে অভিনয় করেন।

তবে সবদিক দিয়ে থিয়েটারধর্মী হওয়ার চেষ্টা থাকলেও নবীন বসুর নাট্যশালা যাত্রার স্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল না। তাই কালুয়া-ভুলুয়া চরিত্র নির্মাণ, সঙ্গীতের প্রাধান্য ইত্যাদি থেকেই গেল।

বিদ্যাসুন্দর নাটক জনপ্রিয় হওয়ায় এই নাটকের একাধিক অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়। ধনী নবীনচন্দ্র বসু তাঁর নাট্যশালায় 'থিয়েটার' নির্মাণের চেষ্টায় প্রচুর অর্থব্যয়ে যা করেছিলেন তা অনেকাংশে দেশীয় যাত্রা থেকে থিয়েটারে পৌঁছোনোর প্রচেষ্টা ছিল একথা আমরা বলতেই পারি।

১.৮ সখের নাট্যমঞ্চের বিকাশ

ক. **ওরিয়েন্টাল থিয়েটার :**

প্রসন্নকুমার ও নবীন বসুর আন্তরিক চেষ্টার পরে নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি নাট্যশালা নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছিলেন বলে জানা যায় (সূত্র : ন্যাশনাল পেপার : ১১ ডিসেম্বর ১৮৭২ : নবগোপাল মিত্র)। কিন্তু এই নাট্যশালা সম্পর্কে আমরা বিস্তৃত কিছু জানতে পারিনি। শুধু তাই নয়, এর মাঝে বেশ কিছুদিন বাংলা থিয়েটারের কোনো সংবাদ বা তথ্য

আমরা পাই না। শুধুমাত্র ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে হেয়ার আকাদেমির বাঙালি ছাত্ররা মার্চেন্ট অব ভেনিস মঞ্চস্থ করে এই সংবাদ পাওয়া যায় (সূত্র : সংবাদ প্রভাকর : ৬ জুলাই ১৮৫৩)।

ঠিক ঐ সময়ে (সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩) কলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুলে একটি নাট্যশালা নির্মিত হয়। এখানে গৌরমোহন আঢ্যের বাঙালি ছাত্ররা ইংরেজি নাটকের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে। ওরিয়েন্টাল থিয়েটার নামে এই থিয়েটারে ওরিয়েন্টাল সেমিনারির প্রধান শিক্ষক হেরম্যান জেফ্রয়, কলাকাতা মাদ্রাসা স্কুলের শিক্ষক মিস্টার ক্লিঞ্জার (ইনি সাঁ সুসি থিয়েটারে যুক্ত ছিলেন) ছাত্রদের অভিনয় শিক্ষা দিতেন।

ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে উদ্যোগী ছাত্র-অভিনেতাদের মধ্যে যাঁদের অভিনয় খ্যাতিলাভ করেছিল তাঁদের মধ্যে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ দে, দীননাথ ঘোষ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের ২৬ সেপ্টেম্বর এই ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। ঐ দিন সন্ধ্যায় মঞ্চস্থ হয় ওথেলো। এই ওথেলো নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় ১৮৫৩-র ৫ অক্টোবর। ওথেলো নাটকে প্রিয়নাথ দে ইয়াগোর ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেন। এরপরে শ্রীমতী ইলিসের প্রশিক্ষণে শেক্স পীয়রের আরও দুটি নাটক ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের মঞ্চস্থ হয় : মার্চেন্ট অব ভেনিস (২ মার্চ ১৮৫৪) এবং হেনরি দি ফোর্থ (১০ মার্চ ১৯৫৪)। ১৮৫৪ সালের ১৭ মার্চ মার্চেন্ট অফ ভেনিস নাটকের দ্বিতীয় অভিনয়-এ মিসেস গ্রিগ নামক এক ইংরেজ মহিলা পোর্শিয়া চরিত্রে অভিনয় করেন। এছাড়া মেরিডিথ পার্কারের আমাটোর নামক একটি প্রহসন এখানে মঞ্চস্থ হয় (৫ এপ্রিল ১৮৫৪) (সূত্র : সংবাদ প্রভাকর : ৬ আগস্ট, ১০ সেপ্টেম্বর, ১২ অক্টোবর ১৮৫৩ এবং ৮ এপ্রিল ১৮৫৪)।

ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে টিকিট বিক্রি করে বিদেশি থিয়েটারের অনুরূপ নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পরামর্শে এই থিয়েটারে দেশীয় নাটকের অভিনয় ও দেশজ বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার-এর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু দু বছরের স্থায়ী এই থিয়েটারে কোনো বাংলা নাটকের অভিনয় হয়নি।

খ. **প্যারীমোহন বসুর জোড়াসাঁকো থিয়েটার :**

নবীনচন্দ্র বসুর ভাইপো প্যারীমোহন বসু তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে তৈরি করেন জোড়াসাঁকো থিয়েটার। প্রসন্নকুমার প্রতিষ্ঠিত হিন্দু থিয়েটারের মতন জোড়াসাঁকো থিয়েটারেও ইংরেজি নাটকের অভিনয় মূল ইংরেজি ভাষাতেই মঞ্চস্থ করা হয়। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৩ মে এই জোড়াসাঁকো থিয়েটারে শেক্স পীয়রের জুলিয়াস সিজার অভিনীত হয়। এই নাট্যশালাটির সাজসজ্জা ছিল খুব সুন্দর। জুলিয়াস সিজার অভিনয় দেখার জন্য সেদিন চারশো দর্শক উপস্থিত ছিলেন। সিজারের ভূমিকায় মহেন্দ্রনাথ বসুর অভিনয় সকলের উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। এছাড়া ব্রুটাস ও কেসিয়াসের ভূমিকায় অভিনয় করেন কৃষ্ণধন দত্ত ও যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়।

গ. **সাতুবাবুর বাড়ির নাট্যশালা :**

নবীনচন্দ্র বসুর নাট্যশালায় বিদ্যাসুন্দরের অভিনয়ের পর (১৮৩৫) কুড়ি বছরেরও অধিককালে বাঙালির নাট্যশালায় কোনো বাংলা নাটক মঞ্চস্থ হবার প্রামাণ্য তথ্য আমরা এখনও পাইনি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে নাট্যাভিনয়ের যে ধারা সূচিত হল তাতে ১৮৫৭ একটি উল্লেখ্য বছর। এই বছরেই তিনটি নাট্যশালা বাংলা নাটকের অভিনয় শুরু করে—সাতুবাবুর বাড়ির নাট্যশালা, জয়রাম বসাকের নাট্যশালা এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ। স্বভাবতই ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ সম্পর্কে অন্যতর ভাবনা ও প্রাপ্তির কথা শোনা যায়,— "The year 1857 marks the begining of a new epoch in the history of bengali Drama and Theatre. In fact, Bengali Drama and the stage have had a continuous history since that memorable year"—(Bengali Drama and Stage : Page 43 : Probodh Chandra Sen)।

সেই সময়ে কলকাতার বিখ্যাত ধনী আশুতোষ দেব (যিনি সাতুবাবু নামে অধিক পরিচিত ছিলেন)। তাঁর বাড়িতে ১৮৫৬-র ১৫ এপ্রিল (সাতুবাবুর মৃত্যুর পরে, মৃত্যু ২৯ জানুয়ারি ১৮৫৬) জ্ঞানদায়িনী সভার (সাতুবাবুর বাড়িতে স্থাপিত) সভ্যরা মিলিত হয়ে একটি নাট্যশালা নির্মাণ ও অভিনয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এখানে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সাতুবাবুর দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষ ও চারুচন্দ্র ঘোষ। বাঙালির নাট্যশালায় বাংলা নাটক অভিনয় হবে এ সংবাদে আনন্দ প্রকাশ ক'রে ১৫ জানুয়ারির (১৮৫৭) সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় লেখা হলো, "সম্ভ্রান্ত ও দেশীয় ভদ্রলোকেরা বিশুদ্ধ আমোদের জন্যে সচরাচর অর্থব্যয় করেন না। এই কারণে আমাদের সম্ভ্রান্ত যুবকগণ সাধারণত যে সকল নীচ আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকেন, তাহা হইতে তাহাদিগকে মুক্ত দেখিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম"।

১৮৫৭-র ৩০ জানুয়ারি, সরস্বতী পুজোর দিন সাতুবাবুর বাড়ির নাট্যশালার উদ্বোধন হয়। প্রথম দিন সন্ধ্যায় মঞ্চস্থ হয় নন্দকুমার রায় অনূদিত ও প্রকাশিত নাটক কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলা।

বহু দিন পর বাঙালির নাট্যশালায় বাংলা নাটকের অভিনয়ে চারদিকে তুমুল আলোড়ন তুলেছিল। এই নাটকে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁরা হলেন—শরৎচন্দ্র ঘোষ (শকুন্তলা), প্রিয়মাধব মল্লিক (দুষ্যন্ত), অন্নদা মুখোপাধ্যায় (দুর্বাসা), অবিনাশচন্দ্র ঘোষ (অনসূয়া), ভুবনচন্দ্র ঘোষ (প্রিয়ংবদা) এবং মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (ঋষিকুমার)। স্টেজ ম্যানেজার ছিলেন উমেশচন্দ্র দত্ত। এই নাটকের সঙ্গীত রচনা করেন কবিচন্দ্র।

সুসজ্জিত এই নাট্যশালায় চারশো দর্শকাসন সেদিন পূর্ণ ছিল। সকলেই অভিনয় প্রশংসা পেয়েছিল। বিশেষত শকুন্তলার ভূমিকায় শরৎচন্দ্র ঘোষের অভিনয় উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছিল। এই মঞ্চে শকুন্তলা নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় হয়েছিল ১৮৫৭ সালের ২২ ফ্রেব্রুয়ারি। তবে ঐ দিন নাটকটির মাত্র তিনটি অঙ্ক অভিনীত হয়েছিল। এছাড়াও সাতুবাবুর বাড়ির নাট্যশালা মঞ্চস্থ হয় মহাশ্বেতা নামক একটি নাটক। বাণভট্টের কাদম্বরী অবলম্বনে এই নাটক রচনা করেন মণিমোহন সরকার। অবশ্য এই নাটকে তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য অনূদিত কাদম্বরী-গ্রন্থের ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়। মহাশ্বেতা মঞ্চস্থ হয় ১৮৫৭-র ৫ সেপ্টেম্বর। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন : শরৎচন্দ্র ঘোষ (তরলিকা), ভুবনচন্দ্র ঘোষ (রানি), ক্ষেত্রমোহন সিংহ (মহাশ্বেতা), মহেন্দ্রনাথ ঘোষ (কাদম্বরী), মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (ছত্রধারিণী এবং পুণ্ডরীক ও নটী) মহাশ্বেতা নাটকটির ত্রুটিপূর্ণ সংলাপ ও নিম্নমানের অভিনয় নাটকটিকে জনপ্রিয় করতে পারেনি।

তবু সাতুবাবুর বাড়ির নাট্যশালা বিভিন্ন কারণে উল্লেখ্য ভূমিকা পালন করেছিল :

এক. বাঙালির মঞ্চে ইংরেজি নাটকের অভিনয়ের পরিবর্তে বাংলা নাটকের অভিনয়।

দুই. স্ত্রী চরিত্রে পুনর্বার পুরুষের অভিনয়।

ঘ. **রামজয় বসাকের বাড়ির নাট্যশালা :**

অধুনা কলকাতার টেগোর ক্যাসল রোডে রামজয় বসাকের বাড়িতে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে একটি নাট্যশালা নির্মিত হয়। মূলত কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদ্দুর্লভ বসাক, প্রিয়নাথ বসুদের উদ্যোগে এবং রামজয় বসাকের অর্থানুকুল্যে নির্মিত হয় এই নাট্যশালা। ১৮৫৭ সালের ৫ মার্চ এখানে মঞ্চস্থ হয় রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলীনকুলসর্বস্ব। এই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন রামজয় বসাক, রাধাপ্রসাদ বসাক, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণচন্দ্র বসাক, জগদ্দুলর্ভ বসাক এবং রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নাটক মোট চারবার মঞ্চস্থ হয়। রামজয় বসাকের বাড়ির নাট্যশালায় কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকের অভিনয়ের উল্লেখ্য দিক হল : এই প্রথম বাঙালির নাট্যশালায় মৌলিক বাংলা নাটকের অভিনয় হল। এবং এই প্রথম কোনো সমাজ সমস্যামূলক নাটক বাংলায় প্রথম অভিনীত হল।

ঙ. **কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ :**

সুপরিচিত বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যরসিক জোড়াসাঁকোর সিংহ পরিবারের সন্তান কালীপ্রসন্ন ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে গঠন করেছিলেন বিদ্যোৎসাহিনী সভা নামক একটি সাহিত্যসভা। এই সাহিত্যসভার সকলে মিলে নির্মাণ করেন বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গামঞ্চ (১৮৫৬)। ১৮৫৭-র ১১ এপ্রিল এই মঞ্চের উদ্বোধনে অভিনীত হয় ভট্টনারায়ণের সংস্কৃত নাটক বেণীসংহারের বাংলা অনূদিত নাট্যরূপ। অনুবাদ করেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। এই নাটকের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, ক্ষেত্রমোহন সিংহ, মণিমোহন সরকার প্রমুখ। এই নাটক দেখতে এদেশীয় দর্শকদের সাথে ইংরেজরাও উপস্থিত ছিলেন। এই নাটকের অভিনয় প্রচুর প্রশংসা অর্জন করে। তাতেই উৎসাহী হয়ে কালীপ্রসন্ন স্বয়ং কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকের বাংলায় অনুবাদ করেন ও গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৪ নভেম্বর বিক্রমোর্বশী মঞ্চস্থ হয় বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গামঞ্চে। সুসজ্জিত মঞ্চে অভিনীত এই নাটক অভিনয় সাফল্য লাভ করে। এই নাটকে রাজা পুরুরবার ভূমিকায় কালীপ্রসন্ন-র অভিনয় সকলকে মুগ্ধ করেছিল। এমনকি ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই নাটকের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন।

১৮৫৮-র ৫ জুন কালীপ্রসন্ন সিংহ রচিত সাবিত্রী সত্যবান মঞ্চস্থ হয় বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গামঞ্চে। অভিনয়ে পূর্বে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে এই নাটকের 'অভিনয়যোগ্য পাঠ' হয়েছিল সেদিন (সূত্র : সংবাদ প্রভাকর : ৮ জুন ১৮৫৮)। সুকুমার সেন একে "নাট্যোচিত আবৃত্তি" বলেছেন। এই ধরনের অনুষ্ঠান মঞ্চে এদেশে পূর্বে ঘটেনি। বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গামঞ্চ প্রথম এই অনুষ্ঠান করেন। একইরকমভাবে 'অভিনয়যোগ্য পাঠ' ১৮৫৯-র ৩ ফেব্রুয়ারি এখানে হয়েছিল মালতীমাধব নাটক অবলম্বনে।

১৮৫৯-র পরে আর কোনো অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায় না। বিদ্যোৎসাহী রঙ্গামঞ্চ নানা কারণে আজও আলোচ্য :

১. দুই বছরের স্থায়িত্বকালে মঞ্চ নির্মাণ, অভিনয় কৃতিত্ব উল্লেখ্য।

২. এখানেই প্রথম ড্রপসীন এঁকে ব্যবহার করা হয়।

৩. এই মঞ্চে ভরত, কালিদাস, ভট্টনারায়ণ প্রমুখদের চিত্র-মূর্তি স্থাপন করে একটি ক্লাসিক পরিমণ্ডল সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়।

৪. এদেশে প্রথম এই মঞ্চে 'অভিনয়যোগ্য পাঠ' প্রচলিত হয়।

৫. মৌলিক নাট্যকার হিসেবে কালীপ্রসন্ন সিংহ বাংলা নাট্যরচনার ধারায় যুক্ত হন।

১.৯ সখের নাট্যমঞ্চের পরিণতি

ক. **বেলগাছিয়া নাট্যশালা :**

পাইকপাড়ার দুই বিখ্যাত ধনী রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও তাঁর ভাই ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ১৮৫৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেন বেলগাছিয়া নাট্যশালা। তাঁদের বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে এই নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের চেষ্টাতে ও উদ্যোগে ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের অভিনেতারা বেলগাছিয়া নাট্যশালায় যোগদান করেন। ইংরেজি থিয়েটারের আদর্শে বিপুল অর্থব্যায়ে নির্মিত হয় বেলগাছিয়া নাট্যশালা। দৃশ্যপট অঙ্কন করেন ইংরেজ শিল্পীরা। পাদপ্রদীপে গ্যাসের আলোর ব্যবহার করা হয়।

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জুলাই বেলগাছিয়া নাট্যশালার উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অভিনীত হয় শ্রীহর্ষের সংস্কৃত নাটক রত্নাবলী। বাংলায় অনুবাদ করেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। রত্নাবলী নাটকের প্রথম অভিনয় দেখতে

এসেছিলেন ছোটলাট হেলিডে সাহেব, মিস্টার হিউম, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নাট্যকার রামনারায়ণ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ।

রত্নাবলী নাটকের এই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন—ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ (রুমজান), হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (রত্নাবলী), প্রিয়নাথ দত্ত (রাজা উদয়ন), কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (বিদূষক), মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী (বাসবদত্তা), গিরিশ চট্টোপাধ্যায় (বাহুভূতি), রামনাথ লাহা (নটী), প্রমুখেরা। নাটকের সঙ্গীত পরিচালনা করেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, সঙ্গীত রচনা করেন গুরুদয়াল পাল। নাট্য পরিচালনায় ছিলেন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। এই অভিনয়ে গীতবাদ্য, আলো, সাজসজ্জা, সর্বোপরি অভিনয় এত উঁচুমানের ছিল যে ৫ আগস্ট 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় এই নাট্যাভিনয়ের উচ্চ প্রশংসা করা হয়। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিনয়ের জন্য কেউ কেউ তাঁকে 'বাংলার গ্যারিক' আখ্যায় চিহ্নিত করেন। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মঞ্চস্থ রত্নাবলী-র অভিনয় এদেশে নাট্যাভিনয়ের ধারায় কিংবদন্তি হয়ে গেল।

ইংরেজ দর্শকদের দিকে তাকিয়ে রত্নাবলী নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ফলে বেলগাছিয়া নাট্যশালার সঙ্গে যুক্ত হন মধুসূদনও। এই রঙ্গামঞ্চের জন্য তিনি রচনা করলেন শর্মিষ্ঠা। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় ১৮৫৯-র ৩ সেপ্টেম্বর মঞ্চস্থ হলো শর্মিষ্ঠা। ৩ সেপ্টেম্বর ও ২৭ সেপ্টেম্বর এই দু' বার শর্মিষ্ঠা মঞ্চস্থ হয়। শর্মিষ্ঠা নাটকের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন : প্রিয়নাথ দত্ত (যযাতি), কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (বিদূষক), দীননাথ ঘোষ (শুক্রাচার্য), ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ (বকাসুর), হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (দেবযানী), কৃষ্মধন বন্দ্যোপাধ্যায় (শর্মিষ্ঠা), চুনীলাল বসু (নট)। এছাড়াও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র সভাসদ হিসেবে অভিনয় করেন। শর্মিষ্ঠা নাটকের অভিনয় দেখে স্বয়ং মধুসূদন এতই তৃপ্ত হয়েছিলেন যে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে তিনি চিঠিতে জানিয়েছিলেন,—"As for my own feelings, they were, things to dream of, not to tell."।

বিদূষকের ভূমিকায় কেশবচন্দ্রের অভিনয় অসামান্য খ্যাতি অর্জন করে। বেলগাছিয়া নাট্যশালার সাজসজ্জা, আলো, দৃশ্যপট, দেশীয় ঐকতানবাদন, নৃত্যগীত,—সর্বোপরি অভিনয় এমনই উঁচুমানের ছিল যে সখের নাট্যমঞ্চের ধারায় সকলের নাট্য প্রচেষ্টাকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী স্বয়ং 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে বলেছেন, "এই নাট্যালয় বঙ্গসাহিত্যে এক নবযুগ আনিয়া দিবার উপায়স্বরূপ হইল। ইহা অমর কবি মধুসূদনের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিল।"

বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনয়ের জন্যই মধুসূদন রচনা করেন পদ্মাবতী, কৃষ্মকুমারী, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড় শালিখের ঘাড়ে রোঁ। কিন্তু উদ্যোক্তাদের উৎসাহের অভাব ও আপত্তির কারণে এগুলির কোনোটিই আর বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মঞ্চস্থ হলো না। মধুসূদনের নাট্যজীবনের সূত্রপাত ও বিকাশে যেমন বেলগাছিয়া নাট্যশালার ভূমিকা অনস্বীকার্য—তেমনভাবেই ঐ নাটকগুলির অভিনয় না হওয়ায় মধুসূদনের মনোবেদনার ফলশ্রুতিতে তাঁর নাট্যকার জীবনের অপমৃত্যুতেও বেলগাছিয়া নাট্যশালার ভূমিকা নিন্দার্হ।

১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মার্চ রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের অকাল মৃত্যুতে বেলগাছিয়া নাট্যশালা গভীর সঙ্কটে পড়ে যায়। শেষপর্যন্ত চিরতরে এই নাট্যশালা বন্ধ হয়ে যায়।

খ. **মেট্রোপলিটান থিয়েটার :**

১৮৫৯ সালে রামগোপাল মল্লিকের বাড়িতে (চিৎপুরের সিঁদুরিয়া পট্টি) প্রতিষ্ঠিত হয় মেট্রোপলিটান থিয়েটার। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে এখানে স্থাপিত হয়েছিল মেট্রোপলিটান কলেজ। মুরলীধর সেনের স্বত্বাধিকারে ও কেশবচন্দ্র সেনের অধ্যক্ষতায় স্থাপিত হয় মেট্রোপলিটান থিয়েটার। ১৮৫৯-র ২৩ এপ্রিল উমেশচন্দ্র মিত্রের বিধবাবিবাহ নাটকের অভিনয় এর মাধ্যমে এই থিয়েটারের সূত্রপাত। ঐ বছরের ৭ মে আবার এখানে আবার নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

১৮৫৬ সালে বিধবাবিবাহ আইন চালু হবার পর বিধবা নারীর মর্মযন্ত্রণা সম্বলিত বিধবাবিবাহ নাটক নিঃসন্দেহে আলোড়িত করে সকলকে। এই নাটকাভিনয়ের জন্য দৃশ্যপট অঙ্কন করেন মিস্টার হলবাইন। নাটকটির সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন দ্বারকানাথ রায় এবং সুর দেন রাধিকাপ্রসাদ দত্ত। কেশবচন্দ্র সেন ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। স্বয়ং বিদ্যাসাগর মেট্রোপলিটান থিয়েটার-এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি এই নাট্যমঞ্চে অভিনীত বিধবাবিবাহ নাটক দু' বারই দেখেন এবং কেঁদে ফেলেন। হিন্দু নারীর চিরবৈধব্য ভোগের কুফল এমনটি প্রত্যক্ষ করে বিদ্যাসাগর অশ্রুপাত করেন। একারণেই নাটকটি অন্যতর মর্যাদা পায়।

গ. **পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়**

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পাথুরিয়াঘাটার রাজবাড়িতে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয় পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়। এর আগে যতীন্দ্রমোহনের খুল্লতাত প্রসন্নকুমার ঠাকুর ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু থিয়েটার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাঙালি ধনীগৃহে নাট্যাভিনয়ের প্রবর্তন করেন। তারই ধারাপথে নির্মিত হয় পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়। এই বঙ্গনাট্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বেই যতীন্দ্রমোহনের আদিবাড়িতে গোপীমোহন ঠাকুরের নাচঘরে তাঁর ভাই শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহযোগিতায় নির্মিত হয়েছিল একটি ছোট্ট নাট্যশালা।

যাইহোক ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর এই পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে মঞ্চস্থ হয় ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর। নাট্যরূপ দেন স্বয়ং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। ঐ রাতেই বিদ্যাসুন্দরের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয় রামনারায়ণ তর্করত্নের প্রহসন যেমন কর্ম তেমনি ফল। ১৮৬৬ সালের ৬ জানুয়ারি দ্বিতীয়বার এখানে বিদ্যাসুন্দর মঞ্চস্থ হয়। এই দুই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন মদনমোহন বর্মণ (বিদ্যা), কৃষ্মধন বন্দ্যোপাধ্যায় (হীরে মালিনী), রাধাপ্রসাদ বসাক (রাজা বীরসিংহ), হরিমোহন কর্মকার (মন্ত্রী), গিরিশ চট্টোপাধ্যায় (গঙ্গাভাট) প্রমুখেরা। এছাড়াও মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সুন্দর), নারায়ণচন্দ্র বসাক (বিমলা), যদুনাথ ঘোষ (সুলোচনা), হরকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (চপলা) উল্লেখ্য। বিদ্যাসুন্দর ও যেমন কর্ম তেমনি ফল মোট দশবার অভিনীত হয়।

এখানে ১৮৬৬ সালের ১৫ ডিসেম্ভবর ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় রচিত বুঝলে কিনা নামক একটি প্রহসন মঞ্চস্থ হয়।

এরপরে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি অভিনীত হয় রামনারায়ণ অনূদিত ভবভূতির নাটক মালতীমাধব। ঐ বছরের ৫, ৬ এবং ১৯ ফেব্রুয়ারি মালতীমাধব আবার মঞ্চস্থ হয়। ১৮৭০-র ২৬ ফেব্রুয়ারী মালবিকাগ্নিমিত্র ও দুটি প্রহসন চক্ষুদান ও উভয়সংকট মঞ্চস্থ হয় এখানে। ১৮৭২-র ১৩ জানুয়ারি মঞ্চস্থ হয় রুক্মিণীহরণ ও উভয়সংকট। আবার ১৮৭৩-র ২৫ ফেব্রুয়ারি বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়িতে এলে ঐদিন রুক্মিণীহরণ ও উভয়সংকট মঞ্চস্থ হয়। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে এই নাট্যশালা বন্ধ হয়ে যায়। পুনরায় ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে শৌরীন্দ্রমোহনের দৃশ্যকাব্য রসাবিষ্কারকবৃন্দ অভিনয়ের মাধ্যমে এই নাট্যশালা চালু হয়। কিন্তু তা স্থায়ী হয়নি।

বস্তুত সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে যতীন্দ্রমোহনের উদ্যোগে পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয় বাংলা নাট্যচর্চায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা এই নাট্যশালাকে জাতীয় নাট্যশালার মর্যাদা দিতে চেয়েছিল।

ঘ. **শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি :**

১৮৬৫-তে রাজা রাধাকান্তদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা দেবীকৃষ্ম বাহাদুরের উদ্যোগে রাজবাড়ির যুবকরাও বাইরের কিছু শিক্ষিত যুবকেরা একত্রে স্থাপন করেন শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি। এর কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি ছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ।

১৮৬৫-র ১৮ জুলাই শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি মঞ্চে অভিনীত হয় একেই কি বলে সভ্যতা। ঐ বছরের ২৯ জুলাই দ্বিতীয়বার ঐ প্রহসন মঞ্চস্থ হয়। এর পরে সভাপতি ও কিছু সদস্য এই থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তবু অভিনয় থেমে যায়নি। ১৮৬৭ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী এখানে মঞ্চস্থ হয়। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন : বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (ভীমসিংহ), প্রিয়মাধব বসুমল্লিক (বলেন্দ্রসিংহ), কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ (জগৎসিংহ), কুমার ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ (কৃষ্ণকুমারী), হরলাল সেন (বিলাসবতী), রামকুমার মুখোপাধ্যায় (মদনিকা) প্রমুখ।

শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি সম্পর্কে আমরা শুধু বলতে পারি : (১) এই রঙ্গালয় প্রথম মধুসূদনের একেই কি বলে সভ্যতা ও কৃষ্ণকুমারী নাটক অভিনয়ের সাহস দেখিয়েছিল। (২) অভিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহায্য ছাড়াও মঞ্চাভিনয়ের কৃতিত্ব কম বড় কথা নয়।

ঙ. **জোড়াসাঁকো নাট্যশালা :**

১৮৬৫-র মে মাসে ঠাকুরবাড়ির জোড়াসাঁকো নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়িতে তাঁর মেজ ছেলে গিরীন্দ্রনাথের অংশে (৫ নং বাড়ি) জোড়াসাঁকো নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই মঞ্চে ১৮৬৫-র জুন মাসে মঞ্চস্থ হয় মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী নাটক। তারপরে মঞ্চস্থ হয় মধুসূদনের একেই কি বলে সভ্যতা। যতদূর জানা যায় কৃষ্ণকুমারী নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কৃষ্ণকুমারীর মায়ের ভূমিকায় এবং একেই কি বলে সভ্যতা প্রহসনে পুলিশ সার্জনের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

এরপরে অভিনয়ের উপযুক্ত নাটক চেয়ে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুলাই ইন্ডিয়ান মিরর পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। ১৮৬৬-র ২ মে প্রকাশিত হয় রামনারায়ণের নবনাটক। এই নাটকের জন্য জোড়াসাঁকো নাট্যশালা (ঠাকুরবাড়ির) কমিটি নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নকে একটি রৌপ্য পাত্র ও দুশো টাকা পুরস্কার দেন। ঠাকুরবাড়ির জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় নবনাটক অভিনয়ের জন্য গুণেন্দ্রনাথ প্রধান দায়িত্ব পান। শ্রেষ্ঠ পটুয়ারা দৃশ্যপট অঙ্কন করেন, সামনের যবনিকা পর্দায় রাজস্থানের ভীমসিংহের সরোবর-তটস্থ জগমন্দির প্রাসাদ অঙ্কিত হয়। প্রায় ছমাস মহড়া চলে। তারপর ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ জানুয়ারি নবনাটক মঞ্চস্থ হয়। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (নটী), নীলকমল মুখোপাধ্যায় (নট), যদুনাথ মুখোপাধ্যায় (চিত্ত ঘোষ), সারদাপ্রসাদ (গণেশবাবুর স্ত্রী), অক্ষয় মজুমদার (গবেশবাবু), মতিলাল চক্রবর্তী (কৌতুক অভিনেতা), অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায় (ছোটগিন্নি), বিনোদলাল গঙ্গোপাধ্যায় (সুবোধ)। এঁরা সকলেই ঠাকুরবাড়ির আত্মীয়পরিজন ও নিকট বন্ধু। এই নবনাটক মোট ন'বার ঠাকুরবাড়ির জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় অভিনীত হয়। সখের থিয়েটারের পরিণত পর্বে 'জোড়াসাঁকো নাট্যশালা' প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে পাশ্চাত্য নাট্যরীতির সঙ্গে ভারতীয় নাট্যরীতি ও বাংলার দেশজ নাট্যরীতির সংমিশ্রণ ঘটানো হয়। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে সাময়িকভাবে এই নাট্যশালা বন্ধ হয়ে যায়। পরে ১৮৭৭ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অলীকবাবু অভিনয়ের মাধ্যমে এর পুনরুজ্জীবন ঘটে। তবে তা স্বতন্ত্র আলোচনারযোগ্য।

চ. **বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয় :**

বলরাম ধর ও চুনীলাল বসুর উদ্যোগে কলকাতার বহুবাজারের ২৫ নং বাঞ্ছারাম অক্রূরের গলিতে গোবিন্দচন্দ্র সরকারের বাড়িতে নির্মিত হয় বহুবাজার নাট্যসমাজ। এই নাট্যশালার উপদেষ্টা ছিলেন মধ্যস্থ পত্রিকার সম্পাদক ও নাট্যকার মনোমোহন বসু। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের ৩ অক্টোবর মনোমোহন বসু রচিত রামাভিষেক নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বহুবাজার বঙ্গ নাট্যালয়-এর উদ্বোধন হয়। সুবিন্যস্ত অঙ্গসজ্জা, সাজপোষাক ও উচ্চমানের অভিনয়গুণে রামাভিষেক নাটকটি খ্যাতিলাভ করে। এই নাটকের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন : অম্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (দশরথ), উমাচরণ ঘোষ (রাম), বলদেব ধর (লক্ষ্মণ), মতিলাল বসু (বিদূষক), চুনীলাল বসু (কৌশল্যা), চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সুমিত্রা), আশুতোষ

চক্রবর্তী (সীতা) এবং ক্ষেত্রমোহন দে (মন্থরা)। এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর পরে বহুবাজার অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের চেষ্টায় ও অর্থানুকুল্যে ২৫ নং মতিলাল লেনে বহুবাজার নাট্যসমাজের স্থায়ী নাট্যশালা নির্মিত হয়। তখন তার নাম হয় বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়। এলাহাবাদের নীলকমল মিত্র ও অন্য কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই নাট্যশালার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। পরিচালকমণ্ডলীর সম্পাদক ছিলেন প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই স্থায়ী রঙ্গামঞ্চে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি মঞ্চস্থ হয় মনোমোহন বসু রচিত সতী নাটক। এই রঙ্গামঞ্চটি ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও দৃশ্যপট ছিল খুবই সুচারুভাবে অঙ্কিত। ঐকতান বাদন ও নৃত্যগীত ছিল উচ্চমানের। সতী নাটকে যাঁরা অভিনয় করেন তাঁদের মধ্যে চুনীলাল বসু (শিব ও দক্ষ), প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (নারদ), বলদেব ধর (নগরপাল), আশুতোষ চক্রবর্তী (সতী) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এরপর ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি মঞ্চস্থ হয় মনোমোহন বসুর হরিশ্চন্দ্র নাটক। এই নাটকে অভিনয় করেন চুনীলাল বসু (হরিশ্চন্দ্র), ননীলাল দাস (রোহিতাশ্ব), প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বিশ্বামিত্র), বলদেবধর (নগরপাল), নন্দ ঘোষ (মল্লিকা) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে স্থাপিত বহুবাজার নাট্যসমাজ নানা কারণে নাট্যমঞ্চের ধারায় উল্লেখ্য :

১. নিয়মিত নাট্যাভিনয়ের প্রবর্তন (প্রতি শনিবার)।

২. একই নাটকের ধারাবাহিক সুষ্ঠু অভিনয়।

৩. স্থায়ী মঞ্চ নির্মাণ।

৪. নাট্যকার মনোমোহন বসুর নাট্যরচনার সূত্রপাত।

৫. নাট্য প্রযোজনায় পেশাদারিত্বের প্রচেষ্টা।

১.১০ অনুশীলনী

১.১০.১ বিস্তৃত প্রশ্নাবলী :

১. বাংলা নাটকে যাত্রার কোনো প্রভাব আছে কি? যুক্তি দিন।

২. বেঙ্গালী থিয়েটার কার? এই থিয়েটারের অবদান আলোচনা করুন।

৩. বাংলা নাট্যমঞ্চে সখের নাট্যশালাগুলির ভূমিকা কতটুকু? যে কোনো তিনটি সখের নাট্যশালার পরিচয় দিন।

৪. বেলগাছিয়া নাট্যশালার আলাদা গুরুত্বের কথা বলা হয়।—কোথায় এর আলাদা গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৫. কলকাতার সাহেবি রঙ্গামঞ্চের ইতিহাসে চৌরঙ্গি থিয়েটার ও সাঁ সুসি থিয়েটারের ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

৬. বাংলার নাট্যাভিনয়ে লেবেডেফের ভূমিকার গুরুত্ব নির্ণয় করুন।

১.১০.২ অবিস্তৃত প্রশ্নাবলী :

১. কলকাতার সাহেবি রঙ্গামঞ্চে প্রধান অভিনেত্রীদের গুরুত্ব কতটুকু ছিল?

২. চৈতন্যদেবের নাট্যাভিনয় বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করুন।

৩. কলকাতার বিলিতি থিয়েটারগুলিতে শেক্সপীয়রের কী কী নাটক অভিনীত হয়েছিল?

৪. শ্যামবাজারে নবীন বসুর নাট্যশালা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

৫. বিদ্যোৎসাহী রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

১.১০.৩ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

১. অষ্টাদশ শতকে যে কৃষ্ণযাত্রা ছিল, তার নাম কি ছিল?

২. বাংলায় যাকে রঙ্গালয় বলা হয়, ইংরেজিতে তাকে কি বলে?

৩. ওল্ড প্লে হাউস কবে কোথায় নির্মিত হয়েছিল?

৪. ক্যালকাটা থিয়েটার কত বছর অভিনয় চালিয়েছিল?

৫. কোন্ ইংরেজ মহিলার নামে কোথায় প্রথম নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়?

৬. চৌরঙ্গি থিয়েটার কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

৭. চৌরঙ্গি থিয়েটার প্রতিষ্ঠার মূলে কারা ছিলেন?

৮. চৌরঙ্গি থিয়েটারের সঙ্গে কোন্ কোন্ ভারতবিদ্ ও সংস্কৃতপণ্ডিত যুক্ত ছিলেন?

৯. সাঁ সুসি থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা কে? কবে এর প্রতিষ্ঠা?

১০. কলকাতার কোন্ অভিনেত্রীর অগ্নিদগ্ধ হয়ে জীবনাবাসন ঘটে? কবে?

১১. কোন্ বাঙালি অভিনেতা প্রথম সাহেবি থিয়েটারে অংশ নেন? কবে?

১২. লেবেডেফ কে? তিনি কার কাছে বাংলাভাষা শেখেন?

১৩. লেবেডেফ কোন্ দুটি গ্রন্থের অনুবাদ করেন?

১৪. প্রসন্নকুমার ঠাকুর কে? তিনি কি জন্য পরিচিত?

১৫. বিদ্যাসুন্দর কাব্য প্রথম নাটকরূপে কোথায় পরিবেশিত হয়?

১৬. সাতুবাবু কে? তিনি কি জন্য বিখ্যাত?

১৭. বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা কে? কবে প্রতিষ্ঠা?

১৮. পাইকপাড়ার কোন্ দুই ভাই থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন? সেই থিয়েটারের নাম কি?

১৯. কোন্ বাংলা নাটকের দর্শক ছিলেন বিদ্যাসাগর ও মধুসূদন?

২০. ঠাকুরবাড়িতে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী ছিলেন কারা?

একক ১খ ☐ বাংলা মঞ্চাভিনয়ের ইতিহাস ১৮৭২-১৯১২ ☐ দ্বিতীয় পর্ব

গঠন

১.১১ সাধারণ রঙ্গালয় : প্রতিষ্ঠা

১.১২ সাধারণ রঙ্গালয় : বিকাশ

১.১৩ সাধারণ রঙ্গালয় : পরিণতি

১.১৪ বেঙ্গল থিয়েটার

১.১৫ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার

১.১৬ ন্যাশনাল থিয়েটার

১.১৭ স্টার থিয়েটার (বিডন স্ট্রিট)

১.১৮ এমারেল্ড থিয়েটার

১.১৯ বীণা থিয়েটার

১.২০ স্টার থিয়েটার (হাতিবাগান)

১.২১ সিটি থিয়েটার

১.২২ মিনার্ভা থিয়েটার

১.২৩ ক্লাসিক থিয়েটার

১.২৪ অরোরা থিয়েটার

১.২৫ কোহিনূর থিয়েটার

১.২৬ অনুশীলনী

১.২৭ গ্রন্থপঞ্জি

১.১১ সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর ৩৬৫ আপার চিৎপুর রোডে মাইকেল মধুসূদন সান্যালের বাড়িতে (বর্তমানে ২৭৯এ-এফ রবীন্দ্র সরণি) দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে সাধারণ রঙ্গালয়ের সূচনা হয়। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে সাধারণ রঙ্গালয় বা ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পেছনে ছিল বাগবাজার এমেচার থিয়েটার (প্রতিষ্ঠা ১৮৬৭) এবং শ্যামবাজার নাট্যসমাজ (প্রতিষ্ঠা ১৮৭২, মে ১১)। এই দুই নাট্যশালার উদ্যোগী যুবকবৃন্দের ঐকান্তিক চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় সাধারণ রঙ্গালয়। যাঁদের উদ্যোগে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল সুর, রাধামাধব কর, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, অমৃতলাল বসু ও ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পরে যোগ দেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। এই সাধারণ

রঙ্গালয় এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মনোমোহন বসু, অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ এবং হিন্দুমেলার উদ্যোক্তা ও ন্যাশনাল পেপার পত্রিকার সম্পাদক নবগোপাল মিত্র।

মাসিক চল্লিশ টাকা ভাড়ায় সাধারণ রঙ্গালয় এর মঞ্চ তৈরি হয়। মঞ্চ নির্মাণের প্রধান দায়িত্বে ছিলেন ধর্মদাস সুর। সম্পাদক ছিলেন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রথম অভিনয়ে (নীলদর্পণ) টিকিটের হার ছিল যথাক্রমে দু'টাকা, একটাকা এবং আট আনা। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর 'ভারতীয় রঙ্গালয়ের ইতিহাস' গ্রন্থে জানিয়েছেন যে প্রথম অভিনয়ে (৭ ডিসেম্বর ১৮৭২) মোট সাতশো টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছিল। 'নীলদর্পণ' অভিনয়ে চারদিকে আলোড়ন পড়ে যায়। উপস্থাপনার গুণে ও অভিনয়ের দক্ষতায় 'নীলদর্পণ' নাটকটি খ্যাতি অর্জন করে। অভিনয়-শিক্ষক অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির পরিচালনায় এই নাটকে অভিনয় করেন : অর্ধেন্দুশেখর (উডসাহেব, গোলক বসু, সাবিত্রী, চাষা), নগেন্দ্রনাথ (নবীনমাধব), কিরণ (বিন্দুমাধব), শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (গোপীনাথ দেওয়ান), মতিলাল সুর (তোরাপ ও রাইচরণ), মহেন্দ্রলাল বসু (পদীময়রানি), ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (সরলা), অবিনাশচন্দ্র কর (রোগসাহেব), অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (ক্ষেত্রমণি), তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় (রেবতী), অমৃতলাল বসু (সৈরিন্ধ্রী), শশিভূষণ দাস (আমিন, পণ্ডিতমশাই, কবিরাজ), পূর্ণচন্দ্র ঘোষ (লাঠিয়াল) এবং গোপালচন্দ্র দাস (আদুরি)।

নীলদর্পণ-এর অভিনয় প্রসঙ্গে ১৮৭২-এর ১২ ডিসেম্বর অমৃতবাজার পত্রিকায় বলা হল : ".....এরূপ অভিনয় সমাজ দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে আর একটি মহৎ ফল ফলিবে। উপযুক্ত গ্রন্থকারগণ নাটক লিখিতে উৎসাহিত হইবেন, ভরসা অচিরাৎ আমরা দুই একখানি ভাল নাটক পাঠ করিতে পারিব।" নীলদর্পণ-এর অভিনয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রশংসা করা হলেও ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকায় ছদ্মনামে দুটি বিদ্রূপাত্মক চিঠি (১৯ ও ২৭ ডিসেম্বর ১৮৭২) প্রকাশিত হয়, চিঠির লেখক ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। অবশ্য এর দুই মাস পরেই গিরিশচন্দ্র সাধারণ রঙ্গালয় তথা ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগদান করেন।

১.১২ সাধারণ রঙ্গালয় : বিকাশ

সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পর ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে অভিনীত হল দীনবন্ধু মিত্রের জামাইবারিক (১৪ ডিসেম্বর), নীলদর্পণ (২১ ডিসেম্বর) এবং সধবার একাদশী (২৮ ডিসেম্বর)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে নীলদর্পণ নাটকের দ্বিতীয় অভিনয়ের পর ইংরেজ শাসকদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। অমৃতলালের স্মৃতিকথায় উল্লেখ আছে; "নীলদর্পণ অভিনীত হইবার সময় এক রাত্রিতে (২১.১২.১৮৭২) পুলিশের ডেপুটি কমিশনার ডাইলস সাহেব আসিয়াছেন শুনিয়া অনেকে মনে করিল যে তিনি দু'চারজনকে ধরিয়া লইয়া যাইবেন। তাহাতে কেহই দমিয়া গেল না, বরং সকলেরই ফূর্তি বাড়িয়া গেল; তোরাপবেশে মতিলাল আস্ফালন করিয়া বলিল, 'ধরে নিয়ে যাবে। আমি এই লুঙ্গি পরেই যাব'।"

বস্তুত একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে রঙ্গামঞ্চে নীলদর্পণ নাটককে কেন্দ্র করেই আমাদের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। এই নাটকের অভিনয় দেখতে-দেখতে কখনো-কখনো ইংরেজশাসক সম্প্রদায় উত্তেজিত হয়েছেন। কখনোবা স্বদেশবাসী।

যাই হোক সাধারণ রঙ্গালয়-এ ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে অভিনীত হলো : নবীন তপস্বিনী (৪ জানুয়ারি), লীলাবতী (২১ জানুয়ারী), বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৫ জানুয়ারি), নবীন তপস্বিনী (১৮ জানুয়ারি), নবনাটক (২৫ জানুয়ারি), নীলদর্পণ (১ ফেব্রুয়ারি), নয়শো রুপেয়া (৮ ফেব্রুয়ারি), জামাইবারিক (১৫ ফেব্রুয়ারি)। একমাত্র শিশির ঘোষের 'নয়শো রুপেয়া' ছাড়াবাকি সব নাটকই দীনবন্ধু মিত্রের লেখা। ঐ সমস্ত নাটকগুলির সঙ্গে কুব্জার কুঘটন, নববিদ্যালয়, পাক্কাতামেশা, পরীস্থান ইত্যাদি প্রহসনগুলি মঞ্চস্থ হয়েছিল।

সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয়ের মাধ্যমেই অর্ধেন্দুশেখর হয়ে উঠলেন প্রখ্যাত শিল্পী। তাঁর অভিনীত গোলোক বসু, উড সাহেব, সৈরিন্ধ্রী, জীবনচন্দ্র বা জলধর তাঁকে প্রথমশ্রেণীর অভিনেতার মর্যাদা দিয়েছিল।

১৮৭৩-এর ২২ ফেব্রুয়ারি সাধারণ রঙ্গালয়ে মঞ্চস্থ হল মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী। ভীমসিংহের ভূমিকায় অভিনয় করলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ধনদাসের ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখর এবং কৃষ্ণকুমারীর ভূমিকায় ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

সাধারণ রঙ্গালয়ের বিকাশ পর্বে ১৮৭৩-এর ৮ মার্চ শেষ অভিনয় হল। ঐ দিন মঞ্চস্থ হয় বুড় শালিখের ঘাড়ে রোঁ ও যেমন কর্ম তেমনি ফল। সঙ্গে ছিল প্যান্টোমাইম (বিলাতিবাবু, সাবস্ক্রিপসান বুক, গ্রিনরুম অব আ প্রাইভেট থিয়েটার, মডেল স্কুল, মুস্তাফি সাহেব কা পাক্কা তামাশা)। অভিনয়ের শেষে অর্ধেন্দুশেখর বিদায়ী ভাষণ দেন ও বিহারীলাল বসুর গানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

১.১৩ সাধারণ রঙ্গালয় : পরিণতি

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৮ মার্চ সাধারণ রঙ্গালয়ের দলবদ্ধ শেষ অভিনয়ের পর দল ভেঙে গেল। দল ভেঙে যাওয়ার পেছনে বিবিধ কারণ ছিল, তার মধ্যে উল্লেখ্য হল :

১. খ্যাতির বিড়ম্বনা—পারস্পরিক মনোমালিন্য ;

২. ব্যক্তিত্বের সংঘাত—একই দলে একাধিক ভালো অভিনেতা ;

৩. অভিনয় উপযোগী সাজসরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণের অসুবিধা ;

৪. বর্ষায় খোলামঞ্চে অভিনয়ে বাধা।

সাধারণ রঙ্গালয় বা ন্যাশনাল থিয়েটার ভেঙে দুটো দল তৈরি হল :

ক. ন্যাশনাল থিয়েটার

খ. হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার

প্রথম দলে অর্থাৎ ন্যাশনাল থিয়েটারে ছিলেন গিরিশচন্দ্র, ধর্মদাস সুর, মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। মঞ্চের সরঞ্জাম তাঁরা পেলেন। অন্যদিকে দ্বিতীয় দলে অর্থাৎ হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারে ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, অমৃতলাল বসু, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। পোশাক-পরিচ্ছদ যা ছিল এঁরা সবই পেলেন।

গিরিশচন্দ্রের নেতৃত্বে ন্যাশনাল থিয়েটার (নতুন) টাউন হলে এবং রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে মঞ্চ বেঁধে নাট্যাভিনয় করতে থাকে। তার মধ্যে নীলদর্পণ (১৮৭৩, ২৯ মার্চ, টাউন হল), সধবার একাদশী (১৮৭৩, ৫ এপ্রিল, টাউন হল), কৃষ্ণকুমারী (১৮৭৩, ১২ এপ্রিল, রাধাকান্তদেবের বাড়ি), নীলদর্পণ (১৮৭৩, ১৯ এপ্রিল, রাধাকান্ত দেবের বাড়ি) উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও একেই কি বলে সভ্যতা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কিঞ্চিৎ জলযোগ এবং কপালকুণ্ডলার নাট্যরূপও মঞ্চস্থ করে এই ন্যাশনাল থিয়েটার। এরপরে ন্যাশনাল থিয়েটার ঢাকায় অভিনয় করতে যায়। কিন্তু সেখানে দল ব্যর্থ হয়। ঋণগ্রস্ত হয়ে ফিরে আসে। অবশ্য গিরিশচন্দ্র ঢাকায় যাননি।

অন্যদিকে হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার লিন্ডসে স্ট্রিটে অপেরা হাউস ভাড়া নিয়ে অভিনয় চালাতে থাকে। প্রথমদিকে কিছু প্রহসন ও প্যান্টোমাইম মঞ্চস্থ করার পরে বিধবাবিবাহ (উমেশচন্দ্র মিত্র) ও নীলদর্পণ অভিনয় করে হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার দল। এরপরে দল ঢাকায় যায় ও সেখানে নীলদর্পণ, রামাভিষেক মঞ্চস্থ করে। তাছাড়াও ঢাকায় সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয় নীলদর্পণ, নবনাটক, সধবার একাদশী, নবীন তপস্বিনী, জামাইবারিক ও কৃষ্ণকুমারী।

এরপরে ন্যাশনাল থিয়েটার ও হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার এই দুই দলেরই অনেকে একত্রে অভিনয়ের চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। শেষপর্যন্ত দুই দল-ই অভিনয় বন্ধ করে দিল।

১.১৪ বেঙ্গল থিয়েটার

ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাবার পরে ১৮৭৩-এর ১৬ আগস্ট ৯ নং বিডন স্ট্রিটে বিখ্যাত ধনী সাতুবাবুর বাড়ির সামনের প্রাঙ্গণে পাঁচহাজার টাকার অধিক ব্যয়ে নির্মিত হয় বেঙ্গল থিয়েটার। লিউসের লাইসিয়াম থিয়েটারের অনুকরণে বেঙ্গল থিয়েটার নামক নাট্যশালাটি নির্মিত হয়। বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা শরৎচন্দ্র ঘোষ। শরৎচন্দ্র ছিলেন সাতুবাবুর দৌহিত্র। এই নাট্যশারা নির্মাণে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন মধুসূদন ও উমেশচন্দ্র দত্ত। এছাড়াও সঙ্গে ছিলেন বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, হরিদাস দাস, দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, অক্ষয়কুমার মজুমদার প্রমুখ। এই নাট্যশালার অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন প্যারীমোহন রায়। ১৮৭৩-এর ২২ ফেব্রুয়ারির মধ্যাহ্ন পত্রিকায় সংখ্যায় জানা যায় যে, ১৮ জন অংশীদার প্রত্যেকে এক হাজার টাকা দিয়ে এই নাট্যশালা নির্মাণে অগ্রণী হয়েছিলেন। এই প্রথম কলকাতায় বাঙালির নিজস্ব থিয়েটার বাড়ি তৈরি হল।

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন শরৎচন্দ্র ঘোষ (যযাতি), বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (শুক্রাচার্য), এলোকেশী (দেবযানী), জগত্তারিণী (দেবিকা) এবং গোলাপসুন্দরী (শর্মিষ্ঠা)। এরপরে ১৮৭৩-এর ৬ সেপ্টেম্বর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস রচিত মোহান্তের এই কি কাজ মঞ্চস্থ করে বেঙ্গল থিয়েটার। বর্ধমানের মহারাজা বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয় দেখে (রত্নাবলী ও কৃষ্ণকুমারী) প্রীত হয়ে এই থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক হন। সেই উপলক্ষে ১৮৭৩-এর ১২ ডিসেম্বর বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনীর নাট্যরূপ অভিনীত হয়। এটি খুব সাফল্য পায়। অভিনয়ে ছিলেন শরৎচন্দ্র (জগৎসিংহ), হরিদাস দাস (ওসমান), জগত্তারিণী (তিলোত্তমা), গোলাপসুন্দরী (আয়েষা) প্রমুখ। জগৎসিংহের ভূমিকায় শরৎচন্দ্র ঘোড়ার পিঠে চড়ে মঞ্চে প্রবেশ করতেন। এই ঘটনা সেই সময়ে দর্শকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েছিল।

বেঙ্গল থিয়েটারের সেরা সাফল্যের বছর ১৮৭৪। এই বছরে একে একে অভিনীত হয় পদ্মাবতী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরুবিক্রম, হরলাল রায়ের বঙ্গে সুখাবসান, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের মণিমালিনী, বিদ্যাসুন্দর, যেমন কর্ম তেমনি ফলষ পুরুবিক্রম, ইত্যাদি। এর মধ্যে পুরুবিক্রম, যেমন কর্ম তেমনি ফল এবং বিদ্যাসুন্দর জনপ্রিয় হয়।

১৮৭৫-তে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের অমৃতলাল বসু, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে বেঙ্গল থিয়েটার মঞ্চস্থ করে নগেন্দ্রনাথের সতী কি কলঙ্কিনী (৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫), মেঘনাদবধ কাব্যের নাট্যরূপ (৭ মার্চ ১৮৭৫) রাজকৃষ্ণ রায়ের উৎসাহে গিরিশচন্দ্র এই নাট্যরূপ দেন। এছাড়াও বেঙ্গল থিয়েটার একে একে মঞ্চস্থ করে সুরেন্দ্রবিনোদিনী, বঙ্গবিজেতা, পলাশীর যুদ্ধ ইত্যাদি নাটক।

১৮৭৬-এ আবার বেঙ্গল থিয়েটার বিদ্যাসুন্দর নাটক মঞ্চস্থ করে এবং এছাড়াও পুরোনো বেশ কিছু নাটকের অভিনয় করে। এরপরেই কুখ্যাত নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন বৃটিশ সরকার চালু করেছিল। এই আইনের ফলে বেঙ্গল থিয়েটার প্রবল চাপের মুখে পড়ে। ঐ বছরেই বিনোদিনী বেঙ্গল থিয়েটারে যোগ দেন। ১৮৭৭ থেকে সপ্তাহে তিনদিন রবি, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার অভিনয়ের দিন ধার্য হয় বেঙ্গল থিয়েটারে। ১৮৭৭-তে অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল : আলিবাবা, অপূর্ব সতী, রত্নাবলী, মেঘনাদবধ, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, দুর্গেশনন্দিনী (বঙ্কিম উপন্যাসের নাট্যরূপ)। বিনোদিনীর অভিনেত্রী জীবনের উৎকর্ষ ঘটে বঙ্কিমসৃষ্ট নারী চরিত্র রূপায়ণেই। বিনোদিনীকে সাইওনারা, ফ্লাওয়ার অফ দি নেটিভ থিয়েটার ইত্যাদি উপাধিতে চিহ্নিত করা হয়। এছাড়াও ১৮৭৭-তেই দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, সুভদ্রাহরণ, সতী

কি কলঙ্কিনী ইত্যাদি মঞ্চস্থ হয়। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে শকুন্তলা নাটকের অভিনয় দেখতে বড়লাট লিটন ও তাঁর স্ত্রী বেঙ্গল থিয়েটারে হাজির হন। এই বছরে মৃণালিনী, দুর্গেশনন্দিনী, রত্নাবলী আবার মঞ্চস্থ হয়। ১৮৭৯ সালে জ্যোতিরিন্দ্রঠাকুরের অশ্রুমতী মঞ্চস্থ হয়। কিন্তু দর্শক ছিলেন শুধুমাত্র ঠাকুরবাড়ির লোকজন।

১৮৮০-তে শরৎচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু হলে শুধু বেঙ্গল থিয়েটারেরই নয়, সমগ্র বাংলা রঙ্গমঞ্চেরই অপূরণীয় ক্ষতি হল। তাঁর মৃত্যুর পর নাট্যশালার দায়িত্ব গ্রহণ করেন বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। বিহারীলালের নেতৃত্বে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হতে থাকে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, সুভদ্রাহরণ, হরধনুভঙ্গ ইত্যাদি নাটক। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে অমৃতলাল বসু বেঙ্গল থিয়েটারে যোগ দেন। তাঁর লেখা প্রহসন ডিসমিশ এবং নাটক হরিশ্চন্দ্র বেঙ্গল থিয়েটার মঞ্চস্থ করে ও প্রভূত জনপ্রিয়তা পায়। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে অমৃতলালের ব্রজলীলা মঞ্চস্থ হয়। তারপরে রাজকৃষ্ণ রায়ের কয়েকটি নাটিক অভিনীত হয় বেঙ্গল থিয়েটারে : হরধনুভঙ্গ (১৮৮৩), প্রহ্লাদচরিত্র (১৮৮৪), ভীষ্মের শরশয্যা (১৮৮৬), দুর্বাসার পারণ (১৮৮৫)। তখন বাংলা রঙ্গমঞ্চে পৌরাণিক নাটকের জোয়ার। এর মধ্যে প্রহ্লাদচরিত্র নাটকটি অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করে। এর মূলে ছিল কুসুমকুমারীর অসাধারণ অভিনয়। আবার ১৮৮৬-তে অভিনীত ভীষ্মের শরশয্যা নাটকে ভীষ্মের ভূমিকায় বিহারীলালের অভিনয় তাঁর অভিনয়জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ১৮৮৭ সালে বিহারীলাল রচিত শ্রীবৎসচিন্তা, পাণ্ডবনির্বাসন, রুক্মিণীহরণ, প্রভাসমিলন একে একে বেঙ্গল থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। ১৮৮৮-তে মঞ্চস্থ হয় বিহারীলালের নন্দবিদায় ও পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয় শৈলজা, জন্মাষ্টমী ও শকুন্তলা। ১৮৯০-এর ৭ জানুয়ারি বেঙ্গল থিয়েটার 'রয়্যাল' উপাধি লাভ করে। বৃটিশ রাজভক্তির নিদর্শনরূপে এই উপাধি প্রাপ্তি ঘটে। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটারে উল্লেখযোগ্য অভিনয় হল : সীতা স্বয়ম্বর ও নাট্যবিচার নামক একটি প্রহসন।

১৮৯১ সালে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয় গোবরগণেশ, বাণযুদ্ধ, বসন্তমেলা ইত্যাদি নাটক। ১৮৯২-তে পুরোনো কয়েকটি নাটকের সঙ্গে মোহশেল ও শ্রীরামনবমী মঞ্চস্থ হয়। বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে দুটি উল্লেখযোগ্য অভিনয় হল ব্যসকাশী ও খণ্ডপ্রলয়।

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটারে যোগ দেন মহেন্দ্রলাল বসু, প্রমদাসুন্দরী প্রমুখ। এদের সহযোগে মঞ্চস্থ হয় বঙ্কিমের মৃণালিনী ও বিষবৃক্ষ। এই দুটি উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। মৃণালিনী সফলতা পেলেও বিষবৃক্ষ ব্যর্থ হয়। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমের 'রজনী' উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন বিহারীলাল। এটি বেঙ্গল থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। এই সময়ে মহেন্দ্রলাল বসু বেঙ্গল থিয়েটার ত্যাগ করেন। এরপরে ১৮৯৫ সালে একে একে দানলীলা, সীতারাম, রক্তগঙ্গা মঞ্চস্থ হয়। সীতারাম-এর নাট্যরূপ অভিনীত হলে প্রচুর প্রশংসা লাভ করে। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে পুরোনো নাটকের সঙ্গে বিহারীলালের দুটি নতুন নাটক ধ্রুব ও নরোত্তমঠাকুর এবং বঙ্কিমের রাজাসিংহ (নাট্যরূপ বিহারীলাল) মঞ্চস্থ হয়। ১৮৯৭-তে বেঙ্গল থিয়েটারের উল্লেখযোগ্য অভিনয় বঙ্কিমের দেবী চৌধুরাণী ও কৃষ্ণকান্তের উইল (নাট্যরূপ বিহারীলাল)। এরপরে ১৮৯৮ থেকে ১৯০১ পর্যন্ত বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয় বভ্রুবাহন, দফর খাঁ, প্রমোদরঞ্জন, সুকন্যা, যমুনা, দাওয়াই ইত্যাদি নাটক।

১৯০১-এর ২০ এপ্রিল বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বেঙ্গল থিয়েটার চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বেঙ্গল থিয়েটার নানা কারণেই বাংলা নাট্যমঞ্চে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার ক'রে আছে :

১. বাঙালির থিয়েটারে প্রথম স্থায়ী নাট্যশালা তথা প্রেক্ষাগৃহ;

২. যথার্থই প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় ও পেশাদারি থিয়েটার;

৩. প্রথম অভিনেত্রী গ্রহণ এক অভিনব দুঃসাহাসিক প্রচেষ্টা;

৪. নাট্যমঞ্চে বঙ্কিমচন্দ্রকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা;

৫. বিহারীলালের নাট্যকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা;

১.১৫ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর ৬ নং বিডন স্ট্রিটে (অধুনা মিনার্ভা থিয়েটার) মহেন্দ্রনাথ দাসের জমিতে নির্মিত হয় কাঠের থিয়েটার বাড়ি। প্রতিষ্ঠাতার নাম ভুবনমোহন নিয়োগী। ধনী ভুবনমোহন নিয়োগী এই থিয়েটারের জন্য ইংরেজ শিল্পী মিস্টার গ্যারিককে ড্রপসীন ও দৃশ্যপট অঙ্কনের দায়িত্ব দেন। বেঙ্গল থিয়েটার ততদিনে দারুণভাবে অভিনয় চালাচ্ছে, ঠিক তখনই প্রতিষ্ঠিত হলো গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার। ১৮৭৩-এর ৩১ ডিসেম্বর এই থিয়েটারে প্রথম মঞ্চস্থ হল অমৃতলাল বসুর কাম্যকানন। কিন্তু প্রথম অভিনয়ের সময় আগুন লেগে মঞ্চ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়। তবু দুর্ঘটনার পরের দিন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার বেলভেডিয়ারে নীলদর্পণ মঞ্চস্থ করে। নতুন উৎসাহে থিয়েটার বাড়ি পুনর্নির্মাণ করে ১৮৭৪-এর ১০ জানুয়ারি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার মঞ্চস্থ করে উমেশচন্দ্র মিত্রের বিধবাবিবাহ। এরপরে ঐ বছরেই ১৭ জানুয়ারি মনোমোহন প্রণয়পরীক্ষা, ২৪ জানুয়ারি মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী, ৭ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা অভিনীত হয়।

কিন্তু সবদিক দিয়ে বেঙ্গল থিয়েটার তখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। তাই শুধু অমৃতলাল বসু বা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা ধর্মদাস সুর থাকলে হবে না, এই ভেবে গিরিশচন্দ্র ঘোষের সাহায্য চাওয়া হল। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের জন্যে গিরিশচন্দ্র বঙ্কিমের মৃণালিনী ও বিষবৃক্ষ এই দুই উপন্যাসের নাট্যরূপ দিলেন। দলের সকলকে অভিনয় শেখালেন ও নিজে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করলেন। বিশেষত মৃণালিনীর অভিনয় অসম্ভব সাফল্য লাভ করেছিল। এতে অভিনয় করেন : গিরিশচন্দ্র (পশুপতি), অর্ধেন্দুশেখর (হৃষিকেশ), নগেন্দ্রনাথ (হেমচন্দ্র), অমৃতলাল বসু (দিগ্বিজয়), অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (ব্যোমকেশ), মহেন্দ্রলাল বসু (বক্তিয়ার খিলজি), বসন্তকুমার ঘোষ (মৃণালিনী), আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় (গিরিজায়া) এবং ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (মনোরমা)। তখনো গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনেত্রী গ্রহণ করা হয়নি। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে ২১ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি মৃণালিনী অভিনীত হয় এবং গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এরপরে একে একে মঞ্চস্থ হয় নবাবের নবরত্ন সভা (৭ মার্চ), নবীন তপস্বিনী (১৮ মার্চ), হেমলতা (১৮ এপ্রিল) ও কুলীনকন্যা বা কমলিনী (৩০ মে)।

এরপরে বাধ্য হয়ে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার অভিনেত্রী গ্রহণ করল। কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, যাদুমণি, হরিদাসী ও রাজকুমারী এই পাঁচজনকে গ্রহণ করা হয়। অভিনেত্রী সহযোগে তারপর মঞ্চস্থ হল সতী কি কলঙ্কিনী নাটক (১৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪)। নাট্যকার নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরে গিরিশ রইলেন না, নগেন্দ্রনাথ হলেন দলের ম্যানেজার।

১৮৭৪-এর ৩ অক্টোবর ও ১০ অক্টোবর যথাক্রমে মঞ্চস্থ হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরুবিক্রম এবং সতী কি কলঙ্কিনী ও ভারতে যবন। ঐ বছরে শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ-এর বাংলা রূপান্তর রুদ্রপাল (রূপান্তর হরলাল রায়) অভিনীত হল ৩১ অক্টোবর।

এরপরে নগেন্দ্রনাথ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ত্যাগ করেন। সেই সঙ্গে দল ছেড়ে চলে যান অমৃতলাল বসু, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন বর্মণ, যাদুমণি ও কাদম্বিনী। এঁরা সকলেই ১৮৭৫-এ বেঙ্গল থিয়েটারে যোগ দেন। এঁরা চলে যাবার পর আবার ধর্মদাস সুর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ম্যানেজার নিযুক্ত হন। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে ৬ ফেব্রুয়ারি অভিনীত হয় শত্রুসংহার নাটক। ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার অবলম্বনে হরলাল রায় এই নাটক রচনা করেন। এই নাটকে বিনোদিনী দ্রৌপদীর সখীর এক ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয় করেন। ১৮৭৫-তে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছিল উপেন্দ্রনাথ

দাসের শরৎ-সরোজিনী, প্রমথনাথ মিত্রের নগনলিনী, যেমন কর্ম তেমন ফল। এর মধ্যে শরৎ-সরোজিনী নাটক দারুণ জনপ্রিয়তা পায়। এই নাটকে গোলাপসুন্দরী সুকুমারী চরিত্রে অনবদ্য অভিনয়ের জন্য সুকুমারী নামেই পরিচিতি লাভ করেন। এরপর ধর্মদাস সুরের নেতৃত্বে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ১৮৭৫-এর মার্চে দিল্লি, আগ্রা, মিরাট, লক্ষ্ণৌ, লাহোর ইত্যাদি স্থানে অভিনয় করতে যায়। দলে ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর, ধর্মদাস, অবিনাশচন্দ্র কর, বিনোদিনী, ক্ষেত্রমণি প্রমুখ। লক্ষ্ণৌ শহরে নীলদর্পণ অভিনয়ের সময় সাহেব দর্শকরা কীভাবে উত্তেজিত হয়ে মঞ্চে এসে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আক্রমণ করে তার বর্ণনা বিনোদিনীর আমার কথা গ্রন্থে আছে। এই সময় কলকাতাতেও দলের একটি অংশ নাটক অভিনয় করতে থাকে : সধবার একাদশী (২০ মার্চ), নয়শো রুপেয়া (১০ এপ্রিল), তিলোত্তমা সম্ভব (১৭ এপ্রিল), নন্দনকানন (৮ মে) ইত্যাদি।

১৮৭৫-এর ৩ জুলাই মহেন্দ্রলাল বসুর পদ্মিনী নাটকের অভিনয়-এর মধ্য দিয়ে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার কলকাতায় পূর্ণশক্তিতে অভিনয় শুরু করে। ১৮৭৫-এর আগস্টে প্রতিষ্ঠাতা ভুবনমোহন নিয়োগী দলের কার্যভার ধর্মদাস সুরের হাত থেকে নিয়ে নেন। ম্যানেজার থাকেন মহেন্দ্রলাল বসু। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে রঙ্গমঞ্চটির ইজারা দেন। কৃষ্ণধন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের নাম পরিবর্তন করেন, নাম দেন ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার। ১৮৭৫-এর ১২ আগস্ট পদ্মিনী নাটক মঞ্চস্থ করে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার। এরপর ১৪ আগস্ট শরৎসরোজিনী, ২১ আগস্ট নীলদর্পণ মঞ্চস্থ হয়। এসময় বেঙ্গল থিয়েটার থেকে বেরিয়ে অমৃতলাল বসু এখানে যোগ দেন। তারপরই অভিনীত হয় সুকুমারী দত্তের লেখা নাটক অপূর্বসতী (২৩ আগস্ট ১৮৭৫)।

কিন্তু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নতুন থিয়েটার চালাতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তখন ভুবনমোহন নিয়োগ আবার নিজের হাতে থিয়েটারের ভার নিয়ে নেন। পুরোনো নামে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার আবার তার অভিনয় শুরু করে। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে ২৫ ডিসেম্বর অমৃতলাল বসুর 'হীরকচূর্ণ' মঞ্চস্থ করে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার। এরপর ঐ বছরে ৩১ ডিসেম্বর অভিনীত হলো উপেন্দ্রনাথ দাসের সুরেন্দ্র-বিনোদিনী। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে এখানে অভিনীত হল প্রকৃত বন্ধু (ব্রজেন্দ্রকুমার রায়), সরোজিনী (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ) ও বিদ্যাসুন্দর নাটক।

এদিকে ব্রিটিশ যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলস কলকাতায় এসে উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়-এর বাড়ির আতিথ্য গ্রহণ করেন। এ নিয়ে কলকাতায় আলোড়ন তৈরি হয়। এসময়েই এই বিষয় নিয়ে উপেন্দ্রনাথ রচিত গজদানন্দ ও যুবরাজ নামক একটি প্রহসন মঞ্চস্থ করে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি, তৎসহ ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সরোজিনী। আবার ২৩ ফেব্রুয়ারি সতী কি কলঙ্কিনী নাটকের সঙ্গে গজদানন্দ ও যুবরাজ অভিনীত হয়। এই অভিনয়ের পরে পুলিশ অভিনয় বন্ধ করে দেয়। তখন উপেন্দ্রনাথ প্রহসনটির নাম পরিবর্তন করে হনুমান চরিত্র নামে মঞ্চস্থ করেন (২৬ ফেব্রুয়ারি)। পুলিশ এই হনুমান চরিত্র-এর অভিনয়ও বন্ধ করে দেয়। তখন পুলিশকে বিদ্রুপ করে উপেন্দ্রনাথ দাস The Police of Pig and Sheep নামক একটি প্রহসন রচনা করেন। ১৮৭৬-এর ১ মার্চ সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটকের সাথে এই প্রহসনটির অভিনয় হয়। ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চের এই ভূমিকায় বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক ২৯ ফেব্রুয়ারি এক অর্ডিন্যান্স জারি করেন,—তাতে যেকোনো নাটক 'Scandalous, defamatory, seditious, obscene or otherwise prejudicial to the public interest'—হলে তা বন্ধ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। গ্রেট ন্যাশনাল তখন সতী কি কলঙ্কিনী ও উভয়সংকট (৪ মার্চ ১৮৭৬) মঞ্চস্থ করে। কিন্তু সেদিনই পুলিশ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে হানা দিয়ে উপেন্দ্রনাথ দাস, ম্যানেজার অমৃতলাল বসু, অভিনেতা মতিলাল সুর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সঙ্গীতকার রামতারণ সান্যাল প্রমুখ আটজনকে গ্রেপ্তার করে। প্রথম বিচারে উপেন্দ্রনাথ ও অমৃতলালের এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। পরে আপিলের রায়ে এঁরা মুক্তি পান (২০ মার্চ, ১৮৭৬)।

বৃটিশ সরকার তারপর ঐ অর্ডিন্যান্সকে মার্চ মাসেই 'Dramatic Performances Control Bill' নামক আইনের খসড়া তৈরি করে ও ডিসেম্বর ১৮৭৬-এ তা আইনে পরিণত হয়।

এর ফলে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার প্রচণ্ড আঘাত পায়। উপেন্দ্রনাথ বিলেত চলে যান। অমৃতলাল বসু ও বিহারীলাল চলে যান পোর্টব্লেয়ারে চাকুরি নিয়ে। সুকুমারী দত্ত অভিনয় ছেড়ে দেন। বিনোদিনী গ্রেট ন্যাশনাল ত্যাগ করেন। নগেন্দ্রনাথ স্বেচ্ছা-অবসর নেন, অর্ধেন্দুশেখর দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে যান আর মামলামোকদ্দমায় সর্বস্বান্ত হন ভুবনমোহন। এভাবেই ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে ৬ অক্টোবর দুর্গাপুজোর পঞ্চরং, আগমনীগান ও ইয়ংবেঙ্গাল এই তিন প্রহসন মঞ্চস্থ হবার পরেই বন্ধ হয়ে গেল গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার।

১.১৬ ন্যাশনাল থিয়েটার

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি ৬ নং বিডন স্ট্রিটে প্রতিষ্ঠিত হল যে ন্যাশনাল থিয়েটার তা সাধারণ রঙ্গালয় নয়। এটির প্রতিষ্ঠাতা ব্যবসায়ী প্রতাপচাঁদ জহুরি। বস্তুত গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার লিজ দিয়ে দেন ভুবনমোহন (বাধ্য হয়ে) গিরিশচন্দ্র ঘোষকে। গিরিশচন্দ্র তখন নাম পাল্টে দেন। নাম হয় ন্যাশনাল থিয়েটার। এরপরে ক্রমাগত মালিকানা বদলাতে থাকে। শেষপর্যন্ত এর নিলাম হয়। ১৮৮০-এর ১২ ডিসেম্বর এই নিলামে অবাঙালি ব্যবসায়ী প্রতাপচাঁদ পঁচিশ হাজার টাকায় কিনে ন্যাশনাল থিয়েটার। তিনি গিরিশচন্দ্রকে মাসিক একশ টাকা বেতনে তাঁর ন্যাশনাল থিয়েটারের ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। গিরিশ তখন পার্কার কোম্পানিতে চাকরি করছিলেন। এই প্রথম গিরিশচন্দ্রও থিয়েটারকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করলেন। গিরিশ প্রথমেই দলে নিয়ে এলেন যাঁদের তাঁরা হলেন ধর্মদাস সুর, মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল বসু, মতিলাল সুর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, রামতারণ সান্যাল, অমৃতলাল মিত্র, ক্ষেত্রমণি, কাদম্বিনী, বিনোদিনী, নারায়ণী এবং বনবিহারিণী।

১৮৮১-র ১ জানুয়ারি প্রতাপচাঁদের ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্বোধনে মঞ্চস্থ হল সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের লেখা নাটক হামীর। গিরিশ এই নাটকের জন্য চারটি গান রচনা করেন। গিরিশচন্দ্র ও বিনোদিনী এ নাটকে অভিনয় করলেও এই নাটক দর্শক গ্রহণ করল না। ভালো নাটকের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হল অথচ তেমন সাড়া নেই। তখন বাধ্য হয়ে ম্যানেজার গিরিশ নিজেই নাটক রচনায় মনোযোগী হলেন। বাংলা থিয়েটারের নাট্যকার হিসেবে গিরিশের আত্মপ্রকাশ ঘটল। ১৮৮১-র ২২ জানুয়ারি ও ৯ এপ্রিল মঞ্চস্থ হল যথাক্রমে গিরিশের নাটক মায়াতরু ও মোহিনীপ্রতিমা। এরপর ১৯ এপ্রিল মঞ্চস্থ হল গিরিশ রচিত আলাদীন। ১৮৮১-র ২১ মে অভিনীত হল রোমান্সধর্মী ঐতিহাসিক নাটক আনন্দ রহো (গিরিশচন্দ্র)। গিরিশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক এটি। এই নাটকে বেতালের ভূমিকায় গিরিশ নতুন ধরনের অভিনয় করেন। এরপর ১৮৮১-র ৩০ জুলাই মঞ্চস্থ হল গিরিশের রাবণবধ। এই নাটক রাতারাতি বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করল। রাবণবধ নাটকের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে এরপরে গিরিশের রচনা সীতার বনবাস (১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮১) অভিনীত হল। গিরিশের রামচরিত্রাভিনয় দারুণ খ্যাতিলাভ করেছিল। এরপর গিরিশের অভিমন্যুবধ অভিনীত হল ১৮৮১-র ২৬ নভেম্বর। পরের বছর অভিনীত হল রামের বনবাস (১১ মার্চ), সীতার বিবাহ (১৫ এপ্রিল), সীতাহরণ (২২ জুলাই) ও মলিনামালা (১৬ সেপ্টেম্বর)। এই সব ক'টি নাটকের রচয়িতা ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। কিন্তু ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ন্যাশনাল থিয়েটারের ভালো গেল না। ১৮৮৩-তে ১৩ জানুয়ারি গিরিশের রচনা পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস মঞ্চস্থ হল। এই নাটকটি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করল। এমনকি রাবণবধ নাটকের জনপ্রিয়তাকেও অতিক্রম করে গেল। দ্রৌপদীর ভূমিকায় বিনোদিনী-র খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল এখান থেকেই। এই সময়েই গিরিশের সঙ্গে প্রতাপচাঁদের মতান্তর শুরু হয়। দলের সকলের মাইনে বাড়ানোর জন্য গিরিশ দাবি জানান কিন্তু প্রতাপচাঁদ তা নাকচ করে দেন। কৃপণ ব্যবসায়ী প্রতাপচাঁদের সঙ্গে ক্রমশ দূরত্ব বাড়তে থাকে গিরিশের। অবশেষে গিরিশ ন্যাশনাল থিয়েটার ত্যাগ করেন। গিরিশের

সঙ্গে চলে যান অমৃত মিত্র, অঘোরনাথ পাঠক, উপেন্দ্র মিত্র, বিনোদিনী, কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি প্রমুখ শিল্পী।

প্রতাপচাঁদ কেদারনাথ চৌধুরীকে ম্যানেজার নিযুক্ত করে আবার থিয়েটার চালাতে শুরু করেন। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ৭ মে কেদার চৌধুরীর নাট্যরূপে বঙ্কিমের আনন্দমঠ মঞ্চস্থ হয়। এই সময় অর্ধেন্দুশেখর এখানে যোগ দেন। এরপরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বপ্নময়ী (১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩)। কেদার চৌধুরীর ছত্রভঙ্গ (১ অক্টোবর ১৮৮৩), রাজসূয় যজ্ঞ (২ জানুয়ারি ১৮৮৪), আনন্দমঠ (২০ এপ্রিল ১৮৮৪) ইত্যাদি নাটক এখানে অভিনীত হয়। কিন্তু তেমনভাবে সাফল্য না আসায় প্রতাপচাঁদ ন্যাশনাল থিয়েটার ছেড়ে দিলেন। ১৮৮৫-তে ভুবনমোহন নিয়োগী 'লেসি' হিসেবে স্ত্রীর বকলমে এই থিয়েটারের ভার গ্রহণ করলেন। ম্যানেজার রইলেন কেদারনাথ চৌধুরী। এরপর হরিভূষণ ভট্টাচার্যের 'কুমারসম্ভব' ও কেদার চৌধুরীর নাট্যরূপে রবীন্দ্রনাথের 'বৌ ঠাকুরানীর হাট' মঞ্চস্থ হল এখানে (৩ জুলাই ১৮৮৬ ও ১৩ জুলাই ১৮৮৬)। এরপরে প্রতাপচাঁদ ও ভুবনমোহন মামলায় জড়িয়ে পড়েন। ন্যাশনাল থিয়েটারের বাড়ি (সাবেক গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার) নিলামে ওঠে। হাতিবাগানের স্টার থিয়েটার মাত্র আড়াই হাজার টাকায় এটি কিনে নেন ও থিয়েটার বাড়িটি সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলেন। ন্যাশনাল থিয়েটার তথা গ্রেট ন্যাশনাল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। পরে এই জমিতেই গড়ে উঠেছিল মিনার্ভা থিয়েটার।

১.১৭ স্টার থিয়েটার (বিডন স্ট্রিট)

১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুলাই বাগবাজারের ৬৮ নং বিডন স্ট্রিটের খালি জমি ইজারা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল স্টার থিয়েটার। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গুর্মুখ রায়। রাজস্থান নিবাসী পিতা গণেশদাস মুসাদ্দি হোরমিলার কোম্পানির বেনিয়ান ছিলেন। তাঁর পুত্র গুর্মুখ রায় বিনোদিনীকে পাবার জন্য প্রায় পাগল। ঠিক তখনই গিরিশচন্দ্র ঘোষ ক্যালকাটা স্টার কোম্পানি নামক একটি থিয়েটারের দল চালাচ্ছেন কোনোক্রমে। এমন সময়ে গুর্মুখ রায় গিরিশের কাছে নতুন থিয়েটার খোলার প্রস্তাব দেন, বিনিময়ে গুর্মুখ রায় বিনোদিনীকে রক্ষিতা হিসাবে পেতে চান। গিরিশচন্দ্র রাজি হয়ে গেলেন। নতুন থিয়েটারের বাসনায় গিরিশচন্দ্র বিনোদিনীকে 'টোপ' হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন! বিনোদিনীও থিয়েটারের প্রতি দুর্বল হওয়ায় গিরিশচন্দ্র যা চাইলেন তাতেই সম্মত হলেন। শেষ পর্যন্ত ২১ জুলাই ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে শুরু হল স্টার থিয়েটার। মালিক ছিলেন গুর্মুখ রায়, কিন্তু প্রকৃত অর্থে স্টার থিয়েটারের গিরিশই ছিলেন সবকিছু,—তিনিই ম্যানেজার, নাট্যকার, পরিচালক ও প্রধান অভিনেতা। উৎপল দত্তের 'টিনের তলোয়ার' নাটকে এই ঘটনার ছায়াপাত দেখা যায়।

১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুলাই শনিবার গিরিশের রচনা দক্ষযজ্ঞ নাটক দিয়ে স্টার থিয়েটার-এর উদ্বোধন হল। অভিনয়ে অংশ নিলেন গিরিশচন্দ্র (দক্ষ), মহাদেব (অমৃতলাল মিত্র), দধীচি (অমৃতলাল বসু), বিষ্ণু (উপেন্দ্রনাথ মিত্র), সতী (বিনোদিনী), ব্রহ্মা (নীলমাধব চক্রবর্তী), তপস্বিনী (ক্ষেত্রমণি), প্রসূতি (কাদম্বিনী) প্রমুখ। এই নাটকের দৃশ্যসজ্জা, সঙ্গীত, আলো ও অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। দক্ষযজ্ঞ দিয়ে স্টার থিয়েটার-এর গৌরবময় যাত্রা শুরু হয়েছিল।

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে গুর্মুখ রায় মালিক থাকাকালীন স্টার থিয়েটারের যেসমস্ত নাটকের অভিনয় হয় সেগুলি হল : দক্ষযজ্ঞ (২১ জুলাই), ধ্রুবচরিত্র (১১ আগস্ট), রামের বনবাস (২৯ আগস্ট), সীতার বনবাস (২৬ সেপ্টেম্বর), সীতাহরণ (২ অক্টোবর), চোরের ওপর বাটপাড়ি (২৬ অক্টোবর), চক্ষুদান (২৭ অক্টোবর), মেঘনাদবধ (২১ নভেম্বর), সধবার একাদশী (৫ ডিসেম্বর), রাবণবধ (৮ ডিসেম্বর), নল-দময়ন্তী (১৫ ডিসেম্বর)। এগুলির মধ্যে চক্ষুদান (রামনারায়ণ), সধবার একাদশী (দীনবন্ধু) এবং চোরের ওপর বাটপাড়ি (অমৃতলাল) এই তিনটি বাদে বাকি সবই গিরিশের সৃষ্টি।

১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে গুর্মুখ রায় মাত্র এগারো হাজার টাকায় স্টার থিয়েটারের স্বত্ব স্টারের চারজনের কাছে (অমৃতলাল মিত্র, দাসুচরণ নিয়োগী, হরিপ্রসাদ বসু ও অমৃতলাল বসু) বিক্রি করে দিলেন। ১৮৮৪-র জানুয়ারি থেকে ঐ চারজন স্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী হয়ে ওঠেন। তবে গুর্মুখ রায় স্টার ছেড়ে চলে গেলেও বিনোদিনী রয়ে গেলেন।

১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে স্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ নাটকগুলির মধ্যে অভিমন্যুবধ (১৬ মার্চ), কমলেকামিনী (২৯ মার্চ), চাটুজ্জে-বাঁড়ুজ্জে (২৬ এপ্রিল), আদর্শসতী (২১ মে), শ্রীবৎসচিন্তা (৭ জুন), চৈতন্যলীলা (২ আগস্ট), প্রহ্লাদচরিত্র (২২ নভেম্বর), বিবাহবিভ্রাট (২৪ নভেম্বর) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই বছরেও অমৃতলাল বসুর চাটুজ্জে-বাঁড়ুজ্জে ও অতুলকৃষ্ণ মিত্র-র আদর্শসতী ছাড়া বাকি সব নাটকের রচয়িতা ছিলেন গিরিশচন্দ্র। এবছরের নাটকগুলির মধ্যে গিরিশের নতুন নাটক চৈতন্যলীলার অভিনয় ছিল অনবদ্য। বিশেষত নিমাই-এর ভূমিকায় বিনোদিনীর অভিনয় দেখতে আসেন স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব (২১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ ; চৈতন্যলীলা নাটকের দ্বিতীয় অভিনয়ে)। তিনি বিনোদিনীর অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করেন। এবছরে গিরিশের প্রহ্লাদচরিত্র নাটক তেমন সাফল্য পায়নি, বরং বেঙ্গল থিয়েটারে রাজকৃষ্ণ রায়ের লেখা প্রহ্লাদচরিত্র বেশি সাফল্য পেয়েছিল।

১৮৮৫-তে স্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছিল যে সমস্ত নাটক সেগুলির মধ্যে চৈতন্যলীলা ২য় ভাগ (১০ জানুয়ারি), দোললীলা (১ মার্চ), মৃণালিনী (১ এপ্রিল), পলাশীর যুদ্ধ (২৬ এপ্রিল), প্রভাসযজ্ঞ (৩০ মে), বুদ্ধদেবচরিত (১৯ সেপ্টেম্বর) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। চৈতন্যলীলা ২য় ভাগ নাটক কিন্তু তেমনভাবে গৃহীত হল না। বরং বুদ্ধদেবচরিত নাটক অভূতপূর্ব সাফল্য পেল। এ নাটকে অভিনয় করেছিলেন—অমৃতলাল মিত্র (সিদ্ধার্থ), উপেন্দ্রনাথ মিত্র (শুদ্ধোধন), শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বিদূষক), প্রমদাসুন্দরী (সুজাতা) এবং বিনোদিনী (গোপা)।

১৮৮৬-তে স্টার থিয়েটারে অভিনীত নতুন নাটকগুলি হল : বিশ্বমঙ্গলঠাকুর (১২ জুন), বেল্লিকবাজার (২৬ ডিসেম্বর) ও কমলেকামিনী (২৯ ডিসেম্বর)। তাছাড়া পূর্বের মঞ্চসফল বেশকিছু নাটকের অভিনয় হয়েছিল এবছরে। এবছরে সব চাইতে বেশি সাফল্য পেয়েছিল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর। রামকৃষ্ণদেবের প্রভাবে রচিত এ নাটকের গানগুলি দর্শকদের পাগল করে তুলেছিল। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন : অমৃতলাল মিত্র (বিল্বমঙ্গল), অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (সাধক), অঘোরনাথ পাঠক (ভিক্ষুক), বিনোদিনী (চিন্তামণি), গঙ্গামণি (পাগলিনী) প্রমুখ।

১৮৮৭ ছিল স্টার থিয়েটার-এর পক্ষে দুঃসময়ের বছর। এ বছরেই স্টার ত্যাগ করলেন বিনোদিনী। তাঁর শেষ অভিনয় বেল্লিকবাজার। এরপর তিনি অভিনয় জীবনে আর ফিরে আসেননি। ১৮৮৭-র ৩১ জুলাই ৬৮ নং বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটার-এর শেষ অভিনয়-ও মঞ্চস্থ হয় বুদ্ধদেবচরিত ও বেল্লিকবাজার। অমৃতলাল বসুর মর্মস্পর্শী ভাষণের মধ্য দিয়ে সেদিনের মঞ্চানুষ্ঠান শেষ হয়।

ঠিক সেই সময় কলকাতার অন্যতম বিখ্যাত ধনী মতিলাল শীলের নাতি গোপাললাল শীল স্টার থিয়েটারের জমি কৌশলে কিনে নেন ও স্টারের স্বত্বাধিকারীদের উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়। তাঁরা বাধ্য হয়ে তিরিশ হাজার টাকায় স্টার থিয়েটার ছেড়ে দেন। সেখানেই গোপাল শীল তৈরি করেন এমারেল্ড থিয়েটার। দিন শেষ হয় ৬৮ বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারের।

১.১৮ এমারেল্ড থিয়েটার

১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে স্টার থিয়েটারের জমি কিনে নিয়ে ৬৮ নং বিডন স্ট্রিটে পুরো নবরূপে প্রতিষ্ঠিত হল এমারেল্ড থিয়েটার। স্টারের স্বত্বাধিকারীরা থিয়েটার বাড়িটি বেচলেও 'স্টার' নামটির গুডউইল বিক্রি করেননি।

১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের ৮ অক্টোবর ৬৮ নং বিডন স্ট্রিটে উদ্বোধন হয় এমারেল্ড থিয়েটারের। ঐ দিন মঞ্চস্থ হয় কেদার চৌধুরীর নাটক পাণ্ডবনির্বাসন। কেদার চৌধুরী এখানে একাধারে ম্যানেজার, নাট্যকার ও পরিচালক হিসেবে কাজ শুরু করেন। অভিনয়ে ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর, ধর্মদাস সুর, রাধামাধব কর, মতিলাল সুর, মহেন্দ্রলাল বসু, ক্ষেত্রমণি, বনবিহারিণী, কিরণশশী প্রমুখ। একাধিকবার পাণ্ডবনির্বাসন নাটকের মঞ্চসফল অভিনয়ের পরে অভিনীত হয়

রবীন্দ্রনাথের নাটক। বউ ঠাকুরানীর হাট উপন্যাসের নাট্যরূপ 'রাজা বসন্ত রায়' ১৮৮৭-র ২৬ অক্টোবর মঞ্চস্থ হল। তারপরে আনন্দকানন, মদনভস্ম ইত্যাদি অভিনয়ের পরেও এমারেল্ড থিয়েটার তেমনভাবে প্রতিষ্ঠা পেলো না। এমারেল্ড থিয়েটারের মালিক গোপাললাল শীল তখন কেদার চৌধুরীর পরিবর্তে গিরিশচন্দ্র ঘোষকে ম্যানেজার হিসেবে পাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। গিরিশ প্রথমে রাজি হননি। পরে স্টারের স্বত্বাধিকারীদের সঙ্গে আলোচনা করেই এমারেল্ড থিয়েটারে যোগ দিলেন। পাঁচ বছরের চুক্তিতে মাসিক তিনশো পঞ্চাশ টাকা বেতন ও কুড়ি হাজার টাকা বোনাস এই শর্তে গিরিশ এমারেল্ড থিয়েটারে যোগ দেন ১৮৮৭-র ৩১ অক্টোবর। তাঁর বোনাসের টাকা থেকে ষোলো হাজার টাকা স্টার থিয়েটারের নতুন বাড়ি কেনার জন্য দেন। ১৮৮৭-র ১২ নভেম্বর থেকে গিরিশ হলেন এমারেল্ড থিয়েটার-এর নতুন ম্যানেজার।

গিরিশচন্দ্র এমারেল্ড থিয়েটারে ম্যানেজার হিসেবে যোগ দিয়েই প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ ও কেদার চৌধুরীর নাটকগুলি (পূর্বে অভিনীত) বন্ধ করে দেন। গিরিশ যতদিন এমারেল্ড থিয়েটার-এর দায়িত্বে ছিলেন ততদিন রবীন্দ্রনাথের কোনো নাটকই এখানে মঞ্চস্থ হয়নি। নীলদর্পণ নাটক দিয়ে গিরিশ এমারেল্ড থিয়েটারে কাজ শুরু করেন। তারপরে একে একে গিরিশের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয় সীতার বনবাস, সীতাহরণ, দীনবন্ধুর নবীন তপস্বিনী ও গিরিশের মায়াতরু। শেষ দুটি নাটক অর্থাৎ নবীন তপস্বিনী ও মায়াতরু দারুণভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে। এমারেল্ড থিয়েটার দারুণভাবে প্রতিষ্ঠা পেল। ১৮৮৮-তে এখানে মঞ্চস্থ হল : নবীন তপস্বিনী, বুড় শালিখের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা, নন্দবিদায় ইত্যাদি।

এরই মধ্যে এমারেল্ড থিয়েটারের মালিক গোপাললাল শীল থিয়েটার ছেড়ে দিলেন। তিনি মতিলাল সুর, হরিভূষণ ভট্টাচার্য, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ এবং ব্রজনাথ মিত্রকে থিয়েটার বাড়ি লিজ দিয়ে দেন ১৮৮৯-এর ৩ ফেব্রুয়ারি। এর আগেই ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে অর্ধেন্দুশেখর এমারেল্ড থিয়েটার ছেড়ে চলে যান। মালিক গোপাল শীল চলে যাওয়ায় গিরিশের সঙ্গে এমারেল্ডের যে চুক্তি তা বজায় রইল না। ফলে ১৮৮৯-এর ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এমারেল্ড থিয়েটারে থাকার পরে গিরিশ এমারেল্ড ছেড়ে স্টারে যোগ দেন। মার্চ ১৮৮৯-তে এমারেল্ড থিয়েটারে যোগ দিলেন অর্ধেন্দুশেখর। ১৮৮৯-এর ২ এপ্রিল এমারেল্ড থিয়েটার-এ মঞ্চস্থ হল 'বক্কেশ্বর' নামক প্রহসন, তাতে বক্কেশ্বরের ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখর অভিনয় করেন। কিন্তু নতুন স্বত্বাধিকারীরা তেমনভাবে এমারেল্ড থিয়েটার চালাতে পারলেন না। পুরোনো মালিক গোপাল শীল তাঁর অতি প্রিয় এমারেল্ড থিয়েটারের সেই দুরবস্থা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি আবার ১৮৮৯-এর ৮ এপ্রিল এমারেল্ড থিয়েটারের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এবার পরিচালক হিসেবে এই দলে যোগ দিলেন মনোমোহন বসু। নাট্যকার অতুলকৃষ্ণ মিত্র এমারেল্ড থিয়েটারে ছিলেন। ৪ মে কেদার চৌধুরী ম্যানেজার হিসাবে এখানে যোগ দেন। ১৮৯০-এর ৭ জুন এখানে মঞ্চস্থ হল রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রানী। তারপর রবীন্দ্রনাথের প্রহসন খ্যাতির বিড়ম্বনা-র পরিবর্তিত নাম 'দুকড়ি দত্ত' দারুণভাবে মঞ্চল সফল হয় (৭ জুলাই ১৮৯০)। এর আগে ১৮৮৯-এর নভেম্বর মাসে কেদার চৌধুরী আবার দল ছেড়ে চলে যান। তখন অতুলকৃষ্ণ মিত্র ১৭ জানুয়ারি (১৮৯০) বিজনেস ম্যানেজার নিযুক্ত হন। ১৮৯০-তে যেসমস্ত নাটক এমারেল্ড থিয়েটার মঞ্চস্থ করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : মৃণালিনী (নাট্যরূপ গিরিশ), বিষবৃক্ষ (নাট্যরূপ অতুলকৃষ্ণ), কপালকুণ্ডলা (নাট্যরূপ অতুলকৃষ্ণ), আনন্দমঠ (নাট্যরূপ গিরিশ), নবীন তপস্বিনী (দীনবন্ধু) ইত্যাদি।

১৮৯০ থেকে ক্রমশ অবস্থা খারাপ হতে থাকলে পুরোনো নাটকগুলি অভিনয়ের মাধ্যমে এমারেল্ডকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চলতে থাকল। ১৮৯৩-এর ১১ ফেব্রুয়ারি অতুলকৃষ্ণ মিত্র ও মহেন্দ্রলাল বসু এই এমারেল্ড থিয়েটারের 'লেসি' হন। তাঁরা ঋণগ্রস্ত হয়েও এমারেল্ড থিয়েটার চালাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু পারেন না, ফলে শেষপর্যন্ত অর্ধেন্দুশেখরকে 'লেসি' করা হয়। ম্যানেজার হন মতিলাল সুর।

১৮৯৪-র ২২ সেপ্টেম্বর অতুলকৃষ্ণ মিত্রের লেখা মা নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে এমারেল্ড থিয়েটার নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করে। অর্ধেন্দুশেখর নাট্যশিক্ষক ও অভিনেতারূপে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এরপরে বৈকুণ্ঠনাথ বসুর মান (৪ ডিসেম্বর, ১৮৯৪), রাজাবসন্ত রায় (২ জানুয়ারি, ১৮৯৫), আবু হোসেন (রচনা গিরিশচন্দ্র, ৩০ জানুয়ারি, ১৮৯৫) নাটকগুলি এমারেল্ড থিয়েটারে দারুণভাবে মঞ্চসফলতা লাভ করে। কিন্তু অর্ধেন্দুশেখর থিয়েটার ব্যবসা বুঝতেন না। ফলে ফের আর্থিক অনটনে পড়ল এমারেল্ড থিয়েটার। নিরুপায় হয়ে অর্ধেন্দুশেখর এমারেল্ড থিয়েটারের মালিকানা বি. ডি. কোম্পানির বেনারসী দাসকে দিয়ে দিলেন। ১৮৯৫-তে ১০ নভেম্বর থেকে অর্ধেন্দুশেখর ম্যানেজার ও নাট্যশিক্ষক হিসাবে এখানে রইলেন। তারপর এখানে মঞ্চস্থ হয় কপালকুণ্ডলা (১৭ নভেম্বর, ১৮৯৫), বঙ্গবিজেতা (রচনা রমেশচন্দ্র দত্ত, নাট্যরূপ অর্ধেন্দুশেখর : ১৪ ডিসেম্বর, ১৮৯৫), দুকড়ি দত্ত (রবীন্দ্রনাথের খ্যাতির বিড়ম্বনা-রূপান্তরী—১৯ ডিসেম্বর, ১৮৯৫), ফুলশয্যা (ক্ষীরোদপ্রসাদ, ২৪ ডিসেম্বর, ১৮৯৫), ভাগের মা গঙ্গা পায় না (অতুল মিত্র : ৩১ ডিসেম্বর, ১৮৯৫) ইত্যাদি।

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি কপালকুণ্ডলা ও ভাগের মা গঙ্গা পায় না মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে এমারেল্ড থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় দশ বছরের স্থায়িত্বকালে এই থিয়েটারে গিরিশ, অতুল মিত্র, মনোমোহন নাট্যকার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। শুধু তাই নয়, একথা ভুলে গেলে চলবে না যে এমারেল্ড থিয়েটার সর্বপ্রথম সাহসের সঙ্গে রবীন্দ্র নাটককে মঞ্চে প্রতিষ্ঠা দেবার চেষ্টা করেন।

১.১৯ বীণা থিয়েটার

১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর ৩৮ নং মেছুয়াবাজার রোডে (ঠনঠনিয়া) কবি ও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় প্রতিষ্ঠা করেন বীণা থিয়েটার। আমরা জানি যে কবি হিসেবে প্রসিদ্ধি ছিল রাজকৃষ্ণ রায়ের (১৮৪৯-১৮৯৪)। কিন্তু বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে নাট্যকার হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করলেন তিনি। তাঁর একটি নিজস্ব ছাপাখানা ছিল। সেখানে থেকে 'বীণা' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন তিনি। তাঁর তৈরি নাট্যমঞ্চের নামও রাখলেন 'বীণা'।

অভিনেতা হিসেবেও রাজকৃষ্ণ রায় বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মাহেশ ও কলকাতার বেশ কিছু অভিনয়ে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। কলকাতার আর্য নাট্যসমাজে রাজকৃষ্ণ নিজের নাটক 'প্রহ্লাদচরিত্র'-এ হিরণ্যকশিপুর ভূমিকায় নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন। সেই সময়ের বাংলা ও ইংরেজি সংবাদপত্রে রাজকৃষ্ণ-র ঐ অভিনয় উচ্চ প্রশংসিত হয়। তাঁর ঐ অভিনয় সাফল্যে তিনি উৎসাহিত হয়ে নিজের থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে ১০ ডিসেম্বর। কিন্তু থিয়েটারের মালিক হিসেবে রাজকৃষ্ণর খুব বেশি আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। তাই বীণা থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ খুব সুসজ্জিত হয়নি, দৃশ্যপটও খুব বেশি মূল্যবান ছিল না,—যদিও রুচির ছাপ ছিল সর্বত্র। অর্থের কারণেই রাজকৃষ্ণ তৎকালীন প্রসিদ্ধ নট-নটীদের বীণা থিয়েটারে আনতে পারেননি। মূলত আর্য নাট্যসমাজ থেকেই রাজকৃষ্ণ নট-নটী সংগ্রহ করেছিলেন। রাজকৃষ্ণ রায় ছিলেন বীণা থিয়েটারের মালিক, নাট্যকার এবং পরিচালক।

১৮৮৭-র ১০ ডিসেম্বর রাজকৃষ্ণ রায় রচিত চন্দ্রহাস (বা দ্বিতীয় প্রহ্লাদ) নাটকের অভিনয়-এর মধ্য দিয়ে বীণা থিয়েটারের উদ্বোধন হল। এরপর পর পর চার রাত্রিতে চন্দ্রহাস মঞ্চস্থ হবার পরে প্রহ্লাদচরিত্র (৩১ ডিসেম্বর, ১৮৮৭) অভিনীত হল। এরপরে দুর্গেশনন্দিনী-র নাট্যরূপ (১২ জানুয়ারি, ১৮৮৮), ভণ্ডদলপতি দণ্ড (২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৮) মঞ্চস্থ হয়। রাজকৃষ্ণ লেখা চতুরালি—'হায় হায় এ কি শুনি ভাই/ আটকে পড়েছে আমার বিনোদিনী রাই' এবং 'চন্দ্রাবলী' গীতিনাট্যের 'তুমি যে কত ভাল/চিকন কালো/বলব কত একটি মুখে'—এই দুটি গান সেসময়ে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। তাঁর প্রহ্লাদচরিত্রও বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছিল। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন : প্রহ্লাদ—শরৎ কর্মকার,

ষণ্ড—অক্ষয়কালী কোঁয়ার, হিরণ্যকশিপু—রাজকৃষ্ণ। সার্থক অভিনেতারূপে রাজকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠা পেলেন এই অভিনয়ের জন্য।

কিন্তু রাজকৃষ্ণ থিয়েটারে দর্শক সমাগম ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকল। এর মূল কারণ হল রাজকৃষ্ণ রায় তাঁর বীণা থিয়েটারে অভিনেত্রী গ্রহণ না করে নারীচরিত্রে পুরুষদের দিয়ে অভিনয় করালেন। কিছু নৈতিকতার পক্ষ অবলম্বনকারী ধনী মানুষ রাজকৃষ্ণর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানালেও চারপাশে অভিনেত্রী সহযোগে-চলা অন্য সব থিয়েটারের প্রবল অভিঘাত সহ্য করা সম্ভব হল না। ফলে অচিরেই ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন রাজকৃষ্ণ রায়।

এরই পরিণামে ১৮৮৮-র সেপ্টেম্বর থেকে বীণা থিয়েটারে আর্য নাট্যসমাজ অভিনয় শুরু করে। ঋণশোধের আশায় রাজকৃষ্ণ আর্য নাট্যসমাজকে বীণা থিয়েটার ভাড়া দেন। রাজকৃষ্ণ নিজেও আর্য নাট্যসমাজের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। অর্ধেন্দুশেখরও অভিনেতারূপে যোগ দেন। কিন্তু ১৮৮৮-র নভেম্বরে আর্য নাট্যসমাজ তাঁদের অভিনয় বন্ধ করে দেন। ঋণভারে জর্জরিত রাজকৃষ্ণ এবার উপেন্দ্রনাথ দাসকে বীণা থিয়েটার ভাড়া দিলেন। বিলেত থেকে ফিরে এসে উপেন্দ্রনাথ বীণা থিয়েটার ভাড়া নিয়ে নিউ ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন (১৪ ডিসেম্বর, ১৮৮৮)। প্রবল উদ্যম থাকা সত্ত্বেও উপেন্দ্রনাথ দাস ব্যর্থ হলেন। ১৮৮৯-তে মার্চ পর্যন্ত কোনোক্রমে থিয়েটার চালিয়ে উপেন্দ্রনাথ বিদায় নিলেন।

সেই সময় স্বয়ং রাজকৃষ্ণ রায় নিজেই ফের বীণা থিয়েটার চালাবার ভার নিলেন। শুরু হল বীণা থিয়েটারের দ্বিতীয় পর্যায়ের যাত্রা। পূর্বের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলেন রাজকৃষ্ণ। সব নৈতিকতা, আদর্শ দূরে সরিয়ে রেখে ও তৎকালীন বাস্তবতা মনে রেখে সেই সময়ের খ্যাতনামা অভিনেত্রী তিনকড়িকে মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে বীণা থিয়েটারে নিয়ে এলেন। অন্য অভিনেত্রীও গ্রহণ করা হয়। তৎসহ যোগ দিলেন আর্য নাট্যসমাজের অভিনেতারা। ১৮৮৯-এর ২০ জুলাই শনিবার বীণা থিয়েটারে মঞ্চস্থ হল মীরাবাঈ। নাটকটির রচয়িতা রাজকৃষ্ণ রায়। মীরাবাঈ-এর ভূমিকায় তিনকড়ি দাসী অসামান্য অভিনয় করেন। এই নাটকে রাজকৃষ্ণ রচিত একটি গান 'খেলার ছলে হরিঠাকুর গড়েছেন এই জগৎখানা' খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এখানে রাজকৃষ্ণ নেপথ্য থেকে সম্ভবত মাইক্রোফোনে গানগুলি পরিবেশন করেন। ১৮৮৯-এর ২০ জুলাই স্টেটসম্যান পত্রিকার বিজ্ঞাপনে বলা হয়, 'Special Attraction—Songs by scientific process.'।

১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে বীণা থিয়েটারে যেসমস্ত নাটকগুলি অভিনীত হয় তার মধ্যে লীলাবতী (৩ আগস্ট), শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা (১৪ সেপ্টেম্বর), সধবার একাদশী (২২ সেপ্টেম্বর), চমৎকার (১৬ নভেম্বর), রুক্মিণীহরণ (১৪ ডিসেম্বর), ঘোষের পো (১৬ ডিসেম্বর) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে বীণা থিয়েটারে মঞ্চস্থ হল যেসমস্ত নাটক তার মধ্যে উভয় সঙ্কট (৪ জানুয়ারি), চন্দ্রহাস (৬ জানুয়ারি), রাজা বিক্রমাদিত্য (১১ জানুয়ারি), চন্দ্রাবলী (২৬ জুলাই), প্রহ্লাদ চরিত্র (১ নভেম্বর), লোভেন্দ্র-গবেন্দ্র (২ নভেম্বর) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

রাজকৃষ্ণ রায় বীণা থিয়েটারকে টিকিয়ে রাখতে সব প্রচেষ্টাই করেছিলেন। এমনকি টিকিটের মূল্য কমিয়ে তিনিই প্রথম বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে 'চীপ থিয়েটার' চালু করেন। টিকিটের মূল্য কমতে কমতে একআনা, দুআনা পর্যন্ত হয়েছিল। বীণা থিয়েটারে খ্যাতিপাওয়া পুরোনো নাটকগুলিও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অভিনয় করতে থাকেন রাজকৃষ্ণ। কিন্তু রাজকৃষ্ণর ব্যবসায়িক বুদ্ধি মোটেই পাকাপোক্ত ছিল না। ফলে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ঋণের ফাঁদ থেকে তিনি কিছুতেই মুক্তি পেলেন না। ফলে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর এর পরে রাজকৃষ্ণ বীণা থিয়েটার সম্পর্কে সমস্ত আশা ত্যাগ করলেন। রাজকৃষ্ণ রায় পরিচালিত বীণা থিয়েটারে ১৬ নভেম্বর ১৮৯০ শেষ অভিনয় হল প্রহ্লাদচরিত্র। তারপরে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি রাজকৃষ্ণ রায় অভিনেতারূপে মাসিক একশো টাকা বেতনে যোগ দিলেন স্টার থিয়েটারে। অন্যদিকে বীণা থিয়েটার ভাড়া নিয়ে ইণ্ডিয়ান থিয়েটার (৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১-২৯ মার্চ ১৮৯১) এবং নীলমাধব চক্রবর্তীর সিটি থিয়েটার

(১৬ মে ১৮৯১-৮ এপ্রিল ১৮৯২) নাটক অভিনয় করেছিলেন।

ততদিনে রাজকৃষ্ণ একেবারে সর্বস্বান্ত।—স্ত্রীর অলঙ্কার ও ছাপাখানা পর্যন্ত বিক্রি করে দিতে বাধ্য হলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর বড় প্রিয় বীণা থিয়েটার প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে বিক্রি করে দিলেন (১৫ নভেম্বর ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ)। প্রিয়নাথ এখানে তৈরি করলেন ভিক্টোরিয়া অপেরা হাউস। তিনি আবার নাটকের সব চরিত্রই মহিলাদের দিয়ে করাবার চেষ্টায় সর্বস্বান্ত হলেন। অন্যদিকে হতোদ্যম, ঋণভারে জর্জরিত, হীনবল রাজকৃষ্ণ রায় ক্রমশ ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে যেতে থাকলেন। মাত্র ৪৫ বছর বয়সে ১৮৯৪-এর ১১ মার্চ তাঁর মৃত্যু হল এবং বীণা থিয়েটারের প্রদীপ চিরতরে হল নির্বাপিত সেই সঙ্গে।

১.২০ স্টার থিয়েটার (হাতিবাগান)

ক. **প্রথম পর্ব (১৮৮৮-১৯০০) :**

৬৮ নং বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারের গিরিশচন্দ্র ও চার স্বত্বাধিকারী (অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র, দাসুচরণ নিয়োগী, হরিপ্রসাদ বসু) থিয়েটারের বাড়ি গোপাল শীলকে তিরিশ হাজার টাকায় বিক্রি করলেও 'স্টার' নামটির 'গুডউইল' সঙ্গে নিয়ে আসেন। ৭৫/৩ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে হাতিবাগানের কাছে রণেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের ত্রিশ কাঠা জমি সাতাশ হাজার টাকায় কিনে নেন তাঁরা। গিরিশচন্দ্র এমারেল্ড থিয়েটার থেকে প্রাপ্ত বোনাসের কুড়ি হাজার টাকা থেকে ষোলো হাজার টাকা নতুন স্টারের থিয়েটার বাড়ি কেনার জন্য দিয়ে দেন। পাঁচ মাসের চেষ্টায় স্টারের নতুন বাড়ি তৈরি হল। সাহায্যে ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার যোগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ধর্মদাস সুর। গ্যাসবাতি দিয়ে আলো তৈরি করেন পি. সি. মিত্র অ্যান্ড কোম্পানি। দৃশ্যসজ্জায় ছিলেন দাসুচরণ নিয়োগী। সঙ্গীতে ছিলেন রামতারণ সান্যাল ও নৃত্যে কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। দেড়হাজার দর্শকাসনবিশিষ্ট এই থিয়েটারের ম্যানেজার ছিলেন অমৃতলাল বসু। টিকিটের মূল্য ছিল সর্বোচ্চ একশো টাকা ও সর্বনিম্ন দুই টাকা। মহিলাদের জন্য একবারে আলাদা বসার ব্যবস্থা ছিল।

১৮৮৮-র ২৫ মে শুক্রবার হাতীবাগানের নবনির্মিত স্টার থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। গিরিশের রচনা নসীরাম নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে হাতীবাগানের স্টার থিয়েটারের যাত্রা সূচিত হল। তবে এমারেল্ডের সঙ্গে চুক্তি থাকায় গিরিশ অত্যন্ত গোপানে এই নাটক রচনা করেন। নাটকে রচয়িতার নাম সেবকপ্রণীত বলে উল্লেখ করা হয়। এই নাটকে অভিনয় করেন : অমৃতলাল বসু (নসীরাম), অমৃতলাল মিত্র (অনাথনাথ), অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (শম্ভুনাথ), অঘোর পাঠক (কাপালিক), কাদম্বিনী (বিরজা), গঙ্গামণি (সোনা) এবং তারাসুন্দরী (পাহাড়ী বালক)।

হাতীবাগানে স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর থেকে ঊনিশ শতকের শেষ তেরো বছর খুব সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় চালিয়ে যায়। প্রথম বছরে অর্থাৎ ১৮৮৮-তে এখানে গিরিশের পুরোনো নাটকগুলি, বিশেষত চৈতন্যলীলা, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, সীতার বনবাস নাটকগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অভিনীত হয়েছিল। তবে এই বছরে মঞ্চ সফলতায় সবাইকে টেক্কা দিয়েছিল সরলা নাটক : তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বর্ণলতা উপন্যাসের নাট্যরূপ (অমৃতলাল বসু) সরলা অভিনীত হয় ১৮৮৮-র ২২ সেপ্টেম্বর। বাংলামঞ্চে এমন পারিবারিক ট্র্যাজেডি আগে অভিনীত হয়নি। এই নাটকের টিকিট বিক্রি রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল। অভিনয়ে ছিলেন : অমৃতলাল মিত্র (বিধূভূষণ), অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (গদাধর), নীলমাধব চক্রবর্তী (শশিভূষণ), কিরণবালা (সরলা), তারাসুন্দরী (গোপাল), গঙ্গামণি (শ্যামা) এবং কাদম্বিনী (প্রমদা)।

গিরিশচন্দ্র ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে ২৭ এপ্রিল হাতিবাগান স্টার থিয়েটারে যোগ দিলেন। সরলা নাটকের অসামান্য সাফল্য তাঁকে সমাজিক সমস্যামূলক নাটক রচনায় উৎসাহিত করল। তিনি রচনা করলেন প্রফুল্ল। প্রফুল্ল মঞ্চস্থ হবার সঙ্গে

সঙ্গে (২৭ এপ্রিল ১৮৮৯) পূর্বের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে গেল। অভিনয় যাঁরা করলেন তাঁরা হলেন অমৃতলাল মিত্র (যোগেশ), অমৃতলাল বসু (রমেশ), কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় (রমেশ), অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (ভজহরি), মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী (পীতাম্বর), শ্যামাচরণ কুণ্ডু (কাঙালিচরণ), নীলমাধব চক্রবর্তী (মদন ঘোষ), ভূষণকুমারী (প্রফুল্ল), গঙ্গামণি (উমাসুন্দরী), কিরণবালা (জ্ঞানদা) এবং টুম্পামণি (জগমণি)। প্রত্যেকের অভিনয়ই সকলের প্রশংসা অর্জন করে। ১৮৮৯-তে প্রফুল্ল ছাড়াও পুরোনো নাটক ধ্রুব চরিত্র, দক্ষযজ্ঞ, তাজ্জবব্যাপার ইত্যাদি মঞ্চস্থ হয়েছিল। তাছাড়া গিরিশের নতুন নাটক হারানিধি মঞ্চস্থ হয়েছিল কিন্তু তেমন সাফল্য পায়নি। ১৮৯০-তে গিরিশের পুরোনো নাটক যেমন রূপসনাতন, চণ্ড, অমৃতলালের বাঞ্চারাম, তরুবালা ইত্যাদি নাটক এখানে মঞ্চস্থ হল। ১৮৯০-তেই স্টারের বিখ্যাত অভিনেতা অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (১১ মার্চ) ও অভিনেত্রী কিরণবালার মৃত্যু হয় (৮ এপ্রিল)। দুজনের আকস্মিক প্রয়াণে স্টার থিয়েটার তিন মাসের জন্য বন্ধ ছিল।

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি গিরিশ স্টার থিয়েটার ত্যাগ করেন। বেশ কিছুদিন ধরেই স্টার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গিরিশের মনোমালিন্য চলছিল। গিরিশ চলে যাওয়ার সময়ে সঙ্গে নিয়ে যান নীলমাধব চক্রবর্তী, অঘোরনাথ পাঠক, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, দানীবাবু, শরৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানদাসুন্দরী প্রমুখদের। গিরিশের পরিবর্তে স্টার থিয়েটারে ম্যানেজার নিযুক্ত হন অমৃতলাল বসু এবং নাট্যকার হিসেবে যোগ দেন রাজকৃষ্ণ রায়। ১৮৯১-তে রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটক নরমেধযজ্ঞ, লয়লা-মজনু, সম্মতি সঙ্কট ছাড়াও অমৃতলাল বসুর রচনা 'বিলাপ বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন' (বিদ্যাসাগরের মৃত্যু উপলক্ষে ২৯ জুলাই ১৮৯১ রচিত) মঞ্চস্থ হল।

১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে স্টার থিয়েটারে রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটক বনবীর, ঋষ্যশৃঙ্গ, রাজাবাহাদুর ছাড়াও অমৃতলালের কালাপানি অভিনীত হয়। এছাড়াও বাংলামঞ্চে এই প্রথম হিন্দিভাষায় রচিত নাটক কৃষ্ণবিলাস অভিনীত হয় (৬ আগস্ট)। বাংলামঞ্চে অন্য প্রাদেশিক ভাষায় অভিনয় এই প্রথম ঘটল। এতে উৎসাহিত হয়ে সীতার বনবাসের হিন্দীরূপ রামাশ্বমেধ (রূপান্তর গিরিশচন্দ্র) পরের বছর ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে ২৭ মে মঞ্চস্থ হয়। এছাড়াও রাজকৃষ্ণের বেনুজীর বদরেমুনীর এবং অমৃতলালের বিমাতা বা বিজয়বসন্ত ঐ বছরে অভিনীত হয়। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমের চন্দ্রশেখর (নাট্যরূপ অমৃতলাল) এবং অমৃতলালের বাবু মঞ্চস্থ হয়। চন্দ্রশেখর আর্থিক সাফল্য লাভ করেছিল।

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ রাজকৃষ্ণ রায়ের মৃত্যু হয়। ফলে নাটক রচনার ক্ষেত্রে একটা শূন্যতা নেমে আসে। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে ১৩ জুলাই গিরিশের 'প্রফুল্ল' মঞ্চস্থ হয়। একই দিনে মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয় 'প্রফুল্ল'। গিরিশ তখন মিনার্ভায়। ফলে প্রতিযোগিতা জমে ওঠে। এ বছরে 'প্রফুল্ল' ছাড়া কোনো উল্লেখযোগ্য নাটক অভিনীত হয়নি। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা থিয়েটার ছেড়ে স্টারে ফের যোগ দিলেন ১৫ এপ্রিল। তিনি 'ড্রামাটিক ডিরেক্টর' পদে যোগ দিলেন। বাংলামঞ্চে এমন একটি পদ এই প্রথম গিরিশের জন্যই তৈরি হয়েছিল। গিরিশ আসার পর তাঁর লেখা কালাপাহাড় মঞ্চস্থ হয় (২০ জুন ১৮৯৬)। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করলেন গিরিশচন্দ্র (চিন্তামণি), অমৃত মিত্র (কালাপাহাড়), নগেন্দ্রবালা (ইমান), নরীসুন্দরী (দোলনা) ও প্রমদাসুন্দরী (চঞ্চলা)। এছাড়াও অমৃতলালের বৌমা (১ জুলাই), ও সরলা (৮ জুলাই) মঞ্চস্থ হয়।

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে স্টার থিয়েটারে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো নাটক অভিনীত হবার সংবাদ পাওয়া যায় না। রানি ভিক্টোরিয়ার শাসনকালের অষ্টম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ২১ জুন অভিনীত হয় হীরকজুবিলী। গিরিশের দুটি নাটক পারস্যপ্রসূন ও মায়াবসান যথাক্রমে ১৫ সেপ্টেম্বর ও ৬ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হয় স্টার থিয়েটারে। গিরিশের মায়াবসান নতুন ধরনের সামাজিক নাটক। এই নাটকে কালীকিঙ্করের ভূমিকায় গিরিশের অভিনয় অবিস্মরণীয়। ১৮৯৮-তে অমৃতলালের গ্রাম্যবিভ্রাট ও হরিশ্চন্দ্র নতুন নাটক হিসেবে অভিনীত হয়। এই বছরে গিরিশের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের মতান্তর হয় এবং

গিরিশ ১১ মে হরিশ্চন্দ্র অভিনয়ের পর স্টার থিয়েটার ছেড়ে চলে যান। তিনি আর কখনো স্টার থিয়েটারে ফিরে আসেননি।

গিরিশ চলে যাবার পর স্টার থিয়েটারে দর্শক সমাগম হ্রাস পেতে থাকে। তখন দর্শক টানার জন্য স্টার থিয়েটার অভিনয়ের পূর্বে বায়োস্কোপ দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। ২৯ অক্টোবর ১৮৯৮ থেকে বায়োস্কোপ দেখানো শুরু হয়। ১৮৯৮-এ কলকাতায় প্লেগ রোগ মহামারির আকার ধারণ করে। ফলে নাটক অভিনয় তেমনভাবে হয়নি। শুধু চৈতন্যলীলা অভিনীত হয় সঙ্গে ছিল অমৃতলালের বাবু।

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে স্টার থিয়েটারে পুরোনো নাটকগুলির সঙ্গে মঞ্চস্থ হয় মৃচ্ছকটিক দ্বিজেন্দ্রলালের বিরহ এবং অমৃতলালের সাবাস আটাশ। এসময় আলোয় প্রথম বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয় অমৃতলালের আদর্শ বন্ধু, কৃপণের ধন, যাদুকরী, মনোমোহন বসুর প্রণয় পরীক্ষা, হরিশ্চন্দ্র, দীনবন্ধুর লীলাবতী এবং দ্বিজেন্দ্রলালের ত্র্যহস্পর্শ। নাট্যকারের অভাবে এই সময় অমৃতলালকে প্রচুর নাটক লিখতে হয়। নতুন নাট্যকার হিসেবে ততদিনে এসেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

খ. দ্বিতীয় পর্ব (১৯০১-১৯২০) :

১৯০১ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত অর্থাৎ বিশ শতকের শুরু থেকে বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময় পর্যন্ত স্টার থিয়েটার পরিচালনায় কখনো অমৃতলাল, অর্ধেন্দুশেখর, কখনো বা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। এই সময়কালের মধ্যেই মারা যান অর্ধেন্দুশেখর ও অমরেন্দ্রনাথ। অমৃতলাল বসু অবশ্য বহুদিন স্টার থিয়েটারে যুক্ত ছিলেন।

১৯০৩-তে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ করার প্রস্তাব সারাদেশে তুমুল আলোড়ন তৈরি করে। স্টার থিয়েটার এতদিন পর সাহসের সঙ্গে স্বাদেশিকতার নাটক অভিনয়ে মনোযোগী হয়ে উঠল। ১ মে (১৯০৩) অর্ধেন্দুশেখর স্টারে যোগ দেবার পরে তাঁরই উদ্যোগে ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপাদিত্য (১৫ আগস্ট, ১৯০৩) ও রঙ্গাবতী (৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯০৩) মঞ্চস্থ হয়। এই ধারাপথেই ক্ষীরোদপ্রসাদের পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত (১৫ অক্টোবর, ১৯০৩), নন্দকুমার (১০ নভেম্বর, ১৯০৩), দ্বিজেন্দ্রলালের রাণাপ্রতাপ (২০ ডিসেম্বর, ১৯০৩) অভিনীত হল স্টার থিয়েটারে। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে একইভাবে স্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ হল নীলদর্পণ, রমেশ দত্তের রাজপতজীবন সন্ধ্যা, অমরেন্দ্রনাথ দত্তের রানী ভবানী ইত্যাদি নাটক। অনেকদিন পর বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে যেন নতুন প্রাণের সঞ্চার হল এইভাবে।

এছাড়াও এই দ্বিতীয় পর্বে ৬ সেপ্টেম্বর ১৯০৫ বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার দিনে শোকপালনের জন্য স্টার থিয়েটার বন্ধু ছিল। ১৯০৫-১৯০৭-র মধ্যে স্টারে মঞ্চস্থ হয় রাজপুত জীবনসন্ধ্যা, নীলদর্পণ, নন্দকুমার, পদ্মিনী ইত্যাদি জাতীয়তা ভাবোদ্দীপক নাটক। ১৯০৮-তে পুরোনো নাটকের সঙ্গে নন্দকুমার-এ মীরকাশিম (অমৃত মিত্র), মোহনলাল (অপারেশ) পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত অভিনীত হয় স্টার থিয়েটারে। ১৯০৯-তে স্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় চন্দ্রশেখর, বিবাহবিভ্রাট, পদ্মিনী, সরলা ইত্যাদি নাটক। ১৯১০-র ৬ আগস্ট অমরেন্দ্র দত্তের রানী ভবানী মঞ্চস্থ হবার পর স্টার কর্তৃপক্ষ আর থিয়েটার চালাতে রাজি হলেন না। তখন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টার থিয়েটারের 'লীজ' নিলেন। এরপর মঞ্চস্থ হয়েছিল ভূপেন ব্যানার্জির সৎসঙ্গ (১১ নভেম্বর, ১৯১১), জীবনসংগ্রাম (১৯ নভেম্বর, ১৯১১), খাসদখল (২৫ ডিসেম্বর, ১৯১১), পরপারে (১২ জানুয়ারী, ১৯১২), সরল (৩০ মার্চ, ১৯১২), রানী ভবানী (২০ জুন, ১৯১২) ইত্যাদি নাটক। ১৯১৩-তে স্টার থিয়েটার মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল মনোমোহন গোস্বামীর ধর্মবিপ্লব (২৯ মার্চ) ও রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়পতাকা (২৪ ডিসেম্বর) নাটক। ১৯১৪-র ১ জানুয়ারি এখানে অভিনীত হয় রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মায়াপুরী'।

তারপর মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অহল্যাবাঈ (১৫ আগস্ট) মঞ্চস্থ হয়। এরপর পরপর মারা যান সুশীলবালা (জানুয়ারি ২৪, ১৯১৫) ও অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (৬ জানুয়ারি ১৯১৬)।

অমরেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু স্টার থিয়েটারের পক্ষে বড় আঘাত নামিয়ে আনে। তবু কোনোক্রমে নাটক অভিনয় চলতে থাকে। ১৯১৬-র ৮ এপ্রিল অভিনীত হল ভূপেন্দ্রনাথের হেমেন্দ্রলাল ২৪ জুন অভিনীত হয় হারাণ রক্ষিতের জড়ভরত; ৭ সেপ্টেম্বর মণি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বারাণসী'; ১৯১৭-র ১৪ এপ্রিল মঞ্চস্থ হল যোগীন্দ্র বসুর দেববালা। কিন্তু স্টার থিয়েটার ক্রমশ দর্শক হারাতে থাকলো।

এরপরে অনঙ্গ হালদার নামক একজন খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী স্টার থিয়েটার 'লিজ' নিলেন। এঁরা তত্ত্বাবধানে কুরুক্ষেত্র, রণভেরী, মুচিরামগুড় ইত্যাদি নাটক মঞ্চস্থ হবার পর ১৯১৮-র এপ্রিলে অনঙ্গ হালদার স্টার থিয়েটার ছেড়ে দেন। তখন গিরিমোহন মল্লিক স্টার থিয়েটারের 'লেসি' রূপে শরৎচন্দ্রের 'বিরাজবৌ' (নাট্যরূপ ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে স্টার থিয়েটার পরিচালনা শুরু করেন (৩ আগস্ট, ১৯১৮)। এই সময়ে অপরেশ মুখোপাধ্যায় ও তারাসুন্দরী স্টার থিয়েটারে ফিরে আসেন। তখন অপরেশবাবু হলেন দলের ম্যানেজার। তিনি আসার পর গীতিনাট্য কিন্নরী-র অভিনয় (২ নভেম্বর, ১৯১৮) শুরু হয়। এরপর দেবেন্দ্র বসু অনূদিত ওথেলো (৮ মার্চ, ১৯১৯) মঞ্চস্থ হয়। এই নাটক একদম দর্শক-আনুকূল্য পায়নি। ১৭ মে, ১৯১৯ তারিখে অভিনীত হয় অপরেশবাবুর উর্বশী। এরপরেই গিরিমোহন মল্লিক স্টার থিয়েটার পরিচালনার ভার ত্যাগ করেন। তখন প্রবোধচন্দ্র গুহঠাকুরতার সহায়তায় ও তারাসুন্দরীর সাহায্যে স্টার 'লিজ' নেওয়া হয়। পরিচালনায় ছিলেন অপরেশ মুখোপাধ্যায়। তাঁর পরিচালনায় ১৯২০-র ৫ জুন রাখীবন্ধন (Warrior of Heligoland অবলম্বনে) মঞ্চস্থ হয়।

এরপরে 'আর্ট থিয়েটার লিমিটেড' নামে যৌথ প্রতিষ্ঠান তৈরি করে স্টার থিয়েটার চালাবার চেষ্টা হয়। ১৯২৩-এর ৩০ জুন অপরেশবাবুর 'কর্ণার্জুন' নাটক এর মধ্য দিয়ে এঁদের অভিনয় শুরু হয়। একটানা ২৬০ রাত্রি এটি অভিনীত হয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করে। পরে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে তার গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে (১৯৩৩)।

১.২১ সিটি থিয়েটার

ক. **প্রথম পর্ব :**

রাজকৃষ্ণ রায় যখন বীণা থিয়েটার চালাতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন, তখন ১৮৯১-তে নীলমাধব চক্রবর্তী বীণা থিয়েটার ভাড়া নিয়ে তৈরি করেন সিটি থিয়েটার। প্রোপাইটার ছিলেন তিনজন—নীলমাধব, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ ও অঘোর পাঠক। লেসি ও সেক্রেটারি ছিলেন নীলমাধব চক্রবর্তী। ১৮৯১-এর ১৬ মে সিটি থিয়েটারের উদ্বোধনে মঞ্চস্থ হল গিরিশের চৈতন্যলীলা। গিরিশ ছিলেন সিটি থিয়েটারের মুখ্য পরামর্শদাতা ও নাট্যকার। তাঁর ছেলে দানীবাবুও এখানে অভিনয় করেন। ১৮১১-তে যে-সমস্ত নাটক সিটি থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় তার মধ্যে চৈতন্যলীলা (১৬ মে), সরলা (১৭ মে), বিশ্বমঙ্গল (৩১ মে), সীতার বনবাস (১৭ জুন), নলদময়ন্তী (২০ জুন), বুদ্ধদেবচরিত (১৮ জুলাই) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ১৮৯২-তে এই সিটি থিয়েটারে যেসমস্ত নাটক অভিনীত হয় তার মধ্যে সরলা, বিশ্বমঙ্গল, বেল্লিকবাজার, বুদ্ধদেবচরিত, ভোটভেক্কি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ১৮৯২-এর ৮ এপ্রিল সরলা ও তাজ্জব ব্যাপার-এর অভিনয় এরপরেই সিটি থিয়েটারের প্রথম পর্বের অভিনয় শেষ হয়ে যায়।

খ. **দ্বিতীয় পর্ব :**

সিটি থিয়েটারে ১৮৯২-এর ৮ এপ্রিল প্রথম পর্বের অভিনয় শেষ করার পরে নীলমাধব চক্রবর্তী সিটি থিয়েটার বন্ধ করে দিয়ে চলে যান। গিরিশের সঙ্গে সিটি থিয়েটার কর্তৃপক্ষের মনোমালিন্য হওয়ায় গিরিশ সিটি থিয়েটার ত্যাগ করেন। দানীবাবু ও প্রবোধ ঘোষ সিটি থিয়েটার ছেড়ে চলে যান।

পরে ১৮৯৩-এর অক্টোবরে নীলমাধব চক্রবর্তী সিটি থিয়েটারের জন্য ফের বীণা থিয়েটার ভাড়া নেন। দ্বিতীয় পর্বে ৭ অক্টোবর (১৮৯৩) সরলা (নাট্যরূপ অমৃতলাল বসু) অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সিটি থিয়েটারের উদ্বোধন হল। ১৮৯৩-তে সিটি থিয়েটার যেসমস্ত নাটক মঞ্চস্থ করে তার মধ্যে সরলা (৭ অক্টোবর), ধ্রুবচরিত্র (৮ অক্টোবর), তাজ্জবব্যাপার (১৪ অক্টোবর), নলদময়ন্তী (১৫ অক্টোবর), চৈতন্যলীলা (৪ নভেম্বর), প্রফুল্ল (১৭ ডিসেম্বর), বেল্লিকবাজার (৩০ ডিসেম্বর) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৪-তে কোনো নতুন নাটক অভিনীত হয়নি। পুরোনো নাটকেরই অভিনয় চলতে থাকে। ১৮৯৪-এর ১১ ফেব্রুয়ারি তাজ্জবব্যাপার অভিনীত হবার পরেই সিটি থিয়েটার-এর দ্বিতীয় পর্ব শেষ হয়ে যায়।

গ. **তৃতীয় পর্ব :**

১৮৯৬-তে নীলমাধব চক্রবর্তী মিনার্ভা থিয়েটার ভাড়া নিয়ে সিটি থিয়েটার চালিয়েছিলেন মাত্র দু' মাস। ১৮৯৬-এর ১১ এপ্রিল থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত স্বল্পকালে সরলা (অমৃতলালের নাট্যরূপ), তাজ্জবব্যাপার ও ধ্রুবচরিত্র এই তিনটি নাটকের অভিনয় হয় এই সিটি থিয়েটারে।

ঘ. **চতুর্থ পর্ব :**

১৮৯৬-এর জুন মাসে এমারেল্ড থিয়েটার লিজ নিয়ে নীলমাধব চক্রবর্তী আবার সিটি থিয়েটারে অভিনয় শুরু করান। ১৮৯৬-এর ২০ জুন এমারেল্ডের মঞ্চে মোহমুক্তি নাটকের মধ্য দিয়ে এই পর্বে সিটি থিয়েটারে উদ্বোধন হয়। ১৮৯৬-তে এখানে অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে মোহমুক্তি (২০ জুন), আবুহোসেন (২১ জুন), বুদ্ধদেবচরিত (২৫ জুলাই), প্রফুল্ল (৯ আগস্ট), সরলা (২৯ আগস্ট), চৈতন্যলীলা (১৩ সেপ্টেম্বর), হীরারফুল (৮ নভেম্বর), দেবীচৌধুরানী (১৯ ডিসেম্বর) ইত্যাদি উল্লেখ্য। ১৮৯৭-তে মাধবী, কষ্টিপাথর, বিশ্বমঙ্গল অভিনীত হয় সিটি থিয়েটারে। ১৮৯৭-এর ১০ জানুয়ারি গিরিশের 'বিশ্বমঙ্গল' সিটি থিয়েটারে চতুর্থ পর্বের শেষ অভিনয়।

ঙ. **পঞ্চম পর্ব :**

অক্লান্ত নীলমাধব চক্রবর্তী ১৯০০-তে ৯১ হ্যারিসন রোডে কার্জন থিয়েটার ভাড়া নিয়ে শেষবারের জন্য সিটি থিয়েটার চালু করেন। ২৩ ডিসেম্বর ১৯০০ তারিখে গিরিশের 'পারিসানা' নাটক দিয়ে এর উদ্বোধন হয়। গিরিশের গীতিনাট্য 'পারস্যপ্রসূনের' পরিবর্তিত নাম 'পারিসানা'। এর সঙ্গে অমৃতলালের 'কৃপণের ধন' মঞ্চস্থ হয়। এই থিয়েটার দু' মাস স্থায়ী হয়। আলিবাবা ও হীরেরফুল ১৯০১-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি শেষ অভিনয়।

১.২২ মিনার্ভা থিয়েটার

১৮৯৩-এর ২৮ জানুয়ারি ৬ নং বিডন স্ট্রিটে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় মিনার্ভা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। এই থিয়েটারের যাবতীয় অর্থব্যয় করলেন নাগেন্দ্রভূষণ, অন্যদিকে নাট্যদল তৈরি ও অভিনয়ের যাবতীয় দায়িত্ব নিলেন গিরিশচন্দ্র। অভিনয় শিক্ষকরূপে এখানে অর্ধেন্দুশেখর। বাংলা রঙ্গমঞ্চের দুই স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের

মিলনসূত্রে মিনার্ভা আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল। বিডন স্ট্রিটের যে জমিতে পূর্বে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানেই নির্মিত হল মিনার্ভা থিয়েটারের নতুন বাড়ি। নতুন দলে অভিনয়ের জন্য রইলেন গিরিশ, অর্ধেন্দুশেখর, দানীবাবু, চুনীলাল দেব, নিখিল দেব, নীলমণি ঘোষ, কুমুদনাথ সরকার, অঘোরনাথ পাঠক, অনুকূল বটব্যাল, তিনকড়ি দাসী, প্রমদাসুন্দরী ও পরমাসুন্দরী। সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন দেবকণ্ঠ বাগচী। স্টেজ ম্যানেজার হলেন ধর্মদাস সুর।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি শেক্স পীয়রের ম্যাকবেথ (অনুবাদ গিরিশ) নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে মিনার্ভা থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। ড্রপসিন এঁকেছিলেন ইংরেজ চিত্রকর মি. উইলিয়ার্ড এবং দৃশ্যসজ্জায় ছিলেন পিমসাহেব। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন গিরিশচন্দ্র (ম্যাকবেথ), তিনকড়ি (লেডি ম্যাকবেথ), দানীবাবু (ম্যালকম), কুমুদ সরকার (ব্যাঙ্কো), অঘোর পাঠক (ম্যাকডাফ), প্রমদাসুন্দরী (লেডি ম্যাকডাফ), অর্ধেন্দুশেখর (দ্বারপাল, ডাক্তার, হত্যাকারী ও ডাকিনি)। এই অভিনয় দারুণ খ্যাতি লাভ করে ও পত্র-পত্রিকাতেও অকুণ্ঠ প্রশংসা করা হয়। কিন্তু সাধারণ দর্শকের কাছে এ নাটক সহজবোধ্য ছিল না। প্রচুর অর্থব্যয়ে নির্মিত এই নাটকের পর পর অভিনয়ে দর্শক হ্রাস পেতে থাকল। দশ রাত অভিনয়ের পর গিরিশ বাধ্য হয়ে এই নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দিলেন। গিরিশ এর পরে মঞ্চস্থ করলেন নৃত্যগীতের নাটক 'মুকুলমঞ্জুরা' ও 'আবুহোসেন'। এই দুই নাটক বিপুল জনপ্রিয়তা পেল ও প্রচুর আয় হল। সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে মিনার্ভা থিয়েটার পর পর বেশ কিছু নাটকের অভিনয় করে। তার মধ্যে সপ্তমীতে বিসর্জন (১১ অক্টোবর, ১৮৯৩), জনা (২৩ ডিসেম্বর, ১৮৯৩), নলদময়ন্তী (২৪ ডিসেম্বর, ১৮৯৩), বড়দিনের বখ্‌শিস (২৫ ডিসেম্বর, ১৮৯৩), প্রফুল্ল (২৪ মার্চ, ১৮৯৪), করমেতিবাঈ (১৪ জুলাই, ১৮৯৪), পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস (১৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪), সধবার একাদশী (২৫ নভেম্বর, ১৮৯৪), দক্ষযজ্ঞ (২৫ জানুয়ারি, ১৮৯৫), পলাশীর যুদ্ধ (২২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৫) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এখানে উল্লেখ্য যে বড়দিনের বখ্‌শিস ও পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস অভিনয়ের সময় ব্রিটিশ পুলিশ নাটকের অভিনয় বন্ধ করার চেষ্টা করে। প্রথমটিতে বড়দিনকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে ও দ্বিতীয়টি অশালীন—এই অভিযোগ ছিল।

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে গিরিশ মিনার্ভা ত্যাগ করেন। মালিক নাগেন্দ্রভূষণের সঙ্গে আর্থিক ব্যাপারে মনোমালিন্য চলছিল গিরিশের। গিরিশ মিনার্ভা ছেড়ে স্টারে যোগ দেন। এরপর মিনার্ভা থিয়েটার পরিচালনায় আসেন চুনীলাল দেব। দুর্গাদাস দে-র সাহায্যে ১৮৯৭ সালে মিনার্ভা থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় জুবিলি যজ্ঞ, আকবর, লক্ষ্মণবর্জন, ফটিকচাঁদ, আলিবাবা, পলাশীর যুদ্ধ ইত্যাদি নাটক। কিন্তু মিনার্ভা থিয়েটারের দুর্দশা কাটে না তবু। বরং আরও অবনতি হয়। শেষপর্যন্ত নাগেন্দ্রভূষণ বাধ্য হয়ে প্রকাশ্য নিলামে মিনার্ভা থিয়েটার বিক্রি করে দেন।

শেষপর্যন্ত নরেন্দ্রনাথ সরকার (শ্রীপুরের জমিদার) ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে মিনার্ভা থিয়েটারের মালিক ও পরিচালক রূপে নব উদ্যমে মঞ্চস্থ করেন দুর্গাদাস দে-র রচনা স্ত্রী (২৯ মে ১৮৯৯)। এরপরে মালিক নরেন্দ্রনাথ সরকারের রচনা মদালসা অভিনীত হয়। এরপর ১৯০০-র মে মাস পর্যন্ত মিনার্ভা থিয়েটারে পর পর অভিনীত হল কিশোরসাধন, জুলিয়া, পলাশীর যুদ্ধ, বসন্তবিহার, বসন্তরায় ইত্যাদি নাটক, নাট্যরূপ ও নীতিনাট্য। কিন্তু কোনো অভিনয়েই তেমনভাবে বিপুলসংখ্যক দর্শক সাড়া দিলেন না। ফলে একরকম বাধ্য হয়ে নরেন্দ্রনাথ মিনার্ভা থিয়েটারের গিরিশচন্দ্রকে নিয়ে এলেন। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে এলেন অর্ধেন্দুশেখর। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন বঙ্কিমের সীতারাম (নাট্যরূপ গিরিশচন্দ্র) মঞ্চস্থ হল মিনার্ভা থিয়েটারে। এই নাটক বেশ কিছুটা জনপ্রিয়তা লাভ করে। এরপর গিরিশের রচনা মণিহরণ গীতিনাট্য মঞ্চস্থ হয়। তারপর গিরিশের কিছু পুরোনো নাটক যেমন প্রফুল্ল, বেল্লিকবাজার ইত্যাদি অভিনয়ের মধ্য দিয়ে মিনার্ভা থিয়েটার যখন শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াল,—তখনই নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে গিরিশের মনোমালিন্য শুরু হয়। গিরিশ মিনার্ভা ত্যাগ করে ক্লাসিক থিয়েটারে চলে গেলেন। গিরিশবিহীন মিনার্ভা চালানো কঠিন বুঝে নরেন্দ্রনাথ নিজেও মিনার্ভা থিয়েটারের মালিকানা ছেড়ে দিলেন। মিনার্ভা থিয়েটারের নতুন মালিক হলেন জমিদার প্রিয়নাথ দাস। তাঁর সহযোগী ছিলেন বেণীভূষণ রায়।

এদিকে অমরেন্দ্রনাথ প্রিয়নাথের কাছ থেকে মাসিক পাঁচশো টাকায় ভাড়ায় তিন বছরের জন্য 'লিজ' নিলেন মিনার্ভা থিয়েটার (১৯০৩-এর ১০ মে)। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ১০ নভেম্বর ক্ষীরোদপ্রসাদের 'রঘুবীর' অভিনয়ের মধ্য দিয়ে অমরেন্দ্রনাথ মিনার্ভার উদ্বোধন করেন। ১৫ নভেম্বর মঞ্চস্থ হয় বঙ্কিমের আনন্দমঠ নাট্যরূপ। কিন্তু এই দুই নাটক দর্শকপ্রিয় হতে পারল না। অমরেন্দ্রনাথ ক্রমশ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ফলে বাধ্য হয়ে অমরেন্দ্রনাথ মিনার্ভা লিজ দিলেন ধনী ব্যবসায়ী মনোমোহন পাঁড়েকে। মনোমোহন পাঁড়ে আবার সাবলীজ দেন মাসিক সাতশো পঞ্চাশ টাকায় চুনীলাল দেবকে। চুনীলাল মনোমোহন গোস্বামীর সংসার নাটক দিয়ে শুরু করলেন। তারপর ১৯০৪-এর ২৩ আগস্ট অভিনীত হয়েছিল নন্দবিদায়, লক্ষ্মণবর্জন, কুব্জ ও দর্জী নামক অকিঞ্চিৎকর তিনটি নাটক। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার প্রচুর দর্শক লাভ করলো ঐ তিনটি নাটক। ১৯০৪-এর শেষদিকে অর্ধেন্দুশেখর এখানে যোগ দেন। গিরিশ ও তিনকড়ি মিনার্ভাতে এলেন। এই সময় মিনার্ভা থিয়েটারে মঞ্চস্থ হল নীলদর্পণ, ঐন্দ্রিলা, প্রতাপাদিত্য ইত্যাদি নাটক। ১৯০৫-এর প্রথমে কলকাতার বাইরে অভিনয় করতে যায় মিনার্ভা থিয়েটার। তখন মালিক মনোমোহন পাঁড়ের সঙ্গে ভাড়াটে চুনীলালের মনোমালিন্য শুরু হয়। চুনীলাল মিনার্ভা ছেড়ে দেন। মনোমোহন পাঁড়ে তখন অপরেশ মুখোপাধ্যায়কে ম্যানেজার নিযুক্ত করেন (১৯০৫, ১৮ ফেব্রুয়ারি)। গিরিশ, অর্ধেন্দুশেখর, অপরেশের সম্মিলনে মিনার্ভার হৃতগৌরব ফিরে এলো। ১৯০৫-এর ৮ এপ্রিল মঞ্চস্থ হল 'বলিদান'। এরপর ২৯ জুলাই অভিনীত হয় 'রাণাপ্রতাপ'। ৯ সেপ্টেম্বর মঞ্চস্থ হয় গিরিশের 'সিরাজদ্দৌল্লা'। ১৯০৬-এর ১৬ জুন গিরিশের 'মীরকাশিম' অভিনীত হল। ১৯০৭-এর ১ জানুয়ারি গিরিশের য্যায়সা কা ত্যায়সা মঞ্চস্থ হবার পরে ২রা জুন অভিনীত হয় প্রফুল্ল নাটক। এরপরই ১৯০৭-এর জুলাই মাস থেকে মিনার্ভা থিয়েটার-এর দুর্দশা শুরু হয়। গিরিশচন্দ্র, দানীবাবু, তিনকড়ি, কিরণবালা মিনার্ভা থিয়েটার ছেড়ে এসময় কোহিনূর থিয়েটারে চলে যান। মিনার্ভা চরম বিপদে পড়ে অমরেন্দ্রনাথকে মাসিক পাঁচশো টাকা বেতনে নিয়ে আসে। অমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আসেন কুসুমকুমারী। অমরেন্দ্রনাথ হলেন নতুন ম্যানেজার। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে এখানে অভিনীত হয় প্রফুল্ল (২৭ অক্টোবর), দুর্গাদাস (৩ নভেম্বর), সিরাজদ্দৌল্লা (১৭ নভেম্বর), ছত্রপতি শিবাজী (৩০ নভেম্বর) ইত্যাদি। ১৯০৮-তে অভিনীত হল বলিদান, নূরজাহান, নবীন তপস্বিনী, তুফানী ইত্যাদি নাটক। পুনর্বার জুলাইয়ে গিরিশচন্দ্র মিনার্ভায় ফিরে এলেন। ততদিনে অবশ্য অর্ধেন্দুশেখর চলে গেছেন। গিরিশ আসার পর অভিনীত হয় সোরাবরুস্তম (২৯ সেপ্টেম্বর), শাস্তি কি শান্তি (৭ নভেম্বর), মেবার পতন (২৬ ডিসেম্বর) ইত্যাদি নাটক। ১৯০৯-তে মঞ্চস্থ হল সাজাহান, অশোক, বাঙ্গালার মসন্দ ইত্যাদি নাটক।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে মনোমোহন মহেন্দ্রনাথ মিত্রকে বাইশ হাজার টাকায় মিনার্ভা থিয়েটার বেচে দিলেন। ১৯১১-এর ১৭ জুন নতুনভাবে চালু করলেন মিনার্ভা থিয়েটার। ১৫ জুলাই মঞ্চস্থ হয় গিরিশের বলিদান। মঞ্চে এটি ছিল গিরিশের শেষ অভিনয়। এরপরেই গিরিশ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯১২ সালে মহেন্দ্রনাথ মিত্রের মৃত্যুর পর মনোমোহন পাঁড়ে আবার মিনার্ভার মালিক হন। এসময় খাসদখল, রঙ্গিলা, রুমেলা, ভীষ্ম ইত্যাদি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল মিনার্ভা থিয়েটারে। ১৯১৫ থেকে মিনার্ভার দায়িত্ব নেন উপেন্দ্রনাথ মিত্র। ২ অক্টোবর ১৯১৫ দ্বিজেন্দ্রলালের সিংহলবিজয় নাটক দিয়ে তিনি মিনার্ভার উদ্বোধন করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে মিনার্ভার যাত্রাপথে সব চাইতে বড় আঘাত এল, হঠাৎ আগুনে মিনার্ভা থিয়েটার পুড়ে যায়। উপেন্দ্রনাথ মিত্র হতোদ্যম না হয়ে মিনার্ভার পুনর্নির্মাণ করলেন। এসময়ে বরদাকুমার দাশগুপ্তর মিশরকুমারী (৫ জুলাই, ১৯১৯) খুবই সাফল্য লাভ করেছিল। এই সময়ে বিখ্যাত অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী কিছু সময় মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয় করেন। ১৯৩৮ পর্যন্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র মিনার্ভা থিয়েটারের মালিক ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিনার্ভা থিয়েটার নতুন পরিচালকমণ্ডলীর অধীনে চলে আসে। ১৯৪২ থেকে আবার অভিনয় শুরু হয়। দুর্গাদাস

বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি গুপ্তা, নীরদাসুন্দরী প্রমুখ প্রসিদ্ধ শিল্পীরা এসময় মিনার্ভা থিয়েটারে যোগ দেন। পরে আসেন বিখ্যাত নির্মলেন্দু লাহিড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, সরয়ূবালা প্রমুখ শিল্পী।

১.২৩ ক্লাসিক থিয়েটার

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ এপ্রিল ৬৮ নং বিডন স্ট্রিটে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিষ্ঠা করেন ক্লাসিক থিয়েটার। ঐদিন সন্ধ্যায় মঞ্চস্থ হল গিরিশের নলদময়ন্তী, তৎসহ প্রহসন বেল্লিকবাজার। ৬৮ নং বিডন স্ট্রিটে এমারেল্ড থিয়েটার লীজ নিয়ে সম্পূর্ণ পেশাদারি ভঙ্গিমায় প্রতিষ্ঠা করেন ক্লাসিক থিয়েটার। অভিনয়ে ছিলেন সতীশ চট্টোপাধ্যায়, তারাসুন্দরী, মহেন্দ্রলাল বসু, অঘোরনাথ পাঠক, প্রমথনাথ দাস, গোবর্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মদাস সুর, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, হরিভূষণ ভট্টাচার্য, কুসুমকুমারী, নয়নতারা, শরৎসুন্দরী, সরোজিনী। এঁদের সকলকে নিয়ে অমরেন্দ্রনাথ তৈরি করলেন ক্লাসিক থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানি। দীর্ঘদিন বাদে নিজস্ব মালিকানা ও পরিচালনায় অমরেন্দ্রনাথ দত্তের নিজস্ব থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হল : ক্লাসিক থিয়েটার। অঘোরনাথ পাঠক ছিলেন সঙ্গীত শিক্ষক।

পূর্ণোদ্যমে ক্লাসিক থিয়েটারের অভিনয় শুরু হয়ে গেল। বাংলা নাট্যমঞ্চে নতুন জীবন সঞ্চারিত হল। ক্লাসিক থিয়েটারে উল্লেখযোগ্য অভিনয়ের একটি তালিকা দেওয়া হচ্ছে :—

১৮৯৭ : নলদময়ন্তী ও বেল্লিকবাজার (১৬ এপ্রিল), পলাশীর যুদ্ধ ও লক্ষ্মণবর্জন (১৭ এপ্রিল), দক্ষযজ্ঞ (১৮ এপ্রিল), বিবাহবিভ্রাট (২৪ এপ্রিল), হারানিধি (১ মে), বিল্বমঙ্গল (২৩ মে), বুদ্ধদেবচরিত (৩০ জুন), রাজা ও রানী (২৪ জুলাই), আলিবাবা (২০ নভেম্বর), আলাদীন (১২ ডিসেম্বর)।

১৮৯৮ : পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস (৮ জানুয়ারি), দোললীলা (৫ মার্চ), মেঘনাদবধ (১৬ জুলাই), প্রফুল্ল (২৭ আগস্ট), ইন্দিরা (২৪ সেপ্টেম্বর), কমলেকামিনী (৫ নভেম্বর)।

১৮৯৯ : জনা (৮ জানুয়ারি), রাজা ও রানী (১৫ জানুয়ারি), ধ্রুবচরিত্র (২২ ফেব্রুয়ারি), সীতার বনবাস (৮ মার্চ), প্রফুল্ল (১৮ মার্চ), আবুহোসেন (১২ এপ্রিল), চক্ষুদান (১৩ মে), করমেতিবাঈ (১৫ জুলাই), ম্যাকবেথ (১৮ নভেম্বর)।

১৯০০ : দেবীচৌধুরানী (১ জানুয়ারী), বিশ্বমঙ্গল (৭ জানুয়ারি), আলিবাবা (১৭ জানুয়ারি), পাণ্ডবগৌরব (১৭ ফেব্রুয়ারি), সীতারাম (৩০ জুন), সরলা (৩১ জুলাই), সধবার একাদশী (২০ আগস্ট), বৃষকেতু (৫ সেপ্টেম্বর)।

১৯০১ : চাবুক (১ জানুয়ারি), অশ্রুধারা (২৬ জানুয়ারি), কপালকুণ্ডলা (১ জুন), মৃণালিনী (২৭ জুলাই), চৈতন্যলীলা (১৪ সেপ্টেম্বর), অভিশাপ (২৮ সেপ্টেম্বর)।

১৯০২ : বহুত আচ্ছা (১৮ জানুয়ারি), ফটিকজল (১২ এপ্রিল), ভ্রান্তি (১৯ জুলাই), আয়না (২৫ ডিসেম্বর)।

১৯০৩ : প্রতাপাদিত্য (২৯ আগস্ট), নীলদর্পণ (১২ সেপ্টেম্বর), হিরণ্ময়ী (১৪ নভেম্বর)।

১৯০৪ : ভ্রমর (৩ মার্চ), সৎনাম (৩০ এপ্রিল), পৈয়ার (১ জুন), তরণীসেনবধ (২৩ জুলাই), বিক্রমাদিত্য (২৪ জুলাই), চোখের বালি (২৭ নভেম্বর)।

১৯০৫ : কোনটা কে? (১২ ফেব্রুয়ারি), প্রেমের পাথারে (২ মার্চ), শিবরাত্রি (৪ মার্চ), সংসার (৪ মার্চ), পৃথ্বীরাজ (৪ নভেম্বর), প্রণয় না বিষ (২৩ ডিসেম্বর), এস যুবরাজ (৩০ ডিসেম্বর)।

১৯০৬ : সিরাজদৌল্লা (২৭ জানুয়ারি)।

এরপরই অমরেন্দ্রনাথ দত্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন ও তিনি অবশেষে ১৯০৬-এর মে মাসে ক্লাসিক ছেড়ে দিলেন। বাংলা থিয়েটারে মঞ্চব্যবস্থার পরিবর্তনে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ভূমিকা অনস্বীকার্য। নাটকের বিজ্ঞাপনে অমরেন্দ্রনাথের মৌলিক ভাবনা সেদিন নতুনত্ব সঞ্চার করেছিল।

১.২৪ অরোরা থিয়েটার

১৯০১-এর এপ্রিল মাসে ৯ নং বিডন স্ট্রিটে অবস্থিত বেঙ্গল থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেলে এই ভাড়া নিয়ে গুরুপ্রসাদ মৈত্র প্রতিষ্ঠা করলেন অরোরা থিয়েটার।

ঐ বছরের ১৭ আগস্ট ক্ষীরোদপ্রসাদের দক্ষিণা নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে অরোরা থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। ম্যানেজার নিযুক্ত হন নীলমাধব চক্রবর্তী। অভিনয়ে ছিলেন শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কুসুম, হরিমতী, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, অক্ষয় চক্রবর্তী, গোপাল এবং নীলমাধব চক্রবর্তী। এর পরে অরোরা থিয়েটারে মঞ্চস্থ হল ক্ষীরোদপ্রসাদের জুলিয়া (১৮ আগস্ট), অমৃতলাল বসুর কৃপণের ধন (১৯ আগস্ট), আলিবাবা (১২ সেপ্টেম্বর), বেল্লিকবাজার (১৬ সেপ্টেম্বর), চৈতন্যলীলা (১ অক্টোবর), বিল্বমঙ্গল (১৫ অক্টোবর), সরলা (১০ নভেম্বর), দেবীচৌধুরানী (২৫ নভেম্বর) ইত্যাদি নাটক। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে মে মাসে অর্ধেন্দুশেখর অরোরা থিয়েটারে যোগ দিলেন। তারপরই মঞ্চস্থ হল মনোমোহনের রিজিয়া নাটক (১৭ মে)। রিজিয়া-র অভিনয় অরোরার ভাগ্য ফিরিয়ে দিল। খ্যাতি ও অর্থপ্রাপ্তির আনন্দে অরোরা থিয়েটার তখন পরপর নাট্যাভিনয় করে যেতে থাকাল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল : সধবার একাদশী (১ জুন), জেনানাযুদ্ধ (১৬ জুলাই), বিষবৃক্ষ (২৭ জুলাই), বিশ্বমঙ্গল (৩০ জুলাই), রাধারানি (২৩ আগস্ট) এবং প্রফুল্ল (২৩ নভেম্বর), রিজিয়া (১৩ ডিসেম্বর)।

এক বছর চার মাস পরে ১৩ ডিসেম্বর ১৯০২ অরোরা থিয়েটার শেষ অভিনয় করল।

১.২৫ কোহিনূর থিয়েটার

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ক্লাসিক থিয়েটার প্রকাশ্যে নিলামে উঠলে জমিদার শরৎকুমার রায় এক লক্ষ ষাট হাজার টাকায় সেই থিয়েটার বাড়ি কিনে সেখানে কোহিনূর থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। ১১ আগস্ট কোহিনূর থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয়। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সহকারী ম্যানেজার হিসেবে এখানে যোগ দেন। শরৎকুমার অপরেশচন্দ্র উভয়ে মিলে নতুন নাট্যদল গঠনে উদ্যোগী হন। নাট্যকার হিসেবে স্টার থিয়েটার থেকে নিয়ে আসা হয় ক্ষীরোদপ্রসাদকে। অভিনয়ে অংশ নিতে ন্যাশনাল থিয়েটার থেকে আসেন শরৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাসুন্দরী, মিনার্ভা থিয়েটার থেকে আসেন দানীবাবু, মন্মথনাথ পাল, তিনকড়ি, কিরণবালা, ক্ষেত্রমোহন মিত্র প্রমুখরা। স্টেজ ম্যানেজার হলেন ধর্মদাস সুর। সাজসজ্জায় শিল্পী মহাতাপচন্দ্র ঘোষ দায়িত্ব পেলেন। ঐকতান বাদনের দায়িত্ব ছিল দক্ষিণারঞ্জন রায়ের। সর্বোপরি গিরিশচন্দ্রকে দশ হাজার টাকা বোনাস ও মাসিক পাঁচশো টাকা বেতনে নিয়ে আসা হল।

ক্ষীরোদপ্রসাদের চাঁদবিবি নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে কোহিনূর থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। ঐতিহাসিক নাটক চাঁদবিবি বিশেষভাবে মঞ্চসফল হওয়ায় দুর্গেশনন্দিনী (নাট্যরূপ গিরিশ), ছত্রপতি শিবাজী (গিরিশ) এবং মীরকাশিম (গিরিশ) পরপর মঞ্চস্থ হল যথাক্রমে ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৬ সেপ্টেম্বর ও ১৭ সেপ্টেম্বর। এরপরে ২৫ ডিসেম্ভর অভিনীত হল ক্ষীরোদপ্রসাদের দাদা ও দিদি।

ঐ বছরই ৩১ ডিসেম্বর কোহিনূরের স্বত্ত্বাধিকারী শরৎকুমার রায়ের মৃত্যু হয়। তাঁর ছোট ভাই শিশিরকুমার রায় রিসিভার হিসেবে কোহিনূর থিয়েটার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

পরের বছর কোহিনূর থিয়েটারে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের অভিনয় দেখতে পাই : গিরিশের প্রফুল্ল, ক্ষীরোদপ্রসাদের অশোক, ভূতের বেগার, বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী (নাট্যরূপ গিরিশ) ইত্যাদি। ১৯০৮-এর মধ্যভাগে জুন মাস নাগাদ শিশিরকুমার রায়ের সঙ্গে গিরিশের মনোমালিন্য শুরু হয়। অভিনেতাদের ক্ষেত্রমোহন মিত্র, মন্মথ পাল,

মণীন্দ্র মণ্ডল কোহিনূর ছেড়ে চলে গেলেন। গিরিশচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাঁপানিতে আক্রান্ত হয়ে তিনি কোহিনূর থিয়েটারে নিয়মিত আসতে পারছিলেন না। মালিক শিশিরকুমার রায় গিরিশের বেতন বন্ধ করে দেন। গিরিশ আদালতে মামলা করেন। গিরিশ মামলায় জিতে সমস্ত প্রাপ্য টাকা বুঝে নিয়ে মিনার্ভায় চলে যান। তাঁর সঙ্গে চলে যান দানীবাবু। গিরিশ চলে এলে ১৯০৮-এর জুলাই মাসে অর্ধেন্দুশেখর কোহিনূর থিয়েটারে যোগ দেন।

১৯০৮ কোহিনূর থিয়েটারে যেসমস্ত নাটক অভিনীত হয় তার মধ্যে সংসার (১৫ জুলাই), জেনানাযুদ্ধ (১৫ জুলাই), আবুহোসেন (২৯ জুলাই), দুর্গেশনন্দিনী (১ আগস্ট), নীলদর্পণ (২ আগস্ট), নবীন তপস্বিনী (৮ আগস্ট), প্রফুল্ল (৯ আগস্ট)। আগস্টের (১৯০৮) দুটি নাটকই অর্ধেন্দুশেখরের শেষ অভিনয়। এরপরেই ১৭ সেপ্টের, ১৯০৮ তাঁর মৃত্যু হয়।

১৯০৮-এর ১৮ ডিসেম্বর পাঞ্জাব গৌরব নাটক মঞ্চস্থ হয়। কিন্তু পাঞ্জাবি সম্প্রদায় এই নাটকের বিরোধিতা করেন। ফলে কোহিনূর থিয়েটার কর্তৃপক্ষ ঐ নাটকটির নাম পাল্টে বীরপূজা নামে মঞ্চস্থ করেন ১৯০৯-এর ৩০ জানুয়ারি।

১৯০৯-তে অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে হরনাথ বসুর ময়ূরসিংহাসন, যোগীন্দ্রনাথ বসুর প্রতিফল, দুর্গাদাস দে-র সোনারসংসার, হরিপদ মুখোপাধ্যায়-এর রানী দুর্গাবতী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১৯১০ সালে কোহিনূর থিয়েটারে উল্লেখ্য নাটকের অভিনয় : রবীন্দ্রনাথের গোড়ায় গলদ, গিরিশের চণ্ড, রাজা অশোক, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূতের বিয়ে ইত্যাদি। পরের বছর অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে (এ বছর অতুল মিত্র ও কুসুমকুমারী কোহিনূরে যোগ দেন) গ্রহের ফের (হরিশ্চন্দ্র সান্যাল), জেনোরিয়া (অতুল মিত্র), প্রাণের টান (অতুল মিত্র) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১৯১২-তে মঞ্চস্থ হয় গিরিশের বলিদান, পাণ্ডব গৌরব, অতুল মিত্রের মোহিনীমায়া ইত্যাদি নাটক। ২১ জুলাই বিশ্বামিত্র ও পলিন নাটকের অভিনয়ের পরেই কোহিনূর থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়॥

১.২৬ অনুশীলনী

১.২৬.১ বিস্তৃত প্রশ্নাবলী :

১. বাংলা নাট্যমঞ্চের বিবর্তনে বেঙ্গল থিয়েটারের ভূমিকা আলোচনা করুন।

২. সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩. গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে বাংলা নাট্যচর্চার ইতিহাস বিবৃত করুন।

৪. স্টার থিয়েটারের গুরুত্ব কোথায়? আলোচনা করুন।

৫. বাংলা রঙ্গামঞ্চে হাতিবাগানের স্টার থিয়েটারের ভূমিকা কতটুকু?

৬. বাংলা নাট্যচর্চায় রাজকৃষ্ণ রায় ও বীণা থিয়েটারের অবদান আলোচনা করুন।

৭. বঙ্গ রঙ্গামঞ্চে মিনার্ভা থিয়েটারের গুরুত্ব কোথায়? আলোচনা করুন।

৮. বাংলা নাট্যাভিনয়ে ক্লাসিক থিয়েটারের গুরুত্ব কোথায়?

৯. বঙ্গ রঙ্গামঞ্চে অরোরা ও কোহিনূর থিয়েটারের অবদান আলোচনা করুন।

১.২৬.২ অবিস্তৃত প্রশ্নাবলী :

১. গিরিশচন্দ্র ঘোষ কবে-কবে, কোন্-কোন্ নাট্যমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?

২. বেঙ্গল থিয়েটারের কী অবদান ছিল বাংলা নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে?

৩. উৎপল দত্তের কোন্ নাটকে বাংলা রঙ্গমঞ্চের কোন ব্যাপারটির ছায়াপাত হয়েছে বলুন।

৪. 'হনুমান চরিত্র' এবং 'The Police of Pig and Sheep' নাটক দুটি অভিনয়ের সূত্রে কী-কী ঘটনা ঘটেছিল, বলনু।

১.২৬.৩ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

১. কবে কোথায় সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়?

২. সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রথম অভিনীত হয়ে কোন্ নাটক? নাট্যকার কে?

৩. সাধারণ রঙ্গালয়-এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কারা?

৪. সাধারণ রঙ্গালয় ভেঙে যাবার দু'টি কারণ কী-কী?

৫. সাধারণ রঙ্গালয় ভেঙে কোন্ দুই দল তৈরি হয়?

৬. কবে কোথায় বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়?

৭. বেঙ্গল থিয়েটার কবে বন্ধ হয়ে যায়?

৮. গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার কবে কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?

৯. গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম কোন্ নাটকের অভিনয় হয়?

১০. নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন চালু হয় কবে?

১১. নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনে গ্রেপ্তার হওয়া অভিনেতাদের মধ্যে অগ্রগণ্য কে ছিলেন?

১২. প্রতাপচাঁদ জহুরি কে?

১৩. হামীর নাটক কার লেখা? কোথায় মঞ্চস্থ হয়?

১৪. স্টার থিয়েটার কবে কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?

১৫. স্টার থিয়েটারের জমিতে কোন্ থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয়?

১৬. বীণা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা কে? প্রতিষ্ঠা কবে? কোথায়?

১৭. বীণা থিয়েটারে অভিনীত প্রথম নাটক কোন্‌টি? কবে প্রথম অভিনয়?

১৮. স্টার থিয়েটার (হাতিবাগান)-এর স্বত্বাধিকারী কারা ছিলেন?

১৯. সিটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠা কবে? প্রোপাইটার ছিলেন কারা?

২০. কবে কোথায় কে মিনার্ভা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন?

২১. মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত নাটক কোন্‌টি?

২২. ক্লাসিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা কবে? কোথায়? প্রতিষ্ঠাতা কে?

২৩. ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত প্রথম নাটক কোন্‌টি? নাট্যকার কে ছিলেন?

২৪. কবে কোথায় কে অরোরা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন।

২৫. অরোরা থিয়েটারে অভিনীত প্রথম নাটক কোন্‌টি? কবে প্রথম অভিনয়?

২৬. কোহিনূর থিয়েটার কবে কোথায় কে প্রতিষ্ঠা করেন?

২৭. কোহিনূর থিয়েটারে প্রথম মঞ্চস্থ হয় কোন্ নাটক?

১.২৭ গ্রন্থপঞ্জি

১. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২. ভারতীয় নাট্যমঞ্চ—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

৩. বাংলা নাটকের ইতিহাস—অজিতকুমার ঘোষ

৪. নাট্যমঞ্চ : নাট্যরূপ—পবিত্র সরকার

৫. বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস—কালীশ মুখোপাধ্যায়

৬. রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

৭. বিলাতি যাত্রা থেকে স্বদেশী থিয়েটার—সুবীর রায়চৌধুরী সম্পাদনা

৮. আমার কথা—নটী বিনোদিনী

৯. বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস (উদ্যোগপর্ব) ১৭৯৫-১৮৭২—নক্ষত্রকুমার রায়চৌধুরী

১০. কলকাতার বিদেশী রঙ্গালয়—অমল মিত্র

১১. গিরিশচন্দ্র—অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়

১২. বাংলা নাট্যমঞ্চের রূপরেখা—দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

১৩. বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস—দর্শন চৌধুরী

১৪. The Indian Stage Vol. I/II/III—H. N. Dasgupta

একক ২ ☐ মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'

পর্যায় ১ একক ২

২.০ প্রস্তাবনা

২.১ বিষয়বস্তু

২.২ প্রহসনের ভাষা

২.৩ চরিত্র বিশ্লেষণ

২.৪ অন্যান্য চরিত্র

২.৫ প্রহসন ঃ তুলনা এবং প্রতিতুলনা

২.৬ বিস্তৃত প্রশ্ন

২.৭ অবিস্তৃত প্রশ্ন

২.৮ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

২.০ প্রস্তাবনা

'অলীক কুনাট্য-রঙ্গে মজে লোকে রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।'

১৮৫৮ সালে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটককে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মধুসূদন তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের প্রস্তাবনায় একথা জানিয়েছিলেন। ফলে মধুসূদনের আবির্ভাবে বাংলা নাট্য-সাহিত্য মুক্তির পথ খুঁজে পেল। তিনিই প্রথম সংস্কৃত ধারা ও ইংরেজি ধারার পার্থক্যটি গভীরভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং তিনি তাঁর প্রথম দুটি নাটকে উভয় রীতিকেই অনুসরণ করেছিলেন। মহাভারতের শর্মিষ্ঠা-দেবযানী-যযাতির কাহিনি অবলম্বনে মধুসূদন পৌরাণিক নাটক 'শর্মিষ্ঠা' রচনা করলেন ১৮৫৯-এ। তাঁর দ্বিতীয় নাটক 'পদ্মাবতী' (১৮৬০) গ্রীক পুরাণের কাহিনি আশ্রয়ে রচিত হল। এরপর তাঁর শেষ পূর্ণাঙ্গ নাটক ও বাংলা সাহিত্যে প্রথম ট্রাজেডি 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬০) রচিত হয়। 'কৃষ্ণকুমারী' নাট্যকার মধুসূদন প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান। কৃষ্ণকুমারীর পর মধুসূদন 'মায়াকানন' রচনা করেন। অতঃপর মধুসূদন ইংরেজি কমেডির আদর্শে 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামে দুটি প্রহসন রচনা করেন। এই প্রথম বাংলা নাটক ইংরেজি আদর্শ আয়ত্ত করল। এ যুগের প্রায় অসংখ্য প্রহসনের মধ্যে এ দুটির অনন্যতা শুধু রচনাভঙ্গীর জন্যই নয়, সমাজ-চেতনার বিশিষ্টতা এবং ব্যাপকতার কথাও স্মরণীয়। দুটি প্রসনই নক্শাধর্মী বিচ্ছিন্ন নাট্যচিত্র না হয়ে পূর্ণাঙ্গ কাহিনি ভিত্তিক রচনা হয়ে উঠেছে। মধুসূদনের এই নাট্যরীতি পরবর্তীকালে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রকে, নাটক রচনায় প্রভাবিত করেছিল।

"In the great European Drama you have the stern realities of life, lofty passion, and heroism of sentiment; with us it is all softness, all romance. We forget the world of reality and dream of fairy land..... Ours are dramatic poem....."

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত নিজেই একথা চিঠিতে জানিয়েছিলেন। তিনি নিজে কিন্তু ১৮৫৯-এ 'শর্মিষ্ঠা' নাটক লিখে নাট্যরচনার সূচনা করার সময় 'all softness, all romance'—কেই নাটকের মূল রস হিসেবে ব্যবহার করেছেন। 'Stern realities'-এ তাঁর প্রথম পদার্পণ ১৮৬০-এ প্রথমে 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং পরে 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের মধ্যে দিয়ে। 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' অবশ্য বাংলার প্রথম প্রহসন নয়। সে কৃতিত্ব মধুসূদনের পূর্বসূরী কালীপ্রসন্ন সিংহের। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'বাবু' প্রহসনটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রহসন। সেখানেও সমাজ-সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে। তারপরের বছর ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে রাম নারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকেও সমাজের বিক্ষত-বিকৃত চেহারা উঠে এল।

'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের বিশিষ্টতা অন্য জায়গায়। বাংলা নাটক-প্রহসনের পটভূমি গ্রাম এবং সেখানে দুশ্চরিত্র সামন্তপ্রভুর শোষণের কথা এত নির্দিষ্ট করে এই প্রথম উঠে এল বাংলা নাটক প্রহসনে।

২.১ বিষয়বস্তু

'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের বিষয়বস্তু আসলে অবক্ষয়। সামন্তপ্রভুর নৈতিক অবক্ষয়। কুলীন পুরুষের বহুবিবাহ নিয়ে আন্দোলনের ফলে তার আইনী প্রতিকার হয়েছিল। কিন্তু শুধুই যে কুলীনের বিবাহ—এবং বিবাহ এমনটাতো নয়। সমাজের ক্ষতটা ছিল আরও বিপজ্জনক-সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় যাদের হাতেই জমিজমা-টাকাপয়সা ছিল তাদের মধ্যে অনেকেই এই ব্যবস্থার সুযোগ নিয়েছে। বিয়ের নামে যে সামাজিক বঞ্চনার শিকার মেয়েদের হতে হত সেখানে তো তবু স্বীকৃতি এবং সামাজিকতার একটা ব্যাপার ছিল, কিন্তু যেসব সালিকের ঘাড়ে রোঁ গজাত, তাদের বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরে যাওয়ার ঘটনাও কম ছিল না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রহসনে তেমনই এক চরিত্র এবং ঘটনাকে উপস্থাপিত করেছেন। ভক্তপ্রসাদবাবু, জমিদার এবং বাচস্পতি, হানিফ গাজি ইত্যাদি প্রজাদের অত্যন্ত কঠোর হাতে দমন করে থাকেন। অর্থনৈতিক শোষণেও তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর ছেলে অম্বিকা কলকাতায় থেকে পড়াশোনা করে। গদাধর, পুঁটি-এরা তার সমস্ত অপকর্মের সাক্ষী ও সহায়ক। হানিফ গাজি একজন কৃষক। বৃষ্টি না হওয়ার ফলে ক্ষেতে ফসল ফলে না। ভক্তপ্রসাদবাবুর কাছে এগারো সিকে কর সে দিতে পারে না। তাঁর কাছে তিন সিকে ছাড়া আর কোন পয়সা ছিল না। দরিদ্র কৃষকের কান্নায় অত্যাচারী সামন্তপ্রভুর মন কোনওদিনও গলেনি। এক্ষেত্রেও তেমনটাই ঘটে। ভক্তপ্রসাদ গদাধরকে হুকুম দেন; "এ পাজি বেটাকে ধরে নে যেয়ে জমাদারের জিম্মে করে দে আয় তো।" নিরুপায় হানিফ ভক্তপ্রসাদের কাছের লোক গদাধরকে অনুনয় বিনয় করে এবং হানিফ গাজি রেহাইও পেয়ে যায়। ঘটনাটা এই রকম ঃ

পর্যায় এক

ভক্ত। এ পাজি বেটাকে ধরে নে জমাদারের জিম্মে করে দে আয় তো।

গদা। যে আজ্ঞে। (হানিফের প্রতি) চল্ রে।

হানিফ। কত্তাবাবু, আমি বড় কাঙ্গাল রাইওৎ। আপনার খায়ে পরেই মানুষ হইছি, এখনে আর যাবো কনে?

ভক্ত। নে যা না—আবার দাঁড়াস কেন?

গদা। চল্ না।

মাঝখানের প্রহসন

হানিফ। ..... (গদার প্রতি জনান্তিকে) তুই ভাই আমার হয়ে দু এট্টা কথা বল্ না কেন?

গদা। আচ্ছা। তবে তুই একটু সরে দাঁড়া।

পর্যায় দুই

ভক্ত। ভাল। আমি যদি আজ তিন সিকে নিয়ে তোকে ছেড়ে দিন, তবে দুই বাদ্‌বাকি টাকা কবে দিবি বল্ দেখি?

হানিফ। কত্তামশায়, আল্লাতালা চায় তো মাস দ্যাড়েকের বিচেই দিতি পারবো।

ভক্ত। আচ্ছা, তবে পয়সাগুলো দেওয়ান্‌জীকে দেগে।

অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ে দরিদ্র হানিফের শত অনুনয় বিনয়েও যে সামন্তপ্রভুর বিন্দুমাত্র করুণা হয়নি, বরং তার কথা শুনে বিরক্ত হয়ে গদাধরকে আদেশ দিয়েছিল তাকে নিয়ে যাবার, দ্বিতীয় পর্যায়ে সে যে কোন শর্তেই টাকা পেতে রাজি। হানিফ দেড়মাস সময় চাইলেও অনায়াসে মেনে নেয়। দুটি পর্যায়ে যে ভক্তপ্রসাদবাবুকে দেখা যায়, তারা যেন দুটি পৃথক মানুষ। আসলে এই দুই পর্যায়ের মাঝখানে যে প্রহসনটুকু আছে, সেটিই পরবর্তী নাট্যঘটনা। হানিফ সাহায্য চেয়েছিল গদাধরের কাছে। গদাধর ভক্তপ্রসাদের দুর্বলতার কথা বিলক্ষণ জানত। সে টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছিল হানিফের নতুন নিকে করা বিবি ফতেমাকে। ভক্তপ্রসাদ ফতেমার সৌন্দর্যের বর্ণনা শুনে একটা বিকৃত আদিম কামনায় অধীর হয়ে হানিফের কর সম্পর্কিত সত্তদায় উদার হয়ে উঠেছিলেন। গদাধর আর তার পিসি পুঁটি ফতেমার সঙ্গে কত্তাবাবুর দেখা করিয়ে দেবার দায়িত্ব পেয়েছিল। ফতেমার কাছে পুঁটি সে প্রস্তাব রাখে। ফতেমাকে একুশ টাকা অগ্রিম দিয়ে, নিজের জন্য চার টাকা দস্তুরি রেখে পুঁটি সব ব্যবস্থা পাকা করে দিয়ে যায়। 'সাঁজের বেলা' 'আঁব বাগানে' যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে পুঁটি চলে যায়। ফতেমা অকপটে সব কথা হানিফকে জানায়। হানিফ প্রাথমিক আক্রোশ কাটিয়ে উঠতে না উঠতে তার দেখা হয়ে যায় বাচস্পতির সঙ্গে। বাচস্পতি ব্রাহ্মণ হলেও হানিফের সঙ্গে তার শ্রেণিগত অবস্থানের বিশেষ তারতম্য নেই। তার মাতৃবিয়োগ হয়েছিল। জমিদার ভক্তপ্রসাদ তার সব সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছে। নিঃস্ব বাচস্পতি মায়ের শ্রাদ্ধের জন্য সাহায্য চাইতে গেলে জমিদার তাকে মাত্র পাঁচ টাকা দিয়ে বিদায় করে। হানিফের কাছে বাচস্পতি যায় অন্য এক সাহায্যের আশায়। একটা তেঁতুল গাছ কাটার জন্য হানিফের সাহায্য চায় বাচস্পতি। বাচস্পতির কাছে হানিফ বলে ভক্তপ্রসাদের সমস্ত কীর্তির কথা। বাচস্পতির পরিকল্পনামাফিক ভক্তপ্রসাদকে শিক্ষাদেবার ব্যবস্থা করে তারা।

ভক্তপ্রসাদ বৃদ্ধ বয়সে হানিফের তরুণী স্ত্রীকে পাওয়ার আনন্দে বেশবাস পরিপাটি করে অপেক্ষা করে বসে থাকেন সূর্য ডোবার। 'আঁব বাগানে'র পরিবর্তে পুকুর পাড়ের ভাঙা শিবের মন্দিরে মিলনের স্থান

নির্দিষ্ট হয় 'রাত চার ঘড়ীর সময়'। ফতেমা হানিফের পরিকল্পনা অনুযায়ী মিলনস্থানে উপস্থিত হয় পুঁটির সঙ্গে। হানিফ ও বাচস্পতি লুকিয়ে থাকে আগে থেকেই। প্রমাণ-সহ ধরে ফেলে ভক্তপ্রসাদকে। যদিও একটা ছোট্ট নাটকের আশ্রয় নেয় তারা। হানিফ ভূতের বেশ ধরে লাফিয়ে পড়ে ভক্তপ্রসাদের ঘাড়ে। আর ভক্তপ্রসাদের গোঙানির আওয়াজ শুনে হতভম্ব পথিকের মত উদ্ধারকর্তা হয়ে বাচস্পতি এসে দাঁড়ায়। অবশেষে বাচস্পতি নগদ পঞ্চাশ টাকা এবং হানিফ দুশো টাকা নিয়ে রফা করে। ভক্তপ্রসাদ লোক অপবাদের ভয়ে তাতেই রাজি হয়ে যায় এবং এমন কাজ আর করবেন না বলে স্বীকার করেন।

২.২ প্রহসনের ভাষা

'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে কথোপকথনের মধ্যে ভাষা ব্যবহারে আশ্চর্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন মধুসূদন দত্ত। যশোরের ভূমিপুত্র হওয়ার সূত্রে সেই অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন নাট্যকার। যদিও বেশিরভাগ সময়টাই কেটেছে তাঁর কলকাতা এবং মাদ্রাজের শিক্ষিত এবং অতি পরিশীলিত পরিবেশে। 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে ভক্তপ্রসাদবাবু এবং আনন্দ সমাজের উচ্চবিত্ত স্তরের মানুষ। বাচস্পতি উচ্চকোটির মানুষ হলেও অর্থনীতির কাঠামোয় তার অবস্থান নিম্নস্তরে। মধুসূদন অত্যন্ত কুশলতায় প্রত্যেকের সংলাপের মধ্য দিয়ে তাদের অবস্থানগুলি চিহ্নিত করে দিয়েছেন। গদাধর, পুঁটি, রাম—এরা যদিও হানিফ-ফতেমার মতনই দরিদ্র কিন্তু এরা হিন্দু। অতএব হানিফের কথা আর গদাধরের কথার ভাষা বৈশিষ্ট্যও বদলে যায়।

হানিফের কথায় অনেক আরবি-ফার্সি শব্দের ব্যবহার আছে, ঈষৎ পরিবর্তিত বা অশুদ্ধ উচ্চারণে, যা বাচস্পতি বা গদাধরের কথায় নেই। যেমন—মজ্জি, আখেরে, ওয়াকিফ্, মেহেরবানি, হারামজাদা, এনছাফ, কাফের, নওয়ার, কসবগিরি, গস্তানী, ইজ্জত, ইয়াদ, সম্‌ঝে, থোড়া, বাৎচিত্, সালাম, তল্লাস্, ঢুঁড়তি ঢুঁড়তি, তজদি, লেকিন, ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার রয়েছে হানিফের কথায়। ফতেমার কথায়ও এই ধরনের শব্দ কিছু কিছু উঠে এসেছে। যেমন—জওয়ান খসম্, মালুম্ করা, আদ্‌মি ইত্যাদি শব্দ।

গদাধরের কথায় আঞ্চলিকতার ছাপ স্পষ্ট। গ্রাম্য কথ্য ভাষা তার সংলাপে ব্যবহার করেছেন নাট্যকার। অসংখ্য স্বগত কথন ব্যবহৃত হয়েছে এই প্রহসনে। তার মধ্যে অনেকটাই গদাধরের। তার কারণ সে আসলে দরিদ্র মানুষ হলেও জমিদারের অধীনস্থ কর্মচারী। অতএব জমিদারের বিকৃত চাহিদার যোগান দেওয়ার কাজ যেমন তাকে করতে হয়, তেমনি নিজের বিবেকের সামনাসামনি সে যখন দাঁড়ায় তখন ভক্তপ্রসাদবাবুর সমালোচনা না করে পারে না। সে কারণেই স্বগত কথনের আশ্রয় নিতে হয় তাকে।

পঞ্চানন বাচস্পতি দরিদ্র হলেও ব্রাহ্মণ হওয়ার সূত্রে তার ভাষা অনেক পরিশীলিত। আঞ্চলিকতার প্রভাব নেই। বরং সংস্কৃত ঘেঁষা কথা তার মুখে শোনা যায়। তার মা মারা গেলে ভক্তপ্রসাদের কাছে গিয়ে সে বলে, ".....এত দিনের পর মা ঠাকরুণের পরলোক হয়েছে।" এবং ভক্তপ্রসাদের প্রশ্নের উত্তরে আরও জানায় "অদ্য চতুর্থ দিবস"।

আনন্দ কলকাতায় থেকে পড়াশোনা করে। ইংরেজি জানা কলকাতাবাসী এই মানুষটির মুখে তাই

আঞ্চলিকতার ছাপ তো থাকেই না। বরং থাকে ইংরেজি বিদ্যাশিক্ষার ছাপ। ভক্তপ্রসাদ-পুত্র অম্বিকা আনন্দের কথায় হিন্দু কলেজের সবচেয়ে 'ক্লেবর্ ছোকরা'।

ভক্তপ্রসাদের কথায় আঞ্চলিকতার প্রভাব স্পষ্ট হয় স্বগত কথনে আর যখন সে নিম্নবর্গ ভৃত্যদের সঙ্গে কথা বলেন। তখন 'ছুঁড়ী', 'হানফের মাগ', 'ছেনালি', ইত্যাদি কথা অনায়াসে স্থান পায় জমিদার মশাইয়ের ভাষায়। কলকাতাবাসী আনন্দর সঙ্গে কথা বলার সময় ভক্তপ্রসাদ অম্বিকার দায়িত্বশীল এবং রক্ষণশীল পিতা। অতএব নব্যশিক্ষিত বাবুদের ঠিক বিপরীত কথা বলার একটা প্রয়াস এবং নিজেকে রক্ষণশীল, ন্যায়নিষ্ঠ দেখানোর প্রয়াস ধরা পড়ে তাঁর কথায়। তখন 'তোমাদের ইংরেজি কথা' এবং 'আমাদের কানে ভাল লাগে না', 'কুকর্ম্মাচারী', 'মুসলমান বাবুর্চী', 'কুলে কলঙ্ক', 'পিতৃপিতামহের শ্রাদ্ধ' ইত্যাদি কথা ভক্তপ্রসাদের মুখে শোনা যায়। আবার ভক্তপ্রসাদ যকন হানিফের স্ত্রী ফতেমার সঙ্গে মিলিত হতে যান; তখন ভক্তপ্রসাদের সংলাপ অন্যরকম ঃ

"আমার হাতবাক্সটা আর আরসিখানা আন্ তো।

(স্বগত) দেখি, একটু আতর গায় দি। (নেড়েরা আবাল বৃদ্ধ বনিতা আতরের খোস্বু বড় পছন্দ করে। ....."

ফতেমাকে দেখার পর তাকে প্রেম নিবেদন করার সময় ভক্তপ্রসাদের ভাষা কাব্যিক ঃ

"বিধুমুখি, তোমার বদনচন্দ্র দেখে আজ আমার মনকুমুদ প্রফুল্ল হোলো!—আঃ!"

ফতেমা আর পুঁটির ধর্মীয় পার্থক্যের কারণে তাদের ভাষা যেমন কিছুটা বদলে যায়, তেমনি মেয়েলি ভাষার ব্যবহার দুজনের সংলাপের একটা সাদৃশ্যও বটে।

এভাবেই সমগ্র প্রহসনে নানা শ্রেণির মানুষের সংলাপে ভাষার পার্থক্য রয়েছে। বাংলা সাহিত্যের গোড়ার দিকের প্রহসন হওয়া সত্ত্বেও ভাষা ব্যবহারের নৈপুণ্য 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ" প্রহসনের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই কৃতিত্ব নাট্যকারের প্রাপ্য। তিনি নিজের অবস্থান উত্তীর্ণ হয়ে চরিত্রগুলির কাছাকাছি এসে দাঁড়াতে পেরেছেন এবং প্রহসনটি ভাষাগত দিক থেকে সমৃদ্ধ হয়েছে।

২.৩ চরিত্র বিশ্লেষণ

ভক্তপ্রসাদ ঃ ভক্তপ্রসাদই মধুসূদের এই প্রহসনের 'বুড় সালিক'। সামন্তপ্রভু হওয়ার সূত্রে ভক্তপ্রসাদের যে পরিচয় সর্বপ্রথম উঠে আসে সেখানে সে অত্যাচারী শোষক। সারাক্ষণ তার মুখে হরি, দীনবন্ধু ইত্যাদি শোনা যায়। মালা জপতে জপতেই হানিফকে বলেন, "তোদের ফসল হৌক আর না হৌক তাতে আমার কি বয়ে গেল।" প্রত্যাশিতভাবেই দুরকম মুখোশের আড়ালে একজন লোভী, দুশ্চরিত্র মানুষ বাস করে। একটা মুখোশ সামন্তপ্রভুর আর একটা নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবের। গদাধরের মুখে হানিফের নতুন নিকে করা 'ছুড়ী'র রূপের বর্ণনা শুনে তাই প্রাথমিক ধাক্কায় জমিদারবাবুর মালা জপার বেগ বেড়ে যায়। মুসলমানের মেয়ে-বউদের সম্পর্কে তার প্রথম প্রতিক্রিয়া তাদের 'মুখ দিয়ে যে প্যাঁজের গন্ধ ভক্‌ভক্ করে বেরোয় তা মনে হল্যে

বমি এসে'। ভক্তপ্রসাদ একটু চিন্তিতও হয়ে পড়েন পরকালের কথা ভেবে। কিন্তু নিজের পক্ষে যুক্তিখাড়া করতে তাঁর বিলম্ব হয় না। এবং পরম বৈষ্ণবের মতই সমস্ত ভালোমন্দের দায় অবশেষে ঈশ্বরের ওপর ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত হন "দীনবন্ধো, তুমিই যা কর। হা, স্ত্রীলোক—তাদের আবার জাত কি? তারা তো সাক্ষাৎ প্রকৃতিস্বরূপা, এমন তো আমাদের শাস্ত্রেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্যে;—বড় সুন্দরী বটে, অ্যাঁ? ..."ভক্তপ্রসাদ নারীর বিষয়ে খরচ সম্পর্কে অকৃপণ হয়ে পড়েন। আসলে হানিফের স্ত্রী ফতেমাই নয়, যে কোন নারী সম্পর্কেই ভক্তপ্রসাদের এই দুর্বলতা। তাই ফতেমা সম্পর্কে প্রলুব্ধ হতে হতেই পীতাম্বরের মেয়ে পঞ্চীকে দেখে ভক্তপ্রসাদ একটা বিকৃত কামনায় পুড়তে থাকেন।

ভক্তপ্রসাদ বুড়ো হলেও কামনার আগুন তৃপ্ত হয় না। আসলে সমাজপতি সেজে সমাজের মাথায় বসে থেকে যারা ধর্মের জয়জয়কার করে, তাদের মধ্যেই থাকে ভক্তপ্রসাদের মত অসৎ মানুষ। সমাজপতি হওয়ার সূত্রে নিজের সমস্ত অপকর্মের ব্যাখ্যা শাস্ত্র থেকে খুঁজে নেয়। আসলে শাস্ত্রের অপব্যাখ্যায় ভক্তপ্রসাদের জুড়ি নেই। শাস্ত্রের দোহাই দিয়েই একটা বড় সময় ধরে কৌলিন্য প্রথা চলেছে। পুরুষের বহুবিবাহকে গৌরবান্বিত করা হয়েছে। শাস্ত্রের দোহাই দিয়েই বাল্যবিবাহ হয়েছে। শাস্ত্রের দোহাই দিয়েই সতীদাহ হয়েছে। ভক্তপ্রসাদ নিজের কামনা চরিতার্থ করতে গিয়ে দু'বার শাস্ত্রের দোহাই পেড়েছেন—

(ক) হানিফের স্ত্রী ফতেমার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হলে ভক্তপ্রসাদের পরকাল 'নষ্ট' হয়ে যাবে কিনা, এই চিন্তা প্রথমেই উদয় হয়। আসলে তো পরকালের চেয়ে ইহকালের কামনার টান ভক্তপ্রসাদের অনেক বেশি। অতএব ঃ "হাঁ, স্ত্রীলোক—তাদের আবার জাত কি? তারা তো সাক্ষাৎ প্রকৃতিস্বরূপা, এমন তো আমাদের শাস্ত্রেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্যে, ..."

(খ) হানিফের স্ত্রী সম্পর্কে ভক্তপ্রসাদবাবুর আসক্তির একটা বড় হেতু—সে সুন্দরী। কিন্তু তার চেয়েও বেশি লোভ বা আকর্ষণ, তার যৌবনের প্রতি। মনে মনে তার শাস্ত্রের একটা কুৎসিত অপব্যাখ্যা দিয়ে বৃদ্ধ ভক্তপ্রসাদ বলেন ঃ "ছড়ী দেখ্‌তে মন্দ নয়, বয়স অল্প, আর নবযৌবনমদে একেবারে যেন ঢলে ঢলে পড়ে। শাস্ত্রে বলেছে যে, যৌবনে কুক্কুরীও ধন্য!"

—এই এক ভক্তপ্রসাদবাবু। কত পঞ্চী, ফতেমা, ইচ্ছে-রা ভক্তপ্রসাদের লোভের বলি হয়েছে তার সবটা লেখাজোখা নেই। আবার ছেলে অম্বিকা সম্পর্কে যখন ভক্তপ্রসাদ আনন্দর সঙ্গে কথা বলেন, তখন রক্ষণশীল পিতার মুখোশ পরে নিতে ভুল হয় না। আনন্দর কাছে ভক্তপ্রসাদের প্রথম প্রশ্ন, অম্বিকার পড়াশোনা কেমন হচ্ছে এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন অম্বিকা কোন 'অধর্ম্মাচরণ' শিখছে কিনা। ভক্তপ্রসাদের অধর্মাচরণের সংজ্ঞা, ব্রাহ্মণের প্রতি অবহেলা, গঙ্গাস্নানের প্রতি ঘৃণা, এই সকল খ্রিষ্টিয়ানি মত-'। অন্যদিকে, জমিদার মশাই অত্যন্ত সচেতন যে অম্বিকা অধঃপাতে যাবে না কারণ—"সে আমার ছেলে কিনা"। কলকাতায় 'কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত্ত, সোনারবেনে, কপালী, তাঁতী, জোলা, তেলী, কলু'—সব জাত বিচার উঠে গিয়ে পরস্পরের ছোঁয়া খায় শুনে আতঙ্কিত ভক্তপ্রসাদ। 'কলকেতায়' হিন্দুরা মুসলমান বাবুর্চি রাখে শুনে ঘেন্নায় 'থু! থু!' করে ওঠেন তিনি। অথচ ফতেমার যৌনব সম্পর্কে তাঁর কোন বাছবিচার থাকে না।

ভক্তপ্রসাদরা সমাজের বিপজ্জনক চরিত্র কেননা এরা স্বচ্ছন্দে মুখোশ পরে ঘুরতে পারে। নিজেরা অন্যায়

করছে জেনেও ধর্মের জয়জয়কার করতে এদের বিবেকে বাধে না।

২.৪ অন্যান্য চরিত্র

'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে ভক্তপ্রসাদ ছাড়া গ্রামের অন্য সকলেই প্রায় দরিদ্র শ্রেণির মানুষ। যদিও পীতাম্বর তেলী ও তার পরিবারকে কিছুটা বর্ধিষ্ণু বলেই মনে হয়। গদাধর, বাচস্পতি, হানিফ, ফতেমা—এরা সবাই নিম্নবিত্ত।

গদাধর নিম্নবিত্ত কিন্তু সেও অধঃপতিত। ভক্তপ্রসাদের নারী-আসক্তির সুযোগ নিয়ে সে কিছু আদায় করে নেয় এবং উৎসাহিতও করে তার প্রভুকে। প্রহসনের একেবারে শুরুতে হানিফের সঙ্গে গদাধরের কথোপকথনের সময় আপাতদৃষ্টিতে গদাধরকে সহৃদয়, সংবেদনশীল একজন মানুষ বলে মনে হয়। নিজে সে দরিদ্র এবং আর একজন দরিদ্র মানুষের বিপদে তাকে সহমর্মী বলেই মনে হয়। হানিফকে জমাদারের কাছে জমা দিয়ে আসার প্রস্তাব দিলে হানিফ তাই তার হয়ে দুটো কথা বলার জন্য গদাধরকে অনুরোধ করে। এরপরই গদাধর নিজমূর্তি ধারণ করে। হানিফকে আশ্বস্ত করে সে ভক্তপ্রসাদের কাছে হানিফকে মাপ করে দেওয়ার অনুরোধ জানায় এই শর্তে ঃ "ও বেটা এবার যে ছুঁড়ীকে নিকে করেছে তাকে কি আপনি দেখেছেন?" গদাধর শুধুই অধঃপতিত নয়, সে জানে কথার ভেলকিতে কেমন করে ভোলানো যায় ভক্তপ্রসাদকে। ভক্তপ্রসাদের মনে মুসলমান ফতেমা সম্পর্কে একটু দোটানার বাষ্প দেখেই ঝোড়ো হাওয়ায় উড়িয়ে দেয় তা গদাধর—"মশায়, মুসলমান হলো তো বয়ে গেল কি? আপনি না আমাকে কত বার বলেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গোয়ালাদের মেয়েদের নিয়ে কেলি কত্যেন।" ভক্তপ্রসাদ সকলের সামনে মালা জপেন, হরির নাম করেন আর অন্ধকারে মেয়েদের সর্বনাশ করেন। সেখানে গদাধরই তার প্রধান সহায়ক। গদাধর পাকা ব্যবসায়ীর মতই দরাদরি করে—"আজ্ঞে এর কম হবে না, ... হাজারো হোক ছুঁড়ী বউমানুষ কি না।"—অর্থাৎ শ্রেণিগত অবস্থানে হানিফদের সঙ্গে একই ধাপে থাকলেও গদাধর কিছুটা স্বতন্ত্র। মেয়ে ব্যবসায়ের দালাল। তাই তার স্বগত কথন—"কত্তাটি এমনি খেপে উঠলিই তো আমরা বাঁচি,—গো মড়কেই মুচির পার্ব্বণ।" গদাধর অন্যায় করেও বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত হয় না বরং ফতেমার বর্ণনা দিতে গিয়ে সে খুব সহজেই তার তুলনা করে ইচ্ছে নামের আর একটা মেয়ের সঙ্গে। "আজ্ঞে, ঐ যে ভট্চাজ্যিদের মেয়ে। আপনি যাকে—(অর্দ্ধোক্তি) তার পরে যে বেরিয়ে গিয়ে কসবায় ছিল"। শুধু তাই নয়, তার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কেও পরম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সে বলে, "আজ্ঞে সে এখন বাজারে হয়ে পড়েছে। ..."

তাই প্রহসনের শেষ দৃশ্যে ভক্তপ্রসাদের প্রাপ্য লাঞ্ছনার একটু ভাগ (ভূতের ভয়) তাকেও পেতে হয়। গদাধর দরিদ্র, আবার কিছুটা অসৎও।

বাচস্পতি ব্রাহ্মণ কিন্তু সে দরিদ্র। ভক্তপ্রসাদ ব্রাহ্মণ-দেবতা ইত্যাদি সম্পর্কে শ্রদ্ধায় অবনত হন কথায় কথায়, আবার দরিদ্র বাচস্পতির সম্পত্তি কেড়ে নেন। বাচস্পতির মা মারা গেলে দরিদ্র ওই ব্রাহ্মণ সাহায্য প্রার্থী হয়ে এলে সে মাত্র পাঁচ টাকা পায়। বাচস্পতি ব্রাহ্মণ হলেও সে হানিফদের অত্যন্ত প্রিয়জন, কাছের মানুষ। সে

কারণেই হানিফ পরামর্শ করার জন্য বাচস্পতিকেই বেছে নেয়। বাচস্পতি বুদ্ধিমান। তার পরিকল্পনা অনুসারেই ভক্তপ্রসাদকে উচিত শিক্ষা দেওয়া গিয়েছিল।

হানিফ সৎ কৃষক। সে অশিক্ষিত, দরিদ্র কিন্তু তার ভাবনায়-কথায়-কাজে মিল। সে ছলনা বোঝে না। তার কথা স্পষ্ট।

২.৫ প্রহসন ঃ তুলনা এবং প্রতিতুলনা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৬০-এ এই দুটি প্রহসন লিখলেন। আসলে উনিশ শতক থেকেই বাংলা সাহিত্য প্রতিবাদের হাতিয়ার হতে শুরু করেছিল। মধুসূদন দত্তের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের একটা আত্মিক যোগাযোগ ছিল। সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা মধুসূদনের মত নাট্যকারের পক্ষে অনুধাবন করা তাই স্বাভাবিক। ডিরোজিওর যুক্তিবাদী আন্দোলনের পরোক্ষ প্রভাবও নাট্যকারের ওপর পড়েছিল; অতএব তিনি দুটি প্রহসনে সমাজের দুটি জ্বলন্ত সমস্যাকে তুলে ধরেছেন।

'একেই কি বলে সভ্যতা?'য় নবকুমার, কালীনাথবাবু ইত্যাদি চরিত্রের মধ্য দিয়ে যুব সমাজের অধঃপতিত হওয়ার প্রবণতা এবং অসম্পূর্ণ ইংরেজি শেখা যুবকদের মধ্যপানে আসক্তি, সভা-সমিতির নামে বেলেল্লাপনা ইত্যাদি তুলে ধরেছেন। সভ্যতার সঠিক অর্থ না বুঝে নকল ইওরোপিয়ান মুখোশটাকেই আসল বলে ধরে নেওয়া যে দেশের সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করে ফেলতে পারে এই প্রহসনের মধ্য দিয়ে তাই তুলে ধরেছেন নাট্যকার। হরর এই খোদাক্তিতে তাই প্রহসন শেষ হয় ঃ "বেহায়ারা আবার বলে কি, যে আমরা সায়েবদের মতন সভ্য হয়েচি। হা আমার পোড়া কপাল! মদ্ মাস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই সভ্য হয়?—একেই কি বলে সভ্যতা?"

'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে সমাজ সমস্যার অন্য একটা দিক তুলে ধরা হয়েছে। নষ্ট চরিত্রের সমাজপতিদের আসল রূপ তুলে ধরা হয়েছে এই প্রহসনে। তাদের মুখোশ টেনে খুলতে পারলেই যে সমাজকে দূষণমুক্ত করা সম্ভভব তার ইঙ্গিতও দিয়েছেন। ভক্তপ্রসাদের বিকৃত রুচিই তাই এই প্রহসনের শেষ কথা নয়, শেষ হয়েছে তার আক্কেল তৈরি হওয়ার মধ্যে ঃ

"আমি যেমন অশেষ দোষে দোষী ছিলেম, তেমনি তার সমুচিত প্রতিফলও পেয়েছি। এখন নারায়ণের কাছে এই প্রার্থনা করি যে এমন দুর্ম্মতি যেন আমার আর কখনও না ঘটে।"

পরবর্তী কালে দীনবন্ধু মিত্রের আর একটি সাড়াজাগানো প্রহসন 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'-তে এইরকমই একটি সমাজ-সমস্যা উঠে এসেছে। 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের ভক্তপ্রসাদের মতই সেখানেও এক বিগতযৌবন বৃদ্ধ বারবার বিয়ে করতে চায়। বলাবাহুল্য সেখানেও তার লক্ষ্য বালিকা, কিশোরী, যুবতীরা। অবশেষে পাড়ার সচেতন যুবকরা বুড়োর বিয়ে করার প্রবণতা ঘুচিয়ে দেয়। একটা শুয়োরকে কনে সাজিয়ে উপস্থিত করে এবং এভাবেই তার চৈতন্যোদয় ঘটে।

তিনটি প্রহসনেই সমাজের সমস্যাকে চিহ্নিত করে তার সমাধানের ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে। আসলে 'Art for art sake'—এই ধারণায় সাহিত্য রচনা যেমন হয়েছে, তেমনি উনিশ শতক থেকেই সমাজ সংস্কারের

জন্যও সাহিত্যকে ব্যবহার করা হয়েছে। এই সব প্রহসন সেই সব সাক্ষ্য বহন করে।

২.৬ বিস্তৃত প্রশ্ন

১। বাংলা সাহিত্যে 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটির গুরুত্ব বিচার করুন।

২। 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের ভাষা বৈশিষ্ট্য দৃষ্টান্ত সহযোগে আলোচনা করুন।

৩। 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'একেই কি বলে সভ্যতা?' এবং দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রহসন তিনটির তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৪। 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের চরিত্র চিত্রণের সার্থকতা বিচার করুন।

২.৭ অবিস্তৃত প্রশ্ন

১। 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের নারী চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

২। হানিফ চরিত্রটি আলোচনা করুন।

৩। প্রহসনের শেষ অঙ্কে শিবমন্দিরের দৃশ্য বর্ণনা করুন।

৪। আনন্দ, চরিত্রটি কতটা প্রাসঙ্গিক বলে আপনার মনে হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটির রচনাকাল কত?

২। ভক্তপ্রসাদের ছেলের নাম কী?

৩। 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের নারী চরিত্রগুলির নাম লিখুন।

৪। এই প্রহসনের শেষে একটি নীতিশিক্ষা কাব্যের আকারে লেখা আছে। সেটা কি এবং কতটা প্রাসঙ্গিক।

২.৮ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। "ধনঞ্জয় অষ্টাদশ দিনে একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা বধ করেন"—কে, কখন বলেছিল?

২। "কলিদেব এতদিনেই যথার্থরূপে ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হলেন।"—কে, কখন বলেছিল?

৩। 'তজ্‌দি', 'ব্রহ্মত্র' কথা দুটির অর্থ কী?

৪। "চার ঘড়ীর" সময় কে, কাকে, কোথায় যেতে বলেছিল?

বাংলা নাটক ❑ মালিনী (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

পর্যায় ঃ ১ একক ঃ ৩

৩.১ ❑ রবীন্দ্রনাথ ও 'মালিনী'

৩.২ ❑ 'মালিনী' ঃ নাটকের উৎস

৩.৩ ❑ 'মালিনী' ঃ কথাবস্তু

৩.৪ ❑ চরিত্রবিচার ঃ মালিনী

৩.৫ ❑ নায়কবিচার ঃ সুপ্রিয় ও ক্ষেমঙ্কর

৩.৬ ❑ অপ্রধান চরিত্র ঃ মহিষী, কাশীরাজ

৩.৭ ❑ নাট্যদর্শন ঃ 'মালিনী'

৩.৮ ❑ কাব্যনাট্য হিসেবে 'মালিনী'

৩.৯ ❑ ঐতিহাসিক ও 'মালিনী'

৩.১০ ❑ ট্র্যাজেডিবিচার ঃ 'মালিনী'

৩.১১ ❑ সংলাপ বিচার ঃ 'মালিনী'

৩.১২ ❑ কবিত্ব ঃ 'মালিনী'

৩.১৩ ❑ নাট্যপ্রযোজনা ঃ 'মালিনী'

৩.১ ❑ রবীন্দ্রনাটক ও 'মালিনী'

রবীন্দ্রনাথের মোট নাটকের সংখ্যা ৫১। বিভিন্ন আকারের ও প্রকারের বর্গেই, গীতিনাট্য, নাটিকা, নাট্যকাব্য, কাব্যনাট্য, প্রহসন, ঋতুনাট্য, রূপক-সাংকেতিক নাটক, ঋতুনাট্য, সামাজিক নাটক, নৃত্যনাট্যের শ্রেণী থেকেই সংখ্যাটি এসেছে। প্রথম ও শেষ প্রকাশিত নাটক যথাক্রমে 'রুদ্রচণ্ড' (১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ) ও 'শ্যামা' (১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ)। বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতে স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। তাঁর কাব্যসাহিত্যের পর, সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর সৃজনশীলতার সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পাওয়া যায় তাঁর নাট্যরচনায়। তাঁর নাট্যরচনার বিভিন্ন স্তরে অভিনয়, নৃত্য, অঙ্গসজ্জা, কোরাস, মঞ্চ আছে বিশেষ। কিন্তু নাটকের রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অন্যান্য সমকালীন রীতিগুলোর তুলনায় স্বাতন্ত্র্যে স্বাক্ষর অতুল। নাট্যসাহিত্যের বিকাশে তিনি পুষ্টিশীল এক শিল্পী। সেই সময়ে গীতিনাট্যের আঙ্গিকে ছন্দে 'বাল্মীকিপ্রতিভা', 'মায়ার খেলা' রচনা করেছেন। এরপর শেক্সপীয়ার রোমান্টিক ট্র্যাজেডির আদর্শে 'রাজা

ও রাণী', 'বিসর্জন'-এর মতো নাটক লেখা। 'চিত্রাঙ্গদা', 'বিদায়-অভিশাপ', 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণকুন্তীসংবাদ'-এর মতো কাব্যনাট্যে নাটকীয় সমস্যাগুলির সঙ্গে ব্যবহারিক ধর্মের সংঘাতচিত্র। 'শারদোৎসব', 'রাজা', 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী'-এর মতো তত্ত্বনাট্যে কোনো এক সূক্ষ্ম দার্শনিক চেতনায়, অতীন্দ্রিয় আবেদনে পৌঁছানোর চেষ্টা। 'গোড়ায় গলদ', 'চিরকুমার সভা'-র মতো প্রহসনে স্নিগ্ধ বিদ্রূপ ও কৌতুকরসময়তার আস্বাদ। 'শেষবর্ষণ', 'বসন্ত', 'ফাল্গুনী'-এর মতো নাটকে রবীন্দ্রনাথ যেন প্রকৃতির প্রতিনিধি। আবার 'শ্যামা', 'চণ্ডালিকা', 'নটীর পূজা', 'তাসের দেশ'-এর মতো নৃত্যনাট্যে অবলীলায় বিস্ময়ের নৃত্যছন্দটি সাবলীল। গীতিনাট্যশৈলী, উপন্যাসনাট্যশৈলী, বিষয়বস্তুর বিবিধ রূপায়ণ—সব মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের নাটক মধুসূদন-দীনবন্ধু-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-গিরিশচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যসৃষ্টির বিপরীতে পরিচিতি আদায় করেছে। আঙ্গিক থেকে বিষয় জীবন, ইতিহাস থেকে সমকালীনতা সবকিছুই এক সময়ে ছুঁয়েছে রবীন্দ্রনাথকে। 'মালিনী'ও (১৮৯৬) তার অন্তর্ভুক্ত।

রবীন্দ্রনাথ খুব আলোচনাসূত্রেও কোনো এক স্থান খুঁজেছেন পৌরাণিক, ঐতিহাসিক আধারে জীবনের বস্তুকে আশ্রয় করে সমকালীনতার প্রেক্ষায় তার মুক্তির প্রতিভা পেতে। 'মালিনী'-তেও তেমনই হয়েছে। 'বিসর্জন' (১৮৯০) নাটকের সঙ্গে, 'সোনার তরী' (১৮৯৪) কবিতার সঙ্গে, 'কাহিনী' (১৯০০) গ্রন্থের মধ্যে দেখার তার সাদৃশ্য। প্রেম-প্রেম-বন্ধুত্বের দ্বন্দ্বমুখরতায় পেরিয়ে পৃথিবীর দূরত্বটি করে বিশ্বপৃথিবীর মমতায় যা দিয়ে যেন আত্মসত্তার জীবনধারাটিকেই মহত্তর।

৩.২ ❑ 'মালিনী' ঃ নাটকের উৎস

'মালিনী' নাটকের দুটি সমান্তরাল উৎস আছে। একটি, রবীন্দ্রনাথের লন্ডনে বাস করার সময়ে ঘুমের মধ্যে দেখা একটি স্বপ্ন। অন্যটি হল বৌদ্ধসাহিত্যের মহাবস্তু অবদানের একটি কাহিনি। এই নাটিকাটির প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ কিভাবে পেয়েছিলেন তা জানা যায় তাঁর ভাষাতেই—

"মালিনী নাটিকার উৎপত্তির একটা বিশেষ ইতিহাস আছে, সে স্বপ্নঘটিত।...তখন ছিলুম লণ্ডনে। নিমন্ত্রণ ছিল প্রিমরোজ হিলে তারক পালিতের বাসায়। প্রবাসী বাঙালিদের প্রায়ই সেখানে হত জটলা, আর তার সঙ্গে চলত ভোজ। গোলেমালে রাত হয়ে গেল। ...পালিত সাহেবের অনুরোধে তাঁর ঘরটাতেই রাত্রি-যাপন স্বীকার করে নিলুম। বিছানায় যখন শুলুম তখনো চলছে কলরবের আবিল স্বর্গ, আমার ঘুম ছিল আবিল হয়ে। এমন সময় স্বপ্ন দেখলুম, যেন আমার সামনে একটা নাটকের অভিনয় হচ্ছে। বিষয়টা একটা বিদ্রোহের চক্রান্ত। দুই বন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু কর্তব্যবোধে সেটা ফাঁস করে দিয়েছেন রাজার কাছে। বিদ্রোহী বন্দী হয়ে এলেন রাজার সামনে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে তাঁর বন্ধুকে যেই তাঁর কাছে এনে দেওয়া হল দুই হাতের শিকল তাঁর মাথায় মেরে বন্ধুকে দিলেন ভূমিসাৎ করে।... অনেককাল এই স্বপ্ন আমার জাগ্রত মনের মধ্যে সঞ্চরণ করেছে। অবশেষে অনেক দিন পরে এই স্বপ্নের স্মৃতি নাটিকার আকার নিয়ে শান্ত হল।"

মহাবস্তু-অবদানের কাহিনীটি হল এই রকমের : মালিনী কাশীরাজের রাজকন্যা। কিন্তু কাশ্যপ তাঁর পরম আশ্রয় হয়। বৌদ্ধ শ্রমণ কাশ্যপের সম্পর্কে রাজার ব্রাহ্মণকুলের আচার পরম বিরোধ। বিরোধবিষয় কাশ্যপকে রাজপুত্র আক্রমণ করতে কিন্তু রাজা ব্রাহ্মণের দল রাজাকে বাধ্য করেন মালিনীকে নির্বাসিত করতে। মালিনী ঐ দণ্ড মেনে নিয়েও এক সপ্তাহ সময় প্রার্থনা করেন পিতার কাছে। ইতিমধ্যে রাজপরিবার ও আত্মীয়কুল মালিনীর পাশে এসে দাঁড়ান। রাজা, রাজপুত্র এবং অমাত্যরা সকলেই বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। প্রধান নাগরিকেরাও তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসেন। ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা রাজার ওপর চাপ সৃষ্টি করেন একদিকে, অন্যদিকে কাশ্যপকে হত্যা করার উদ্যোগ নেন। পরিশেষে, তাঁদের সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলে, সম্পর্কে মালিকা হয় রাজ্যে। ব্রাহ্মণদের কিছু হয়ে যায়।...রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'Sanskrit Buddhist Literature of Nepal (1882) গ্রন্থ থেকে রবীন্দ্রনাথ এই গল্পের কাঠামোটি আহরণ করেন। নাটকটির প্রথমাংশ মহাবস্তু-অবদান এবং দ্বিতীয়াংশ অবদানশতক থেকে সংকলিত হয়েছে।

৩.৩ ❑ 'মালিনী' ঃ কথাবস্তু

কাশীরাজের রাজকন্যা মালিনী বৌদ্ধধর্মের আদর্শে দীক্ষিত। কাশ্যপের কাছে তিনি মানবধর্মের শিক্ষা নিয়েছিলেন। রাজা হিন্দুধর্মাবলম্বী। রাজার কন্যার বিধর্মে দীক্ষা—এমন আশঙ্কায় ব্রাহ্মণেরা বিদ্রোহী হয়েছেন। তাঁরা রাজকন্যাকে নির্বাসন করার প্রস্তাব দিয়েছেন। একদিকে বিদ্রোহের আশঙ্কায় রাজসিংহাসন— অন্যদিকে স্নেহ রাজা দোলায়মান। দোলায়মান নিরুপায় রাজমহিষীও। ব্রাহ্মণদের কথা মালিনীর আদর্শের আশঙ্কায় কম্পিত হয়ে যাচ্ছে। আবার রাজাকে পালন করতে মালিনীকে নির্বাসন দেবার কথা শুনে। তার একাগ্রেই একদিন কন্যার অনুগামী হয়ে ওঠেন। মালিনীকে রাজ্যে আটকে রাখতে চান মোহবন্ধনীতে আর মালিনী নিজেকে বিলিয়ে দিতে চান 'বহুজন হিতায় চ, বহুজন সুখায় চ'। কিন্তু সেই বহুজন তো সনাতন হিন্দু ধর্মের গণ্ডির ভিতর ব্রাহ্মণ আমলাতন্ত্রের কথা ভাবতে পারেনা। তারা চায় মালিনীর নির্বাসন।

একারণেই ব্রাহ্মণেরা বিদ্রোহের মাঝখানে একদিন এসে দাঁড়ায় মালিনী। ক্ষেমংকর, সোমাচার্য, চারু দত্ত এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা মালিনীর উপস্থিতিতে প্রথমে হতবাক হয়ে যায় ঃ

> "এ কী দেবী, এ কী মেয়ে। মায়াময়ী এ যে
> এসেছেন মানবের মাঝখানে নেমে।
> এ কী অপরূপ রূপ। এ কী জ্যোতির্ময়ী
> দেহখানি। এ তো নহে সামান্য নারী।
> কোথা হতে এলে মাতঃ কী লাগিয়া হেথা,
> কী করিতে চাও?..."

এভাবেই মালিনী লোকমাতার ভূমিকায়। ব্রাহ্মণরা দেখে সেই মালিনীকে, মালিনীর লোকমাতাকে। ব্রাহ্মণদের নেতা ক্ষেমংকর। তিনি বিদ্রোহের নেতা বাইরে থাকতে কাশী ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। যেতে গিয়েছিলেন

মিত্রবন্ধু সুপ্রিয়কে। সুপ্রিয় মালিনীকে প্রথম দেখেই মুগ্ধ হয়েছিল। মালিনীর মানবধর্ম সম্পর্কে সুপ্রিয়র বোধ দিয়েছিলো। অন্যদিকে ক্ষেমংকর চিঠিতে সুপ্রিয়কে জানিয়েছিল, সে বহুদূরবর্তী নগরী থেকে সৈন্যদল নিয়ে কাশীতে ফিরবে রাজকুমারী মালিনীর রক্তপাত নিতে। সুপ্রিয় তার প্রিয় মানবীর জন্য বিসর্জন দেয় আশৈশব বন্ধুত্ব। ক্ষেমংকরের চক্রান্তের কথা সে জানিয়ে দেয় রাজাকে। রাজা গুপ্তচর দ্বারা গোপনে সৈন্যদল দিয়ে ক্ষেমংকরকে আক্রমণ করে। আকস্মিক আক্রমণে পরাজিত ও বন্দী হন ক্ষেমংকর। রাজা সুপ্রিয়কে পুরস্কার দিতে চান এবং তাকে 'অন্তরের আশা' পূর্ণ করার আশ্বাস দেন। সুপ্রিয় আঘাত করেছে ক্ষেমংকরের বিশ্বাসে। সে অমর্যাদা করেছে বন্ধুত্বের। অনুতাপে দগ্ধ হতে থাকে সুপ্রিয়। বন্ধুর মুক্তিদান ভিক্ষা করার অনুরোধ জানায় সে রাজাকে। রাজার কিছুই অদেয় ছিলনা সুপ্রিয়কে। রাজা ক্ষেমংকরের প্রাণভিক্ষা দিতে স্বীকৃত হন। সেইসঙ্গে মালিনীকেও সমর্পণ করতে চান সুপ্রিয়র হাতে। রাজার শুধু ক্ষেমংকরের কাছে অন্য এক পরীক্ষা নেওয়ার সাধ ছিল। ক্ষেমংকরের চিত্তের পরীক্ষা নেবার জন্য তাকে উপস্থিত করা হয় মালিনী, সুপ্রিয়, রাজা সকলের উপস্থিতিতে। ক্ষেমংকর কিছু কথা প্রার্থনা করেন রাজার কাছে। সে ক্ষমা করে না সুপ্রিয়কে। বন্দী ক্ষেমংকর শৃঙ্খল দিয়েই আঘাত করে সুপ্রিয়কে। সুপ্রিয়র মৃত্যু হয়। মালিনী চোখের সামনে দেখে তার প্রণয়ীর মৃত্যু। ক্রুদ্ধ রাজা ক্ষেমংকরকে চরম শাস্তি দিতে চান। তিনি খড়্গ আনার নির্দেশ দেন। নাটকের শেষ মালিনীর মূর্ছা যাওয়ায়। মূর্ছিত হবার আগে তার শেষ উচ্চারণ—"মহারাজ, ক্ষমো ক্ষেমংকরে।"

৩.৪ ❑ চরিত্রবিচার : মালিনী

মালিনী—শব্দটির অনেক অর্থ আছে। ফুলের সন্ধান যে জানে, সেতো সৌন্দর্যের কারবারী। মালিনী তার সুন্দর মন দিয়ে সর্বজনের মধ্যে সুন্দরের চেতনা জাগ্রত করতে চেয়েছে। মালিনী ফুলবিক্রেতার নারী। সেই অর্থেও সে মনে ফুলের রেণু ছড়িয়ে তোলে। বিভিন্ন মানুষের হৃদয় সে ফুলের মাধ্যমে গ্রথিত করে। সে যে ফুলের মালাকার। আবার, মালিনী অর্থে নদীবাহিনী, খরস্রোতা। মানুষের কল্যাণে গঙ্গা প্রবাহিত হয়। মালিনীর ধর্মবোধের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে মানুষের কল্যাণকে স্পর্শ করে তোলবার চেষ্টা করেছে। সে গঙ্গারই মতো পবিত্র। দুটি অর্থেই মালিনীর তাৎপর্য একীভূত। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ মালিনীর প্রেমধর্মকেই অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে নাটকটি রচনা করেছিলেন বোঝা যায়। বালিকা রাজকুমারী থেকে মহৎকালের তাকে বিপুল করে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে যেভাবে রবীন্দ্রনাথ তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেই মালিনী-চিত্রের রূপরেখাটি দেখে নেওয়া যাক—

অন্তর্জগৎবিহারিণী, উদার হৃদয়সম্পন্না কল্যাণময়ী কাশীর রাজকন্যা মালিনী। পিতা-মাতার স্নেহ ছেলেটির মধ্যে আর রাজৈশ্বর্য, বিলাস আড়ম্বর—কিছুর মধ্যেই জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায়না মালিনী। তার কানে বাজে মানুষের আকুল আহ্বান। কাশ্যপের কাছে তাই সে মুক্তির মন্ত্র শুনতে চায়।

"...ধর্মাধর্ম
কী যেন বলিছে আমি অন্তরেতে মম
বারম্বার—কিছু আমি নারি বুঝিবারে
জগতের আহ্বান আজি আসিয়াছে আমারে।"

—সেই ডাক শুনে মালিনী রাজঅন্তঃপুর ছেড়ে বাইরে যেতে চায়। রাজকীয় অলংকার, বেশবাস তার কাছে মূল্যহীন। মহিষী কন্যার এই বিসদৃশ আকাঙ্ক্ষায় ব্যথিত হন। মালিনী মহিষীকে স্মরণ করিয়ে দেয় তার মাতামহের কথা। মহিষীর পিতা, মালিনীর মাতামহ আদর্শের জন্য ত্যাগ করেছিলেন সব সম্পদ। সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মালিনী বলে—

"...সেই বীর ধর্মব্রতী
মোর মাতামহে মনে নিয়েছ, মা, আমি—
আর কিছু নহে। থাক্-না মা, সর্বক্ষণ
তব পিতৃদেবের বাহিরের ধন
তোমারি কন্যার মুখে..."

মালিনী অকুতোভয়। প্রজারা তার নির্বাসন চাইলে মহারাজ এবং রাজমহিষী কাতর হয়ে পড়েন। আর মালিনী অনায়াস উদাসীনতার সঙ্গে বলে :

"প্রজাদের শুনব প্রার্থনা। মহাক্ষণ
এসেছে নিকটে। দাও মোরে নির্বাসন
পিতা।

এই দিকের আর্ত-পীড়িত মানব-মানবীর ডাক শুনতে পায় মালিনী। রাজপ্রাসাদের সুখ-বিলাসের আরাম ত্যাগ করে সে মানব-সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায়। স্বেচ্ছায় নির্বাসিত হতে চায় রাজঅন্তঃপুর ছেড়ে।

"...কন্যা সেটি তব মহারাজ,
মাগো, ছেড়ে দে মা, কন্যা আমি নহি আর,
নহি রাজসুতা—যে মোর অন্তরবাসী
অধিবাসী মহাপ্রাণী, সেই শুধু আমি।"

—মালিনী রাজা-রাজমহিষীর স্নেহশীলতার উদ্বেগকে উপেক্ষা করে না কিন্তু ব্যক্তি মানুষের একক পরিচয়ে সে মানুষের মাঝখানে দাঁড়াতে চায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর একক অবস্থানকে যেখানে গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই বরং, সেখানে মালিনী কিন্তু একক পরিচয়েই মানুষের মাঝে দাঁড়াতে চেয়েছে। পুরোহিত তন্ত্রের কুটিলতার কবলে, রাজতন্ত্রের আধিপত্য সকল প্রাতিষ্ঠানিকতাকেই আঘাত করেছে মালিনী। মালিনীর বিশ্বাস, তার সহিষ্ণুতা তাকে উত্তীর্ণ করেছে একটা অন্য স্তরে। তাই অনায়াসে মালিনী গিয়ে দাঁড়ায় বিদ্রোহী ব্রাহ্মণের মাঝখানে। অকপটে ব্যক্ত করে নিজের পরিচয়। সে 'রাজার দুহিতা' এবং সে-ই সেই

বিদ্রোহিণী নবধর্মের পূজারিণী, যার নির্বাসন কামনা করে তোলপাড় হয়েছে বিপ্রগণ। এরপর 'রাজার দুহিতা' মালিনী উন্নীত হয় 'বিশ্বজনী'র ভূমিকায়।

মালিনী শুধুই লোকমাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ নয়। মালিনী অন্তরলোকের সাধনায় ভেঙে যায় না। মালিনী সচেতনভাবে চিত্রায়িত করেছে নিজের অন্তর্মুখী দুর্বলতার দীনতাকে।

"রাজকন্যা আমি—কখনো পরশ খুলে
রাখি নি বাহিরে, দেখি নাই এ সংসার
সুখদুঃখ বিপুল—কোথায় কী ব্যথা আর
জানি না তো কিছু। শুনিয়াছি দুঃখময়
বসুন্ধরা,..."

নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যেই অতএব মালিনীর রূপান্তরের ধারা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে।

নাটকের চতুর্থ দৃশ্য থেকে মালিনীর ভূমিকা বদলে যায়। সুপ্রিয়ের মধ্যে আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখছে মালিনী। রাজকন্যা মালিনী নয়, লোকমাতা মালিনী নয়। মালিনী নারী। সুপ্রিয়র মধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে দেখতে মালিনী নতুন করে আবিষ্কার করে নিজেকে :

"...হায় বিপ্রবর,
যবে তুমি চাহিতেছ আমি যেন কত
অনন্তের প্রেরিতেছি নবীনের মতো।
যে দেবতা স্বর্গ হতে বহুলোক ছাড়ি
নামিছেন একদিন কিছুকাল ধরি
সে আমি কোথায় গেল। সেদিন, ব্রাহ্মণ,
কেন তুমি আসিলে না।..."

মালিনী সুপ্রিয়র কাছে খুঁজে পায় একটি অনাস্বাদিত আনন্দ। তাই ক্ষেমংকর যখন মালিনী সুপ্রিয়র অবাধ্যতার মাঝখানে ক্ষেমংকরের আগমনের খবর নিয়ে এসেছে, মালিনী প্রত্যাখ্যান করেছে ক্ষেমংকরের স্বার্থ।

"আজ নহে, আজ নহে। সকলের কাছে
মিনতি আমার;..."

মালিনী সুপ্রিয়র সম্পর্ক যেন কোন রাজা যার।—একটি পরিণতির পথে এগিয়ে গেছে সেখানেই মালিনীর সামনে একটা অমীমাংসিত দ্বন্দ্বসূত্রের আয়োজন। ক্ষেমংকর অবশ্য সচেতন সমস্তই মনে রেখেছিল রাজকন্যাকে। মালিনীর আপনার আদর্শ, তার নির্ভর নিয়েছেন, তবে বিদ্রোহ করেছেন বিদ্রোহী ব্রাহ্মণেরা। সকলেই স্বীকার করে নিয়েছে মালিনীকে। স্বীকার করে নিয়েছে সুপ্রিয়। শুধু স্বীকার নয়, মনে মনে নিজেকে সমর্পণ করে

৩.৫ □ নায়কবিচার ঃ সুপ্রিয় ও ক্ষেমংকর

এখন দেখা যাক, নায়ক কে। নায়ক হল সেরা যে হারায় না কোনো। আমার নায়ক হল ঘটির আলাদা না পৃথগাত্মকতা। আমাদের 'দটিলগ্রন্থ' অনুযায়ী নায়ক দীর্ঘোন্নত, সিংহস্কন্ধ, প্রাংশু, বিপুল বক্ষপিঞ্জর বিশাল, মদ উপভোগে পারদর্শী, গভীর, সত্যভাষক ও ঈর্ষণীয় পুরুষ যার মধুর আকর্ষণে সবাই মুগ্ধ।

এখন আমিনিকের অনুযায়ী দেখে নেওয়া যুটির ও কেয়াকলের আলোচনা। কেয়াকলের সৌন্দর্যে আকৃষ্ণতা এমনটির। সেখানে নিজেরই প্রাকৃতিক রাজকন্যা আমিনীর নির্বাসিত আবর্তন করে। প্রকৃতপক্ষে, সেখানকার, উচ্চমানের ঘিরেনি প্রাকৃতিকদেশীর অবস্থানে আলাদা করে বিভিন্ন কথা যায় যুটি পুরুষকে। প্রাকৃতিকদেশীর নায়ক তারা। সাধারণের আমি বিভক্তিক সেখানে যাকে না। তবুও একজন যুটির কথা বলে। আমিনিকেতনে আমিনিক প্রকৃতিকের ঐতিহ্যিকতা নিয়ে সে প্রশ্ন তোলে :

"আর। মহাশয়,
যুটে উপাদেশ সেরেছ আর কাকে কথা।
আর নিয়েছিল নির্বাচনে?"

—এই প্রশ্ন যুটিয়ের। সাধারণের পরিচয় নয় সে কিন্তু প্রাকৃতিকতার নিজেরই সে আর, সেই আর্যের তোর আর নেই। সেখানেই প্রাকৃতিকতার আমিনিকেই একটি ঘটির যুটিয়ে। পাঠকদের নিয়ে সে আলোচনা করে একক নিজেরই। কেয়াকলের সঙ্গে তার আমিনিকের মুলাম্পর্ক। বন্ধুত্বের কারণেই শুধু কেয়াকলেই মুখরে পারে যুটিয়েকে। যুটিয়ে কিন্তু নিজেরই হয়। নিজেকে প্রাকৃতিকতার আলাদা তার আছে নিজের।

"বন্ধু, কাকাকে নিজের।
যুগলের যুগিনের পরি পরে আর।
যাপাকের ক্রিয়াকর্ম ছাত্র-উপদেশ
এই শুধু আর আর আমিনিকে বিশ্বাস
নিয়েপরেছ।..."

আমাদের—প্রকারীয় নিয়েপরের নিশ্চাল যুটিয়ের আপেক্ষে। আমিনীর আরো আমাদের কথা যুটিয়ে পরে না ঠিকই কিন্তু যুটিয়ে যে আর্যের কথা বলে, ঠিক, সাধীন প্রাকৃতিকতার নিজুলে সেও তো এক আমাদের আর্য। এই আমাদের আর্যের বীতিনিষ্ঠা, আমন-নিষ্ঠেকার জন্য প্রাকৃতিকতা সেরেক সেরিয়ে তোলেও ঘিরে আছে না যুটিয়ে। এখানেও আমিনী ও যুটিয়ের পথ নিজেদিকে এলাপাত হয়ে যায়।

বন্ধুত্বের আছে কিন্তু যুটিয়ে নমনীয়। বন্ধুর আর নামে আমিনীয়। নামাত, বন্ধুত্ব, প্রেম ও সমাজ "যুটিয়ুটি পরে" নির্ণয় করে না একথা যুটিয়ে নিজেকেকারে আমিনিকে নেয়। এই আমিনীয় আমিনিকেতনে সমাজ নিজেরই প্রাকৃতিক ঘিরেনিক হলেও যখন কেয়াকলে নিজেরের আমার নেকে পরে আসে না, যুটিয়ে তখনও বন্ধুকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। পরিণত যুটিয়ে অনে অনে নিজেকিত হয়ে নিজেরিল সমাধানের পুনর্নিশ্চিত আছে। কেয়াকলে যুগিনিক প্রকৃতিকের ধনপ্রাপ্ত আলাদা আমার। একক আমি প্রাকৃতিকতা করে পরিণতকর্ম করার সময় করে। যুটিয়ে কিন্তু বন্ধুত্বের আছেরেন তেকে যায়। আর পথ কেয়াকলের পরেনের সঙ্গেও তোল না।

অথচ ক্ষেমঙ্করকে প্রত্যাখ্যান করতেও পারে না সুপ্রিয় তখন সেখানেও বিশ্বাসের যন্ত্রণা, বন্ধুত্বের পথটাই রুদ্ধ হয়ে যায়।

"...নিদ্রাহীন চোখে
দীপহীন শয্যা 'পর।"

সংশয় ভারাক্রান্ত মনকে নিয়েছে সুপ্রিয়। সুপ্রিয় আসলে ধর্মীয়সংস্কারের আবেগের কাছে অসহায়। ঠিক একারণেই মালিনীর কাছেও তার শর্তহীন সমর্পণ। ব্রাহ্মণ্যবাদ, শাস্ত্রবচন ইত্যাদি মানবধর্মের প্রতিকূল হলে সুপ্রিয় তর্ক করে। মালিনী যে নবধর্মের কথা বলে, সেই নবধর্মের কথা বলে, সেই নবধর্মের আদর্শে সুপ্রিয় প্রাণিত নয় কিন্তু মালিনীর কাছে তার স্বীকারোক্তি :

"শাস্ত্রমতে তর্ক করি, নহে তোমা-সনে।
সভায় পণ্ডিত আমি, তোমার চরণে
বালকের মতো।..."

—এই সুপ্রিয়, বন্ধুত্বের কাছে, প্রণয়িনীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে পারে প্রশ্নাতীত আবেগেই। অতএব বালকের মতোই অসহায় সমর্পণ মালিনীর কাছে : "দেবী নহো মোর তরে"

সুপ্রিয় প্রেমী। মালিনীর কাছে আত্মনিবেদনে তাই সে প্রার্থীর মতোই নিষ্কাশনের নিয়ে দাঁড়ায় তার সামনে

"বন্ধু আমা অমি
অমি চাহ মোরে।"

সুপ্রিয় আদর্শের আত্মত্যাগের মালিনীর সহ-পথিক নয় অথচ সেখানে সুপ্রিয় আর্তিক অনুগ নয়।

বন্ধু সুপ্রিয়র পরাজিত হতে হয় প্রেমিক সুপ্রিয়র কাছে। আজন্ম অর্জিত ও লালিত বন্ধুত্বকে সুপ্রিয় বিসর্জন দেয় মালিনীর পায়ে। বিসর্জন দেয় ঠিকই কিন্তু সেখানে তার মন জুড়ে দ্বিধা। ভালোবাসার মধ্যেই ক্ষেমঙ্করের বিশ্বাস ভেঙে দেয় সুপ্রিয়। আসলে মালিনীর প্রাণ যেখানে নিরাপদ, সেখানে সুপ্রিয় নিজেকে হারিয়ে ফেলে। রাজাকে জানিয়ে দেয় বন্ধু ক্ষেমঙ্করের গোপন অভিসন্ধির কথা। কিন্তু সেই জানিয়ে দেওয়াটা সুপ্রিয়র পক্ষে অতটা সহজ ছিল না। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সে বারে বারে বিক্ষত হয়েছে। রাজার পুরস্কার প্রতি অবজ্ঞাভরে ক্ষেমঙ্কর পরাজিত হলে তাই সুপ্রিয় ভুলে যায় আশার সমুদ্রেই। সেখান থেকে উঠে জীবনকে উপভোগ করার বাসনাও আর সুপ্রিয়র থাকে না। রাজা সুপ্রিয়র সামনে পুরস্কার স্বরূপ কন্যা মালিনীকে তার হাতে তুলে দিতে চাইলেও তাই সুপ্রিয় উল্লসিত হতে পারে না। আসলে একজন অন্ধ মানুষের সুস্থ বুদ্ধিবৃত্তি কখন দু'ভাগ হয়ে গেছে দুটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপে। একদিকে অকপটচিত্ত বন্ধুর প্রতি অবারিত প্রেম, সমর্পণ। সুপ্রিয়কে নিয়ে তাই একটা অসহায় অসামঞ্জস্য। কঠিন করে ভালোবাসতে পারে না, কঠিন করে প্রত্যাখ্যান করতেও পারে না। সুপ্রিয় আসলে যুক্তিবাদী হলেও বন্ধুত্বের আবেগে সে বড় বেশি অসহায়। তাই মালিনীর নবধর্ম ব্রাহ্মণ্যবাদের পরিপন্থী হলেও, আবেগের পক্ষে হিতকর,

অন্তঃসার, একথা কিন্তু সুমিত্রা নিজে যতটা উপলব্ধি করেছে, কেশবকে সেভাবে বোঝাতে পারেনি। মালিনীকে দাদার দেশের পরে সুমিত্রা বিচলিত হলেও কেশবকে কিন্তু সুমিত্রা প্রভাবিত করতে পারেনি। তাকে বিমুখ করতে পারেনি।

নাটকের শেষ দৃশ্যে সে বন্ধুবন্ধকে নিজের মৃত্যুকে ডেকে এনেছে। নিজেকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবেই উপলব্ধিত করেছে কেশবের কাছে। অপরাধীদের অন্তর্নিহিত বন্ধুত্ব ভাঙিয়ে যেতে যেতে এই মৃত্যু যেন সুমিত্রার কাছে শাস্তি নয়, মুক্তি।

কেশবের বিদ্রোহী চরিত্র। বিদ্রোহ তো মালিনী এবং কেশবেরও স্বভাব বৈশিষ্ট্য কিন্তু সেই বিদ্রোহের মূল কথা মানবতা। কেশবের কিন্তু মানবতার প্রতি গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদ থেকে কিছু কেটে যাবে না। যদি মালিনীকে সামনে রেখে কেশবেরও সবটাই সমর্থনের বিরুদ্ধে। এবং একান্ত মানসিক দুর্বলতাকে সে জয় করে নিতে পারে। মালিনীর উপস্থিতি বিচলিত করেছিল সমস্ত বিদ্রোহী ব্রাহ্মণদের কিন্তু একমাত্র অবিচলিত মানুষটি কেশব। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব আসলে প্রোথিত ছিল আরও অনেক গভীরে। তাই একা একাই কেশবের সৈন্য সংগ্রহ করতে বেরিয়েছে। কেশবের একমাত্র দুর্বলতা, একমাত্র বিশ্বাসের জায়গা তার বন্ধু সুমিত্রা। কেশবের চলে যাওয়া কিন্তু সুমিত্রার কাছে যন বিশ্বাস রেখে চলে যাওয়া। কেশবের চলে যাওয়ার পর সুমিত্রার যে পরিবর্তন সেটি কেশবের জানা ছিল না। এমনকি কেশবের মনের কোণে কোনও সন্দেহের বাষ্পও জমা হয়নি। মালিনীকে দেখে সমস্ত ব্রাহ্মণ তথা সুমিত্রার বিচলনকে কেশব দেখেছে কিন্তু সেসব নিয়ে কোন সন্দেহই কেশবের মনে স্থান পায়নি। তাই কেশব যখন কাশী আক্রমণ করার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করে ফেলেছে, তখন সেই গোপন সংবাদ সে নির্দ্বিধায় জানিয়েছে সুমিত্রাকে। সুমিত্রার জীবনে বন্ধুত্বের স্থান অন্য কোন সম্পর্কের কাছে ছোট হয়ে গেছে, একথা কেশবের স্বপ্নেও আসে নাহি। কেশবের চোখে বিশ্বস্ত বন্ধু সুমিত্রাকে এবং জানা ছিল সুমিত্রা কেশবেরই পাশেই থাকবে।

একদিকে কেশবের দেশেতে ফিরে এসে, যেখানে সে বিশাল পরিকল্প রেখে গিয়েছিল সেখানে সবকিছু জুড়ে আছে একজন, অন্য এক 'মালিনী'। কেশবকে সুমিত্রা আকস্মিকের কথা বোঝাতে চেয়েছে কিন্তু কেশবের অবিচল। এমনকি বন্ধুর মুখে বিচলনকে অমানুষতা চোখে দেখতে পারেনি সে। প্রেম নয়, পরিত্রাণ নয়, কঠিন ভর্ৎসনাই ঝরে পড়েছে কেশবের কণ্ঠে :

> "সিঁথি পরে লাজসাজ, তুমি কোথা যাবে
> কী কারণ—রাজপুত্রের সুবাসনে
> কী মর্ম মনের মতো করেছ যুজন
> দীর্ঘ অবসরে।

আসলে সুমিত্রার কথা কেশবের কাছে 'প্রলাপবাণী'। কেশবের পরাজিত কিন্তু সে পরাজয়কে একা একাই স্বীকার করতে চায় না। সুমিত্রাকে সে অবিশ্বস্ত বন্ধু বলে জেনেছে। সুমিত্রা মালিনীর সঙ্গে সুখের

সত্যের পরিবর্তে তার শাস্ত্রকে স্বীকার করে নিতে হবে ক্ষেমংকরকে, এই উপলব্ধিকে প্রকাশ দিতে পারেনি এই উদ্ধত ব্রাহ্মণ যুবক। বন্ধুর ক্ষেত্রে অভিমানবোধ তার সুতীব্র। অতএব—

“এসো তবে কাছে এসো, ধরো মোর কর,
চলো মোরা যাই দেশে, তীরে এক সনে,
যেমন সে বাল্যকালে—...”

—একথা বলে ক্ষেমংকর আহ্বান জানিয়েছে সুপ্রিয়কে। ক্ষেমংকরের বিচারে সুপ্রিয়র মৃত্যুদণ্ড অনিবার্য। তাই

“মৃত্যুরে নিয়েছিনু এসে কাছে মোরে
সেথায় অনন্তকাল বিচ্ছেদ না হবে।
লহো তবে বন্ধুত্বের করুণ বিচার—
এই লহো।”

সুপ্রিয়র মাথায় হাতের শৃঙ্খল দিয়ে ক্ষেমংকর আঘাত করেছে।

'মালিনী' নাটকে ক্ষেমংকরের শেষ পরিণতি হয়তো মৃত্যুদণ্ড নয় কেননা এই নাটক শেষ হয়েছে মালিনীর ক্ষমার উচ্চারণে। অতএব নিজের বিশ্বাসের জন্য বন্ধুকে হত্যার এবং বন্ধুর বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহ্য করে বাকীটা সময় কাটাবে—এমনটাও ভাবা যেতে পারে।

ক্ষেমংকর সুপ্রিয়কে ক্ষমা করেনি। কারণ অপরাধটা বিশ্বাসঘাতকতা। কিন্তু অন্য একটা প্রশ্নও কি উঠে আসে না? মালিনী রাজকন্যা, মালিনী রূপসী, মালিনী সুপ্রিয়র কাছেই নিবেদন করেছে নিজেকে। অতএব সুপ্রিয়র আচরণে সূত্রের পথ—একটা ঈর্ষার বোধও কি ক্ষেমংকরের মনের কোণে দানা বাঁধেনি? মালিনীকে প্রথম দর্শনে ক্ষেমংকরও যে বিচলিত হয়েছিল সেকথা নাটকের শেষ দৃশ্যে ক্ষেমংকর নিজেই স্বীকার করে নিয়েছে।

“আমি কি দেখি নি ওরে?
আমিও কি ভাবি নাই মুহূর্তের তরে
এসেছে আপনি ধর্ম নারীমূর্তি ধরে
কঠিন পুরুষমন কেড়ে নিতে তোরে
অশ্রুজলে? অন্তরে দুর্বল হৃদয়ে
জাগে নি কি ক্ষণকাল?...”

অতএব নিছক বন্ধুত্ব নয়, ক্ষেমংকর-সুপ্রিয়র মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল রাজকন্যা মালিনী। সুপ্রিয় জয় করে নিয়েছিল মালিনীর হৃদয়। অতএব ক্ষেমংকরের 'আদর্শবাদ' যা তার 'অন্তরে অন্তরে' 'অস্থিতে মজ্জাতে' মিশেছিল, সেই 'আদর্শবাদ'কে শুধু যে কর্তব্যের খাতিরেই নিয়ে চলে গিয়েছিল ক্ষেমংকর এমনটা নয়।

তার বিচারের বস্তু সেখানে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছিল বটে। ক্ষেমংকরের হাতে তোলেন শাসনে সুপ্রিয়র হত্যাদৃশ্য দেখার পরও মালিনীর মুখে ক্ষমার উচ্চারণ একান্তই আবশ্যক ছিল। তিনি নাট্যরীতির মতো একটা সূক্ষ্ম ভিত্তি আর ভালবাসার নিরাপোষহীনতা হয়ত বা তৈরী হয়েছিল।

সার্বিকভাবে চারিত্রিক দৃঢ়তা ও কর্মদক্ষতার কারণে ক্ষেমংকরের মতো নাট্যকেন্দ্রিক গৌরব অন্যদের চরিত্রগৌরবে, বন্ধুত্বভাবনায়, নির্ভর ধর্মীয়তায়, ললিতকলানির্ভর সুপ্রিয়ই নায়ক। ক্ষেমংকর নায়কের প্রতিস্পর্ধীমাত্র।

৫.৬ ❑ অপ্রধান চরিত্র ঃ মহিষী, কাশীরাজ

মাতৃত্বধর্মে আসীন মহিষী। নরধর্ম বা সমাজধর্ম অপেক্ষা মাতৃধর্মে গরীয়ান। অন্তরে মাতৃভাবনা তিনি। সেখানে তিনি রাজনীতির তোয়াক্কা করেন না। মায়ের মত করেই তার রাজকুমারী বসনে-ভূষণে-অলংকারে থেকে রাজঅন্তঃপুর আলোকিত করে থাকুন। রাজমহিষীর অন্তর পরিচয় জানা যায় মালিনীর মুখে। মহিষীর জন্য 'মহিমার মুখে'। কন্যার সুকঠিন ধর্মচিন্তা, তেমনি যেমনই ঈষৎ গভীরতর দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার আগ্রহ মহিষীকে বিচলিত করে। মহিষী কিন্তু দৃঢ়তায় তার মালিনীর সমর্থক।

> "…এ তোর খেলার বেলা,
> এ ধর্ম কোথায় পেলি, কী শাস্ত্রবচন?
> আমারে শিখায় ধর্ম সে তো পুরাতন
> অনাদি কালের। কিন্তু মা গো এ যে নব
> সৃষ্টিছাড়া কোথাকার ধর্ম অভিনব
> আজিকার-গড়া। কোথা হতে ঘরে আসে
> বিদেশী সন্ন্যাসী, দেখে আমি মরি ত্রাসে।"

এই উৎকণ্ঠা মায়ের একান্ত। সেই উদ্বেগের কারণেই মাতৃসুলভ সমাধানের প্রস্তাবনা করেন। রাজাকে বলেন ঃ

> "…অমঙ্গলখানা আসে থেকে
> মালিনীর তরে। মনোমত বর দেখে
> বেঁধে দেহ সোনা কাছে নিজ আবাসে
> সুখ হবে স্বধর্মে, ঘুচাইবে জ্বালা।"

রাজমহিষী শুধু একটি জায়গাতেই কঠিন। যেখানে দীন হোমের কন্যার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণেরা বোঝার, তারা মালিনীর নির্বাসন কামনা করে, সেখানেই মহিষীর উৎকণ্ঠা ঘটে। মাতৃ অন্তরে যে বহ্নিশিখা ছিল, তার প্রকাশ ঘটেছে।

"...নির্বাসন। এই যদি হয়
ধর্ম প্রাচারের, তবে হোক, হা, উদয়
মায়ধর্ম—শিখে নিক যেটি আজ হতে
নিত্যধন।

শহীদ নিত্যধন ধর্ম পালনে কোনো শিথিলতা, আপত্তি, দোদুল্যতা, দ্বন্দ্বমুখর থাকতে দেয়। তাই রাজাদের আপত্তি ও অসম্মতি উপেক্ষা করেই তিনি। স্বামীর নিত্যধর্মে বাধা দিতে মহিনীরা পর্যন্তকে প্রস্তুতিপর হয়ে নিয়োজিত তিনি—

কী শিক্ষা শিখাতে এসে আজ
পাপ রাজপুরীতে। পুজারে অধিকে আজ,
ধর্ম নিতে চাও। সে তোমা আমার নয়।

তবে রাজাদুলেন মহিনীরা যারা মন্ত্রমুগ্ধ হলেন ঘটনাকে তিনি সমর্থন করেননি আদৌ। আসলে এ মহিনী পুতুলরা সংসারধর্মে আসীন হলেও শিক্ষা নিতেই আসেনি, দৃঢ়তর বর্ণনালাদের অস্তীকার তাঁর মধ্যে নেই।

তবে রাজা রাজাদেরকে প্রভাবে নিশ্চয়ই। মহিন রাজধর্ম আর শিক্ষাদের এই দুয়ের বিশ্লেষণেতে তিনি যে শিক্ষার আর আসলে তোলে নিতে তিনি নিশ্চয়ই। সমস্যাটি প্রতি ব্যক্তিগত আক্রোশ বা মনোভাব প্রকাশের প্রতি অতিরিক্ত প্রশ্রয়ের কোনোটিই আর নেই। আসলে নিত্যধর্ম চেতনাতার জন্য রাজা মহিনীকে শুধু একটি সোপানে একটু ঘিরিয়ে হয়ে থাকতে বলেন—

"...বর্ষাইতে রাখিতে চাও
তাহা মনে মনে।"

মহিনীর রাজা দুরত্বাজক হয় মহিনীর নির্বাসন। সেখানেও রাজা সোজাসুজি। দুরত্বাজকে বলেন :

"নিয় আজে নির্বাসন, পুরাণ রাজধর্ম,
সহিনি কর্তব্য তোর। যদি অধিকার না
দৃঢ় আমি মোরমুখ, অন্তর দুর্বল,
রাজধর্ম দুরুহ তাই তেমি আজুজন।"

অবশ্য কর্তব্যসম্পাদনে অটিলক হয়ে দাড়ায় না তিনি। 'নিত্যধর্ম' সহিনক শিক্ষা হলেও রাজুপতি হেসাবে রাজনিতিক প্রয়োজনিতে অন্য নীতিনিয়মের অনুসরী হতে, শিখা নিয়েছে মহিনীর শিখা আবেগ সহিষ্ণু, আবেগ দুর্বল। সমাজমনস্কের প্রতি অনুরাগ এই ভিন্নধর্মী কাশীরাজ পুত্রটি প্রশংসক হিসেবে বন্ধ। যে ধর্ম যা রাজনীতিকে তিনি নিজের নিত্যধর্ম পালনে অটিলে, সেটি রাজ্যপুরীর মঙ্গল কল্পে সম্পূর্ণে অন্তরালে নিয়েছে, তখন আজুত শাসক তিনি, গভীর শিখা।

৬.৭ ❑ নাট্যগঠন ঃ 'মালিনী'

এ নাটকের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ যে বিবৃতি দিয়েছেন, তাতে নাট্যগঠন সম্বন্ধে তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিষয় সূচনা পাই।

১। "সেক্সপীয়রের নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ"

২। "একদিন ট্রেভেলিয়ানের মুখে এর সম্বন্ধে মন্তব্য শুনেছিলুম। তিনি কবি এবং গ্রীক সাহিত্যের রসজ্ঞ। তিনি আমাকে বললেন—এই নাটকে তিনি গ্রীক নাট্যকলার প্রতিরূপ দেখেছেন।"

৩। "মালিনীর পরিণাম সরল, সংযত এবং দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন।"

এ নাটকে রয়েছে অঙ্কবিহীন চারটি দৃশ্য। অবশ্য অঙ্কহীনতা রবীন্দ্রনাথ নাটকটিতে ব্যবহার করেননি। প্রমথনাথ বিশী বলেছেন—"ইহাকে দুই অঙ্কে ভাগ করিলেই নাটকীয় ঐক্যটিকে রক্ষা করা যাইত। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় দৃশ্য—প্রথম অঙ্ক এবং চতুর্থ দৃশ্যটিকে দ্বিতীয় অঙ্কের অন্তর্গত করা উচিত ছিল। তৃতীয় দৃশ্য ও চতুর্থ দৃশ্যের মধ্যে অনেকটা সময়ের ব্যবধান আছে, তাহা ছাড়া চতুর্থ দৃশ্যে প্রধান দুইটি চরিত্র, মালিনীর ও সুপ্রিয়ের চরিত্রে অনেকটা পরিবর্তন হইয়াছে, অতএব ইহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিবার জন্যে অঙ্কপাতের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু নাটকের এই জাতীয় আঙ্গিক অসম্পূর্ণতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের চিরকালই ঔদাসীন্যের অভাব" (রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৩৬০, পৃষ্ঠা ৬৬); তবু আমরা খুঁজবো, ঠিক কেমন নাট্য গঠনে গঠিত এই 'মালিনী'।

১। সেক্সপীয়রীয় গঠন অনুযায়ী এ নাটকে এটি অঙ্ক তো দূরের কথা, এটি দৃশ্যও নেই। তবে সংস্কৃত নাটকের পঞ্চসন্ধি অনুযায়ী কাহিনীক্রমে Exposition (আরম্ভ), rising action (আরোহণ), climax (শীর্ষবিন্দু) falling action (অবরোহণ) ও Catastrophe (শেষ সমাপন) রয়েছে। দুই ব্রাহ্মণের কাছে মালিনীর নবধর্ম প্রচারে আরম্ভ, রাণী ও কাশ্যপের সংলাপে মালিনীকে নিয়ে উদ্বেগে আরোহণ, ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মালিনীকে নিয়ে সুপ্রিয় ও ক্ষেমংকরের কথোপকথনে শীর্ষবিন্দু, মালিনীর কাছে ব্রাহ্মণদের আনুগত্যস্বীকার এবং সুপ্রিয়-মালিনীর প্রেমে পরিণামের অবরোহণ, আর ক্ষেমংকরের আঘাতে সুপ্রিয়ের মৃত্যু ও মালিনীর ক্ষমাপ্রার্থনায় এ নাটকের শেষ সমাপন। নাট্যকাহিনীর পরিবিন্যাসে সেক্সপীয়রীয় পঞ্চসন্ধির ব্যবহার এখানেই বিস্তৃত হোক।

২। এবার দেখা যাক গ্রীক নাট্যরীতির প্রভাব কতটা। গ্রীক নাটক মানে ত্রিবিধ ঐক্য—time, place, action। নাটকের প্রথম তিনটি দৃশ্যের সময়ের ধারাবাহিকতা থাকলেও চতুর্থ দৃশ্যটির ঘটনাপ্রবাহে বেশ খানিক ব্যবধান রয়েছে। কারণ সুপ্রিয় মালিনীর অনুরাগপূর্ণ প্রণয়ে সময় লেগেছে আর তারই সে রাজার কাছে গিয়ে বন্ধু ক্ষেমংকরের বৈদেশ গমন ও বিদেশী সৈন্যদের সহায়তার কথা জানিয়েছে। রাজার দূতেরা ক্ষেমংকরকে নিয়ে এসে বন্দী করে দিয়েছেন। তৃতীয় দৃশ্যটির পরে চতুর্থ দৃশ্যটির ঘটনা অনেকখানি কালগত ব্যবধান আছে যা গ্রীক ঐক্যগত

[illegible]

৩। [illegible]

৩.৮ ❑ কাব্যনাট্য হিসেবে 'মালিনী'

[illegible]

[illegible] —'The tendency, at any rate, of prose drama is to emphasize the ephemeral and superficial, if we want to get at the permanent and eternal we tend to express inverse" ('A Dialogue on Dramatic Poetry')।

[illegible]—

১। [illegible]

২। [illegible]

৩। [illegible]

৪। কাহিনী অত্যন্তের পর যুক্ত হবে না। চরিত্রের সংঘাতে, দ্বন্দ্ব আবর্তন ও পরিণতির জন্য নাট্যকারের নিরাসক্তি থাকবে না।

৫। এর ফলে সৌন্দর্যবিধান করবে, কাহিনি স্বল্প হবে, একমাত্র নাটকের মুহূর্ত সৃষ্টিতেই সক্ষম হবে।

এক্ষেত্রে শম্ভু মিত্রের বক্তব্য অনুধাবনযোগ্য—"সে কোনো মুহূর্তে আবেগ বা অনুভব অনুভূত পাঠকের তরঙ্গ করতে পারে এমন কাব্যভাষা যদি নির্মাণ করতে হবে কাব্যনাট্যে, তার জন্য নিরবচ্ছিন্নতার মধ্য এক ছন্দের প্রয়োজন এবং এর ফলে একদিকে যেমন নাটকে কাব্যভাষার সাবলীলতা ও কাব্যিকতার চিরন্তনতা যুক্ত হবে, অন্যদিকে তেমনি কবিতার ক্রমশ প্রসারিত হবে বহুদূর।" (সাহিত্যকোষ : নাটক)

রবীন্দ্রনাথের কাব্যনাটক গুলি—'রুদ্রচণ্ড' (১৮৮১), 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪), 'রাজা ও রাণী' (১৮৮৯), 'বিসর্জন' (১৮৯০), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২), 'মালিনী' (১৮৯৬)। প্রতিটি কাব্যনাটকেই রবীন্দ্রনাথ নতুন সত্যের সন্ধান দিয়েছে। আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তির অন্তরের অন্তরতম আবেগ প্রকাশ করে প্রতিটি নাটকই চরিত্রের দ্বন্দ্বমূলক কোনো নতুন বোধকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছে। 'মালিনী' নাটকে প্রতিটি চরিত্রের সংলাপে আবেগের রূপ ধরেছে। নাটকের ক্রিয়াশীলতা, চরিত্রের আচরণ, সংলাপের উৎকণ্ঠা—সবকিছুর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত নাট্যমুহূর্তে অন্তর্গত কাব্যরূপ প্রকাশের সাযুজ্য রেখে চলেছে। আধুনিককালের অনেক কবিতা ও নাটকের আনুপাতিক প্রভেদটিকে যেমন খুঁজে পাচ্ছেনা। যদি কাব্যনাটকে কবিতার আত্মবোধ আর প্রয়োজনীয় নয়। সংলাপের তো দুয়ের সাহিত্য হয়েই নাট্যগুণ বিকাশের সহায়ক হতে পারে। সেক্ষেত্রে যেমন নাটক ও কাব্যনাটক আলাদা থাকে। কাব্যের বৈশিষ্ট্য যদি তার চিন্তা-গাম্ভীর্য বিন্যাস, অনুভূতি, রূপ, আবেগ, ভাবের ঐক্য হয়, আর নাটকের বৈশিষ্ট্য যদি তার সংলাপ, দ্বন্দ্ব, উৎকণ্ঠা হয় তবে এদের সমন্বয়ে চরিত্রের ও সংলাপের প্রকাশ ঘটেই পরিণতি পাচ্ছে এ ধরনের নাটক। 'মালিনী' সেভাবেই কাব্যগীতিতে ও অন্তর্নিহিত নাট্যগুণে। সমগ্র আলোচনায় স্পষ্ট এর সার্থকতা।

৩.৯ □ গ্রীকনাটক ও 'মালিনী'

প্রাচীনকাল থেকেই গ্রীস ও ভারতবর্ষ—এই দুই দেশেই নাট্যসাহিত্যের চর্চা শুরু হয়। প্রাচীন গ্রীক নাট্যকার Aeschylus (খ্রিস্টপূর্ব ৫২৫-৪৫৬) এর 'Persians' নাটকটি প্রথম প্রকাশিত খ্রিস্টপূর্ব ৪৭২ অব্দে। আর অপর দুই প্রধান গ্রীক নাট্যকার Sophocles (খ্রিস্টপূর্ব ৪৯৬-৪০৬) এবং Euripides (খ্রিস্টপূর্ব ৪৮০-৪০৬) ও পঞ্চম শতাব্দীর মানুষ। গ্রীকের নাটক সম্বন্ধে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীক দার্শনিক Aristotle (খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) তাঁর 'Poetics' গ্রন্থে আলোচনা করে গেছেন। সুতরাং সেই আলোচনা সম্পর্কে নিয়েই গ্রীকনাটক সম্বন্ধে আলোচনাবিন্দু জানা হয়ে যায়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'মালিনী' নাটকের সূচনায় লিখেছেন—"...একদিন টম্‌সনসাহেবের মুখে এর সম্বন্ধে মন্তব্য শুনলুম। তিনি কবি এবং গ্রীক সাহিত্যের রসজ্ঞ। তিনি আমাকে বললেন—এই নাটকে তিনি গ্রীক নাট্যকলার প্রতিরূপ দেখেছেন। তার অর্থ কী তাহা সম্পূর্ণ বুঝতে পারিনি, কারণ গ্রীক কিছু কিছু পড়েছি হয়তো কিন্তু গ্রীকনাট্য আমার অধিকারের

করিয়ে।" তবু, আমরা গ্রীক নাটকের সঙ্গে 'মালিনী' নাটকের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য অর্থাৎ সামগ্রিক তুলনা বোঝার একটি চেষ্টা করি।

১। "Aeschylus, like all great tragic poets, was not the obedient servant but the imperious master of his sources' (Greek Tragedy : H. D. F. Kitto : P-103)। যদি গ্রীক পুরাণ থেকে কাহিনী নিয়ে যেমন গ্রীক নাটক রচিত হতো, তেমনই রবীন্দ্রনাথও বৌদ্ধকাহিনী 'মহাবস্তু-অবদান' থেকে 'মালিনী'-র কাহিনী গ্রহণ করেছেন।

২। গ্রীক নাটকে অতীতের কাহিনীকে পরিবর্তন করে যেমনভাবে সমকালীন করে দেখা হতো, তেমনই এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের দেখা সময়কে যুক্ত করে কাহিনীর নতুন রূপ দিয়েছেন।

৩। গ্রীক নাটক একটা দৈবিক বিধি দিয়ে আবৃত থাকত। বিধি অলঙ্ঘ্য অথচ কারো পরিত্রাণ নেই। এ নাটকের ধর্মবিধির পরিবেশে অবতার হলেই বিধি অতিক্রমণের দায় পড়েছে অন্যায়কারীর ওপর।

৪। গ্রীক নাটকে প্রয়োজনে Miracles বা দৈব ঘটনা ঘটানো হয়। 'মালিনী' নাটকে ব্রাহ্মণেরা যখন দেবীকে আহ্বান করছেন তখন নাটকীয় মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ মালিনীকে হাজির করিয়েছেন। এ যেন শিল্পকলা কৌশলে অলৌকিকতাকে দেখিয়ে আনলেন।

৫। Sophocles অভিনেতাদের বিশেষ মূল্য দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও অন্যান্যের অভিনেতাকে ব্যর্থ হতে দেননি।

৬। গ্রীক নাটকগুলি যেমন সংক্ষিপ্ত, 'মালিনী'-তেও তেমন সংক্ষিপ্ততা ও দ্রুতগতি দেখা যায়। উভয় নাটকেই অবান্তর ঘটনা বা কাহিনীর স্থান নেই। যদি উপাখ্যানের কাহিনীতে ক্ষেমঙ্করের যে পরিণাম ও সময় লেগেছিল, তা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কোনো নতুন দৃশ্য রচনা করেননি।

৭। গ্রীক নাটকের মতো 'মালিনী'-ও 'imitation of action and not imitation of character : চরিত্র বিশ্লেষণের কোনো দায় রবীন্দ্রনাথের ছিল না।

৮। স্থান, কাল ও ঘটনার ঐক্যবিধি গ্রীক নাটকের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। 'মালিনী' নাটকের দৃশ্যগুলি রাজার অন্তঃপুর, মন্দির-প্রাঙ্গণ, রাজ-উদ্যানের মধ্যে স্থাপিত, সুতরাং স্থানের ঐক্য নেই। সময়ের ঐক্যের দিকে নজর দিলে বলতে হয় প্রথম তিনটি দৃশ্যের মধ্যে অবিচ্ছিন্নতা থাকলেও চতুর্থ দৃশ্য অনেক পরে ঘটেছে। একমাত্র ঘটনার ঐক্যের দিকে এ নাটক গ্রীক রীতিরই অনুসারী। ঘটনার কোথাও শিথিলতা, অপ্রাসঙ্গিকতা নেই। তা ঘনীভূত ও সংহত।

৯। সমালোচকেরা বলেন 'মালিনী'তে গ্রীক নাটকের একটি কাহিনীর ও নিয়তিনির্ভর ট্র্যাজেডির প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করা পড়েছে।

তবে গ্রীক নাটকের অবশ্য ও অদৃশ্য দেবশক্তির লীলা এখানে নেই। প্রতিহিংসা নর্মদার্পী নিয়তি এখানে লোকাতীত আলো ক্রিয়াশীল হয়েছে। 'দেবতা'-এর আবির্ভাব নয়। সুতরাং বহিরঙ্গিকের বিচারেও 'মালিনী'-র সঙ্গে গ্রীক নাটকের সাদৃশ্য।

৫.১০ ❑ ট্র্যাজেডিবিচারে ঃ 'মালিনী'

গ্রীক ও শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডি—দু রকম। গ্রীক দেশের ট্র্যাজেডির কারণ নিয়তি বা নিমিসিস। নিয়তিতাড়িত হয়ে নায়ক ট্র্যাজেডির শিকার হতে পারে। আর শেক্সপীয়রের চরিত্ররা কোনো দুর্বলতা বা ত্রুটিবিচ্যুতির কারণে ট্র্যাজেডির শিকার হয়। তারা মহৎ নায়ক বা উচ্চশ্রেণীর প্রতিনিধি হয়েও কোনো মুহূর্তে আবেগের কাছে আত্মিকশক্তির পরাজয়স্বীকার করে, ফলতে বাধ্য হয়। মোটকথা, নায়কের দুর্বল সত্যশক্তি ও প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও পরাজয়ই হল ট্র্যাজেডির বিষয়। Aristotle তাঁর 'Poetics'-এ ট্র্যাজেডির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল—"...ট্র্যাজেডি হল একটি গম্ভীর, সম্পূর্ণ ও বিশেষ আয়তনবিশিষ্ট ক্রিয়ার অনুকরণ, ভাষার সৌন্দর্যে তার প্রতিটি অংশ স্বতন্ত্র, এই ক্রিয়াটির প্রকাশরীতি বর্ণনাত্মক নয়, নাটকীয়; আর এই ক্রিয়া ভীতি ও করুণার উদ্রেক করে এবং তার মধ্য দিয়ে অনুরূপ অনুভূতিগুলির পরিশুদ্ধি ঘটায়।" (শিশিরকুমার দাশ, কাব্যতত্ত্ব আরিস্টটল, প্যাপিরাস, ১৯৮৯, পৃ. ১৫)। তথাচ রবীন্দ্রসাহিত্যের উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 'মালিনী'কে রোমান্টিক ট্র্যাজেডি, অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় 'মালিনী'কে 'বিসর্জন' অপেক্ষা উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডি এবং অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী 'মালিনী'-কে 'সমুদ্রের প্রতিবেশ'-এর মতো সামঞ্জস্যবিহীন অবিকৃতির অকারণিক ট্র্যাজেডি বলেছেন। সুতরাং 'মালিনী' অবশ্যই ট্র্যাজেডি। তবে দেখা যাক কিভাবে এবং কোথায় এই ট্র্যাজিকধর্ম গড়ে উঠেছে।

১। রবীন্দ্রনাথ 'মালিনী'-র সূচনায় স্পষ্টই লিখেছেন—'শেক্সপীয়রের নাটক আমার আমাদের কাছে নাটকের আদর্শ। তার বহু শাখায়িত বৈচিত্র্য, ব্যাপ্তি ও ঘাত-প্রতিঘাত প্রথম থেকেই আমাদের মনকে অধিকার করেছে।" সুতরাং, ধরে নেওয়া যে শেক্সপীয়রীয় রীতির ক্ষতিকারক ধীরে ধীরে নায়ককে আচ্ছন্ন করেছে 'মালিনী' নাটকে। সুপ্রিয়র মৃত্যু ঘটিয়ে। কিন্তু ট্র্যাজেডি ক্ষেমংকরের বাসভূমে ঘটেনি। মালিনী যখন ক্ষেমংকরকে ক্ষমা করতে বলেছেন তখন ধরে নেওয়া অন্যায় হবে না যে শেষপর্যন্ত ক্ষেমংকরের মৃত্যুদণ্ড হয়নি। সুপ্রিয়কে হত্যা করে সেই আঘাতের স্মৃতি নিয়ে ক্ষেমংকর কি দুর্বিষহ জীবনযাপন করেছিলেন সেকথা ভাবলেও কেঁপে উঠতে হয়। সে শাস্তি, অভিশাপ। যদি তার আঘাত লাগতে না এমনটি হত। নাটকের উপসংহার তো আমরা দেখি না।

২। অ্যারিস্টটল Peripeteia শব্দটি দিয়েছিলেন ট্র্যাজেডির উপাদান প্রসঙ্গে। একে ভাগ্যবিপর্যয় বা reversal of fortune বলা যায়। যে জিনিসকে ভালোবাসি, তাকে যখন নিজেই নষ্ট করি বা নিজে নষ্ট হই, তখনই সত্যিকার ট্র্যাজেডি জন্মায়। ক্ষেমংকর তারই নিদর্শন।

৩। নায়কচরিত্রের পতন বা ভাবসংস্থিতি একটা এক জায়গায় যখন পৌঁছয়, তখন মৃত্যু-আনন্দ

ক্ষেমংকরের মতো তাকে লড়াই করতে হয় নিয়তির সঙ্গে, নিজের অন্তরে নিজের সত্তা অন্তর্দ্বন্দ্বের সঙ্গে; আর তখনই ঘটে ট্র্যাজেডি। ক্ষেমংকরের যুক্তি, চিন্তা, আবেগানুভূতি তার ট্র্যাজেডি ঘনিয়ে এনেছে।

৪। 'মালিনী'-র পরিসমাপ্তিতে হৃদয়ে মুক্তবেদনাই বোধ হয়। সুপ্রিয়র মৃত্যু আমাদের সান্ত্বনা করে দেয়। ধর্মবিশ্বাস কোনো অধিকার কোনো ব্যক্তির হাতে নেই। ধর্ম হৃদয়ের জিনিস, যুক্তি দিয়ে তাকে বোঝাবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। রক্তপাতের জোরে দিয়ে আদর্শ রক্ষিত হয় না। সুপ্রিয়র মৃত্যুর করুণ পরিণতি দিয়ে তাই-ই তো আমার ট্র্যাজেডি ছাড়া এ আর কি।

৫। 'মালিনী' নাটকের ট্র্যাজেডি বাইরে থেকে আরোপিত নয়। Hamlet এর সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ততা, Macbeth-এর উচ্চাকাঙ্ক্ষা, Othello-র ঈর্ষা যেমন; তেমনই সুপ্রিয়-মালিনী-ক্ষেমংকর প্রত্যেকের আচরণ এবং মনোভাবই ট্র্যাজেডি সৃষ্টির জন্য দায়ী। কোনো একজনের Hamartia বা ত্রুটি এর জন্য দায়ী নয়।

৬। তবু, শেষ পর্যন্ত 'মালিনী' শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডির পর্যায় পৌঁছিতে পারে না কারণ রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডিতে নায়কের মৃত্যু নেই। সেখানে মৃত্যু তার নিষ্ক্রিয় মানুষকে গ্রাস করে আর জন্যে রেখে দেয় জীবনব্যাপী হাহাকার আর অনুশোচনা।

৩.১১ ❑ সংলাপবিচার ঃ 'মালিনী'

সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন—"সংলাপ ঃ স্যাৎ দশীতোক্তির্নির্দশায় সমাসত ঃ", অর্থাৎ বিভিন্ন চরিত্রের বাক্যসম্পূর্ণ পদীর উক্তি হল সংলাপ। চরিত্রের মুখে উচ্চারিত বিভিন্ন ভাবের উক্তি নাট্যসংলাপ। তবে তা পদ্যীয় না অপদ্যীয় তা অবশ্যই নাট্যযুগের উপর নির্ভরশীল। ভরতের মতে নাট্যশাস্ত্রে আর্যভাষা, অতিভাষা, জাতিভাষা, যোন্যন্তরের শ্রেণীর ভাষা রয়েছে। ভাষাদর্শ যতে সে নাট্য আবার স্থান। অ্যারিস্টটলের মতে নাট্যভাষা অলংকারবহুল, ছন্দময়। নাট্যভাষা গদ্যময় ও পদ্যময়-ও হয়। 'মালিনী'-র নাট্যসংলাপের গঠন আধুনিক এবং কাব্যময় উভয়-ই। কবিতার ছন্দে লেখা তাই সংলাপগুলো। আবার নাটক রচনার উদ্দেশ্য থাকলেও দুর্নীতিবাদকে খুঁজে তোলার বা কাব্যময়তাকেই গ্রহণ করেছে। সেটা রাজনীতির প্রবহমান পয়ারে লেখা হয়েছে। আবেগের ভূমিকাও রয়েছে। সংলাপ এ নাটকের কাহিনীর ঐতিহাসিক আবেশ তৈরিতে সাহায্য এনেছে। উৎপ্রেক্ষা, উপমা, সমাসোক্তি অলংকারে, সাধু ক্রিয়াপদে সংস্কৃতানুগতকে মনে করায় 'মালিনী' নাটকের। নিয়তেন্দ্রীর ক্ষতারতির এ নাটকে নেই। ব্রাহ্মণকুল ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে আবদ্ধ, তারা মূলত নিষ্ক্রিয় দর্শক। আর অবশিষ্ট চরিত্রের প্রত্যেকের অধিকার রাজদর্শন বা নির্দিষ্ট অধিকারে বাহিত। নারীর আবেগের ভাষা, প্রেমিকের হৃদয়ের ভাষা, মহাপুরুষের বিদ্রোহের ভাষা, রাজার প্রজাহিত ভাষা—সব মিলেমিশে সৃষ্টি হয়েছে 'মালিনী'-র সকল নাট্যভাষা ও নাট্যসংলাপ।

৩.১৫ ☐ বিষয়বস্তু : 'মালিনী'

দ্বন্দ্বই তো নাটকের প্রাণ। "All drama arises out of conflict. In tragedy there is ever a clash between forces physical or mental or both; in comedy there is ever a conflict, between personalities, between the sexes or between an individual and society." (দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, নাট্যতত্ত্ববিচার, ১৩৯১, পৃষ্ঠা ৮)। এ দ্বন্দ্ব ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সমাজ পরম্পরার যে কোনো স্তরেই হতে পারে। এ নাটকে ধর্মকে কেন্দ্র করে নানা বিরুদ্ধশক্তির সংঘাত ঘটেছে। সাধারণভাবে বলা হয় নবাগত বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে সনাতন হিন্দুধর্মের সংঘর্ষ 'মালিনী'-র পটভূমি। [illegible]

নাটকের ১ম দৃশ্যেই নাটকীয় দ্বন্দ্বটি স্পষ্ট। এ দ্বন্দ্ব ধর্মের সঙ্গে ধর্মের নয়। এ দ্বন্দ্ব সংস্কারের সঙ্গে মুক্তধর্মের। [illegible] কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ নাটক হিন্দু বনাম বৌদ্ধ সংঘাতের কাহিনী নয়। কারণ 'প্রাচীন সাহিত্য'-র ধম্মপদং প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন—"ভগবদ্গীতায় ভারতবর্ষ যেমন আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে, গীতার উপদেষ্টা ভারতের চিত্তকে যেমন এক স্থানে একটি সমন্বয়মূর্তি দান করিয়াছেন, ধম্মপদের ভারতবর্ষের চিত্তের একটি পরিচয় তেমনি স্বচ্ছ হইয়াছে।...ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র দিক হইতে ভারতবর্ষ একই কথা বলিয়াছে।" [illegible]

ধর্মকে মুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা যে ক্ষেমঙ্করের তার এটুকু বিশ্বাস নেই যে ধর্ম তার অন্তরাত্মার শক্তির জোরেই প্রতিষ্ঠা পায়, তা জোর করে চাপানো যায় না। তাই সে শাস্ত্র থেকে শাস্ত্রে নির্ভরশীল হয়েছে। সুপ্রিয়র আত্মোৎসর্গ তাই সহজেই অবলম্বন করেছে মালিনীর কাছে। প্রশংসার এটাই যে মালিনী কখনোই সমর্থ ও ক্ষেমঙ্করের হাতে আত্মসমর্পিত নয়। নিশ্চয়তে শুদ্ধ ও সহযোগশীল থাকেই, সর্বসম্পূর্ণ ধর্মে আস্থাশীল থাকেই মালিনী ক্ষমাধর্মে অবিচল থেকেছে। আসলে এ নাটক ধর্মবোধের পটভূমিকায় মানবজীবনের আদর্শ ও বাস্তবের দ্বন্দ্ব হয়ে উঠেছে কোথাও কোথাও। মানুষের ধর্ম প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন "মানুষের একটা স্বভাবে আসক্ত, অন্য স্বভাবে মুক্তি"।

৩.১৩ ❑ নাট্যপ্রযোজনা : 'মালিনী'

রবীন্দ্রনাটক খুব একটা মঞ্চসফল নয় বা হয়না—ইতিহাস এ কথা বললেও বাংলা রঙ্গমঞ্চ জানে রবীন্দ্রনাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে 'বহুরূপী' নাট্যদল (১৯৪৮) এর ভূমিকার কথা। রবীন্দ্রনাথ এর 'রক্তকরবী', 'ডাকঘর', 'রাজা', 'মুক্তধারা', 'বিসর্জন' প্রভৃতি নাটক বহুরূপী অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চায়ন করেছে। 'মালিনী'-র ১ম অভিনয় হয় ১৯৮৩ সালের ১লা মে Academy of fine arts মঞ্চে। 'বহুরূপী' নাট্যদলের ৩৫তম বর্ষপূর্তি ও রবীন্দ্রনাথের ১২২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে 'মালিনী' মঞ্চস্থ।

সেদিনের সেই প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বহুজনই। তার তালিকা :

❑ 'মালিনী' ❑

নাটক : রবীন্দ্রনাথ

সম্পাদনা ও নির্দেশনা : কুমার রায়

মঞ্চ : সুরেশ দত্ত

আলো : নির্মল ঘোষ

আবহ : ষষ্ঠী সেন

রূপসজ্জা : শক্তি সেন

❑ অভিনয়শিল্পী ❑

কাশ্যপ : কুমার রায়

মালিনী : শিপ্রা দাশগুপ্ত

মহিষী : নমিতা মজুমদার

আলোক : দেবেশ রায়চৌধুরী

মঞ্চ : সৌমিক বসু

গান : অজয় ব্যানার্জী

অভিনয় : আব্দুল মান্নান, সমীর মুখার্জী, সুশান্ত দাস, প্রশান্তকুমার পাল, সুব্রত সেন, শঙ্কর মিত্র, লক্ষ্মীকান্ত সাহা, অমিতাভ মাইতি, পুষ্পল মুখার্জী, সুব্রত গুহ রায়, অমিত হালদার, সঞ্জয় আচার্য্য, সমীর চক্রবর্তী, সুমিত মুখার্জী।

সহচরী : শম্পা ঘোষ, মালবী মজুমদার, মঞ্জুরী রায় সরকার।

❑ বহুরূপী কেন 'মালিনী' নির্বাচন করল নাট্যাভিনয়ের জন্য তার কথামুখ—

বারে বারে এক অদ্ভুত শব্দকটি শোনা যায় এই ভারতভূমিতে। আজও আমাদের এই ভারতবর্ষে আবহমানের মতো ধর্মান্ধতার এক ভয়াবহ বিস্তার দেখতে পাচ্ছি আমরা। ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতার শিকার হচ্ছে মানুষ। সেই মধ্যযুগের অন্ধকার। রবীন্দ্রনাথ 'মালিনী' নাটকে সেই অন্ধকার দূর করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ধর্ম প্রাচীন নয়, ধর্ম আলো—প্রেম প্রীতি। আকাশের আলোকে গায়ের জোর দিয়ে ঠেকানো যায় না। এক চিরন্তনী কথা। 'মালিনী' নাটকে নাট্যকাহিনী যতই এগোয় ততই দেখতে পাওয়া যায় ক্ষেমঙ্করের মতো এক ভয়ঙ্কর 'না' বসে আছে। পুরোহিততন্ত্রে সে সবার্থে বিচলিত হয়ে ওঠে না, মিথিলা মালবকে, বিশ্বাসীকে, বিশ্বাসের আলোকলোকে, বুদ্ধ-বাণী ভরা মন্দিরের অন্ধকারকে প্রবেশ করতে দেবে না। আর কাশীরাজকন্যা মালিনী। তার মধ্যে জেগে ওঠে প্রেম বিশ্বাসী হয়ে মানবলোকে নিবিড় করুণাঘন, মৈত্রীঘন আলোকে গ্রহণ করতে আরম্ভ করছে। ক্ষেমঙ্করের এই অন্ধ-গ্রাম ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিয় সেই বুদ্ধ মন্দিরের আলো আনতে চেয়েছে। নির্ভয়ে বহুজন বলের হানাহানি এড়িয়ে, যেখানে মানব, যেখানে মানবের গেহ—যেখানে পরস্পরের কাছাকাছি পৌঁছে থাকার মতো জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পেতে চেয়েছে। একদিকে মালিনীর সমর্থন আর অন্যদিকে বন্ধু ক্ষেমঙ্করের প্রতি সুপ্রিয়র আবাল্যলালিত আস্থা, বিশ্বাস, নির্ভরতা, একটা টানাপোড়েন, দোলাচল তৈরি করে নাটকের ট্র্যাজিক পরিণতি ঘটিয়েছে। বহুরূপী এ নাটক নির্বাচন করেছে কেননা এ কাহিনী আজকের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন অর্থে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সেই প্রাসঙ্গিকতা অবশ্যম্ভাবে চিনিয়ে দিতে পারলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। চিরদিনকালীন নয়, চিরদিনেরই এ নাটক।

❑ কেন প্রাসঙ্গিক 'মালিনী' নাটক তার উত্তরে কুমার রায়ের বক্তব্য

"ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশে যেখানে নানা জাত, নানা মত, নানা পরিধান, সেখানে ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয়েছে বহু মানুষ যুগে যুগে, আমার মনে হয়, আজও এই মুহূর্তে ভারতবর্ষে সেই সাম্প্রদায়িকতার বীজ প্রতিনিয়ত আমাদের কুরে কুরে খাচ্ছে। এই আবহমানের বিরুদ্ধে মালিনী সময়োপযোগী প্রতিবাদ।"

❑ প্রশ্নাবলী

❑ বিস্তৃত প্রশ্ন

১। রবীন্দ্র নাট্যধারায় 'মালিনী'র অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। মালিনী চরিত্রটি এই নাটকের প্রাণ—আলোচনা করুন।

৩। ক্ষেমংকর ও সুপ্রিয় চরিত্রদুটির তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৪। "কোথা ক্ষেমংকর"—মালিনীর এই উক্তির প্রেক্ষিতে সুপ্রিয়-ক্ষেমংকর-মালিনী চরিত্রের উপসংহারের আলোচনা করুন।

৫। 'মালিনী' নাটকের গঠনকৌশল সম্পর্কে আলোচনা করুন। তা গ্রীক বা শেক্সপীয়রীয়—কোন নাট্যরীতিকে অবলম্বন করেছে?

৬। 'মালিনী' নাটকের উৎস সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

৭। কাব্যনাট্য কাকে বলে? কাব্যনাট্য হিসেবে 'মালিনী' নাটকের সার্থকতা কতখানি তা বিবেচনা করুন।

৮। গ্রীক নাটকের সঙ্গে 'মালিনী' নাটকের কোথায় সাদৃশ্য আছে তা আলোচনা করুন।

৯। ট্র্যাজেডি কী? 'মালিনী' নাটকের ট্র্যাজেডি কি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছে?

১০। 'মালিনী' নাটকের মর্মবস্তু আলোচনা করুন।

❑ অবিস্তৃত প্রশ্ন

১। বিশেষ কোনো ধর্মকে আঘাত করা নাট্যকারের উদ্দেশ্য নয়, ধর্মীয় কেন্দ্রীকরণের বিরুদ্ধেই নাট্যকার সোচ্চার—আলোচনা করুন।

২। বড়ো সহজেই মালিনী জয় করে নিয়েছে বিদ্রোহী ব্রাহ্মণদের—বক্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করুন।

৩। 'অন্তরের দুর্গ চূর্ণ হয়েছে আজ কি কি অভাবনে'?—এই উক্তি দিয়ে ক্ষেমংকরকে কতটা চেনা যায়?

৪। রাজমহিষী স্নেহশীলা এবং আদর্শনিষ্ঠ একজন মা—কর্তব্যবোধ দিয়ে তাঁর ভালোবাসা মেশা—আলোচনা করুন।

৫। রাজকর্তব্য আর পিতৃস্নেহ এই দুটির দ্বন্দ্বে দিশেহারা রাজা হয়েছেন—আলোচনা করুন।

৬। নাট্যকাব্য ও নাট্যসংলাপে 'মালিনী'র সফল দিক আলোচনা করুন।

৭। বহুরূপী নাট্যদল কেন 'মালিনী' প্রযোজনা করেছিল?

❑ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। 'মালিনী' নাটকটির রচনাকাল কবে?

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা কততম নাটক এটি?

৩। মালিনী কোন্ ধর্মের পূজারিণী?

৪। মালিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ব্রাহ্মণদের মধ্যে কারা ছিলেন?
৫। মালিনীর কোন্ শক্তি ব্রাহ্মণরা কামনা করেছিলেন?
৬। "তুমি শুধু নিষ্কলঙ্ক"—কে, কখন বলেছিলেন?
৭। মালিনীকে "লোকললাটিকা" বলার তাৎপর্য কী? "সত্যবেশে ধর্মের কর্মীসেবিকা অনুসার চতুর্দিক্ নতে" কাকে কাকে বলা হয়েছে? কেন?
৮। "সবার অধিক আমি তোমার চরণে বন্দনের মতো"—তাৎপর্য কী?
৯। ক্ষেমঙ্কর কার কাছে "ধর্মের পরীক্ষা" দেবার প্রস্তাব করেছিলেন?
১০। "দীক্ষাগুরু মোর তুমি আজ" কথাটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কী?
১১। "সৌন্দর্যবিপ্লব" কথাটি কবি কোথায় ব্যবহার করেছেন?
১২। 'Sanskrit Buddhist Literature of Nepal' বইটি কে, কবে লেখেন?
১৩। নাট্যকাব্য কাব্যনাট্যের লক্ষণ কী?
১৪। বাংলা কাব্যনাট্যের পরিচয় দাও?
১৫। রবীন্দ্রনাথ মোট কটি কাব্যনাটক লিখেছেন? কি কি?
১৬। Peripeteia কী?
১৭। Hamartia কী?
১৮। বহুমুখী করে 'মালিনী' প্রযোজনা করো?

❑ পাঠসহায়ক গ্রন্থ

- ❑ রবীন্দ্রনাট্যপরিক্রমা—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
- ❑ রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ—প্রমথনাথ বিশী,
- ❑ রবীন্দ্রনাট্যসমীক্ষা—শচীন্দ্রকুমার মজুমদার, বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড
- ❑ রবীন্দ্রনাথের ট্র্যাজেডি—সোমেন্দ্রনাথ বসু, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট
- ❑ বাংলা নাটকের ইতিহাস—অজিতকুমার ঘোষ, জেনারেল প্রিন্টার্স
- ❑ রবীন্দ্রনাথের মালিনী—অপু ভট্টাচার্য, ইন্দিরা বুক এজেন্সি

বাংলা (ষষ্ঠ পত্র)

স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

পর্যায় ঃ ২

একক ৪ ☐ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান'

পর্যায় ২ একক ৪

৪.০ উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা

৪.১ আলোচনা

৪.২ ট্র্যাজেডি বিচার

৪.৩ নামকরণ

৪.৪ নায়কবিচার

৪.৫ সংলাপ

৪.৬ সঙ্গীত

৪.৭ চরিত্র বিচার ঃ সাজাহান, ঔরংজীব, দারা, দিলদার, মোরাদ, সুজা, জয়সিংহ, যশোবন্ত সিং। জাহানারা, নাদিরা, পিয়ারা, মহামায়া।

৪.৮ অনুশীলনী

৪.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৪.০ উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল

বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু নাট্যকারই নন, তিনি কবি ও সঙ্গীতকার রূপেও স্মরণীয়। স্বদেশি আন্দোলনের ভরা জোয়ারের কালে দ্বিজেন্দ্রলাল [১৮৬৩-১৯১৩] সাহিত্য রচনায় অবতীর্ণ হন ও সার্থকতা অর্জন করেন। তাঁর সাহিত্য রচনার বৈশিষ্ট্য হলো মার্জিত মনন, উচ্চাঙ্গের শিল্পচেতনা, বৈদগ্ধ্য, পরিচ্ছন্ন চিন্তা ও উন্নত রুচি। দ্বিজেন্দ্রলাল বেশ কয়েকটি নাটক ও প্রহসন রচয়িতা। দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত নাটকগুলি যথাক্রমে ঃ কল্কিঅবতার (১৮৯৫), বিরহ (১৮৯৭), ত্র্যহস্পর্শ (১৯০০), পাষাণী (১৯০০), প্রায়শ্চিত্ত (১৯০২), তারাবাঈ (১৯০৩), প্রতাপসিংহ (১৯০৫), দুর্গাদাস (১৯০৬), নূরজাহান (১৯০৮), সাজাহান (১৯০৯), চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১), পুনর্জন্ম (১৯১১), পরপারে (১৯১২), আনন্দবিদায় (১৯১২)। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর তিনটি নাটক ভীষ্ম (১৯১৪), সিংহলবিজয় (১৯১৫), বঙ্গনারী (১৯১৬) প্রকাশিত হয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকলার নিম্নোক্ত শ্রেণি বিভাগ করা যেতে পারে ঃ

ক. প্রহসন ঃ কল্কি অবতার, বিরহ, ত্র্যহস্পর্শ, প্রায়শ্চিত্ত, পুনর্জন্ম ও আনন্দবিদায়। [আনন্দবিদায় ব্যতীত অন্যান্য প্রহসনগুলি সুরুচিপূর্ণ ও পরিচ্ছন্ন।]

খ. পুরাণকেন্দ্রিক ঃ পাষাণী, সীতা, ভীষ্ম।

গ. সামাজিক ঃ পরপারে, বঙ্গনারী।

ঘ. ঐতিহাসিক ঃ তারাবাঈ, প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস, নূরজাহান, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, সিংহলবিজয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনরচনার বিষয়বস্তু হলো নানা সামাজিক অসঙ্গতি, সংকীর্ণতা, নারী সমাজের পাশ্চাত্য অনুকরণপ্রিয়তা, প্রেম, বিবাহ-সমস্যা ইত্যাদি। চাতুর্যপূর্ণ সংলাপ, কৌতুককর পরিস্থিতি ও হাসির গান তাঁর প্রহসনের সম্পদ।

দ্বিজেন্দ্রলালের পৌরাণিক নাটকগুলির বৈশিষ্ট্য হলো অলৌকিকতা বর্জন ও ভক্তির দিক অস্বীকার। তবে তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে 'সীতা' বিশেষভাবে সফল নাটক। সামাজিক নাটক 'পরপারে' ও 'বঙ্গনারী' চরিত্রসৃষ্টি, নাট্য পরিস্থিতি ও সংলাপ কোনো দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য নয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলির জন্য। এই শ্রেণির নাটকগুলির ঐতিহাসিক পটভূমিকা, ঘটনাবিন্যাস, চরিত্রসৃষ্টি, ট্র্যাজিক পরিণতি, সংলাপ রচনা, সঙ্গীত প্রয়োগ ইত্যাদি তাঁকে খ্যাতির সুউচ্চ শিখরে নিয়ে গেছে। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকে দেশপ্রেমের প্রচারের সঙ্গে বিশ্বমৈত্রী ও মানবপ্রেমের কথাও আছে।

৪.১ আলোচনা

ঐতিহাসিক নাটক ও সাজাহান ঃ

ঐতিহাসিক উপাদানের সঙ্গে নাটকরূপে সার্থকতা অর্জন করাই ঐতিহাসিক নাটকের বিশেষত্ব। নাটকরূপে ব্যর্থ অথচ ঐতিহাসিক উপাদানের প্রয়োগে সার্থক হলেও তা ঐতিহাসিক নাটক হবে না। 'ইতিহাসের বিশেষ সত্য' ও 'সাহিত্যের নিত্য সত্য' যদি উভয়ই সমানুপাতে রক্ষিত হয় তবেই ঐতিহাসিক নাটক সার্থক হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রবন্ধে ঐতিহাসিক উপন্যাসের রস সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। ইতিহাসের দাবি মেটানোই ঐতিহাসিক নাটকের কাজ নয়; কল্পনাশক্তি না থাকলে ঐতিহাসিক নাটক নীরস তথ্যসর্বস্ব ইতিহাসে পরিণত হতে পারে। আসলে ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাসের রস বিবেচ্য। রবীন্দ্রনাথ 'রাজসিংহ' উপন্যাসের আলোচনায় বলেছেন ঃ "সাধারণ ইতিহাসের একটি গৌরব আছে। কিন্তু স্বতন্ত্র মানবজীবনের মহিমাও তদপেক্ষা ন্যূন নহে। ইতিহাসের উচ্চচূড় রথ চলিয়াছে, বিস্মিত হইয়া দেখ, সমবেত হইয়া মাতিয়া ওঠে, কিন্তু সেই রথ চক্রতলে যদি একটি মানবহৃদয় পিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিয়া মরিয়া যায় তবে তাহার সেই মর্মান্তিক আর্ত ধ্বনিও—রথের চূড়া যে গগনতল স্পর্শ করিতে স্পর্ধা করিতেছে—সেই গগনপথে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; হয়ত সেই রথচূড়া ছাড়াইয়া চলিয়া যায়।" আসলে ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাস ও মানবজীবন উভয়কেই একত্রিত করতে হবে। ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে যুগের আবহ, আচরণ, স্বরূপ, প্রকৃতি ইত্যাদিও চিত্রিত করতে হবে। ঐতিহাসিক নাটক ইতিহাস নয়, নাটক। ইতিহাস বহিরাশ্রয়ী ঘটনাবৃত্তের পরিচয় দেয়; মানুষের অন্তর্জীবনের পরিচয় দেওয়া ইতিহাসের কাজ নয়। ইতিহাসের তথ্য সমাহৃত করে মানবরসের উদ্বোধন ঘটাতে হবে। নাট্যকারের

সৃজনী কল্পনার সাহায্যে ইতিহাসের নীরস তথ্যকে জীবনরসে মণ্ডিত করতে হবে। সার্থক ঐতিহাসিক নাটক রচনা করতে হলে ইতিহাসের স্বরূপ, প্রকৃতি, তার মর্মরহস্য, বিপুল প্রবাহ ইত্যাদিকে অন্তর দিয়ে অনুভব করতে হবে। তা অনুভূতির সত্যে পরিণত হবে। ইতিহাসের বিশেষ সত্যকে সাহিত্যের সত্যে পরিণত করতে হবে। ইতিহাসের রাষ্ট্রবিপ্লবের সঙ্গে মানবজীবনের ভাব, প্রেম, দ্বন্দ্ব ইত্যাদি সমস্তই সমান্তরাল ভাবে অগ্রসর হবে। ঐতিহাসিক রসসঞ্চারের নিপুণতার উপরেই ঐতিহাসিক নাটকের সার্থকতা নির্ভরশীল।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকটি মোগল সাম্রাজ্যের একটি বিশেষ কালপর্বকে কেন্দ্র করে রচিত। এই কালপর্ব হলো সপ্তদশ শতকের পঞ্চম দশক থেকে ষষ্ঠ দশক পর্যন্ত। সাজাহান বৃদ্ধ হলে সিংহাসনকে কেন্দ্র করে পুত্রদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। কূটকৌশলে, ধূর্ততায় ও নৃশংসতার ঔরংজীব দারা, সুজা, মোরাদকে পরাজিত বা হত্যা করে সাজাহানকে বন্দি করে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। ক্ষমতালোভী ঔরংজীব পিতা সাজাহানকে অন্তরীণ করে প্রতিকূল শক্তিকে উৎপাটিত করেন এবং সততার আবরণে নিজেকে আবৃত করে দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইতিহাসের এই বিষয়কে কেন্দ্র করে 'সাজাহান' নাটকটি রচিত; ঘটনাবিন্যাসে ও চরিত্রচিত্রণে এখানে ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষিত হয়েছে।

'সাজাহান' নাটকের ঐতিহাসিক উপাদানের উৎস ঃ যদুনাথ সরকারের HISTORY OF AURANGZIB (VOL. I), A SHORT HISTORY OF AURANGZIB, ডাচ রিপোর্ট, ফেব্রুয়ারি ১৬৬১, ANNALS AND ANTIQUITIES OF RAJASTHAN. (VOL. II), নিকোলাই মানুচির বিবরণ, যদুনাথ সরকারের History of Bengal, এবং STUDIES IN AURANGZIB'S REIGN গ্রন্থ।

সুজার বঙ্গদেশে বিদ্রোহ, গুজরাটে সম্রাটরূপে মোরাদের ঘোষণা, দাক্ষিণাত্য থেকে ঔরংজীবের যোগদান ইত্যাদি ঘটনা ইতিহাস সমর্থিত।ষ আলোচন্য নাটকের ১/২, ১/৭, ২/৩, ৩/১, ৩/৩, প্রভৃতি অঙ্ক ও দৃশ্যে যে সমস্ত ঘটনা, ঘটনার ইঙ্গিত বা পরিণাম আছে তা সমস্তই ইতিহাস সমর্থিত। ধর্মাটের যুদ্ধে যশোবন্ত সিংহের পরাজয়, শামুগড়ের যুদ্ধে দারার পশ্চাদ্ধাবন, আমেদাবাদের শাসনকর্তাকর্তৃক দারাকে আশ্রয়দান ইত্যাদি ঘটনারও সমর্থন ইতিহাসে মেলে। তবে দিলার খাঁ সোলেমানের অনুরোধে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন কিনা তা ঠিকমত জানা যায় না। জয়সিংহ ও যশোবন্ত সিংহের ভূমিকা যে যথাযথ সে বিষয়ে সংশয় নেই।

নাটকের কাহিনি ব্যতীত চরিত্রাঙ্কনের দিকে নজর দিলে দেখা যায়, সেখানেও ইতিহাস যথাযথভাবে অনুসৃত হয়েছে। 'সাজাহান' নাটকে দারা পিতৃভক্ত পুত্র, সন্তানবৎসল পিতা ও পত্নীপ্রেমী স্বামীরূপে যেভাবে চিত্রিত তা ইতিহাস সমর্থিত সূজার সঙ্গীতপ্রিয়তা ও লঘুচিত্ততা ইতিহাসবিরোধী নয়; তবে পিয়ারা চরিত্রটি নাট্যকারের কল্পনাপ্রসূত। মোরাদের সঙ্গে ঔরংজীবের চুক্তি ইতিহাসসম্মত। নাটকে নারীচরিত্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য জাহানারা তাঁর ব্যক্তিত্ব ও তেজস্বিতার জন্য ইতিহাসে স্মরণীয়। দিলদার চরিত্রের উপস্থাপনা নাট্যকারের নিজস্ব কল্পনাপ্রসূত। এই চরিত্রের পটভূমিকায় সামান্যতম ঐতিহাসিকতা ছিল কিনা তা বিতর্কিত। নাটকে যে নিয়ামৎ কাঁ হাজীকে এশিয়ার সুপণ্ডিত ও বিজ্ঞতম সুধী বলা হয়েছে সেজাতীয় নাম ইতিহাসে অনুপস্থিত; তবে ইতিহাসে দানিশমন্দ খাঁ নামটি পাওয়া যায়।

'সাজাহান' নাটকে ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রচিত্রণে ঐতিহাসিকতা অনুসৃত হয়েছে। নাট্যকার কোথাও ইতিহাসকে অতিক্রম না করলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে দারা নাদিরার দাম্পত্যজীবন, সুজা-পিয়ারার দাম্পত্য অন্তরঙ্গতা, পিতা সাজাহান ও কন্যা জাহানারার পারিবারিক বন্দিদশা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সাজাহানের স্নেহদুর্বলতা, পুত্রদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, নানা উন্মত্ততা, শেষ পর্যন্ত ভ্রাতৃঘাতক ঔরংজীবকে ক্ষমা প্রদর্শন ইত্যাদি নাট্যকার ইতিহাসের ইঙ্গিতেই লিপিবদ্ধ করেছেন। ইতিহাসাশ্রয়ী নাটকের অন্যতম উদ্দেশ্য মানবহৃদয়ের অন্তর্বিরোধ প্রদর্শন এবং এ ব্যাপারে নাট্যকারের দক্ষতা অতুলনীয়। ইতিহাসের তথ্যের সাহায্যে ইতিহাসের অন্তর্নিহিত সত্যটিকে নাট্যায়িত করার ব্যাপারে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন দ্বিজেন্দ্রলাল। ইতিহাসের সামগ্রিক চিত্র এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। সমস্ত মিলিয়ে 'সাজাহান' একটি সার্থক ঐতিহাসিক নাটকরূপে স্মরণীয়।

৪.২ ট্র্যাজেডি বিচার

পাশ্চাত্য সাহিত্যে অ্যারিস্ততল ট্র্যাজেডির যে সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছিলেন তার সঙ্গে আধুনিক কালের ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্যে ট্র্যাজেডির দুজাতীয় শ্রেণিভেদ লক্ষ্যগোচর—গ্রীক ট্র্যাজেডি ও শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডি। গ্রীক ট্র্যাজেডিতে নিয়তি মানবচরিত্রের নিয়ন্তা; কিন্তু শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডিতে মানুষের চরিত্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও ভুলভ্রান্তি তার জীবনকে ট্র্যাজিক পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। মানুষের চরিত্রের মধ্যে তার পতনের বীজ আত্মগোপন করে থাকে। পূর্বতন ট্র্যাজেডিতে মৃত্যুদৃশ্যের অবতারণা থাকলেও আধুনিক কালে ট্র্যাজেডিতে মৃত্যুদৃশ্যের অবতারণা অপরিহার্য নয়। অ্যারিস্ততল মনে করতেন, করুণা ও ভয় জাগ্রত করাই ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য। কিন্তু একালের নাট্যতত্ত্ববিদ্ নিকল মনে করেন, বিস্ময়বিমূঢ়তার আবেগ জাগানোই ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য। ট্র্যাজেডির নায়কের পতন হয় তার চরিত্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা থেকে। নায়ক চরিত্রের প্রচ্ছন্ন দুর্বলতার পথ ধরে জীবনে শনি প্রবেশ করে এবং তার পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

উল্লিখিত আলোচনার পটভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকের ট্র্যাজেডি বিচার করতে গেলে প্রশ্ন ওঠে—ট্র্যাজেডি কার, ট্র্যাজেডি কেন এবং কী ধরনের ট্র্যাজেডি অর্থাৎ তা ঘটনাগত না চরিত্রগত। কেউ কেউ মনে করেছেন, দারার মৃত্যুই সাজাহান নাটকের চরম ট্র্যাজেডি, চূড়ান্ত ঘটনা। দারার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নাটক শেষ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এ মত গ্রাহ্য হতে পারে না। কেননা, যাঁর ভাগ্যবিপর্যয়ের সঙ্গে নাটকের মূল ঘটনাবর্ত গ্রথিত তিনি সাজাহান, দারা নন। দারার বিপর্যয় নাটকের নানা বিপর্যয়ের অন্যতম; কিন্তু সাজাহানের জীবনে বহু বিপর্যয় ঘটেছে। দারার মৃত্যু সাজাহানের জীবনের বহু বিপর্যয়ের একটি; কেননা, দারার মৃত্যুতে স্নেহপ্রবণ সাজাহান মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে অর্ধোন্মাদে পরিণত হয়েছেন। দারা যদি ট্র্যাজেডির লক্ষ্য হতেন তাহলে নাট্যকার সাজাহান চরিত্রের বিকার দেখাতেন না। পঞ্চমাঙ্কে সাজাহানের অন্তর্জীবনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও তার পরিণতি সাজাহান চরিত্রকে যে ট্র্যাজিক মর্যাদা দিয়েছে, দারার চরিত্রে অন্তর্দাহের সে তীব্রতা

নেই। সুকুমার সেন মনে করেন ঃ 'ট্র্যাজেডির দিক দিয়াও সাজাহান নামকরণের সার্থকতা খুব আছে বলিয়া মনে হয় না। সাজাহানের ভূমিকা নিষ্ক্রিয় সাক্ষীর ভূমিকা। ..... নাটকটির নাম জাহানারা হইলেই বোধ হয় ঠিক হইত।" কিন্তু একথা মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, জাহানারা চরিত্রের 'ডুয়িং এ্যান্ড সাফারিং'-কে ঘিরে নাটকটি রচিত নয়। জাহানারা বলিষ্ঠ চরিত্র হলেও ট্র্যাজেডি সৃষ্টিতে তাঁর বিশেষ কোনো ভূমিকা নেই। অতএব জাহানারা ট্র্যাজেডির কেন্দ্রীয় চরিত্র নন।

আবার নাট্য সমালোচক অজিতকুমার ঘোষের মতে ঃ "প্রকৃতপক্ষে যিনি কাহিনির মধ্যস্থলে বিরাজ করিয়া সমস্ত চরিত্রকে নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন তিনি ঔরংজীব। ..... ঔরংজীবের কুটিল নিষ্ঠুর চক্রান্ত ..... অন্যান্য চরিত্রগুলিকে পাকে পাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। তাহারা যেন নিরুদ্ধ হাহাকারে জীবন সাঙ্গ করিয়াছে।" ঔরংজীব সক্রিয় চরিত্র, বহু চরিত্রের বিপর্যয়ের জন্য দায়ী ঔরংজীব, তিনি দ্বন্দ্বহীন নন—এ সমস্ত কথা স্বীকার করেও বলা যায় যে, সার্থক ট্র্যাজেডির নায়কের পক্ষে যতখানি অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিবেকের দংশন থাকা উচিত, ঔরংজীবের তা নেই। আসলে ট্র্যাজেডি ঘটেছে সাজাহান চরিত্রে। সাজাহান যেন শেক্সপীয়রের কিং লিয়রের মত ট্র্যাজেডি অব সাফারিংস-এর প্রতীক। সাজাহান বাইরের দিক থেকে সক্রিয় না হলেও তাঁর চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের অভাব ঘটে নি। তাঁর স্নেহাতিশয্যের দুর্বলতার পথে ট্র্যাজেডি গভীরতর হয়েছে। দুঃখভোগের চিত্রবর্ণনাই ট্র্যাজেডি নয়। চরিত্রের কোন দুর্বলতার ছিদ্রপথে সেই দুঃখ এলো তা জানতে হবে। পিতা সাজাহান স্নেহাতিশয্যের জন্য পুত্র ঔরংজীবের প্রতি কঠোর হতে পারেন নি। এই দুর্বলতার পথ ধরেই সাজাহানের জীবনে ট্র্যাজিক পরিণতি নেমে এসেছে। ঘটনার বহিরঙ্গ সংঘাতে তীব্র মানসিক দ্বন্দ্বের দিকটি সাজাহান চরিত্রে সংলক্ষ্য। সাজাহান আদৌ নিষ্ক্রিয় চরিত্র নন। নাটকের সমাপ্তিতে সাজাহানের মৃত্যু ঘটেনি; ক্ষমাপ্রার্থীত্র ঔরংজীবকে ক্ষমা করে নাটক সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু তার জন্য সাজাহানের ট্র্যাজিক ব্যঞ্জনা ক্ষুন্ন হয় নি; সম্রাটসত্তা ও পিতৃসত্তার দ্বন্দ্বে দ্বিধাবিভক্ত সাজাহান। একদিকে দারা, সুজা ও মোরাদের পিতারূপে পুত্রবেদনায় অধীর; অন্যদিকে পুত্রঘাতী পুত্র ঔরংজীবের জন্য পিতৃহৃদয়ের অপার ক্ষমতা—এই হলো সাজাহানের বিভক্ত আত্মার আত্মক্ষয়কারী চিত্র।

সুতরাং দেখা গেল, সাজাহানের ট্র্যাজেডিকে কেন্দ্র করে নাটকটি গড়ে উঠেছে। সাজাহানের মত ট্র্যাজিক নায়কের বিরাটত্ব ও মহনীয়তা আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে। তাঁর পতনে ও বিপর্যয়ে পাঠক/দর্শক ভয়চকিত বিহবলতায় অভিভূত হয়ে পড়ে। সাজাহানের বিপর্যয় তাঁর চারিত্রিক মহিমা বা গৌরবকে ম্লান করে না। সাজাহান নাটক শুধু সার্থক ট্র্যাজেডি নয়, সাজাহান চরিত্রটিও ট্র্যাজিক নায়কের উপযোগী। 'সাজাহান' নাটকের ট্র্যাজেডি দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যতম কীর্তি।

৪.৩ নামকরণ

সৃজনশীল সাহিত্যবস্তুর নামকরণ কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিনিয়মের বাঁধা পথে চলে না। সাধারণভাবে রচনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য নামকরণের মাধ্যমে প্রকটিত হয়। নামকরণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক, ঘটনাকেন্দ্রিক, ব্যঞ্জনাকেন্দ্রিকও হতে

পারে। তবে শিল্পী নামকরণের ক্ষেত্রে মূলত ব্যঞ্জনাধর্মিতার প্রতি দৃষ্টিপ্রদান করেন।

'সাজাহান' নাটকের নামকরণ প্রসঙ্গে সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। একদল মনে করেন, 'সাজাহান' নাটকের নামকরণ যথার্থ; নাট্যকারের মূল বক্তব্য আলোচ্য নামের মাধ্যমে সার্থকতা লাভ করেছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন 'সাজাহান' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র ঔরংজীব; অতএব তার নামেই নামকরণ হওয়া উচিত ছিল। আবার অনেকে মনে করেন, জাহানারা আলোচ্য নাটকের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও সক্রিয় চরিত্র বলে নাটকের নামকরণ হওয়া উচিত ছিল জাহানারার নামে। সুতরাং প্রত্যেকটি মত বিচার বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

'সাজাহান' নাটকের প্রধান চরিত্র কোনটি তা বিচারের উপর নাটকের নামকরণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ যথাযথ হবে। মনে রাখতে হবে, কেবল কতকগুলি দৃশ্যের উপস্থাপনাকেই নাটক বলে না। দৃশ্যগুলি সংলগ্নভাবে রচিত হবে এবং তার মধ্য দিয়ে. নাট্যকারের বিশেষ বক্তব্য উপস্থিত হবে। বিভিন্ন চরিত্র ও দৃশ্যাদির সমাবেশে নাট্যকার তাঁর বক্তব্যকে ফুটিয়ে তোলেন। ঘাত-সংঘাতের মাধ্যমেই নাটকের বক্তব্য উপস্থাপিত হয়। দুই বিপরীত শক্তির একদিকে থাকে নাট্যকারের বক্তব্য উপস্থাপনার মাধ্যম বিশেষ চরিত্রটি ও তাকে পরিস্ফুট করার জন্য পার্শ্ব চরিত্র ও ঘটনাবলী। অন্যদিকে থাকে সেই চরিত্রটি যে বিরোধিতার মাধ্যমে নাট্যকারের বক্তব্য প্রকাশের বাহন। প্রথম ক্ষেত্রের প্রধান চরিত্র নায়কূরপে পরিগণিত হন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রের উল্লিখিত চরিত্রকে প্রতিনায়ক বলা হয়। কোনো চরিত্র যদি তার সক্রিয়তার দ্বারা ও বুদ্ধি কৌশলে নাটকে প্রাধান্য বিস্তার করে তবে তাকে কেন্দ্রীয় চরিত্র বা নায়ক বলা যাবে না। এমনকি নাট্যকারের বক্তব্য প্রকাশে সহায়ক হলেও নাটকের প্রকৃতি বিচারে মুখ্য বা কেন্দ্রীয় চরিত্র হতে পারে না।

'সাজাহান' নাটকের বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে সাজাহানের জীবনের শেষ আট বছরের কাহিনিকে কেন্দ্র করে। এই আটটি বছর পারিবারিক ও ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের কলঙ্কিত অধ্যায়। একদিকে দারা, অন্যদিকে সুজা, মোরাদ ও ঔরংজীব আপনাপন স্বার্থ ও হানাহানিতে মগ্ন। কিন্তু সাজাহানের কাছে সকল পুত্রই সমান স্নেহাস্পদ। দারাকে বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঠালেও পিতা সাজাহানের হৃদয় হাহাকার করে উঠেছে। আবার জাহানারাকে ভ্রাতৃবিরোধে না জড়াতে অনুরোধ করেছেন। সুতারং 'সাজাহান' নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হলো সাজাহানের সম্রাটসত্তা ও পিতৃসত্তার দ্বন্দ্ব। পরিণতিতে সাজাহানের সম্রাটসত্তা পরাজিত হয়েছে ও পিতৃসত্তা জয়লাভ করেছে। 'সাজাহান' নাটকের মূল বক্তব্যও তাই। সাজাহান বহিরঙ্গ আচরণে ঔরংজীবের মতো ক্রিয়াশীল না হলেও নাট্যকারের বক্তব্য প্রকাশে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং সাজাহানই আলোচ্য নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র অতএব সাজাহানের নামে নাটকের নামকরণ সঙ্গত ও সার্থক হয়েছে। 'সাজাহান' নাটকের দৃশ্যযোজনা, উপস্থাপনা ও আঙ্গিকগত কৌশল উক্ত বক্তব্যের পক্ষে রায় দেয়। সুতরাং দারা, ঔরংজীব অথবা জাহানারা কেন্দ্রিক নামকরণ সঙ্গত হতো না। সাজাহানের নামে নাটকটির নামকরণ সঙ্গত ও সার্থক হয়েছে।

৪.৪ নায়কবিচার

নাটকের ঘটনা ও পরিণতি যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাকেই নায়ক বা কেন্দ্রীয় চরিত্র বলা হয়। 'সাজাহান'

নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন, ঔরংজীব কেন্দ্রীয় চরিত্র; আবার কারোর মতে, জাহানারা চরিত্রের সক্রিয়তা অনেক বেশি। ঔরংজীব চরিত্রকে যাঁরা কেন্দ্রীয় চরিত্রের মর্যাদা প্রদান করতে চান তাঁরা বলেন, 'ঔরংজীবই কাহিনির মধ্যস্থলে বিরাজ করিয়া সমস্ত চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মিত করিয়াছেন।'

'সাজাহান' নাটকটি যদি ট্র্যাজেডি হয় এবং ঔরংজীব যদি নায়ক হন তাহলে ঔরংজীবের ট্র্যাজেডি প্রদর্শন নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কিন্তু ট্র্যাজেডির নায়ক হতে গেলে যেসব বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার, ঔরংজীব চরিত্রে সেগুলি কতখানি প্রকাশিত হয়েছে সে সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া দরকার। ঔরংজীবের কূটবুদ্ধির বার বার জয়লাভ এবং শেষ পর্যন্ত সাজাহানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা দর্শকচিত্তে তাঁর প্রতি কোনো করুণা বা সহানুভূতি জাগ্রত করে কিনা সে বিষয়ে সংশয় আছে। ট্র্যাজেডি নায়কের বিভিন্ন প্রকার সদগুণের সঙ্গে একটি দুর্বলতার ছিদ্র থাকে যার ভিতর দিয়ে বিপর্যয় নেমে আসে। ঔরংজীব নিজের সিংহাসন নিষ্কণ্টক করার জন্য একে একে ভ্রাতৃহত্যা করেছেন, পিতাকে কারারুদ্ধ করেছেন। এমনকি নিজের পুত্রকেও ঔরংজীব বিশ্বাস করতে পারেন নি। তাঁর কার্যকলাপ দর্শকচিত্তে সহানুভূতি জাগাতে পারে নি; আবার ঔরংজীবের জীবনে এমন কিছু বিপর্যয় ঘটে নি যা পাঠক-দর্শকচিত্তে করুণা জাগ্রত করতে পারে। অতএব ঔরংজীবকে নায়কের মর্যাদা প্রদান করা যায় না।

ঔরংজীব বাইরের দিক থেকে নাটকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করলেও, নাট্যকার 'সাজাহান' নাটকে যে বক্তব্য রাখতে চেয়েছেন তা সাজাহান কেন্দ্রিক। সাজাহানের পিতৃসত্তা ও সম্রাটসত্তার দ্বন্দ্বই এ নাটকের মুখ্য বিষয়। পিতা সাজাহান ও সম্রাট সাজাহানের অন্তর্দ্বন্দ্ব, পুত্রদের প্রতি স্নেহাতিশয্য সাজাহানের জীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছে। তাঁর স্বকৃত ভুলের জন্যই নাটক ট্র্যাজেডির পথে ক্রমাগ্রসরমান। দারাকে অন্যান্য পুত্রদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঠিয়ে সম্রাট সাজাহান তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন সত্য, কিন্তু পিতা সাজাহান ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে ইন্ধন যুগিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন এবং দর্শকদের চিত্তে সহানুভূতি জাগিয়েছেন। সাজাহানের বন্দিদশার কারণ স্নেহাতিশয্য; পুত্রদের মৃত্যুজনিত শোকের আঘাতও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। কাহিনিতে বারবার সাজাহানকে অবলম্ভবন করেই নাটকের সূচনা, বিকাশ ও পরিণতি। ঔরংজীবের জয়লাভ, বিবেকের দংশন বা মার্জনা ভিক্ষা কোনটা দেখানোই নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল না। নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য সাজাহানের অন্তর্দ্বন্দ্বে ও ট্র্যাজিক পরিণতি প্রদর্শন। পিতা সাজাহান ও সম্রাট সাজাহানের দ্বন্দ্ব এবং তাঁর বিকাশ ও পরিণতিকে কেন্দ্র করে নাটকটি গড়ে উঠেছে। তাঁর ভাগ্যবিপর্যয়, এক পুত্রের অকৃতজ্ঞতা, অন্যপুত্রদের মৃত্যু—একের পর এক আঘাতে বিপর্যস্ত সাজাহান শেষ পর্যন্ত ট্র্যাজেডির এক নায়ক। বৃদ্ধ সাজাহানের আট বছরের করুণ ট্র্যাজিক জীবন চিত্রিত করাই 'সাজাহান' নাটকের লক্ষ্য বলে সাজাহানকেই কেন্দ্রীয় চরিত্র বলতে হবে।

ট্রাজেডির নায়ককে সব সময় যে বহিরঙ্গভাবে সক্রিয় থাকতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। সাজাহানের সংগ্রাম বিদ্রোহী পুত্রদের বিরুদ্ধে ততটা নয়, যতটা নিজের দুটি সত্তার মধ্যে। তাই সাজাহানের চিন্তায় আত্মরক্ষাপেক্ষা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব! তাঁর সমস্যা হলো—যে পক্ষেরই পরাজয় হোক্ না কেন তাতে তাঁরই ক্ষতি। তাঁর জীবনের পরিণতি হলো সন্তানদের ম্লান মুখ দেখা। দারা, সুজা, মুরাদ এবং ঔরংজীব সকলেরই অন্তিম পরিণতির সর্বশেষ আঘাত বহন করতে হয়েছে সাজাহানকে। ফলত, সাজাহানই আলোচ্য

নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র।

৪.৫ সংলাপ

সংলাপ নাটকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং সংলাপ ব্যতীত নাটক গড়ে উঠতে পারে না। কাহিনির অগ্রগতি, চরিত্রের বিকাশ ইত্যাদি সমস্ত কিছুর দায়িত্ব সংলাপকে বহন করতে হয়। সংলাপের সাহায্যে নাটকের পটভূমি যেমন আলোকিত হয়, তেমনি নাটকের সামগ্রিক বক্তব্যও সংলাপের মাধ্যমে রূপায়িত হয়। সংলাপ ব্যতীত নাটকের হয়ে ওঠা সম্ভব নয়।

বাংলা নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের সংলাপ কাব্যধর্মী। বহিরঙ্গে তাঁর সংলাপ গদ্যবাহিত হলেও অন্তরঙ্গে তা কাব্যমণ্ডিত। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রায় অধিকাংশ নাটকের সংলাপ তাঁর কবিধর্মের দ্বারা চলিত। সংলাপ যদি অধিক পরিমাণে কাব্যধর্মী হয়, তাহলে সেখানে নাটকীয়তা হারিয়ে যায়। যেমন, তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে সোলেমনের সংলাপ—"সুন্দর এই দেশ! যেন একটা কুসুমিত সঙ্গীত, একটা চিত্রিত স্বপ্ন, একটা অলস সৌন্দর্য।" আবার কাশ্মীরি নর্তকীদের কাছে সোলেমানের উক্তি যেন নৈতিক বক্তৃতার ন্যায়—"তোমরা ভালোবাসো কিংখাবের পাগড়ি, হীরার আংটি, কর্পেটের জুতো, হাতির দাঁতের ছড়ি।" দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকের অনেক চরিত্রই এমন কাব্যধর্মী সংলাপ ব্যবহার করেছেন যে, নাটকীয়ত্ব অনেক পরিমাণে রক্ষিত হয় নি। আবার বিপরীত দিকে পঞ্চমাঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে ঝটিকাবিদ্যুৎময় রাত্রে আগ্রা দুর্গে বন্দি সাজাহানের সংলাপ অন্তর্জীবনের দ্বন্দ্বমথিত, নাটকীয় সার্থকতা-মণ্ডিত—"ইচ্ছে কর্চ্ছে জাহানারা, যে এই রাত্রির ঝড়বৃষ্টি অন্ধকারের মাঝখান দিয়ে ছুটে বেরোই। ইচ্ছে কর্চ্ছে যে আমার বুকখানা খুলে বজ্রের সম্মুখে পেতে দিই।"

'সাজাহান' নাটকের গদ্যসংলাপ বক্তৃতাধর্মী ও অলংকারধর্মী! সংলাপের কারণে নাটকের অনেক চরিত্রই ব্যর্থ হয়েছে এমন বলা চলে। পঞ্চমাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে পিয়ারার সংলাপ এতই কাব্যধর্মী যে তাকে নাটকের সংলাপস্বরূপ গ্রহণ করতে সংশয় হয়—"আজ তবে এইরূপ নির্বাণোন্মুখ শিখার মত উজ্জ্বলতম প্রভায় জ্বলে উঠুক; এই গান তারস্বরে আকাশে উঠে নক্ষত্ররাজ্য লুটে নিক"। সাজাহান, ঔরংজীব, জাহানারা, পিয়ারা, দিলদার, মোরাদ প্রমুখ চরিত্রের সংলাপে অভিশাপের ভয়াবহতা, মর্মান্তিক চিত্তবিক্ষোভ, যৌবনস্বপ্নের হৃদয়াবেগ ইত্যাদি প্রকাশিত। আলোচ্য নাটকের স্বগতোক্তি চরিত্রগুলির মনোজগতের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে অদ্বিতীয়। ঔরংজীবের নির্জন স্বগতোক্তি এক শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। যেমন—"আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ঝড় উঠছে, একটা নদী পার হয়েছি; এ আর এক নদী ভীষণ কল্লোলিত, তরঙ্গসংকুল"। আলোচ্য স্বগতোক্তিতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশের মেঘাচ্ছন্নতা, ঝড়ের সংকেতবাহিতা যেন প্রকাশিত। ঔরংজীবের বিচক্ষণতা, ব্যক্তিত্ব, জটিলতা, ষড়যন্ত্র, হৃদয়হীনতা, ক্ষমতার জন্য লোভ, কূটকৌশল ইত্যাদি সমস্তই তাঁর সংলাপে প্রকাশিত। একাকিত্ব, নিঃসঙ্গতা, আত্মশক্তির উপর আস্থা ইত্যাদিও তাঁর সংলাপে অনুপস্থিত নয়। ঔরংজীবের একান্ত ভাষণ বা স্বগতভাষণ একান্তভাবে স্মরণীয়—"ঔরংজীব! এবার তোমার উত্থান না পতন? পতন? অসম্ভব; উত্থান? কিন্তু কি উপায়ে?" ঔরংজীব তাঁর কৃতকর্মের জন্য, স্বজনদ্রোহিতার জন্য, ভ্রাতৃহত্যার জন্য বিন্দুমাত্র বিবেকদংশন অনুভব করেন না। তাঁর একান্ত ভাষণে মনে হয় ভাগ্যবিধাতা বোধ হয় তাঁকে দিয়ে এই কাজ করিয়ে নিচ্ছেন—"আমার

হাত ধরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ খোদা, আমি এ সিংহাসন চাইনি, তুমিই আমায় হাত ধরে এ সিংহাসনে বসালে! কেন?—তুমিই জান"। ঔরংজীব তাঁর আবেগপূর্ণ সংলাপের ভাষা সভাসদদের অভিভূত করেন। তাঁর সংলাপে কপট ধর্মধ্বজী, নৃশংস, ধূর্ত, ছলনাময় রূপ প্রকাশিত—"আপনারা নিজেদের দিকে চেয়ে বলুন যে পীড়ন চান না শাসন চান? বলুন, আমি আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাসনদণ্ড গ্রহণ কর্তে পার্ব না। আর আপনাদের ইচ্ছাক্রমেও এখানে দাঁড়িয়ে দারার উশৃঙ্খল অত্যাচার দেখতে পার্বন না"।

নাটকে জাহানারা ব্যক্তিত্বময়ী রমণীরূপে অঙ্কিত। নাটকে তিনিই একমাত্র ঔরংজীবের প্রতিস্পর্ধিনী চরিত্র। তাঁর সংলাপ ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি, স্পষ্টবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি প্রকাশিত। জাহানারার কয়েকটি সংলাপের উদ্ধৃতি এই বক্তব্যের পক্ষে রায় দেয়। যেমন—১. "দলিত ভুজঙ্গের মত ফণা বিস্তার করে উঠুন। হৃতশাবক ব্যাঘ্রীর মত প্রমত্ত বিক্রমে গর্জে উঠুন"। ২. "আজ যে অন্যায়-নীতির মহাবিপ্লব, যে দুর্বিষহ অত্যাচার ভারতবর্ষের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়ে যাচ্ছে, তা এর পূর্বে বুঝি কুত্রাপি হয় নাই"। দারার সংলাপে পরধর্মসহিষ্ণুতা, সুফীদর্শনের প্রতি অনুরক্তি, মহত্ত্ব, উদারতা, দার্শনিকতা, মানবতা ইত্যাদি প্রকাশিত। দিলদারের সংলাপ আপাতদৃষ্টিতে হাস্যকর ও কৌতুকমণ্ডিত মনে হলেও তাঁর সংলাপের পটভূমিকায় আছে জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা বিষয়ে অভিজ্ঞতা। দিলদারের সংলাপ পরিহাসতরল, অসংলগ্ন মনে হলেও তাঁর সংলাপেই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দর্শক-পঠকের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। যেমন—"চিনবেন কেমন করে জাঁহাপনা! আপনার সাধ্যের রাজ্যেই বাস। আপনি দেখে আসছেন শুধু জোচ্চোরি, খোসামুদি, নেমকহারামি"।

পিয়ারার সংলাপে তাঁর সুখী, শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন, পরিতৃপ্ত জীবনের রূপ প্রকাশিত। মাঝে মাঝে সংলাপে লঘু চপলতা থাকলেও সমস্ত অতিক্রম করে তাঁর দাম্পত্য জীবনের কবিত্বময় প্রবণতা সংলাপে প্রকাশিত। যেমন—"এই পূর্ণ জ্যোৎস্নালোকে তোমার মনকে স্নান করিয়ে নাও। তোমার বাসনা পুষ্পগুলিকে প্রেমানন্দে মাখিয়ে নাও"। এই জাতীয় সংলাপ মাঝে মাঝে কৃত্রিম বলে মনে হয়। মহামারা চরিত্রের সংলাপে তাঁর আদর্শপ্রেমের তত্ত্ব, দৃপ্ত, তেজস্বিতা, ক্ষাত্রগর্ব, রাজপুতনীতি ইত্যাদি প্রকাশিত হলেও, মাঝে মাঝে সংলাপে যেন সাজানো বাক্যের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

'সাজাহান' নাটকের সংলাপে নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও, কাব্যধর্মিতার প্রকাশ ঘটলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছে। 'সাজাহান' নাটকের সংলাপ বিষয়ানুগ ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত। এ জাতীয় সংলাপ নাটকীয়ত্ব প্রকাশে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাধা হলেও, 'সাজাহান' নাটকের সংলাপ যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী ও সার্থক।

৪.৬ সঙ্গীত

সঙ্গীত নাটকের অন্যতম উপাদান এবং বহু প্রাচীনকাল থেকেই নাটকে সঙ্গীতের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তবে গানের আধিক্য ঘটলে নাটকের রসগ্রহণে বাধার সৃষ্টি হতে পারে। বাংলাদেশে যাত্রা-র যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সঙ্গীত প্রযুক্ত হয়েছে মূলত দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য। নাটকের একঘেয়েমির মধ্যে নতুনত্ব সঞ্চারের জন্য, গম্ভীর বিষয়ের মধ্যে লঘুতা সঞ্চারের জন্য, দর্শকদের আনন্দ বিতরণের জন্য নাটকে সঙ্গীতের প্রয়োগ ঘটে।

দ্বিজেন্দ্রলাল এই সমস্ত দিকের প্রতি লক্ষ রেখে 'সাজাহান' নাটকে সঙ্গীত যোজনা করেছেন। তাঁর সঙ্গীতগুলি কাব্যগুণান্বিত, গীতিরসেপূর্ণ। 'সাজাহান' নাটকে মোট ন'টি সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তার মধ্যে দ্বিজেন্দ্র-গীতি সাতটি এবং চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের একটি করে মোট দুটি বৈষ্ণবগীতি। এই ন'টি গানের মধ্যে সুজা পত্নী পিয়ারা পাঁচটি গান গেয়েছে। মোরাদের নর্তকী ও কাশ্মীরের নর্তকীরা দু'টি গান গেয়েছে। বাকি দু'টি গান গেয়েছে মহামায়ার চারণ বালক ও চারণী সহযোগীরা। বিষয়বস্তু অনুযায়ী 'সাজাহান' নাটকে প্রযুক্ত সঙ্গীত তিনটি ভাগে বিন্যস্ত হতে পারে ঃ—(১) পিয়ারার সঙ্গীতগুলি প্রেমমূলক। (২) যোধপুরের চারণ-চারণীদের সঙ্গীতগুলি জাতীয় প্রেরণাময়। (৩) বৈষ্ণবগীতি।

'সাজাহান' নাটকের প্রথম সঙ্গীতটি পেয়েছে সুজা পত্নী ও সহ্গীতে পারদর্শিনী পিয়ারা—'এ জীবনে পুরিল না সাধ ভালবাসি'। সঙ্গীতটি প্রথমাঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে সংযোজিত হয়েছে। মুজা-পিয়ারার দাম্পত্য প্রেমের করুণ মধুর সুর এখানে ধ্বনিত। পিয়ারা প্রকৃতি-প্রেমিক, সঙ্গীত বিভোর; আলোচ্য সঙ্গীত জীবনের ঋণত্বের বেদনা প্রকাশিত।—'এ ক্ষুদ্র জীবন মোর, এ ক্ষুদ্র ভুবন মোর/হেথা কী দিব এ ভালোবাসা'। আলোচ্য সঙ্গীতটির যে আবেদন পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত হয় তা ক্ষণস্থায়ী নয়। জীবন যে ক্ষুদ্র, প্রেম যে ঋণস্থায়ী—সঙ্গীতের এই সত্য প্রমাণের জন্য নির্মম কামানের ভয়ংকর শব্দ জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার সুর নষ্ট হয়ে যায়।

পরবর্তী সঙ্গীত দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে পিয়ারার কণ্ঠে গীত হয়েছে। সঙ্গীতটি জ্ঞানদাস বিরচিত বৈষ্ণবগীতি—"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল'। পিয়ারার প্রত্যাশা যেন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে—এ ভাবনাই এ গীতে প্রকাশিত। সুজাকে বার বার যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা ত্যাগের অনুরোধ জানিয়ে পিয়ারা ব্যর্থ হলে তার বেদনাহত মনোভাব আলোচ্য সঙ্গীতে ব্যক্ত।

তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে পিয়ারা দুটি গান গেয়েছে। দৃশ্যটির সূচনা হয় পিয়ারার সঙ্গীতে—'আমি সারা সকালটি বসে বসে এই সাধের মালাটি গেঁথেছি' এবং দৃশ্যটি সমাপ্ত হয় পিয়ারার গানে—'তুমি বাঁধিয়া কী দিয়ে. রেখেছ হৃদি এ'। খিজুয়ার শিবিরে বসে সুজা যখন একখানি মানচিত্র দেখছিলেন, তখন ফুলের একটি মালা হাতে করে পিয়ারা গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করে সুজার গলায় সেটি পরিয়ে দিল। এ সঙ্গীতে দাম্পত্য জীবনের সুখ পরিতৃপ্ত চিত্র প্রকাশিত। ঐ অঙ্কের সমাপ্তি দৃশ্যে পিয়ারার কণ্ঠে গীত 'তুমি বাঁধিয়া কী দিয়ে রেখেছ হৃদি এ' সঙ্গীতে প্রেমের মধুর মহিমা প্রকাশিত।

পিয়ারার সর্বশেষ সঙ্গীত গীত হয়েছে চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে টাণ্ডায় সুজার প্রাসাদকক্ষে। আলোচ্য সঙ্গীতটি চণ্ডীদাসের পূর্বরাগ পর্যায়ের পদ—'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।' এ সঙ্গীতটির লক্ষ্য সুজার কন্যা ও জামাতা মহম্মদ। মহম্মদের সঙ্গে সুজার কন্যার বিবাহিত জীবন ঔরংজীবের কূটকৌশলে বিনষ্ট হতে চলেছে। এই বিচ্ছেদের আভাস সঙ্গীতটিতে থাকায় সঙ্গীতটি সুপ্রযুক্ত হয়েছে। সঙ্গীতটিকে প্রণয়মুগ্ধা রমণীর রূপ প্রকাশিত।

পিয়ারার পর 'সাজাহান' নাটকে মহামায়ার চারণ-চারণীদের স্বদেশি সঙ্গীত উল্লেখযোগ্য। 'সেথা গিয়াছেন তিনি সমরে আনিতে জয়গৌরব ছিনি'—প্রথমাঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে মহামায়ার চারণীদের কণ্ঠের প্রথম গান। সঙ্গীতটিতে আছে যুদ্ধজয়ের তীব্র বাসনা, সমর সঙ্গীতরূপে এটি উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য সঙ্গীতে রাজপুত রমণীর ঐতিহ্য, আত্মবিসর্জন, স্বাধীনতা প্রিয়তা, দেশগরিমা ইত্যাদির স্তুতি করা হয়েছে।

নাটকের তৃতীয় অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে মহামায়ার আদেশে চারণ বালকগণের কণ্ঠে 'ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' গানটি গীত হয়েছে। মনে হয়, আলোচ্য সঙ্গীতটির মাধ্যমে মহামায়া তাঁর দোলাচল চিত্ত দুর্বল স্বামীকে রাজপুতানার অতীত গৌরবে ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সঙ্গীতটি যোজনা করেছেন।

নাটকের বাকি দুটি গান নর্তকীদের কণ্ঠে গীত হয়েছে। নর্তকীদের নৃত্যলাস্য, দেহবিভ্রম ও সঙ্গীত উদ্দামতা দর্শকের মনোরঞ্জনে সহায়ক। দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকের মঞ্চ সফলতার জন্য দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথম দৃশ্যে মোরাদের নর্তকীদের কণ্ঠে 'আজি এসেছি বঁধূ হে' সঙ্গীতটি যোজনা করেছেন। গানটি প্রমোদসঙ্গীত—এ যেন আসন্ন সর্বনাশের ইঙ্গিত বহন করে। এই সঙ্গীতটি নির্বোধ মোরাদের আসন্ন পরিণাম সম্পর্কে উৎকণ্ঠিত করে।

তৃতীয়াঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে কাশ্মীরি নর্তকীদের 'ছোট্ট মোদের পানসী' গানটি অপেক্ষাকৃত লঘু রসের, এ গানের ভাষা লঘু, চটুল; জীবনসম্ভোগের আদিম আকর্ষণ, রূপযৌবনে প্রলুব্ধ করার ছলনা—এ গানে প্রকাশিত। মনে হয়, দর্শকদের সঙ্গীত পিপাসা নিবৃত্তির জন্য মঞ্চের দিকে তাকিয়ে সঙ্গীতটি যোজনা করেছেন।

আলোচ্য নাটকে সঙ্গীতগুলি নাটকের আবেদনকে ব্যর্থ করেনি। নাটকে সঙ্গীত যোজনায় দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক বোধ, রুচি, শিষ্টাচার ইত্যাদি প্রকাশিত এবং নাটকে প্রযুক্ত সঙ্গীতগুলি সার্থক ও সুন্দর।

৪.৭ চরিত্রবিচার

সাজাহান ঃ

দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটক 'সাজাহান' বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় নাটক। নাটকীয় গতিময়তা, চরিত্রচিত্রণ, অন্তর্দ্বন্দ্ব ইত্যাদি রূপায়ণে 'সাজাহান' শ্রেষ্ঠ নাটক। নাটকটির নামকরণে প্রমাণিত হয় যে আলোচ্য নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র সাজাহান। নাট্যকার সাজাহান চরিত্রাঙ্কনে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

'সাজাহান' নাটকের বিষয়বস্তু হলো সাজাহানের ভাগ্যবিপর্যয়। প্রবল প্রতাপশালী সম্রাট কীভাবে সমস্ত ক্ষমতা হারিয়ে তাঁরই পুত্রের চক্রান্তে কারাগানে নিক্ষিপ্ত হলেন, সেই বিপর্যয়ের কাহিনি আলোচ্য নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয়। সাজাহান চরিত্রের দুটি সত্তা—পিতৃসত্তা ও সম্রাটসত্তা। একদিকে তিনি দারা, সুজা, ঔরংজীব, মোরাদ—এই চারপুত্র এবং জাহানারা, রৌশেনারা—এই দুই কন্যার পিতা। প্রথম সত্তা পরিবার ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে জড়িত; দ্বিতীয় সত্তা ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। ইতিহাসের পটভূমিতে সাজাহানের জীবনের বেদনা-দুঃখ-হাসিকান্না-সাফল্য-বর্থতা সমস্তই নাট্যকার অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে রূপায়িত করেছেন।

ইতিহাস খ্যাত মহান চরিত্র সাজাহান ধীরে ধীরে আপন চরিত্রগত ত্রুটির জন্যে সমুন্নত মহিলা বিচ্যুত হয়েছেন। সাজাহানের ট্র্যাজেডিকে 'ট্র্যাজেডি অফ্ ক্যারেকটার' বলা যেতে পারে। মহান পতনের ফলে দর্শকের অন্তরে ভীতি ও করুণার ভাব জাগ্রত হয়; আর তারই রস পরিণতিতে ট্রাজিক রস অনুভূত হয়। শেক্সপীয়রের 'কিং লিয়র' নাটকের কিং লিয়র চরিত্রে যেমন বিচার ক্ষমতার ত্রুটি লক্ষ করা যায়, সাজাহান চরিত্রেও তেমনি অবাঞ্ছিত দুর্বলতা লক্ষ করা যায় যা তাঁকে শোচনীয় পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে। কিং লিয়রের মতোই সাজাহান অন্তর্নিহিত ত্রুটি-দুর্বলতা ও বিচার ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যর্থতার জন্য ধীরে ধীরে মর্মান্তিক

পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছেন। স্ববিরোধ ও কর্তব্যবুদ্ধির অস্থিরতায় সাজাহান ধীরে ধীরে আত্মক্ষয়ী হয়ে উঠেছেন। যেখানে কঠোর কর্তব্যবুদ্ধির প্রয়োজন সেখানে পুত্রদের তিনি স্নেহের শাসনে বদ্ধ করতে চেয়েছেন। সাজাহান বিদ্রোহী পুত্রদের প্রতি যে কঠোর হতে পারেন নি তাকে কর্তব্যজনিত চারিত্রিক ভ্রান্তি বলা যেতে পারে। এই ভ্রান্তির ছিদ্রপথে তাঁর জীবনে নেমে এসেছে মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি। মাঝে মাঝে জাহানারার পরামর্শে তাঁর অন্তরে কঠোর কর্তব্য বুদ্ধি জাগ্রত হলেও পুনরায় স্নেতাতুর পিতৃসত্তার জাগরণ ঘটেছে। সাজাহান উচ্চারণ করেছেন—"আমার হৃদয় এক শাসন জানে, সে শুধু স্নেহের শাসন।" ফলে বিদ্রোহী পুত্র ঔরংজীবের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণে তাঁর সদিচ্ছার অভাব দেখা যায়। ভ্রাতায় ভ্রাতায় সংগ্রাম সাজাহানকে দুর্বল করে ফেলেছে। পুত্রস্নেহের জন্যই তিনি ঔরংজীবের শঠতা সম্পর্কে সজাগ ছিলেন না। পুত্রস্নেহের আধিক্যহেতু তিনি ঔরংজীবকে আগ্রাদুর্গে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিলেন। আগ্রার দুর্গে তিনি যখন বিদ্রোহী পুত্রের হাতে বন্দি হলেন, তখন পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় তাঁর ব্যর্থ গর্জন করা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না।

সমালোচ্য 'সাজাহান' নাটকের সাজাহান চরিত্রের তিনটি পর্যায়ে তাঁর চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব রূপায়িত হয়েছে। নাটকের সূচনা থেকে আগ্রার দুর্গে বন্দি হওয়া পর্যন্ত তাঁর প্রথম পর্যায়। এই সময় পুত্রস্নেহ থাকলেও সম্রাট সত্তার জাগরণ অধিক। দ্বিতীয় পর্যায় ঔরংজীবের দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ থেকে নিজেকে সম্রাটরূপে ঘোষণা করা পর্যন্ত। এখানে সাজাহানের সম্রাটসত্তা ক্ষণকালের বিদ্যুদ্দীপ্তির ন্যায় জ্বলে উঠেছে। তাঁর কাছে সম্রাট জীবিত থাকতে পুত্রের সিংহাসনে আরোহণ বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছে। এই বাস্তব সত্যকে গ্রহণ করতে না পারার জন্য সাজাহান ক্রমশ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। তৃতীয় পর্যায়ে সুজার নিরুদ্দেশের সংবাদে, মোরাদের আসন্ন প্রাণনাশে এবং দারার পরাজয় ও বন্দিত্বের পরিণাণ আশঙ্কায় সাজাহান পূর্ণ উন্মাদ। এই উন্মাদ অবস্থাতেও তাঁর পিতৃসত্তা ও সম্রাটসত্তার দ্বন্দ্ব লক্ষ্যগোচর।

মাতৃহারা সন্তানদের প্রতি তাঁর স্নেহ তাঁকে দুর্বল করেছে। বিদ্রোহী পুত্রদের প্রতি কঠোর হতে না পারায় তাঁর স্নেহান্ধতা প্রকাশিত। কখনো কখনো তিনি উচ্চারণ করেছেন—'সাজাহান শুধু পিতা নয়, সম্রাটও'। সম্রাটের কর্তব্য পালন করতে গেলে পুত্রস্নেহে বিচলিত হওয়া চলে না—এই বোধ প্রথম দিকে জাগ্রত থাকলেও পরবর্তীকালে তা ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে গেছে। আগ্রার দুর্গে প্রবেশের অনুমতিদানকালে সাজাহানের আশা ছিল উদ্ধতপুত্রকে তিনি স্নেহের শাসনে বশ করবেন। কিন্তু পুত্রের হাতে বন্দি হলে সাজাহান সে ভুল বুঝতে পারলেন। আবার ঔরংজীব সম্পর্কে তাঁর গর্বও ছিল—'সে আমার উদ্ধত পুত্র, আমার লজ্জা, আমার গৌরব'। এখানে আবার সম্রাটসত্তাকে আচ্ছন্ন করে পিতৃসত্তার প্রকাশ।

দুটি সত্তার দোলাচলতায় সাজাহান দ্বন্দ্বমুখর চরিত্র। সম্রাটসত্তা ও পিতৃসত্তার অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্ষত-বিক্ষত সাজাহান পাঠক-দর্শকচিত্তে সমবেদনা, সহানুভূতির জাগরণ ঘটায়। সাজাহানের ন্যায় ট্র্যাজিক চরিত্র বাংলা নাট্যসাহিতে দুর্লভ।

ঔরংজীব ঃ

ঔরংজীব 'সাজাহান' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র না হলেও, এবং তাঁর নামে নাটকের নামকরণ না হলে, তিনি যে প্রতিনায়ক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সমগ্র নাটকে সাজাহানের মত বিস্তৃততর মহিলা বা মহত্তম বিচ্যুতির প্রাণকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত না হলেও নাটকে বার বার তাঁর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। বাহুবলে তাঁর নিপুণতা কম

হলেও বুদ্ধিবলে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান, কূটনৈতিক কলাকৌশল তাঁর স্বভাবগত। শক্তি প্রয়োগ অপেক্ষা ছলে-বলে-কৌশলে তিনি কার্যসিদ্ধি করতে উৎসাহী। যশোবন্ত সিংহের অধীনস্থ মোগল সৈন্যদের তিনি ধর্মের দোহাই দিয়ে স্ববশে এনেছেন ও যুদ্ধজয় করেছেন। ঠিক এইভাবেই কৌশলের সাহায্যে যুদ্ধের পর যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন তিনি।ষ লোকচরিত্র সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। দক্ষতা, বুদ্ধি, বিচার-বিশ্লেষণ ইত্যাদি তাঁর সহজাত। যে কোনো উপায়ে কার্যোদ্ধার করাই তাঁর জীবনের লক্ষ্য। স্বীয় ক্ষমতা ও বুদ্ধির প্রতি তাঁর আস্থা ছিল এবং নানা জটিল সমস্যার সমাধান তিনি করতে পারতেন।

ঔরংজীব নীতিবাদী ছিলেন না। স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যে কোনো পাপ ও অন্যায় কাজে তিনি নিযুক্ত হতে দ্বিধী বোধ করতেন না। মোরাদকে সুরাপানে নিয়োজিত রেখে বন্দি করতে দ্বিধা করেননি ঔরংজীব। নিজের সমস্ত পাপকার্যকে ঈশ্বরের নামে চালাতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। সিংহাসন লাভের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থেকেও তিনি ধার্মিকের ভাণ করতেন। জহয়ৎ-এর সংলাপে ঔরংজীবের চরিত্র লক্ষণ প্রকাশিত হয় ঃ "ভিতর এত ক্রূর, বাইরে এত সরল, ভিতরে এত প্রবল, বাইরে এত অস্থির, ভিতরে এত বিষাক্ত, আর বাইরে এত মধুর।" আর জাহানারার দৃষ্টিতে ঔরংজীব 'সৌম্য সহাস্য মনোহর পাষণ্ড'; 'ব্যাঘ্রের লোলুপ চাউনি চাইতে পারে'; আবার অন্তরে বিদ্বেষের জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছে। ঔরংজীব নতুন শয়তানী মতবল করার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে হাত জোড় করেন। কথায় কথায় মক্কায় চলে যেতে চান।

ঔরংজীবের চরিত্রের এটাই কিন্তু সামগ্রিক পরিচয় নয়। তিনি অবিমিশ্র দুর্বৃত্ত নন। তাই তাঁর আচরণে মাঝে মাঝে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়। চরিত্রাগত এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের জন্য তিনি অনেকখানি মানবিক লক্ষণাক্রান্ত। বিবেকের ক্ষীণ পদধ্বনি তাঁর চরিত্রে মানবিক রস সিঞ্চন করেছে। দারার মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে তিনি বিবেকের দংশনে পীড়িত হয়েছেন। নিজের মনকে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য তিনি বলেছেন, 'এ কাজীর বিচার, আমার অপরাধ কি?' দিলদারের কথায় ঔরংজীব যেন তাঁর বিবেকেরই কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছেন। কিন্তু ঔরংজীবের বিবেকী প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত সাময়িক; ইসলাম ধর্মের দোহাই দিয়ে তিনি বিবেকের কাছে সত্য হতে চেয়েছেন। তাঁর শঠতা ও মিথ্যাচারিতা এতই প্রবল যে আপন পাপকার্যের সমর্থনে তুচ্ছতম যুক্তিও ঔরংজীব কাজে লাগিয়েছেন। বিবেকের দংশন আরও বেশি হলে ঔরংজীব চরিত্রটি আরও সজীব হয়ে উঠত।

তবে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করে ঔরংজীব শেষ রক্ষা করতে পারেন নি। দারার ছিন্ন শির, সুরাজের রক্তাক্ত দেহ, মোরাদের কবন্ধ ঔরংজীবকে অধীর করে তুলেছে। কিন্তু তাঁর চিত্তগত প্রতিক্রিয়া দর্শক চিত্তে সহানুভূতি জাগায় নি।

শেষ দৃশ্যে শীর্ণ দেহে, পাণ্ডুর মুখে তিনি নতজানু হয়ে পিতা সাজাহানের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছেন—'আমি পাপী! ঘোরতর পাপী! সেই পাপের প্রদাহে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছি। এই দেখুন পিতা—এই শীর্ণ দেহ, এই কোটরাগত চক্ষু, এই শুষ্ক পাণ্ডুর মুখ তার সাক্ষ্য দেবে।'

সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ঔরংজীব সর্বাপেক্ষা সজীব চরিত্র। তাঁর শঠতা ও কপটতা মানুষের সহানুভূতি আকর্ষণ না করলেও তাঁকে গতিশীল ও জীবন্ত চরিত্র রূপে মেনে নিতে হয়। তাঁর আচার-আচরণ অত্যন্ত সুনিয়ন্ত্রিত ও আবেগবর্জিত; জাগতিক ভোগের প্রতি তাঁর কোনো স্পৃহা নেই। ঔরংজীব অত্যন্ত স্বার্থপর বলে নিজেকে ব্যতীত আর কাউকে ভালবাসেন না। তিনি ছলনার দ্বারা মোরাদকে স্বপক্ষে এনেছেন, মোরাদকে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করেছেন; যশোবন্ত সিংহকে সন্দেহ করে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে কাজে লাগিয়েছেন।

তিনি স্বয়ং বলেছেন, 'ঔরংজীব তাঁর কার্যাবলীর জন্য এক খোদার কাছে ভিন্ন আর আরও কাছে কৈফিয়ৎ দেয় না'। জাহানারা কক্ষে প্রবেশ করলে দারার অসাধারণ কূটনৈতিক আচরণে সভাসদগণ বিস্মিত হন। সোলেমানের একটি উক্তি ঔরংজীবের যথার্থ পরিচয় বহন করে—'মানুষ এমন মৃদু কথা কইতে পারে আর এতবড় দুরাত্মা হতে পারে!' শেষ পর্যন্ত ঔরংজীব তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য অর্ধোন্মাদ পিতার মার্জনাও আদায় করে নিয়েছেন এবং 'সাজাহান' নাটকের স্মরণীয় চরিত্ররূপে উপস্থাপিত হয়েছেন।

দারা ঃ

সম্রাট সাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা ইতিহাসে উদারচেনা ব্যক্তি রূপেই চিত্রিত। তিনি পিতৃভক্ত পুত্র, সন্তান স্নেহাতুর পিতা এবং প্রেমিক স্বামী ও কবি। সমস্ত প্রকার রক্ষণশীলতার ঊর্ধ্বে তাঁর অবস্থান। দারার সঙ্গে অন্য ভ্রাতাদের, বিশেষত ঔরংজীবের সম্পর্ক ভালো ছিল না। তাঁর উদার ধর্মমতের জন্য ঔরংজীব তাঁকে ইসলামধর্ম বিরোধী 'কাফের' রূপে অভিহিত করেছেন। ইসলামের নামেই তিনি দারার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন। দারা হিন্দু অনুরাগী ছিলেন বলে ঔরংজীব দারার প্রতি অপ্রসন্ন ছিলেন। দারা নমাজ বা রোজাকে তেমন গুরুত্ব দিতেন না। তিনি উপনিষদের ফারসী অনুবাদের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি সাহিত্য শিল্প দর্শনের অনুরাগী ছিলেন।

দারা রাজনীতির পটভূমিতে লালিত পালিত হলেও কূটকৌশলী রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না। পিতা সাজাহান অসুস্থ হলে তিনি অধিকাংশ সময় তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকতেন এবং পিতার হয়ে ফরমান জারি করতেন। ঔরংজীবের অনুগতদের পদচ্যুত করে আপন শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করতেন। দারা পিতার সেবায় যেমন নিযুক্ত ছিলেন, তেমনি রাজধানীর কোনো চিঠি যাতে ভাইদের কাছে না পৌঁছয় সেদিকেও দৃষ্টি দিয়েছিলেন।

দারা উদার হলেও ইসলামধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন এবং স্বধর্ম ইসলাম ত্যাগ না করেও সর্বধর্ম সমন্বয়ের উদার পটভূমি রচনার প্রচেষ্টা তাঁর অন্তরে সদা জাগ্রত ছিল। তিনি সাম্রাজ্য চান নি; কেন না, তাঁর কথাতেই 'আমি দর্শনে উপনিষদে এর চেয়ে বড়ো সাম্রাজ্য পেয়েছি'। সমস্ত প্রজা ও সৈন্য দারার পক্ষে ছিল এবং তারা দারার জন্য বালকের মত ক্রন্দন করেছে। দারার মহত্ত্বে দিলদার বলেছেন—"একটা পর্বত ভেঙে পড়ে রয়েছে, একটা সমুদ্র শুকিয়ে গেছে, একটা সূর্য মলিন হয়ে গেছে।"

দারার সঙ্গে ঔরংজীব চরিত্রের মূলগত পার্থক্য বিদ্যমান। ঔরংজীবের সঙ্গে বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় দারা বার বার পরাস্ত হয়েছেন। লোকচরিত্র অভিজ্ঞতা ও শাসন পরিচালনা ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি ঔরংজীবের সমকক্ষ ছিলেন না। পিতার অনুগ্রহে দারার রাজ্য লাভ ঘটেছে। রাজকীয় ঐশ্বর্য ও মর্যাদা লাভ অত্যন্ত সহজে ঘটেছিল বলে তিনি শাসন বা সংগ্রামে, পররাজ্য আক্রমণে বা চক্রান্তে ঔরংজীবের সমান হতে পারেন নি। শাসন পরিচালনায় দমনপীড়ন করেন নি বলে সাধারণ মানুষের প্রীতি ও ভালবাসা পেয়েছেন দারা। তিনি পরিশীলিত মনের অধিকারী ছিলেন। নাদিরার মৃত্যুতে দারা বিচলিত হয়ে পড়লেও মৃত্যুকালে দারা সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

দারাকে কেন্দ্র করেই নাটকে করুণরসের সৃষ্টি হয়েছে। দারা স্নেহ প্রেম বিজড়িত রক্ত মাংসের মানুষ; কিন্তু তাঁর মহৎ বৃত্তিগুলি জীবনে মহিমামণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে নি। নাট্যকার সুকৌশলে দারার মানসিক বৃত্তিনিচয়ের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। রাজনীতির কুটিল চক্রান্তে সুস্থ-সুকুমার বৃত্তিসম্পন্ন দারা যেভাবে বিপর্যস্ত হয়েছেন তাতে

পাঠক-দর্শক তাঁর জন্য ভীতিমিশ্রিত করুণা ও শ্রদ্ধা বোধ করে। দারার মর্মান্তিক পরিণতিতে তারা বেদনাবিদ্ধ হয়।

দিলদার ঃ

চরিত্রের পরিচয় লিপিতে নাট্যকার দিলদারকে ছদ্মবেশী জ্ঞানী রূপে অভিহিত করেছেন। তবে এই চরিত্রটির কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা তা সংশয়ের। অবশ্য ঔরংজীবের পরামর্শদাতাদের মধ্যে দানিশ মন্দ নামক এক ব্যক্তি ছিলেন বলেন জানা যায়। কেউ কেউ মনে করেন, দানিশ মন্দ খানের মোল্লা সাফিয়া-ই-আজাদী চিকিৎসা ব্যবসায়ের জন্য পারস্য থেকে ভারতবর্ষে আসেন। সাজাহান তঁআকে চিকিৎসক নিযুক্ত করেন। সাত বছর পরে তিনি মীর বক্শী পদে উন্নীত হন। মসির-উল উমেরাতে বলা হয়েছে যে ১৬৭০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। নাটকে পাই দিলদারের অনুরোধে ঔরংজীব দারার প্রাণদণ্ডাদেশ মকুব করতে প্রথমে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু পরে শায়েস্তা খাঁর পরামর্শে তিনি মত পরিবর্তন করেন।

উল্লিখিত ঐতিহাসিক ভিত্তি ব্যতীত অন্য কোনো তথ্য দুর্লভ এবং নামটিও নাট্যকারের কল্পনাপ্রসূত। পঞ্চমাঙ্কের শেষ দৃশ্যে দিলদার আপন আত্মপরিচয়ে বলেছেন—'আমি গির্জা মহম্মদ নিয়ামৎ খাঁ'। ঔরংজীব বিস্মিত হয়ে উচ্চারণ করেছেন—'নিয়ামৎ খাঁ হাজী! এশিয়ার বিজ্ঞতম সুখী নিয়ামৎ খাঁ।' পরে দিলদার আপন পূর্ণ পরিচয় জানিয়ে বলেছেন—'আমি সেই নিয়ামৎ খাঁ। শোনো আমি রাজনীতিক অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এসে ঘটনাক্রমে এই পারিবারিক বিগ্রহের আবর্তের মধ্যে পড়েছিলাম। সেই অভিজ্ঞতা লাভের জন্য জঘন্য বিদূষক সেজেছি, ... কিন্তু যে অভিজ্ঞতা নিয়ে এখান থেকে বেরোচ্ছি—মনে হয় যে সেটুকু না নিয়ে গেলে ছিল ভালো।'

দিলদার বিদূষক সেজে ঔরংজীবের চাটুকারিতা করলেও তাঁর অনৈতিক কর্ম ও পাপের সমর্থন করেন নি। তিনি বিদূষকের ছদ্মবেশ ত্যাগ করে বলেছেন—'ঔরংজীব! ভেবেছিলে যে আমি তোমার রৌপ্যের জন্য এতদিন তোমার দাসত্ব কর্চ্ছিলাম। বিদ্যার এখনও এ তেজ আছে যে সে ঐশ্বর্যের মস্তকে পদাঘাত করে। আমায় ফেরাতে পারবে না ঔরংজীব! আমি চল্লাম। মনে ভাবছ যে এই জীবনসংগ্রামে তোমার জয় হয়েছে? না, এ তোমার জয় না ঔরংজীব। এ তোমার পরাজয়। বড় পাপের বড় শাস্তি!—অধঃপতন? তুমি যত ভাবছো উঠছ, সত্য সত্যই তুমি ততই পড়ছো।' দিলদার যে কত স্পষ্টবাদী, সত্যদ্রষ্টা ও জ্ঞানী আলোচ্য উক্তিতেই তা প্রমাণিত। কোনো বিদূষক বা অনুগ্রহপ্রার্থীর পক্ষে এমন মন্তব্য করা সম্ভব নয়।

দিলদার প্রথমে ছিলেন মোরাদের বিদূষক; কিন্তু মোরাদ দিলদারের অর্থবহ ব্যঙ্গের তীব্রতা উপলব্ধি করতে পারেন নি। বার বার লঘু পরিহাসের মাধ্যমে তিনি মোরাদের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেও নির্বোধ মোরাদ তা বুঝতে পারেন নি। কিন্তু দিলদারের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গাপ্রবণ উক্তির তাৎপর্য ঔরংজীব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। দিলদার চাটুকার ছিলেন না বলে ঔরংজীবকে 'শঠ' বলতেও তাঁর দ্বিধা হয় নি। নিরপেক্ষ দর্শকরূপে থাকতে না পেরে তিনি ভ্রাতৃবিরোধে জড়িত হয়েছিলেন। তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য একাকিত্ব, নিঃসঙ্গতা বোধ ও রহস্যাচ্ছন্নতা। দার্শনিকতা তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে মৃত্যুও তাঁর কাছে মনোহর। তাঁর দার্শনিকতার ভিত্তি অনেক গভীরে বলেই কারাগারে বেশ পরিবর্তন করে দারাকে মুক্ত করে নিজেকে মৃত্যুমুখে

নিক্ষিপ্ত করতেও তাঁর দ্বিধাগ্রস্ততা নেই। তাঁর চরিত্রে কোমলতা, মাধুর্য ও মানবিকতা সমস্ত গুণই বিরাজিত।

ঔরংজীব মুগ্ধ হয়েছেন দিলদারের জীবনের প্রতি অনাসক্তি বোধে। দিলদারের মানসিক শক্তির কাছে ঔরংজীব পরাভূত। দিলদার চরিত্র সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন—'দিলদার চরিত্রে ব্যক্তের সঙ্গে সহজগতি অপেক্ষা অব্যক্তের সঙ্গে নেপথ্যক্রিয়াই বিলক্ষণ হইয়া উঠিয়াছে।' নাটকের প্রথমাঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে দিলদার বলেছেন—'আমি মুখে মোরাদের বিদূষক, আমি হাস্য-পরিহাস করতে যাই, সে ব্যাঙ্গের ধূল হয়ে ওঠে। দিলদারের ভাঁড়ামিতে তীব্রতা, তীক্ষ্ণতা ও ব্যঙ্গমিশ্রিত মনোভাব প্রকাশিত। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দিলদার বিদূষকের ছদ্মবেশে পরিত্যাগ করে তাঁর সত্যস্বরূপ ঔরংজীবকে দেখিয়ে তাঁকে কঠোর তিরস্কার করেছেন। আপন সত্তাকে ক্রমপ্রকাশমান করে দিলদার 'প্রথমে পাঠক, তারপরে বিদূষক, তারপরে রাজনৈতিক, তারপের দার্শনিক' বলেছেন। চতুর্থ অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে ঔরংজীবের সঙ্গে দিলদারের সংলাপে ঔরংজীবের বিবেকের দ্বন্দ্ব প্রকাশিত। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে দিলদারের সংলাপে মৃত্যুবিলাসী দার্শনিকের প্রকাশ। অবশেষে পঞ্চমাঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে আপন সত্য পরিচয় ঘোষণার পর দিলদারের বিদায় গ্রহণ।

দিলদার চরিত্রের মাধ্যমে নাট্যকার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছেন। নাটকের গম্ভভীর পরিস্থিতি দিলদারের লঘু হাস্য পরিহাসে সুসহ হয়ে উঠেছে। তাঁর লঘু চপলতা ও হাস্য পরিহাসের পশ্চাতে সত্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। সাধারণ বিদূষকের সঙ্গে দিলদার চরিত্রের পার্থক্য এখানেই। কেউ কেউ তাঁকে শেক্সপীয়রের 'ফুল' চরিত্রের সঙ্গে ও গিরিশচন্দ্রের সৃষ্ট 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের করিম চাচা চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

মোরাদ ঃ

সাজাহানের অন্যান্য পুত্রদের তুলনায় মোরাদ চরিত্র বেশ কালিমাময়। তাঁর মধ্যে শাহজাদার সাহস ও বীরত্ব থাকলেও তা বিকশিত হবার সুযোগ পায়নি তাঁর অসংযম ও ভোগলালসার জন্য। তিনি অত্যন্ত নির্বোধ ছিলেন বলেই ঔরংজীবের চাতুরীর কাছে তাঁর পরাজয় ঘটেছে। দিলদারের সংলাপে মোরাদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। মোরাদ 'মূর্খ', 'বর্বর', 'যুদ্ধোন্মাদ', 'সম্ভোগসজ্জিত'। শাসক হিসেবেও নির্বোধ, অবিবেচক, স্থূলরুচি সম্পন্ন, অসংযত জীবন যাপনে অভ্যস্ত। স্থূলবুদ্ধির অধিকারী ছিলেন বলেই দিলদারের ব্যঙ্গ মিশ্রিত সতর্কবাণী তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাঁর সাহস ও বীরত্ব থাকলেও নির্বুদ্ধিতা তাঁকে চরম পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে।

মোরাদ চরিত্র সৃষ্টিতে নাট্যকার ইতিহাসকে অনুসরণ করেছেন। অর্থাগমের আশায় ও সৈন্য বৃদ্ধির জন্য একবার তিনি অরক্ষিত সুরাট নগর আক্রমণ করেন। সম্রাট সাজাহানের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হলে ঔরংজীব যখন তার অনুসন্ধানে ব্যস্ত, তখন নিজেকে সম্রাটরূপে ঘোষণা করলেন। এইখানেই তাঁর নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। আবার ঔরংজীব যখন তাঁকে বলেন যে, সিংহাসনে তাঁর লোভ নেই, তিনি ফকির হয়ে মক্কায় চলে যেতে চান এবং মোরাদকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তখন মোরাদ সহজেই তাঁর ফাঁদে ধরা দেন। ঔরংজীবের কূটকৌশল বোঝার মত বাস্তবচেতনা তাঁর ছিল না। ধর্মাটের যুদ্ধে মোরাদ বীরত্বের পরিচয় দিলেও ঔরংজীবের প্রতি তাঁর নির্ভরশীলতা কমেনি। শেষ পর্যন্ত নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ও ঔরংজীবের চক্রান্তে মোরাদ হত হন। একটি আত্মাভিমানে স্ফীত, অকর্মণ্য, ভোগবিলাসী ও স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন শাহজাদার জীবনের এই পরিণতি ঘটে।

সুজা ঃ

সম্রাট সাজাহানের মধ্যমপুত্র সুজা বাংলার সুবাদার ছিলেন। রাজধানী থেকে দূরে অবস্থান করলেও সম্রাটের মৃত্যুর পর সিংহাসন লাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁর মানসিকতায় ক্রিয়াশীল ছিল। তবে সুজা বঙ্গদেশে বিদ্রোহ করলেও তখনও সম্রাট নাম গ্রহণ করেন নি। সুজার বিদ্রোহ দমনের জন্য দারার পুত্র সোলেমান প্রেরিত হন এবং সোলেমানকে সাহায্যের জন্য দুজন সুদক্ষ সেনাপতি জয়সিংহ ও দিলীর খাঁ নির্বাচিত হন। সুজা সোলেমানের কাছে কাশীর সন্নিকটস্থ বাহাদুরপুরে পরাজিত হন। পরবর্তীকালে আর একটি যুদ্ধে সুজা পরাজিত হয়ে মুঙ্গেরে অবস্থান করতে থাকেন। অবশেষে মীরজুমলার কাছে পরাজিত সুজা ঢাকার দিকে এবং পরে আরাকানে পালিয়ে যান। আরাকানের রাজাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে সিংহাসন দখলের চক্রান্ত করলে আরাকানরাজ তাঁকে হত্যায় উদ্যত হন। সুজা জঙ্গলে পলায়ন করেন এবং সেখানে মগদের হাতে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

সুজা অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন এবং বাংলাদেশে দীর্ঘ কাল থাকার ফলে রাজ্য শাসনের দৃঢ়তা ও মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলেন। তিনি বিলাসী হলেও মোরাদের মত বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন নি। পিয়ারার মত প্রেমময়ী পত্নী থাকার ফলে তিনি অনেকাংশে সংযত ছিলেন। সুজার মধ্যে অনেক রাজকীয় গুণ যে সুপ্ত ছিল পিয়ারা যথাযথভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। একজন যোদ্ধার আচরণে যে দৃঢ়তার প্রয়োজন সুজার চরিত্রে তা ছিল না। তাঁর চরিত্রে যে একটি লঘু স্বচ্ছন্দ জীবনাবেগ ছিল, পিয়ারার সঙ্গে কথাবার্তায় উপলব্ধি করা যায়। ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের ভয়ঙ্কর শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ায় সুজা-পিয়ারার দাম্পত্যালাপ, হাস্য-পরিহাস যেন নির্মল পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। দারা ও নাদিয়ার শোকাবহ দৃশ্যাবলীর সমান্তরালভাবে সুজা-পিয়ারার দৃশ্যাবলী স্থাপন করে নাটকে বৈপরীত্য ও বৈচিত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথমাঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে কাশীতে সৈন্য শিবিরে সুজা ও পিয়ারাকে প্রথম দেখা যায়। সুজার যুদ্ধ স্পৃহাকে পরিহাসের মাধ্যমে দমন করার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। মুঙ্গেরের দুর্গ প্রাসাদে পিয়ারা নানাভাবে সুজা সংযত করার চেষ্টা করেছেন। সাম্রাজ্যলোভের মোহ ও ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের কালিমা থেকে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা পিয়ারার মধ্যে লক্ষ করা যায়। পিয়ারার পরম আকাঙ্ক্ষিত ছিল একটি সুখীদাম্পত্য জীবন। সুজাকে সে পথে পরিচালিত করাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। পিয়ারার প্রেমে সুজার যুদ্ধোন্মত্ততা দূরীভূত হয়েছে। ঔরংজীব কর্তৃক বিতাড়িত সুজা আরাকানরাজের প্রাসাদে আশ্রয় লাভ করলে সেখানে তাঁদের মধুর দাম্পত্য প্রেম আরও প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত। পিয়ারার প্রতি আরাকানরাজের আসক্তি প্রকাশিত হলে তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করতে গিয়ে সুজা ও পিয়ারার জীবনে বিষাদময় পরিণতি দেখা দেয়।

জয়সিংহ ঃ

জয়পুরের মহারাজা, মোগলপক্ষের অনুগত জয়সিংহ সম্রাট সাজাহানের পতনে ও ঔরংজীবের অভ্যুত্থানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। জয়সিংহ সাজাহানের বিশ্বস্ত সেনাপতি হলেনও ঔরংজীবের অভুত্থানের সময় তিনি কৌশলগতভাবে নিষ্ক্রিয়তা অবলম্ভবন করেন এবং সুযোগ বুঝে ঔরংজীবের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। নাট্যকার জয়সিংহের সুযোগসন্ধানী ভূমিকাটি নাটকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বিশ্বাসঘাতকতার জন্য জয়সিংহ কোনো

অনুতাপ পোষণ করেন না। উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ জয়সিংহ শাসকের অনুগ্রহভাজন হওয়ার চেষ্টায় জ্যোতিষীর সাহায্যে যখন জানতে পেরেছেন যে, ঔরংজীবের উত্থান অনিবার্য তখন থেকেই ঔরংজীবের দিকেই হেলেছেন। তিনি রাজনীতিগতভাবে দূরদর্শী নন; ঘটনার গতি লক্ষ করে অভীষ্ট পথে এগিয়ে যান। সেনাপতি দিলীর খাঁকেও তিনি আখের গোছানোর পরামর্শ প্রদান করেন।

দারার চরম বিপর্যয়ের দিনে জয়সিংহ দারার অধীন হয়েও সোলেমানকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেন নি। এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য জয়সিংহের মনে কোনো গ্লানি নেই। অন্যতম সেনাপতি দিলীর খাঁ সোলেমানকে সাহায্য করলেও জয়সিংহ দ্বিধাহীন ছিলেন। জয়সিংহ চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই হল স্বার্থসিদ্ধি। তাঁর কোনো স্বদেশচিন্তা বা নৈতিকতা ছিল না। নাটকে জয়সিংহ যেন কালিমালিপ্ত। জয়সিংহের মত চরিত্র চতুর ও অভিজ্ঞ ঔরংজীবের কাছে সম্পদ। তাই জয়সিংহকে দিয়ে তিনি যশোবন্ত সিংহকে প্রতিহত করার ষড়যন্ত্রে রত হন। জয়সিংহের সুহৃদবলে ঔরংজীব যশোবন্তকে ক্ষমা করতে চান ও কিছু উপঢৌকনও দিতে চান। এর ফলে জয়সিংহের আত্মাভিমান জেগে উঠল। জয়সিংহ ভাবলেন, ঔরংজীব তাঁকে যথেষ্ট মর্যাদা প্রদান করেন। ফলে ঔরংজীবের কথায় বিগলিত জয়সিংহ যশোবন্তকে আন্তরিকভাবে ঔরংজীবের পক্ষে যোগদানের জন্য অনুরোধ জানালেন। যশোবন্ত স্বদেশপ্রেমের কথা বলে জয়সিংহ-যশোবন্ত ও রাজসিংহের মিলিত বাহিনীর দ্বারা মোগল বিতাড়নের স্বপ্নের কথা জয়সিংহকে জানান। কিন্তু জয়সিংহ তাঁকে বলেন যে, তাঁর পক্ষে ঔরংজীবের প্রভুত্ব মানা সম্ভব হলেও জয়সিংহের প্রভুত্ব স্বীকার অসম্ভব। জয়সিংহ স্বজাতিদ্রোহিতা, সংকীর্ণতা, পদলেহিতার মূর্তিমান প্রতীক। জয়সিংহের নেই কোনো দেশপ্রেম, নেই কোনো দেশভক্তির আদর্শ, নেই অপরাধবোধের আত্মগ্লানি। তিনি অত্যন্ত সহজভাবে ঘোষণা করেন—'আমি কোনো উচ্চ প্রবৃত্তির ভাণ করি না, সংসার আমার কাছে একটা হাট। যেখানে কম দামে বেশি পাব, সেইখানেই যাব।' তাঁর পর—পদানত হওয়া, দালালি করা অনেক আত্মপ্রসাদ লাভের কারণ। জয়সিংহ জাতীয় চরিত্রের কলঙ্ক ও ঔরংজীবের অনুগত দালাল রূপে নাটকে চিত্রিত।

যশোবন্ত সিংহ ঃ

সম্রাট সাজাহানের মিত্রস্থানীয় যোধপুর অধিপতি যশোবন্ত সিংহ দারার আদেশে মোরাদের বিদ্রোহ দমনার্থে প্রেরিত হন। কিন্তু সে যুদ্ধে ঔরংজীবের বুদ্ধিকৌশলে ও মোরাদের বীরত্বে যশোবন্ত সিংহ পরাজিত হন। ঔরংজীবের কূটকৌশলে কাফের যশোবন্ত সিংহ ও আধা-কাফের দারার বিরুদ্ধে সৈন্যদলের মধ্যে এমন প্রচার করা হয় যে, তারা যশোবন্ত সিংহের নেতৃত্বে যুদ্ধ করতে অসম্মত হয়। রাজপুত যশোবন্ত সিংহ সম্মুখ যুদ্ধের শৌর্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলে তিনি ঔরংজীবের কপটতা বুঝতে পারেন নি। রাজপুত চরিত্রের সরলতা, অকপটতা, নির্ভীকতা ও তার অহংকার একদিন যে যশোবন্তের পতনের কারণ হবে তা ঔরংজীব জানতেন। ফলে শেষ পর্যন্ত যশোবন্ত দর্পহীন, গর্বহীন, অনুগত করদরাজে পরিণত হয়েছিলেন। সম্মুখ সংগ্রামে যশোবন্ত সিংহের পরাজয় তাঁর বীর্যবতী ক্ষত্রপত্নী মেনে নিতে পারেন নি; ফলে লজ্জা ও আত্মগ্লানিতে পূর্ণ মহামায়া পরাজিত যশোবন্তের জন্য দুর্গে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দুর্গদ্বার বন্ধের আদেশ দিয়েছেন।

'সাজাহান' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে যশোবন্তের আচরণ অসঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয়। দিল্লিতে ঔরংজীব সম্রাট হয়ে সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি সুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঔরংজীবকে সাহায্য করতে এসেছেন

সৈন্য দিয়ে। যশোবন্ত এর আগে ঔরংজীবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও বর্তমানে আবার ঔরংজীবের পক্ষে। কিন্তু রাজসভায় এলে বিরূপ মনোভাবাপন্ন যশোবন্ত প্রশ্ন করেছেন, কি অপরাধে সম্রাট সাজাহানকে বন্দি করে পিতা বর্তমান থাকতে ঔরংজীব সিংহাসনে বসেছেন? তাহলে যশোবন্ত কী ঔরংজীবের সম্রাট হওয়ার সংবাদ জানতেন না? আসলে যশোবন্ত সিংহ দুর্বল, দ্বিধাগ্রস্ত, দোলাচলচিত্ত। তাঁর মধ্যে সক্য স্থাপনের আনুগত্য জ্ঞাপনের ইচ্ছা যেমন প্রবল, তেমনি প্রবল রাজপুত দর্প। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মানবচরিত্রাভিজ্ঞ ঔরংজীবের পূর্বেই পরিচয় ছিল এবং তিনি জানতেন যে, রাজপুত দর্পই একদিন যশোবন্ত সিংহের পরাজয়ের কারণ হবে। ঔরংজীব তাঁকে স্বপক্ষে গ্রহণের ইচ্ছা জানালে ও আনুগত্য দাবী করলে যশোবন্ত সিংহ রাজপুত দর্পের সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, তিনি ঔরংজীবের দয়ার ভিখারী হতে আসেন নি; তিনি বাহুবলে সাজাহানকে মুক্ত করতে চান। যশোবন্ত একথা জানিয়েছেন যে, নর্মদাযুদ্ধে তিনি ঔরংজীবের বাহুবলের কাছে পরাস্ত হন নি; পরাজিত হয়েছেন শঠতার কাছে। এই যশোবন্তই আবার প্রকাশ্যসভায় জাহানারার অভিযোগের সমর্থনে ঔরংজীবের বিরোধিতা না করে ঔরংজীবের জয়ধ্বনি ঘোষণা করেন। যশোবন্ত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হলো আত্মবিশ্বাসের অভাব, আত্মসম্মানের অভাব এবং ব্যক্তিত্বহীনতা।

নাটকের বেশ কয়েকটি দৃশ্য ধরে ধূর্ত ও কুচক্রী ঔরংজীবের কাছে যশোবন্ত একেবারে অনুগত রাজায় পরিণত হন। ঔরংজীবের শঠতা ও ছলনা ভুলে তিনি ঔরংজীবের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করেন। অথচ যশোবন্ত সিংহ যদি খিজুয়া যুদ্ধে সুজার পক্ষে যোগ দিতেন তাহলে হয়তো ইতিহাস ভিন্ন পথে চালিত হতো। অব্যবস্থিতচিত্ত যশোবন্ত ঔরংজীবকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলতে সাহায্য করেছেন। যশোবন্ত শেষ পর্যন্ত আত্মসম্মান হারিয়ে পত্নী মহামায়ার অবজ্ঞা ও ধিক্কারের পাত্র হয়েছেন। তিনি রাজপুতের চরিত্র বৈশিষ্ট্য ভ্রষ্ট, যোদ্ধার আদর্শ বিচ্যুত।ষ দুঃসাহসী নির্ভীক বীর স্বামী হওয়ার গৌরবও তিনি হারিয়েছেন। ঔরংজীবের রাজত্বে অন্যতম অধীনস্থ রাজা রূপে তিনি ইতিহাসে অশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত।

জাহারানা ঃ

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' নাটকের জাহানারা চরিত্র ব্যক্তিত্বের বালিষ্ঠতায়, যুক্তিনিষ্ঠ মানসিকতায়, নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে, উপস্থিত আবেগে, কঠোরতায় কোমলতায় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনেকে জাহানারাকে কেন্দ্রীয় চরিত্র মনে করেন এবং তাঁর নামেই নাটকের নামকরণ হওয়া উচিত বলে মত পোষণ করেন। কিন্তু সমগ্র নাটক বিচার করলে জাহানারাকে কেন্দ্রীয় চরিত্র বলা যাবে না এবং তাঁর নামে নাটকের নামকরণ করা সঙ্গত বলে মনে হয় না। নাট্যকার জাহানারা চরিত্রাঙ্কনে ইতিহাসের নির্দেশকেই মান্য করেছেন।

দারার সমর্থকরূপে জাহানারা পিতৃসিংহাসনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এটা ছিল তাঁর কাছে ন্যায়সঙ্গত। পিতাকে অগ্রাহ্য করে অন্য ভ্রাতাদের সিংহাসনে আরোহণের ইচ্ছা তাঁর কাছে যথাযথ বলে মনে হয় নি। ফলে তিনি বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে প্রতিবাদ করেছেন এবং তাঁর এই প্রতিবাদের ফলে তাঁর চরিত্র শক্তি লক্ষ করা গেছে। সমস্ত বিপদ ও বিপর্যয়ের মধ্যে উন্নতশির জাহানারা বার বার সাজাহানকে তাঁর দুর্বলতা ত্যাগ করে বিদ্রোহীদের শাস্তি দিতে বলেছেন। সাজাহানের প্রতি তাঁর এই অনুরোধ কিন্তু স্বার্থরক্ষার জন্য নয়; তাঁর এই অনুরোধ ন্যায়সঙ্গত বলে তিনি মনে করেছেন। তিনি মনে করেন, পুত্র শুধুই পিতার স্নেহের অধিকারী নয়; তাকে শাসনও করতে হবে। ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের কলুষতাপূর্ণ পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে না জড়িয়ে তিনি পিতার

আদেশমতই চলেছেন।

নাটকে জাহানারা কোথাও তাঁর ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দেন নি। তিনি সমস্ত বিপদের করালগ্রাস থেকে সাজাহানকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। সাজাহানের জীবনে চরম বিপর্যয়ের দিনে জাহানারা একমাত্র সান্ত্বনা। তিনি সাজাহানের সেবার যেমন নিয়তা, তেমনি আবার বলিষ্ঠভাবে সাজাহানের প্রেরণাদাত্রীও বটে। তিনি সাজাহানের মধ্যে বলিষ্ঠতা সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন—"এই কারাগারের কোণে বসে অসহায় শিশুর মত ক্রন্দন করলে কিছু হবে না, পদাহত পশুর মত দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে অভিশাপ দিলে কিছু হবে না। * * * উঠুন, দলিত ভুজঙ্গের মত ফণা বিস্তার করে উঠুন, হৃত শাবক ব্যাঘ্রীর মত প্রমত্ত বিক্রমে গর্জে উঠন, অত্যাচারে ক্ষিপ্ত জাতির মত জেগে উঠুন।'

জাহানারা যেভাবে প্রকাশ্য রাজসভায় উপস্থিত হয়ে ঔরংজীবকে সুকঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করেছেন তা তার অসীম সাহসিকতার পরিচয় বহন করে। সত্য কথা মুখের উপর শুনিয়ে দিতে তাঁর কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু জাহানারার সত্যনিষ্ঠা ঔরংজীবের কুটিল চক্রান্তে বার বার পরাজিত হয়েছে। তবুও ঔরংজীবের কাছে তিনি মাথা নত করেন নি। তাঁর বাক্‌পটুতা, সাহস, সত্যনিষ্ঠা, চরিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর অসামান্য চরিত্র বৈশিষ্ট্য দ্যোতক।

সমগ্র নাটকে একমাত্র জাহানারাই দৃঢ়তার সঙ্গে সাজাহান ও দারার আপনাপন কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছেন। নাদিরার ভীরু মানসিকতাকে ধিক্কার জানিয়ে জাহানারা উচ্চারণ করেছেন—"নাদিরা, তুমি পয়ভেজের কন্যা না? একটা যুদ্ধের ভয়ে এই অশ্রু, এই শংকাকুল দৃষ্টি, এই ভয়বিহ্বল উক্তি তোমার শোভা পায় না।" জাহানারা চরিত্রের বলিষ্ঠতা, সম্রাট কন্যার মহিমা নাটকের আদ্যন্ত প্রকাশিত। নাটকে তিনি যেন বৃদ্ধ পঙ্গু সাজাহানের মুখপাত্র। তাঁর স্নেহ যত্ন ও মমতায় সাজাহান শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যান নি। জাহানারা কোমলে কঠোর মিশ্রিত নারী; যেমন বাস্তবতা মণ্ডিত তেমনি সজীব চরিত্র। জাহানারা চরিত্রে নীচতা বা শঠতা ছিল না। জাহানারা সম্পর্কে সমালোচক সঙ্গতভাবেই বলেছেন—"তার ধীরতা, বাস্তববুদ্ধি, চারিত্রিক স্নিগ্ধতা, দৃঢ়তার চরম পরীক্ষা ঘটেছে অন্তিম দৃশ্যে সাজাহানের অনুরোধে ঔরংজীবের প্রতি ক্ষমাবাক্য উচ্চারণে। হত্যা, সন্দেহ, চক্রান্ত, কৃতঘ্নতা, অবিশ্বাসের নিত্য আবর্তমান ঘূর্ণির কেন্দ্র মোগল অন্তঃপুরে যার আশৈশব অধিষ্ঠান, শোণিতধারার মধ্য দিয়ে যে সহজে তৈমুর বংশের দোষগুণ লাভ করেছে, প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যার জীবন সাজাহানের রাজত্বকালে জড়িয়ে গিয়েছিল, সে যে কেমন করে নারীসুলভ শুচিতা, স্নিগ্ধতা ও কোমলতা এবং সেবা শুশ্রূষা ও আত্মত্যাগের শ্লাঘনীয় বৃত্তিগুলিকে বিসর্জন দেয় নি তা ইতিহাসের বিস্ময়। নাটকেও এই জাহানারাকেই নাট্যকার স্থান দিয়েছেন।

নাদিরা ঃ

'সাজাহান' নাটকের নাদিরা চরিত্রটি নাট্যকারের কল্পনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও রচিত; কেননা নাদিরার চরিত্র চিত্রণে ইতিহাস নাট্যকারকে কোনো সাহায্য করে নি। নাদিরা দারার যোগ্য সহধর্মিনী; দারা যেমন ধর্মপ্রাণ, উদার, মহৎ, অসাম্প্রদায়িক, ক্ষমতানিস্পৃহ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, তেমনি নাদিরাও ধর্মপরায়ণা, প্রেমশীলা, স্নেহময়ী, স্বামিগতপ্রাণা। তাঁর মধ্যে নেই সম্রাজ্ঞীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা অহমিকা; সিংহাসন অপেক্ষা অনুদ্বিগ্ন জীবনই তাঁর কাম্য। সমস্ত

দুঃখদুর্দশা তিনি শান্ত সহিষ্ণু চিত্তে মাথা পেতে বরণ করে নিতে প্রস্তুত। তিনি বীর, সাহসী, যুদ্ধকুশলী জাহাঙ্গীরের পৌত্রী হলেও তিনি কোমল, স্নেহবৎসল, মমতাময়ী এবং প্রেমব্যাকুল।

নাটকের সূচনাতেই দুঃস্বপ্ন দর্শনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আসন্ন যুদ্ধে দারার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি শংকায় আকুল। তিনি সে আশঙ্কা জাহানারার কাছে ব্যক্ত করলে জাহানারা লতাঁকে তিরস্কার করেছেন। দারার যুদ্ধে অংশগ্রহণের রাজনৈতিক কারণ সম্পর্কে তিনি অনাগ্রহী; মমতাময়ী নারীর কাছে স্বামীর জীবন অনেক মূল্যবান। স্বপ্নে দেখা নাদিরার আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয়েছে। বিদ্রোহ দমনের প্রচেষ্টায় দারা বার বার ব্যর্থ, পর্যুদস্ত ও পরাভূত, পশ্চাদপসরণ ও পলায়ন ব্যতীত তাঁর কোনো গত্যন্তর নেই। সম্রাট সাজাহান মনোনীত ভারতসম্রাট ও তাঁর পত্নীর দুর্ভাগ্য, লাঞ্ছনা এ বেদনাপীড়িত জীবনযাত্রার শুরু হলো। অর্ধাহারে, অনাহারে দিনাতিপাত করেও নাদিরা বিচলিত হন নি। আশ্রয়হীনা, নিদ্রাহীনা নাদিরা অসম্মানের, অপমানিতের জীবন যাপন করলেও মুহূর্তের জন্যও স্বামীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করেন নি। আর এই হল অনুরক্তা, প্রেমমুগ্ধা নাদিরার মহত্ত্ব ও গৌরব। অসহনীয় দুঃখদুর্দশায় দারা মানসিক ভারসাম্য হারালে নাদিরা আপনমৃত্যুর জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন; এমনকি দারা তাঁকে হত্যায় প্রবৃত্ত হলেও নাদিরা বাধা না দিয়ে. ঈশ্বর-প্রার্থনায় নিরত হয়েছেন।

বিতাড়িত, পর্যুদস্ত দারা পলাতক অবস্থায় আমেদাবাদে পুত্রকন্যা, স্ত্রীসহ উপনীত হলে নাদিরা স্বামীর অস্থিচর্মসার ভগ্নস্বাস্থ্য দেখে দুঃখবিদীর্ণ হয়েছেন। অশ্রুসংবরণে ব্যর্থ হয়েছেন। নাদিরার মুখে দারা তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্য ও শীর্ণদেহের কথা শুনে নাদিরাকে ভুল বুঝে কর্কশ কণ্ঠে বিদ্রূপ ও তিরস্কার করলে নাদিরা ঈশ্বরের কাছে মৃত্যুপ্রার্থনা করলেন। আত্মধিক্কারে, বেদনায়, নৈরাশ্যে ভেঙে পড়লেও নাদিরার প্রেমানুরক্তি লোপ পায় নি। অবশেষে নানা বিপর্যয়ের ফলে নাদিরার জীবনদীপ নির্বাপিত প্রায়; দীর্ঘকাল জ্যেষ্ঠপুত্র সোলেমানকে দেখেন নি। তবুও স্বামীর প্রতি তাঁর প্রেম দীপশিখার ন্যায় প্রোজ্জ্বল; তিনি অভিযোগে কখনও উচ্চকণ্ঠ নন। নাদিরার জীবনদীপ শেষ পর্যন্ত নির্বাপিত হয়েছে, তবে মৃত্যুর পূর্বে পৃথিবীর কুৎসিত কৃতঘ্নরূপ তাঁকে দেখে যেতে হয় নি। নাদিরার মত নারী মোগলবংশের ইতিহাসে দুর্লভ; হত্যা-মৃত্যু-ষড়যন্ত্র কৃতঘ্নতার পরিবেশে নাদিরা শোকাময়ী, প্রেমকাতরা, কর্তব্যপরায়ণ নারীরূপেই স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

পিয়ারা ঃ

'সাজাহান' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র সাজাহানের মধ্যম পুত্র সুজার পত্নী পিয়ারা দারার পত্নী নাদিরার সমগোত্রী চরিত্র। সমগ্র নাটক যখন ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন পিয়ারা সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত চরিত্র। পত্নীপ্রেমে একনিষ্ঠ সততায় পিয়ারা চরিত্র স্মরণীয়। তবে বহিরঙ্গ জগতে নাদিরা ও পিয়ারার চরিত্রগত পার্থক্য লক্ষ্যগোচর। নাদিরা গম্ভীর ধীর স্রোতস্বিনী; পিয়ারা উচ্ছল নির্ঝরিণী। পিয়ারা হাস্যচ্ছটায়, কৌতুকে জীবনের সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণাকে সহ্য করেছে। পিয়ারাকে আপাতদৃষ্টিতে লঘু চরিত্র মনে হলেও চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সময় তাঁর চরিত্রে দৃঢ়তা ও তেজস্বিতা লক্ষ্য করা যায়। পিয়ারা তার অন্তরের সুগভীর প্রেম-প্রীতি ও মমতা দিয়ে. যুদ্ধের উন্মাদনা থেকে সুজাকে অন্তরালে রেখেছে। পিয়ারা হাস্যে-পরিহাসে, কৌতুকে,

উচ্ছলতায়, সঙ্গীতে পরিবেশকে মধুময় করে তোলে। জীবনের কঠিন বাস্তবতাকে ভুলে থাকার জন্য পিয়ারা অর্থহীন প্রগলভতার আশ্রয় গ্রহণ করে। তার চরিত্রে ছলনা, মিথ্যাচারিতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনুপস্থিত। পিয়ারা বাস্তব পরিবেশে নেমে আসতে চায় না। সুজা পিয়ারার মধ্যে তৃপ্তি খুঁজে পায় না; সে তাকে 'এক হাস্যের ফোয়ারা এক অর্থশূন্য বাক্যের নদী' মনে করে। কিন্তু পিয়ারা তাতে ক্ষুন্ন হয় না। প্রেমের অসামান্য শক্তি তাকে সমস্ত তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে উঠতে সাহায্য করেছে। সুজার বিপর্যয়ে পিয়ারার চিত্ত হাহাকার করে উঠলেও সে কৌতুকে-পরিহাসে সমস্ত মর্মবেদনাকে গোপন করে রেখেছে। বাইরের দিক থেকে পিয়ারাকে লঘু, চটুল বলে মনে হলেও সে আসলে হালকা ধরনের চরিত্র নয়। মর্যাদাবোধ ও প্রেমশক্তি তাকে মহিমাময়ী নারীতে পরিণত করেছে। বহিরঙ্গ চপলতার অন্তরালে ছিল অসামান্য দৃঢ়তা। আর এই দৃঢ়তা আরোপিত নয়, স্বাভাবিক। পিয়ারা প্রেমময়ী হলেও শক্তিময়ী।

পিয়ারার কুসুম-কোমল হৃদয় প্রয়োজনে বজ্রের মতো কঠিন হয়ে উঠত। পিয়ারার জীবন-নাট্যে হিংস্র চক্রান্ত, স্বার্থপরতা, হত্যা, মৃত্যু, ষড়যন্ত্র উত্তীর্ণ এক নির্মল আলোকোজ্জ্বল আকাশের প্রতিফলন। প্রেমের সাধনাতেই তার জীবনের সার্থকতা। যুদ্ধের বিরোধিতা তার স্বভাজজাত হলেও প্রয়োজনে সুজাকে যুদ্ধের সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রেরণাদানও তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আর এ সমস্ত সম্ভব হয় প্রেমের শক্তি থেকে। পিয়ারা রূপে, কণ্ঠে, সঙ্গীতে, রসিকতায়, উচ্ছলতায়, উদ্বেলতায় 'সাজাহান' নাটকে যেন এক অপার্থিব চরিত্র। ঘনান্ধকার মৃত্যুর অন্ধকারে পিয়ারা মর্ত্যভূমিতে অনাবিল প্রাণের এক উজ্জ্বল দীপশিখা।

মহামায়া ঃ

দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকে মহামায়া চরিত্র যেন অনেকখানি প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়। আসলে, আলোচ্য নাটকে মহামায়া যে গুরুত্ব লাভ করেছে তা বোধহয় সঙ্গত নয়। মহামায়া যশোবন্ত সিংহের বীরাঙ্গনা পত্নী, তিনি স্বামীর দলত্যাগে ক্ষুব্ধ, সর্বোপরি বিশ্বাসঘাতকতায় বেদনার্ত। আলোচ্য নাটকে মহামায়া নাট্যকারের দ্বারা অতিরিক্ত প্রশ্রয় পেলেও তাঁর ভূমিকা যে অনেকটাই অপ্রোয়জনীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মনে হয়, নাট্যকার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁকে নাটকে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। 'সাজাহান' নাটকে স্বদেশপ্রেম, দেশচেতনা ইত্যাদি প্রকাশের সম্ভাবনা নেই। অথচ তার প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা আছে—এমন ধারণা থেকেই নাটকে মহামায়া চরিত্রের গুরুত্ব। ঔরংজীবের সময়ে হিন্দু রাজাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের অবসান আসন্ন, অথচ নাটকে কোনো সূত্রে দর্শকমনোরঞ্জনের জন্য সঙ্গীত ও স্বদেশানুরক্তি প্রকাশের প্রয়োজন ছিল। মহামায়া ও চারণীদের কণ্ঠে স্বদেশপ্রেমের উদাত্ত সঙ্গীত পরিবেশনে চরিত্রটির সার্থকতা নিহিত বলে মনে হয়।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৬৫৮-র এপ্রিল মাসে ধর্মাটের যুদ্ধে ঔরংজীব ও মোরাদের সম্মিলিত বাহিনীর কাছে সাজাহান ও দারার পক্ষে সেনাপতি যশোবন্ত পরাজিত হন। তবে সে পরাজয় শৌর্যবীর্যের পরাজয়, না কূটকৌশলের কাছে পরাজয় তা বিচার না করে যশোবন্ত-পত্নী মহামায়া পরাজিত সেনাপতিকে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করতে না দিয়ে দুর্গদ্বার বন্ধের আদেশ প্রদান করেন। এইভাবেই মহামায়া চরিত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা নাটকে প্রতিষ্ঠিত হয়; নচেৎ সাজাহান নাটকের পটভূমিকায় যোধপুর দুর্গের কোনো ভূমিকাই নেই। যশোবন্তের পরাজয় ওতার গ্লানি

মহামায়াকে স্পর্শ করে; তিনি বেদনার্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেন—"ক্ষত্রিয় বীর তুমি— ক্ষত্রকুলের অবমাননা করেছ! জানো সমস্ত রাজপুতানা তোমায় ধিক্কার দিচ্ছে।"

মহামায়া চরিত্রে রাজপুত রমণীর তেজ, বীর্যবত্তা, ক্ষাত্র অহংকার ইত্যাদির প্রকাশ লক্ষ করা যায়। মহামায়া মূর্তিমতী স্বদেশচেতনা বলে স্বামীর দুর্বলতা, কাপুরুষতা, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি সহ্য করতে পারেন না। যশোবন্ত পত্নী মহামায়াকে আনুগত্যময়ী নারীশরীর ভাবলেও মহামায়ার চিন্তা-ভাবনা ও আদর্শ সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি স্বামীকে আদর্শবাদী মানুষরূপে দেখতে চান। তাঁর মতে—'ভালোবাসা প্রিয়জনকে দিন দিন হেয় করে না। দিন দিন প্রিয়তম করে।' মহামায়া চরিত্রে আদর্শ-দাম্পত্য প্রেমতত্ত্ব ও দেশপ্রেমের গৌরব প্রতিফলিত। তিনি শুধু বীররমণী বা বীরজায়া নন; তিনি দেশপ্রেমিকা। স্বদেশের মৃত্তিকা, পাহাড়, অরণ্য সমস্তই তাঁর কাছে মহিমামন্ডিত—"চেয়ে দেখ—ঐ রৌদ্রদীপ্ত গিরিশ্রেণী—দূরে ঐ ধূসর বালুস্তূপ, চেয়ে দেখ—ঐ পর্বত স্রোতস্বতী—যেন সৌন্দর্য কাঁপছে।" তিনি মেবার মাড়বারের গোধূলি আলোকে শেষ বারের মত উদ্দীপক দেশপ্রেমের সঙ্গীতটি গেয়েছেন চারণ—বালকদের সঙ্গে—'ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।' মহামায়ার দেশপ্রেম, দৃপ্ত তেজ, ব্যক্তিত্ব, ক্ষাত্রমহিমা, কর্তব্যপরায়ণতা ইত্যাদি স্মরণীয় হয়ে থাকে এবং পরবর্তীকালে অনেকের কাছে প্রেরণার সঞ্চার করে।

৪.৮ অনুশীলনী

১। 'সাজাহান' নাটকের ট্র্যাজেডি বিচার করুন।

২। 'সাজাহান' নাটকের নামকরণ সার্থকতা বিচার করুন।

৩। 'সাজাহান' নাটকের নায়ক সাজাহান।—মন্তব্যটি সঠিক কিনা বলুন।

৪। 'সাজাহান' নাটকের সংলাপ চরিত্রানুযায়ী যথাযথ।—আলোচনা করুন।

৫। 'সাজাহান' নাটকে সঙ্গীত প্রয়োগের সার্থকতা আলোচনা করুন।

৬। চরিত্র বিচার করুন ঃ সাজাহান, ঔরংজীব, জাহানারা, দিলদার, সুজা, মোরাদ, পিয়ারা।

৪.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) ঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

২। বাংলা নাটকের ইতিহাস ঃ অজিতকুমার ঘোষ

৩। দ্বিজেন্দ্রলাল ঃ কবি ও নাট্যকার ঃ রথীন্দ্রনাথ রায়।

৪। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত ঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (দ্বিতীয় পর্যায়) ঃ ভূদেব চৌধুরী।
৬। বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক, প্রথম খণ্ড ঃ পুলিন দাস।
৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড ঃ সুকুমার সেন।

একক ৫ ☐ ছেঁড়া তার

পর্যায় ২ একক ৫

৫.১ নাট্যকার ঃ তুলসী লাহিড়ী

৫.২ নবনাট্য আন্দোলন

৫.৩ নাটকের কাহিনি বিন্যাস

৫.৪ নাটকের পরিপ্রেক্ষিত : গ্রাম বাংলা ও পঞ্চাশের মন্বন্তর

৫.৫ নাটকটির বর্গীকরণ

৫.৬ প্লট বিচার

৫.৭ নামকরণের তাৎপর্য

৫.৮ ট্র্যাজেডির উৎস ও পরিণতি : নেপথ্য পরিণাম

৫.৯ মুখ্য চরিত্রগুলির পর্যালোচনা : ক. রহিম; খ. হাকিমুদ্দী; গ. ফুলজান

৫.১০ গৌণ চরিত্রের পরিচয় : ক. মহিম; খ. কানা ফকির; গ. অন্যান্য

৫.১১ নাটকের প্রাসঙ্গিকতা ও সামগ্রিক মূল্যায়ন

৫.১২ এই নাটকের ভাষা, সংলাপ, গান

৫.১৩ বিস্তৃত প্রশ্ন

৫.১৪ অবিস্তৃত প্রশ্ন

৫.১৫ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

৫.১ নাট্যকার : তুলসী লাহিড়ী

নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী (১৮৯৭-১৯৫৯) ছিলেন বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে বাংলা নাটকের জগতের অন্যতম পুরোধা পুরুষ। বস্তুতপক্ষে, তাঁর 'ছেঁড়া তার', 'দুঃখীর ইমান' প্রভৃতি নাটকের মাধ্যমেই বাংলা নবনাট্য আন্দোলন উৎসারিত হয় বলে মনে করা যায়। প্রথম বয়সে তাঁর জন্মস্থান রংপুরে ওকালতি ব্যবসা শুরু করলেও, তাঁর বেশী আগ্রহ ছিল সংগীত সাধনায়। পরে কলকাতায় এসেও একই সঙ্গে আইন ও সংগীত দুয়েরই চর্চা অব্যাহত রাখেন তিনি। এরপরে অভিনয়ের জগতে তাঁর পদক্ষেপ ঘটে : বহুরূপী এবং রূপকার, এই দুই নাট্যগোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে মঞ্চে নিয়মিতভাবেই অভিনয় করেছেন তিনি। প্রায় পঞ্চাশটি চলচ্চিত্রেও অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনি।

তুলসী লাহিড়ী পনেরোটি একাংকিকা এবং তেরোটি পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখেছিলেন, যাদের মধ্যে বেশ কয়েকটিই বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে স্থায়ী মর্যাদার আসন অধিকার করে রেখেছে। 'ছেঁড়া তার' সেই তালিকায় অবশ্যই প্রথম নাম। তাঁর অন্যান্য উল্লেখনীয় নাটকের মধ্যে আছে পূর্বোক্ত 'দুঃখীর ইমান' ছাড়াও, 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার', 'পথিক', 'বাংলার মাটি', 'নববর্ষ', 'নায়ক', 'গ্রীনরুম', 'ওলটপালট', মণিকাঞ্চন', 'চৌর্যানন্দ', 'দেবী' প্রভৃতি। নিজের সমকালের

অজস্র সমস্যা ও সামাজিক-নৈতিক স্খলনকে উপজীব্য করে তিনি এই যেসব নাটকগুলি রচনা করেছেন সেগুলির বাস্তবধর্মিতা অসামান্য। পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রেক্ষিতে লেখা 'ছেঁড়া তার' এবং 'দুঃখীর ইমান'—এ দুটি নাটককে তো কেউ-কেউ সমকালের (আর্থ-সামাজিক) ইতিহাসের বিশ্বস্ত দলিল হিসেবেই মনে করেন। দেশ ভাগের যন্ত্রণা ও সমস্যা ('বাংলার মাটি' এবং 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার'); শ্রমজীবী মানুষের জীবন সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন যুগের উদ্ভাসের প্রতীক্ষা ('পথিক'); ভণ্ড জননায়কের স্বার্থান্ধ স্বরূপের উদ্‌ঘাটন ('মণিকাঞ্চন'); দাঙ্গা-দুর্ভিক্ষ-দেশভাগ-কালোবাজারির চিহ্ননির্দেশী ভেজাল বস্তুর পণ্যায়নে মুনাফাবাজির চিত্রায়ন ('ওলট-পালট'), শ্রেণীসমাজের শোষণের লব্ধফল—নারীর অমর্যাদার মর্মন্তুদ রূপ চিত্রণ ('নববর্ষ') প্রভৃতি বিষয়কে তুলসী লাহিড়ী তাঁর এই সব নাটকের মুখ্য উপজীব্যরূপে গ্রহণ করেছেন।

তাঁর নাট্য সৃষ্টির মুখ্য প্রেরণা সমকালের সমাজের বহুবিচিত্র অপহ্নব হলেও, একটা কথা কিন্তু বিশেষভাবেই স্মরণযোগ্য : জীবনের দুঃখ, গ্লানি, বেদনা, অসহায়তা তিনি সুনিপুণভাবে চিত্রায়িত করেছেন বটে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে অনমনীয় প্রতিজ্ঞায় রুখে দাঁড়ানোর ছবি সেখানে বিরলপ্রাপ্য; নেই বললেই চলে। অবশ্য গণনাট্যের ভাবাদর্শের সঙ্গে হয়ত এই কারণেই তুলসী লাহিড়ীদের বিচ্ছেদ ঘটেছিল। তা সত্ত্বেও, জীবনের নির্মম নিষ্পেষণের মধ্যেও মানুষ যে বাঁচার অভীপ্সা হারায় না, বা হারাতে চায় না—এমনটাই তাঁর নাটকে বারংবার ব্যঞ্জিত হয়েছে।

৫.২ নবনাট্য আন্দোলন

১৯৪৩ সালে গণনাট্য সঙ্ঘের প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক প্রগতি ও অর্থনৈতিক সুবিচারের জন্য জনগণের বক্তব্যের মঞ্চ ও সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে তারা কাজ করবে। পাশাপাশি ঐতিহ্যাশ্রিত শিল্পকলাকেও পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস চলবে। কিন্তু আন্দোলনভিত্তিক কর্মসূচী নিয়ে সংঘের সদস্যদের মধ্যে তীব্র মতভেদ, শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে মতান্তর, রাজনীতি তথা পার্টি কতদূর শিল্পের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব করবে—এইসব বিষয় নিয়ে মাত্র চার বছরের মধ্যেই গণনাট্যের মধ্যে ভাঙন দেখা দিল। ১৯৪৮ সালে একাংশ সদস্য বেরিয়ে গিয়ে তৈরী করলেন 'বহুরূপী' নাট্যদল—শম্ভু মিত্রের নেতৃত্বে। এইভাবে ধীরে ধীরে ক্রমাগত পঞ্চাশের দশকে গণনাট্য ভাঙতে শুরু করেছিল। ১৯৫৪ সালে খানিক সংশোধনের পর সঙ্ঘের দক্ষিণ কলকাতা শাখাটি আবারও কিছুদিন নাট্যচর্চা করছিল গণনাট্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই। কিন্তু তাতেও ভাঙন রোধ করা গেল না। 'বহুরূপী' ছাড়াও আরো বহু নাট্যদল তৈরি হল—গণনাট্য নয় নবনাট্যের ভাবনায় শরিক হয়েই। এইভাবে প্রথাগত নাট্যভাবনাকে অবিন্যস্ত চেহারা থেকে নতুন করে সঞ্জীবিত করতেই নবনাট্যের সূচনা—এমনটাই দাবী করেন এর মুখ্য প্রবক্তা শম্ভু মিত্র প্রমুখ। মূলত রাজনৈতিক ভাবনার সহায়ক হিসেবে নাট্য তথা শিল্পচর্চাকে তাঁরা শিল্পের অপমান মনে করেন। এই প্রেক্ষিতেই তাঁদের উপলব্ধিতে গণনাট্যের পদ্ধতিকে সীমাবদ্ধ বলে মনে হতে থাকে। এই মতাদর্শগত বিরোধই নবনাট্যের প্রেরণা হয়ে ওঠে। এইভাবে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মে 'স্বাধীনতার' বিষয়টি প্রধান হয়ে উঠতে থাকে—এইভাবেই তৈরি হল ব্যক্তিকেন্দ্রিক দল গঠনের পারিপার্শ্বিক। 'সংকীর্ণতা মুক্তি'-র চিন্তা থেকেই পঞ্চাশের দশকে সম্ভবত শম্ভু মিত্রই 'নবনাট্য আন্দোলন' শব্দগুচ্ছটি ব্যবহার করেন। নবনাট্য আন্দোলনের নাটকে তাঁরা একই সঙ্গে দেখাতে চান সমাজের রূপ ও সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিমানুষের জীবনের সুখদুঃখ, সেন্টিমেন্টের রূপও। ব্যক্তি ও সমষ্টিকে একই সঙ্গে নাটকের ফর্মের মধ্যে দেখাতে হলে, প্রকাশভঙ্গী বদলাতে হয়—তাই নবনাট্যের প্রকাশভঙ্গীও হলো আলাদা—যার পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখা গেল "রক্তকরবী" নাটকেও যা গণনাট্যের 'জবানবন্দী' কি 'নবান্ন' থেকে আলাদা। এই স্বতন্ত্র প্রকাশভঙ্গীও নবনাট্যকে গণনাট্য থেকে পৃথক করে দিল। তাছাড়া মানুষের ব্যক্তিগত অনুভূতির আরো কাছাকাছি আসার প্রয়াসের জন্য নবনাট্য ক্রমেই বেছে নিতে লাগল মনস্তত্ত্বমূলক কি ব্যক্তিকেন্দ্রিক নাটকের প্রযোজনা। এই সূত্রেই মঞ্চায়িত হল "ছেঁড়া তার" নাটক যা সমষ্টির পাশে ব্যক্তি প্রাধান্য ও মনস্তত্ত্বমূলকতাকে প্রতিফলিত করেছে।

৫.৩ নাটকের কাহিনি বিন্যাস

বাল্যকালের সহপাঠী এবং সরকারি অফিসার মহিমের শহরের বাড়িতে এসে পরম সমাদর পেল স্বল্পবিত্ত কৃষক রহিম। পুরানো দিনের প্রীতিময় স্মৃতিতে মহিম রহিমকে তার সঙ্গীতচর্চার জন্য কিনে দেয় একটা দিলরুবা আর তার বউ-ছেলের জন্য উপহার দেয় নতুন শাড়ি-জামা। (১ম অঙ্ক/১ম দৃশ্য)

বিশ্বযুদ্ধের কালো ছায়া উত্তরবঙ্গের অজ্‌গাঁয়েও এসে পড়েছে। গাঁয়ের মাতব্বর সুদখোর-মহাজন এবং কুচক্রী হাকিমুদ্দী গরিব চাষিদের কাছ থেকেও যুদ্ধের বাবদে সরকারি চাঁদা আদায় করছে—তারা সেটা মকুব করার আর্জি নিয়ে এসেছে তার কাছে। এমন সময়ে, হাকিমের গোয়ালের দড়ি-ছেঁড়া গরু রহিমের বাড়িতে ধান খাওয়ায় সেটাকে সে খোঁয়াড়ে দিয়েছে এই খবর এল। এর ফলে হাকিমে-রহিমে কথা কাটাকাটি হলে, রহিমকে শাসায় হাকিম। (১/২)

রহিম এবং ফুলজান বসে প্রাণের, মনের কথা বলে। শহর, সেখানকার মানুষজন, রীতিনীতির কথা রহিম স্ত্রীকে শোনায়। স্বামীর আনা জুতো জোড়া পায়ে দিয়ে হাঁটতে লজ্জা পায় ফুলজান। গোবিন্দ এসে খবর দেয়, শয়তান হাকিমুদ্দী রহিমের নামে সার্কেল অফিসারের কাছে চুক্‌লি কেটে তার নামে মিথ্যে অভিযোগ করেছে। গত রাতে একটা চুরির ব্যাপারেও হাকিমুদ্দী রহিমের নামে দোষারোপ করে দারোগার কাছে। কানা ফকির, হাকিমুদ্দীর ভৃত্য কুকরা মিথ্যে সাক্ষী দিলেও শেষ অবধি প্রমাণিত হয় রহিম নির্দোষ। রহিম আর হাকিমুদ্দীর মধ্যে শত্রুতার মাত্রা বাড়ে এই ঘটনায়। (১/৩)

দেশে আকাল। হাকিমুদ্দীর মতো শোষক, শয়তানদের অবশ্য তাতে কিছু ক্ষতি হয় না। তার বাড়িতে প্রাচুর্য এবং স্বাচ্ছল্যের ছাপ সর্বত্র। দুই অনুগত ভৃত্যোপম ব্যক্তির সঙ্গে হাকিম ষড়যন্ত্র করে কিভাবে অধিকাংশ ধান সরিয়ে ফেলে, দুর্ভিক্ষের জ্বালায় উদ্ভ্রান্ত গাঁয়ের লোককে উস্‌কিয়ে দিয়ে তার বাড়িতে লোক-দেখানি ধানের গোলা লুটতরাজের ব্যাপার ঘটানো যায়! ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টও তার ঐ হীন চক্রান্তের অংশীদার হয়। (২/১)

দুর্ভিক্ষ আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। হাকিমুদ্দীর দুই পরিচারক কুদরৎ এবং সহরুল্লা লোক-দেখানি গোলা লুটের কথা আলোচনা করে। গোবিন্দ, মামুদ, শ্রীকান্ত, তমিজ প্রমুখ গ্রামবাসীরা নিজেদের দুর্দশার কথা বলাবলি করে। রহিমের মায়ের মৃত্যু, তার নিজের কঠিন রোগ ভোগ ইত্যাদির কথাও প্রসঙ্গক্রমে ওঠে। অথচ গ্রামের প্রায় সব মানুষই নির্ভর করতে চায় তারই বিচারবুদ্ধি, পরামর্শের উপর।

রহিম এসে এই চরম দুঃসময়েও সকলকে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে বলে। যেখানে দুর্ভিক্ষের ফলে মানুষ না খেয়ে দলে দলে মরছে, অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে রোগে ভুগে মরছে, খিদের জ্বালায় ঘটি বাটি তো বটেই, এমনকি স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকেও বেচে দিচ্ছে, গ্রাম ছেড়ে শহর কলকাতার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিচ্ছে, সেখানে ধানের গোলা লুট করার কথা চিন্তা করা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু লুটতরাজে যে কোনও সমাধান হয় না—রহিম সেটাই সবাইকে বোঝায়। রহিম আরও বলে যে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে সবাই মিলে আর্জি করা হোক সরকারি লঙ্গরখানা খোলার জন্যে। আড়ি পেতে সহরুল্লা এই কথা শুনে, তার মনিবকে গিয়ে জানায়। হাকিমুদ্দী আর প্রেসিডেন্ট আবারও ষড়যন্ত্র করে, তারাই এই পরিকল্পনাটা আগে দেবে সরকারকে—তাতে তাদের চোরা পথে আয় এবং সামাজিক প্রতাপ আরও বাড়বে যেহেতু! (২/২)

বসির আর ফুলজানকে রহিম রেখে এসেছে এক আত্মীয়ের বাড়িতে। দুশ্চিন্তায়, অভাবে, অনটনে অবসন্ন বসির দিলরুবাটা নিয়ে একটু বাজায়। শ্রীমন্তকে বলে হাকিমুদ্দীর বাড়িতে যে সরকারি লঙ্গরখানা বসানো হয়েছে, সেখানে আত্মসম্মান খুইয়ে সে খেতে যায়নি। মাসির বাড়িতে গঞ্জনা শুনে ফুলজান বসিরকে নিয়ে ফিরে আসে। রহিমের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও, অসহায় ফুলজান ক্ষুধার্ত ছেলেকে লঙ্গরখানায় খাওয়াতে নিয়ে যায়, কিন্তু যেহেতু রহিম চৌকিদারি ট্যাক্স দেয় (অর্থাৎ, নিষ্প্রাণ সরকারি আইনের চোখে স্বচ্ছল মানুষ!), তাই তার ছেলে-বউ সেখানে খেতে পাবে না—এই যুক্তি

দেখিয়ে হাকিমুদ্দী তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়। ক্রোধে আত্মহারা হয়ে রহিম আচম্বিতে এক তালাকনামা লিখে ফেলে—ফলে শরিয়তি বিধানমতে ফুলজানের সঙ্গে তার বিয়েটা তৎক্ষণাৎ ভেঙে যায়! ফুলজান এখন আর 'ট্যাক্স-দেওয়া' রহিমের বউ নয়, তাই এবার থেকে আর লঙ্গরখানার লপ্‌সি পেতে তার আর কোনও বাধা থাকবে না! কিন্তু বসির যেহেতু সরকারি-বিচারে 'স্বচ্ছল' রহিমের সন্তান, তাই তার সেটা জুটবে না যেহেতু, তাই তাকে নিয়ে রহিম পাড়ি দেয় শহরের উদ্দেশে। হতবাক বেদনায় ফুলজান পড়ে থাকে একা, অসহায় হয়ে। (২/৩)

মহিমের বাড়িতে ঠাঁই পেয়েছে রহিম আর বসির। সামান্য একটা চাকরিও করে দিয়েছে মহিম। বসির কিন্তু গুরুতর অসুস্থ; মাকে ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়ে হেদিয়ে মরছে সে। দেশে গিয়ে ফুলজানের সঙ্গে দেখা করা এবং বসিরকে তার কাছে রেখে আসার পরামর্শ দেয় মহিম রহিমকে। কিন্তু রহিম তা মানতে চায় না, কারণ প্রথমটায় হাদিসের বিধানকে অমান্য করা হবে, আর দ্বিতীয়টায় বসির "বাঁদির বাচ্চা" হয়ে যাবে (যেহেতু, নিরুপায় হয়ে ফুলজান এখন হাকিমুদ্দীর বাড়িতে দাসীর কাজ করছে জীবনধারণের জন্য)! রহিমের ধর্মানুগত্য এবং আত্মাভিমান তাকে মানসিকভাবে নিদারুণ বিপন্নতার মধ্যে ঠেলে দেয়। (৩/১)

গ্রামের পথে সরেমামুদ আর গোবিন্দর দেখা। কলকাতায় গান গেয়ে, ভিক্ষা করে গোবিন্দ কোনও মতে প্রাণে বেঁচেছে। মহানগরীর পথে ভুখমিছিলের করুণ, নির্মম বিবরণ দেয় সে। তার মুখেই শোনা যায় রহিমও ফিরে আসছে গাঁয়ে—তার "ভুলের মাশুল" চোকাতে। (৩/২)

নাটকের চূড়ান্ত দৃশ্যে অজস্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত দেখা যায়: হাদিসের বিধানমতে রহিম ফুলজানকে যাতে 'ধর্মত' ফিরে পাওয়া যায়, তার ব্যবস্থা করেছে। টাকা নিয়ে কানা ফকির ফুলজানকে নিকাহ্ করবে, তারপরে তাকে তালাক দেবে। নির্দিষ্ট একটা সময়ের পর, রহিমের সঙ্গে ফুলজানের আবার নতুন করে বিয়ে হতে পারবে তার সূত্রে। এদিকে বসির আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে, ফুলজানও উতলা হয় প্রবলভাবে। আবার কানা ফকির ফুলজানকে নিকাহ্ করার জন্য আরও বেশি টাকা চায়। হাকিমুদ্দী এসে বাগড়া দেয়—হাকিমে-ফকিরে বাধে কুৎসিৎ ঝগড়া: ফুলজান সম্পর্কে দুজনেরই লোলুপতা অনাবৃত হয়ে পড়ে। ক্ষিপ্ত হয়ে রহিম ফকিরকে তাড়িয়ে দেয়, হাকিমুদ্দীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বিক্ষুব্ধ গ্রামের মানুষেরা। ফুলজানকে জোর করে নিয়ে আসে রহিম তাদের মুমূর্ষু ছেলের পাশে। ধর্মের সংস্কার আর মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা—দুয়ের দ্বন্দ্বে উদ্ভ্রান্ত ফুলজানকে আশ্বস্ত করে রহিম: সে তাদেরকে 'ছেড়ে' চলে যাবে। উত্তেজনার বশে দিলরুবাটার তার ছিঁড়ে ফেলে রহিম—তারপর ঘরের দোর বন্ধ করে দেয়।

পাড়ার লোক এসে দরজা ভেঙে তার মৃতদেহটা বার করে আনে। গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে সে। ফুলজান করুণ বিলাপে আছড়ে পড়ে তার বুকের ওপর; হাদিসের বিধান তখন হারিয়ে গেছে। (অভিনয়কালে, অনেক সময়েই রহিমের আত্মহত্যার বদলে ফুলজানের মৃত্যুও দেখানো হয়েছে তুলসীবাবুর অনুমোদনক্রমেই।)

□

এই নাটকের কাহিনি বিন্যাসে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে (তালাকনামা লিখে দেওয়া) এর গতি চূড়ান্ত শীর্ষে (অর্থাৎ, ক্লাইম্যাক্স-এ) পৌঁছেছে এবং তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে (রহিমের আত্মহত্যা) এর ট্র্যাজিক পরিণাম (অর্থাৎ, ক্যাটাস্ট্রোফি) উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে দেশ ও জাতির চরম এক বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে, তারই অবশ্যম্ভাবী অনুষঙ্গে একটি পরিবারেরও বিধ্বংসী সর্বনাশ ঘটল। নাটকের প্রধান খলচরিত্র—যে মূলত এটার জন্য দায়ী—ক্ষিপ্ত জনতার হাতে লাঞ্ছিত হলেও কিন্তু ঐ অসহায় ট্র্যাজিক পরিণতির বেদনার উপশম কিন্তু ঘটে না যে তার ফলে, প্রসঙ্গক্রমে তাও স্মরণযোগ্য।

৫.৪ নাটকের পরিপ্রেক্ষিত : গ্রামবাংলা ও পঞ্চাশের মন্বন্তর

পঞ্চাশের মন্বন্তর নিয়ে লেখা বাংলা নাটকগুলির মধ্যে বিজন ভট্টাচার্যের "নবান্নে"-র পরে সম্ভবত তুলসী লাহিড়ীর "ছেঁড়া তার"-ই সবচেয়ে বেশি পরিচিত। "বহুরূপী"-র মতো বিশিষ্ট নাট্যগোষ্ঠী অনেকবার এই নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন বলেই এর পরিচিতি—শুধু তা নয়—এতে এমন কিছু সুগভীর ও মর্মস্পর্শী মানবিক আবেদন আছে, যা এর জনপ্রিয়তার উৎস স্বরূপ।

বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন', 'জবানবন্দী' (১৯৪৩), 'নবান্ন' (১৯৪৪), দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দীপশিখা' এবং তুলসী লাহিড়ীর "দুঃখীর ইমান" (১৯৪৭) ও "ছেঁড়া তার" (১৯৫০)—মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষ নিয়ে লেখা এই কটি বাংলা নাটকের মধ্যে একদিকে "নবান্ন", অন্যদিকে "ছেঁড়া তার"—নাটক দুটির বিশেষ মূল্য আছে।

"নবান্নে"-র মধ্যে দুর্ভিক্ষের যে সামগ্রিক রূপটি চিত্রিত হয়েছে, সে বিষয়ে শম্ভু মিত্র মন্তব্য করেছিলেন "নবান্নের আগে সব ট্র্যাজেডিই ডোমেস্টিক ট্র্যাজেডি। 'নবান্ন'-এ এল এপিক নাটকের ব্যাপ্তি।" ["নবান্ন" ; দ্বিতীয় প্রমা সংস্করণ ; পৃ : ১৯]—এই এপিক-ব্যাপ্তির কারণটি খুব সুষ্ঠুভাবে বুঝিয়েছিলেন কবি বিষ্ণু দে ঃ "নবান্ন আমাদের ইতিহাসের কয়েকটি মুহূর্ত আধৃত করেছিল নাটকের ভাষায় নাট্যরূপে.....সেই বেদনাকম্প্র জীবনের সঙ্গে একান্ত অভিনয়ের কর্তৃত্বে ও আবেগে।" ['বহুরূপী' পত্রিকা ; ৩৪ সংখ্যা ; পৃ : ৮৯]—আর এই দুজনের বক্তব্যের স্বরূপটুকু স্বয়ং নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য বলেছিলেন এইভাবে—"আমরা চেয়েছিলাম মজুতদার ও কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে একটা জাগরণ ঘটুক।" ['নবান্ন' ; প্রমা—সংস্করণ ; পৃ : ১৯]

"নবান্ন" সম্পর্কে এতখানি আলোচনার কারণ এই যে, অত্যন্ত জনপ্রিয় ও মর্মস্পর্শী ও একই বিষয় নিয়ে লেখা হওয়া সত্ত্বেও ; "ছেঁড়া তার" এই নাটকটির মতো প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞা নিয়ে ইতিহাসের সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে এপিক গড়ার পথে সহযাত্রী হয়নি।

উত্তরবঙ্গের রঙপুরের অঞ্চলের পটভূমিকায় পঞ্চাশের মন্বন্তরে বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া বিশেষ একটি পরিবারের ট্র্যাজেডিই এর মধ্যে সর্বময় হয়ে থেকেছে। মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষ এখানে নিঃসন্দেহে ক্রিয়াশীল থেকেছে অপহ্নবী ঘটনা হিসেবে। কিন্তু সেসব কিছু ছাপিয়ে উঠেছে প্রথমে বিত্তবান ও ক্ষমতাশালী সমাজপতির উৎপীড়ন এবং তারপর ধর্মীয় সংস্কারাচ্ছন্নতা।

এ কথা ঠিকই যে নাটকের শেষে নিপীড়িত, অর্ধভুক্ত, দরিদ্র গ্রামের মানুষ ফুঁসে ওঠে এবং উৎপীড়ক সমাজপতি হাকিমুদ্দীকে সায়েস্তা করে। কিন্তু তবু এ নাটকে "নবান্নে"-র মতো বড়ো প্রতিরোধের ক্যান্‌ভাস প্রাপ্য নয়। কারণ "নবান্ন" নাটকে যে ক্ষয়ক্ষতি দেখানো হয়েছে, তা শুধু আমিনপুরের প্রধানের পরিবারের মানুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—সমগ্র দেশের কয়েক কোটি নিরন্ন ও ক্ষুধার্ত মানুষের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে এ নাটকের কুশীলবরা—আর প্রতিরোধের পথ বেয়ে সংগ্রামী মানুষদের যে লড়াই তা-ই এ নাটকের শেষ দৃশ্যে পূর্ণতা পেয়েছে বিপর্যয়কে অতিক্রম করে আসন্ন উজ্জ্বল দিনের প্রত্যাশায় পালিত উৎসবকে কেন্দ্র করে।

এই আশাবাদ "ছেঁড়া তার" নাটকে মেলে না—কারণ তার প্রেরণা ও অভিব্যক্তি সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর। তাই এতে ধরা পড়ে না কিভাবে দুর্ভিক্ষের ভয়াল বীভৎস মূর্তিটি সমস্ত দেশের সাধারণ মানুষকে মুখব্যাদান করে গ্রাস করতে আসছে। তাই এই সূত্রেই গ্রামবাংলায় দুর্ভিক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা হলেও "ছেঁড়া তার" নাটকের বর্গটি আলাদা নিঃসন্দেহে।

৫.৫ নাটকটির বর্গীকরণ

আপাতভাবে দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় এ নাটকটি লেখা হলেও, প্রকৃতপক্ষে ফুলজানকে তালাক দেওয়া ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে এই নাটকের আর কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ওপরই এর অভিঘাত সরাসরি পড়েনি। হাকিমুদ্দীর সঙ্গে রহিমের দ্বন্দ্বের সূত্রপাত মন্বন্তরের অনেক আগেই, রহিমের প্রতিবাদী মানসিকতার কারণে। এই ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের সূত্রেই লঙ্গরখানা থেকে বিতাড়িত হতে হয়েছিল ফুলজান ও তার ছেলেকে এবং এই অপমানে উদ্ভ্রান্ত হয়েই রহিম তালাক দিয়ে বসে স্ত্রীকে। অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের পাশাপাশি ক্ষমতাবান ধনীর শত্রুতাও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না এই তালাকের নেপথ্যে। তাই 'নবান্নে'-র মতো এপিক-ব্যাপ্তি দূরে থাক, এমনকি পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যেও দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস সর্বময় হয়ে থেকে সর্বনাশ ঘটিয়েছে—এমনটিও বলা যাচ্ছে না।

বরং বলা যেতে পারে এই নাটকে সূক্ষ্ম জীবনবোধ ও শিল্পরস কাহিনীকে নিটোল এক বুনোটে বেঁধে নাটকীয় ধারাবাহিকতায় এগিয়ে নিয়ে গেছে ট্র্যাজিক পরিণামের দিকে। প্রকৃতপক্ষে রহিমের ফুলজানকে তালাক দেওয়ার মুহূর্ত থেকেই নাটকের ট্র্যাজেডি তরান্বিত হতে শুরু করেছে।

এই তালাক কিন্তু রহিম ও ফুলজানের ব্যক্তিগত কোনো বোঝাপড়ার অভাবে ঘটেনি। আসলে রহিমের মতো সাধারণ নিপীড়িত মানুষেরা এমনই একটা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে থাকতে বাধ্য হয়; যেখানে অনাহার থেকে বাঁচবার তাগিদে নিজের স্ত্রী পুত্রকন্যাকেও কখনো বিক্রী করতে কিংবা ঘরের মেয়ে-বউকে পাপের পথে ঠেলে দিতে তারা বাধ্য হয় দুটো ভাতের জোগাড় করতে।—এই অতি পরিচিত ছকটি বদলে তুলসী লাহিড়ী "ছেঁড়া তার" নাটকে তালাকের বিষয়টি এনেছেন—যার অন্যতম কারণ রহিমুদ্দীর আত্মসম্মানবোধ ও স্ত্রীপুত্রের প্রতি অসীম ভালোবাসা। ফলে এ নাটকে তালাক নিছক একটি প্রচলিত বিবাহবিচ্ছেদ নয়—রহিম এ তালাক দিয়েছে প্রকৃতপক্ষ নিজের সুখ এবং প্রত্যয়কেই—ফুলজান যার প্রতীক তার জীবনে।

কিন্তু নাটকটির দুর্বলতা এখানেই যে অভাবিত পূর্ব বিক্ষিপ্ত ঘটনা—যা ট্র্যাজেডিকে অনিবার্য করে তুলল নাটকের পরিণামে—সেই ঘটনার বেদনা ও যন্ত্রণাকে ভাগ করে নেবার মতো কাউকে পাশে পেল না রহিম। কেন না ঠিক এই ধরনের অভিজ্ঞতাটি তার কোনো পড়শি বা বন্ধুর কাছে ছিল অজ্ঞাত। অথচ রহিমের প্রতি তাদের সহানুভূতি ও সমবেদনার কোনো খাম্‌তি ছিল না। তবু 'নবান্ন' নাটকে যেভাবে প্রধানের পরিবারের প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রেই নিজস্ব দুঃখগুলো আসলে বহুজনীন দুঃখের প্রতিনিধিকল্প হয়ে উঠেছিল; 'ছেঁড়া তার' নাটকে রহিম-ফুলজানের মর্মান্তিক পরিণতির ক্ষেত্রে তেমনটি হলো না—এটি একান্তভাবেই তাদের ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডিই হয়ে থাকল।

আসলে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তবেই তার দুমুঠো ভিক্ষান্নের ব্যবস্থা করে দেওয়ার এই যে অভাবনীয় ও নির্মম পরিস্থিতি—এটি সূচিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি রহিম সমব্যথী বন্ধুরা কি পড়শিরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে হাকিমুদ্দীর লঙ্গরখানায় চড়াও হত তাহলে এ নাটককেও প্রতিরোধের নাটক হিসেবে নিঃসন্দেহে গণ্য করা যেত। কিন্তু তা হয়নি। পক্ষান্তরে রহিম তালাকের সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য হয়ে ওঠা ধর্মীয় সংস্কারকে পরাভূত করতে না পেরে আত্মহত্যা করে নিজের গ্লানি ও ব্যর্থতার জ্বালা মিটিয়েছে। একথা ঠিকই যে হাকিমুদ্দী তার বন্ধুদের হাতে অবশেষে নিগৃহীত হয়েছে—কিন্তু তাতে করে যে সমাজ ব্যবস্থার শিকার রহিমের মতো মানুষগুলো—তার কোনো পরিবর্তন কিংবা বদলের প্রত্যাশাও সূচিত হলো না; যেমনটি হয়েছিল "নবান্ন" নাটকে। তাই এই নিগ্রহ একান্তভাবেই ব্যক্তি হাকিমুদ্দীর প্রতি রহিমের বন্ধুদের ব্যক্তিগত রোষ।

অবশ্য এ নাটকের প্রথম থেকেই বুঝতে পারা যায় যে এর কুশীলবেরা প্রতিকূল বাস্তবতার সম্মুখীন হতে পারবে না। যে সংঘবদ্ধ প্রত্যাঘাতের শিক্ষা "নবান্ন"-এর আমিনপুরের মানুষগুলো ইতিহাসের কাছ থেকে পেয়েছিল, সেই তালিম

সমকালের হলেও "ছেঁড়া তার"-এর রহিমরা পায়নি। তাই দিনের পর দিন অভুক্ত থাকলেও তারা মজুতদার-মহাজনদের ধান লুঠ করার কথা চিন্তাও করতে পারেনি, কারণ তাদের বিচারে "মান" আর "হুঁশ" থাকলে মানুষ "লুঠ দাঙ্গা কইরবার যায় না।" [দ্বিতীয় অঙ্ক/দ্বিতীয় দৃশ্য]। কারণ তারা এও মনে করে "একদিনের লুটে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন প্যাট চলে না.....মাইর দাঙ্গাত খুনজখম হয়া কি ধরা পড়িয়া আপনজনগুলীক্ হেলি গেইলে তারাও ভাসি যায়।" [ঐ]—তাই অনেকেই মনে করে যে সরকার যখন ধান 'সীজ' করে নিয়েছে, তখন তার কাছেই ধান দাবী করা যেতে পারে—এবং সেও কর্জ হিসেবে।

আসলে এ নাটকে মূল রাজনৈতিক ও সামাজিক দ্বন্দ্ব যদি তীব্র হয়ে উঠতো, তাহলে নাটকের পরিণামে রহিম ও ফুলজানের সম্পর্কের বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারত না। কিন্তু এই বিষয়টিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠায়, রহিমকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিয়ে তবেই নাটকটি শেষ করা গেছে। এমনকি 'বহুরূপী'-র কিছু প্রযোজনায় রহিমের বদলে ফুলজানের মৃত্যুর মাধ্যমেও নাটকের সমাপ্তি টেনেছেন নাট্যকার। যেই হোক—মূল কুশীলবের মৃত্যু ছাড়া নাটকের সমাপ্তির অন্য কোনো বিকল্প খাড়া করা যায়নি। অর্থাৎ সবকিছু ছাপিয়ে রহিম ও ফুলজানের ব্যক্তিগত বিপর্যয়টাই এ নাটকে প্রধান হয়ে উঠল। এবং বিত্তবানের উৎপীড়ন, অন্নাভাব ও ধর্মীয় সংস্কার—এই তিনের মিলিত আক্রমণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে গেল—পাঠক-দর্শক মনে এমন একটি বোধ সঞ্চারিত করেই এ নাটক শেষ হয়। আর ঠিক সে কারণেই "ছেঁড়া তার" কখনোই প্রতিরোধের নাটক হয়ে উঠল না, শেষ দৃশ্যে জনতার হাতে হাকিমুদ্দীর নিগ্রহ সত্ত্বেও।

নাটক জুড়ে তাই প্রতিবাদ-প্রতিরোধের পরিবর্তে বহমান হয়ে থেকেছে বেদনার মর্মস্পর্শিতা—জীবনবীণার তার ছিঁড়ে যাওয়ার করুণ মূর্চ্ছনা—তাই অত্যাচারের পীড়ন মানুষগুলোকে কাঁদায়, রাগায় কিন্তু প্রতিবাদে উদ্বুদ্ধ করে না। আর তাদের সেই বেদনায় সমব্যথী হয় দর্শকেরা।

যে মন্বন্তরের সুবাদে শুধু কলকাতার রাজপথেই পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল, সেই ভয়ংকর মারণোৎসবের প্রতীকী ব্যঞ্জনাও তাই রহিম/কিংবা ফুলজানের মৃত্যুর প্রতীকে ফুটে ওঠে না। সমকালের স্বদেশের বৃহত্তম বিপর্যয় এ নাটকে তাই একটি অস্পষ্ট প্রেক্ষাপট হয়েই রইল। দুর্ভিক্ষ একটি চরিত্র হয়ে কাহিনীর মধ্যে অলক্ষ্যে থাকলেও তা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতে পারল না। ক্ষমতাশালী শত্রু ও ধর্মীয় কুসংস্কার—যা সাধারণ মানুষের সর্বকালের সর্বদেশের বৈরী—তারাই এখানেও মুখ্য হয়ে থাকল। সমকালের ভয়ালতম অপহ্নবের দলিলচিত্র হবার পরিবর্তে "ছেঁড়া তার" একান্তভাবেই ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি নির্ভর একটি নাটকে পর্যবসিত হলো।

৫.৬ প্লট বিচার

প্রথম দৃশ্যের তাৎপর্য/শেষ দৃশ্যের দুটি পৃথক রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা

"ছেঁড়া তার" নাটকটিকে তুলসী লাহিড়ী কোনো সময়েই সংগ্রামের ইস্তেহার করে তুলতে আকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। একটা সময়ে দুর্ভিক্ষকে প্রেক্ষিতে রেখে বাংলার হতভাগ্য কৃষকের জীবনকে নিয়ে অজস্র উপন্যাস, গল্প, কবিতা এবং নাটক আমাদের সাহিত্যে রচিত হয়েছে। এই বর্গের লেখাগুলির মূল তিনটি ধারা দেখা যায় :

(ক) যা ঘটেছে তার শিল্পসম্মত এবং করুণ রসের দলিল তৈরি করা।

(খ) এই আকালের পিছনে মানুষের যে লোভ ও কুটিলতা ক্রিয়াশীল থাকে, সেটিকে ফুটিয়ে তোলা।

(গ) আকালকে উপলক্ষ করে প্রতিবাদী মানুষের প্রতিরোধ ও ভবিষ্যতের উজ্জ্বল দিনের প্রত্যাশা করা।

"ছেঁড়া তার" নাটকে প্রথম দুটি ধারার একটি মিশ্রিত রূপ প্রকাশিত হয়েছে। তাই প্রথম থেকেই এ নাটকের মধ্যে

তুলসীবাবু এমন কোনো ইঙ্গিত রাখেননি, যার পরিণতিতে রুখে দাঁড়ানোর বা বিপর্যয় অতিক্রম করার আকাঙ্ক্ষার ছবি ফুটে উঠতে পারে। বরং তিনি বেশী আগ্রহী ছিলেন রহিমের ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখের ছবি আঁকতেই। এবং তারই সূত্রে দেশকালের বৃহত্তর পরিবেশটির সামান্য খানিকটা আভাস মিলেছে। সম্ভবত এই কাহিনির পরিণাম আগেই স্থির করে সেই অনুযায়ী নাট্যকার প্লটটিকে ধীরে ধীরে বুনেছেন।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে নাটকের প্রথম দৃশ্যে তাৎপর্যপূর্ণ দুটি ঘটনার বিন্যাস করেছেন তুলসীবাবু। এই দৃশ্যেই মহিম রহিমকে উপহার দেয় একটি দিলরুবা। শেষ দৃশ্যে এই দিলরুবার তার ছিঁড়ে যাবার মাধ্যমেই যে নাটকের ট্র্যাজিক যবনিকাপতন ঘটবে; তার একটি পূর্ব-সঙ্কেত সূচিত হয়ে যায় নাটকের গোড়ায় এই প্রথম দৃশ্যেই। আরেকটি ঘটনায় রহিমের শখের ফুলগাছটি হাকিমের পোষা গরু এসে মুড়িয়ে খায়। এ ঘটনার তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনা দ্বিবিধ : এই ঘটনা সংকেত করে যে রহিম-হাকিমের পুরোনো শত্রুতা আরো তীব্র হয়ে উঠবে। আর, একদিন রহিমের 'হৃদয়ের ফুল' ফুলজানও হাকিমের কুচক্রের ফাঁদে পড়ে তার জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে; তারও নাটকীয় পূর্বাভাস যেন এই ঘটনা।

যেহেতু নাটকটি একান্তভাবেই ব্যক্তিগত সুখদুঃখের জীবনকথা, তাই শুরু থেকেই রহিমকে তুলসীবাবু অত্যন্ত আবেগপ্রবণ করে দেখিয়েছেন। অবশ্য একটা যুক্তিবাদী প্রবণতাও সমান্তরালভাবে তার মধ্যে বহমান রেখেছিলেন তিনি। কিন্তু শেষপর্যন্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে যুক্তি নয়, তার আবেগই তাকে পরিচালিত করেছে। তাই যে মানুষটি গাঁয়ের লোক উন্মত্ত হয়ে জোতদারের ধানের গোলা লুঠ করতে গেলে, তাদের যুক্তি দিয়ে নিরস্ত করেছে—সেই একই মানুষ ক্ষুধার্ত সন্তানের কান্নায় নিজের যুক্তি ভাসিয়ে দিয়েছে। তাই প্রখর আত্মাভিমানী হয়েও সে ফুলজানকে শেষপর্যন্ত পরমশত্রু হাকিমের লঙ্গরখানায় পাঠায় ওই পিতৃহৃদয়ের আবেগেই। আবার সেখান থেকে অপমানিত হয়ে অভুক্ত স্ত্রী ও পুত্র ফিরে এলে একই আবেগে সে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বসে তাকে দুটো ভাত জোগাড় করে দেবার আকুলতায়। যুক্তি সেখানে সম্পূর্ণ পরাস্ত তার হৃদয়ের কাছে। আর এই প্রবল আবেগপ্রবণতাই শেষপর্যন্ত তাকে আত্মহননের পথেও ঠেলে দিয়েছে।

তাই দেখা যাচ্ছে এ কাহিনির প্লটের বিন্যাস প্রথম থেকে তুলসী লাহিড়ী এমনভাবেই করেছেন যাতে আত্মহনন অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায় কাহিনির যবনিকাপাতের প্রয়োজন। অবশ্য এ প্রসঙ্গে আরো কিছু কথা গুরুত্বপূর্ণ—রহিম আবেগপ্রবণ হলেও তার ব্যক্তিত্ব, মানসিকতা, সামান্য হলেও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এবং বাইরের জগতের সঙ্গে খানিকটা যোগাযোগের ফলে, সে ধর্মীয় অপূর্ণতাকে অতিক্রম করে যাবার মনোবল অর্জন করতে পেরেছিল। কিন্তু তুলসীবাবু ফুলজানকে তেমন কোনো সুযোগ দেয় নি। ফলতঃ গ্রামের অশিক্ষিত মহিলা হবার কারণে তার পক্ষে অন্ধ সংস্কারের বিধান এড়িয়ে রহিমের অন্তরের ডাকে সাড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি, মানসিক সংকীর্ণতার কারণেই। প্লটের এই বিন্যাসের ফলেই রহিম ও ফুলজানের পরস্পরের প্রতি আবেগের ঘাটতি না থাকলেও, মানসিকতার দিক থেকে তাদের অবস্থান হয়েছিল বিপরীত মেরুতে। তাই ওদের দুজনের যুগলজীবনের ছিঁড়ে যাওয়া তারটি আর কিছুতেই বাঁধা সম্ভব ছিল না। সে কারণে নাটকটিতে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল দুজনের বিচ্ছেদ। ফলে কাহিনি সাঙ্গ করতে গেলে প্রবল আবেগচালিত কোনো একটি ঘটনা ঘটানো ছাড়া নাট্যকারের আর কোনো বিকল্প ছিল না। তাই শেষে রহিমকে আত্মহত্যা করতেই হয়। কারণ দুজনের মধ্যে সেই ছিল বেশি আবেগনির্ভর।

রহিমের আত্মহননের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নাটকটির শেষ দৃশ্যের পরিকল্পনায় একটি অভিনবত্ব এনেছেন তুলসীবাবু। 'বহুরূপী' নাট্যগোষ্ঠী যখন নিয়মিতভাবে 'ছেঁড়া তার' অভিনয় করতে শুরু করে, তখন তাঁরা রহিমের আত্মহত্যার ব্যাপারটি নিয়ে একটি সমস্যায় পড়েছিলেন। ওই নাট্যগোষ্ঠীর তৎকালীন অন্যতম প্রধান শিল্পী অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায় : "নানা জনের কাছ থেকে নানা কথা উঠতে লাগলো। নাটকের শেষে নায়ক যদি আশার বাণী না শুনিয়ে হতাশায় আত্মহত্যা করে, তাহলে নাটক দুর্বল হয়ে পড়ে। পক্ষে বিপক্ষে নানান যুক্তি দিয়ে আলোচনা হতে

থাকে। কখনো স্থির হয় এ নাটকের পরিণতিতে রহিমের মৃত্যুই স্বাভাবিক, আবার কখনো মনে হয় ফুলজানের মৃত্যুই অনিবার্য। শেষপর্যন্ত তুলসীবাবু শেষ অংশটা দুরকম করে লিখে শেষ রক্ষা করলেন। আমরাও কখনো রহিমের মৃত্যুতে নাটক শেষ করেছি; কখনো বা ফুলজানের মৃত্যুতে।" ["ছেঁড়া তার"; জাতীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ; ১৩৭২, পৃ : ৫]

বস্তুতপক্ষে 'বহুরূপী' গোষ্ঠী যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন সেটি খুবই মৌলিক। কারণ, এ কথা ঠিকই যে নাটকের নায়ক যদি জীবন পলাতক হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেয়, তাহলে নাটকের গণমুখিন আবেদন দুর্বল হয়ে যায়; যা প্রগতিশীল কোনো নাট্য দলেরই কাম্য নয়। সেদিক থেকে ফুলজানের মৃত্যু ঘটালেও নাটকের অভিপ্রেত পরিণামটি মোটামুটি অক্ষুণ্ণই থাকে—অর্থাৎ রহিমের সঙ্গে তার অনিবার্য বিচ্ছেদ অথচ ঐ গণমুখিনতার ব্যত্যয়ও ঘটে না। তাই এক অভিনব পরিকল্পনায় শেষ দৃশ্যের দুটি পৃথক রূপান্তরণের প্রয়োজন হয়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও যেহেতু প্লটের আধারেই কাহিনির যুক্তিগ্রাহ্য ও সম্ভাব্য বিন্যাস ঘটে তাই রহিমের মৃত্যুর মাধ্যমে সূচিত পরিণামটিই বরং অনেক বেশি করুণ ও মর্মস্পর্শী বলে বিবেচিত হয়। তুলসীবাবু তো এ নাটকে প্রতিরোধ বা সংগ্রামের পরিবর্তে মর্মস্পর্শিতাকেই মুখ্য করেছেন। তাই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র রহিমের মৃত্যুতে কারুণ্য যতটা প্রবল হয়ে ওঠে, ফুলজানের মৃত্যুতে সেটা সম্ভব নয়। কারণ রহিমের আত্মহননের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকে তার গ্লানি, হঠকারী সিদ্ধান্তে জীবন ও পরিবারকে ধ্বংস করার অপরাধবোধ এবং সর্বময় ব্যর্থতার অনুভূতি যা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় ছিল মৃত্যুই। এতগুলো ব্যঞ্জনা ফুলজানের মৃত্যুর সঙ্গে সংযুক্ত করা যেত না। তাছাড়া অতি আবেগপ্রবণ বলেই রহিমের পক্ষেই চকিত সিদ্ধান্তের বশে আত্মহত্যা করাটা নাটকের প্লটের গতিপথকেই সঠিকভাবে অনুসরণ করে যে সে কথাও বলাই বাহুল্য।

ফলে নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে অবকাশ থাকলেও, প্লট কিংবা নাটকের লিখিত মূল পাঠের সঙ্গে দুটি পৃথক রূপান্তরণ যে একেবারেই খাপ খায় না সে কথা অনস্বীকার্য।

৫.৭ নামকরণের তাৎপর্য

'ছেঁড়া তার' নাটকের নামকরণের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম আলংকারিক ব্যঞ্জনা নিহিত আছে। প্রত্যক্ষত এর মধ্যে শেষ দৃশ্যে রহিমুদ্দীর আত্মহত্যার ঠিক আগে তার হাতের অসতর্ক মোচড়ে দিলরুবার তার ছিঁড়ে যাওয়ার একটি ঘটনা আছে ঠিকই, কিন্তু শুধু ওইটুকুই এই নামকরণের সবটা তাৎপর্য সূচিত করে না।

আসলে এই তার ছিঁড়ে যাবার ঘটনাটির পরেই রহিম যেভাবে আকুল হয়ে কেঁদে উঠেছিল : "আল্লা! মোর যন্তর বাজিলয় না। আল্লা! তার খালি ছিঁড়ি ছিঁড়ি গেল।" [তৃতীয় অঙ্ক/তৃতীয় দৃশ্য]—এ থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে রহিম এখানে শুধু হাতের দিলরুবাটির তার ছেঁড়ার কথা বলছে না। যে 'যন্তর'-টি বাজল না—যার তার খালি 'ছিঁড়ি ছিঁড়ি গেল', সে আসলে তার হৃদয়বীণা—হাতের দিলরুবা—হয়ত বা দিলের রবাব।

এ কথার রূপকব্যঞ্জনার যে অন্তর্গত তাৎপর্য তার বিশ্লেষণ এরকম : রহিম বারংবার জীবনের নানা পর্বে ব্যর্থ হয়েছে; জীবনকে গড়ে তুলতে গিয়ে বিফলতাই জুটেছে তার ভাগ্যে। এ নাটকের যে ট্র্যাজেডি ঘটেছে, তার চূড়ান্ত যবনিকাপাত রহিমের মৃত্যুর মাধ্যমে হলেও, বহু আগে থেকেই নানা ঘটনা সেই পরিণামকে অনিবার্য করে তুলেছিল। সেই ঘটনাগুলিকেই রহিম 'তার' বারবার ছিঁড়ে যাওয়া হিসেবে নির্দেশ করেছে।

দেশে দুর্ভিক্ষ লাগলে আর সকলের সঙ্গে রহিমও বিপন্ন হয়েছে। অন্নের অভাবে তার মায়ের মৃত্যু ঘটেছে, নিরুপায় হয়ে সে শুধু তা প্রত্যক্ষ করতে বাধ্য হয়েছে নিষ্ক্রিয়ভাবে। কোনো প্রতিকার করতে পারেনি। স্ত্রী এবং একমাত্র পুত্রও

অনাহারে মরতে বসেছে দেখে শেষপর্যন্ত নিজের আত্মসম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে রহিম তাদেরকে পাঠাতে বাধ্য হয়েছে পরমশত্রু হাকিমুদ্দীর বাড়ির চৌহদ্দীতে খোলা সরকারী লঙ্গারখানায়—যাতে তারা দুটি ভাত পায়। সরকারী হুকুমের ছুতো দেখিয়ে হাকিম সেই সরকারী খাবার থেকেও বঞ্চিত করে রহিমের স্ত্রী ও পুত্রকে। রহিমের স্ত্রী ফুলজানকে এরপর বলা হয় হাকিমের বাড়ির অন্দরমহলে গিয়ে খাবার ভিক্ষা চাইত।

স্ত্রীর চরম অপমান এবং তা নিরসন করতে না পারার অক্ষম অপরাগতা—এই অসহায়তা ও অসম্মানের পীড়নে অস্থির হয়ে ওঠে রহিম। সমস্যা সমাধানের দুর্বার প্রয়াসে সে ঝোঁকের মাথায় ফুলজানকে তালাক দিয়ে দেয় যাতে তাকে কেউ আর রহিমের 'স্ত্রী' হবার 'অপরাধে' সরকারী খাদ্য থেকে বঞ্চিত করতে না পারে।

রহিমের জীবনের এইটিই করুণতম ভ্রান্তি—তার হৃদয়বীণার সবচেয়ে সুরেলা তারটি সে নিজের হাতে ছিঁড়ে ফেলল ফুলজানকে তালাকনামা লিখে দিয়ে। এরপর থেকে তার অন্তরকেই অহরহ বেসুরো বেতালা করে দিয়েছে দুটি পরস্পর বিরোধী আবেগের উদ্দাম সংঘাত—একদিকে ফুলজানের প্রতি সুগভীর ভালোবাসা আর হঠকারিতার বশে তার প্রতি অকল্পনীয় অবিচার করে বসার আত্মগ্লানি; অন্যদিকে এক সুপ্রবল ধর্মসংস্কার যা তাকে নিরস্ত করছে তালাক অস্বীকার করে জোর করে ফুলজানকে ফিরিয়ে আনা থেকে। এমনকী বন্ধুদের পরামর্শে ফুলজানকে নিয়ে শহরে পালিয়ে যাবার কথা ভাবতেও সে গ্লানিবোধ করে, অপরাধী মনে করে নিজেকে শরিয়তী বিধান অমান্য করার কথা ভেবেছে মনে করে।

রহিমের জীবনে 'কোন হাহারবে' তার ছিঁড়ে যাওয়া বেদনা কিন্তু ওই ঝোঁকের মাথায় তালাক দেওয়াতেই সাঙ্গ হয়নি। হদিসের বিধান মেনে ফুলজানকে যাতে ফিরে পাওয়া যায় তার জন্যে আকুল হয়ে সচেষ্ট হয়েছিল রহিম। কিন্তু তার সেই প্রয়াসও ব্যর্থ হবার উপক্রম হলো কানা ফকির বনাম হাকিমুদ্দিনের কুৎসিৎ লালসার লড়াইয়ের সূত্রে। তখন মরিয়া হয়ে এতদিনের লালিত সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে জোর করে ফুলজানকে বাড়িতে নিয়ে আসে রহিম অসুস্থ সন্তানকে মায়ের সঙ্গ দিতে। কিন্তু 'হদীজ-খেলাপ' হবার ভয়ে ফুলজান তার ঘরে ঢুকতে অসম্মত হলে বীণার শেষ তারটিও ছিঁড়ে যায়।

মায়ের অনাহারে মৃত্যু, ক্ষুধার্ত স্ত্রী ও সন্তানের মুখে অন্ন জোগানোর জন্যে পরমশত্রুর বাড়িতে তাদের পাঠিয়ে আত্মসম্মান খোয়ানো, স্ত্রী-র চরম অপমানিত হওয়া, ঝোঁকের মাথায় উদ্ভ্রান্ত হয়ে তালাক দিয়ে আত্মগ্লানিতে জর্জর হওয়া, ফিরিয়ে আনার প্রয়াস করতে গিয়ে স্ত্রীকে দুটি ঘৃণ্য মানুষের লোভ ও লালসার বস্তু করে তোলা এবং সবশেষে ধর্মসংস্কারকে বিসর্জন দিয়ে ফুলজানকে ফিরিয়ে এনেও শেষপর্যন্ত সম্পর্ক জুড়তে ব্যর্থ হওয়া। এতগুলি গ্লানিময় ও অবমাননামূলক ঘটনা রহিমের মতো আবেগপ্রবণ মানুষের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হয়নি; মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি যে জীবনবীণার প্রতিটি তার একে একে এইভাবে ছিঁড়ে গেছে। হাতের অসতর্ক মোচড়ে দিলরুবার তার ছিঁড়ে যাওয়া এই সবকটিরই রূপক হিসেবে এ নাটকে ব্যঞ্জিত হয়েছে।

জীবনের যুগলবন্দীতে রহিম-ফুলজানের সুরে-লয়ে কখনো গরমিল হয়নি। তাই ঘটনা পরম্পরায় আপাত তাদের বিচ্ছেদ হলেও সেই শুধু বাইরের বিচ্ছিন্নতা; অন্তরে তা ঘটেনি। কিন্তু দুর্ভিক্ষের করালস্পর্শ, হাকিমুদ্দী দেওয়ানের দুরভিসন্ধি, আর জগদ্দল পাথরের মতো অনড়, অটল ধর্মীয় সংস্কার তাদের দুজনের সম্মিলিত হৃদয়রাগিনীর ছন্দকে এলোমেলো এবং অবশেষে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু ভালোবাসার সুর ছিল অক্ষুণ্ণ। শুধু পারিপার্শ্বিকের নির্মম পরিস্থিতিতে সে সুর তারা আর যৌথভাবে বাজাতে পারছিল না। প্রতিদিনের জীবনচর্চার অঙ্গীভূত তারগুলি ছিঁড়ে গেছিল দুর্ভিক্ষ, হাকিমুদ্দিন আর হাদিসের বিধানে। রহিম অবশ্য নতুন করে তার বেঁধে সেই সুরে আবার বাজাতে চেয়েছিল জীবনবীণাকে। কিন্তু আজন্মলালিত সংস্কার তাতে প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠায় নিজের অজান্তেই ফুলজান তাদের মিলিত জীবনবীণার শেষ তারটি ছিঁড়ে ফেলেছিল। যে বীণার তার ছিন্ন হয়েছিল উত্তেজনার বশে রহিমের তাকে তালাক দেওয়ার

সূত্রে।

নতুন করে তার বেঁধে সুর বাজানোর আকাঙ্ক্ষা তাদের দুজনেরই ছিলো, ছিলো না সাধ্য। পরে রহিম তাতে সমর্থ হলেও ফুলজান আর সেই সাহস করতে পেরে উঠল না। এরপর ছেঁড়া তার আর কোনো দিনই বাঁধা সম্ভভব হলো না রহিমের আত্মহত্যার পরিণামে—হৃদয়বীণা, জীবনরাগিনী সবই থেমে গেল চিরকালের জন্যে।

'ছেঁড়া তার' নামকরণটির অন্তরালে এভাবেই ব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছে দুটি অসহায় মানুষের জীবনের করুণ ও নির্মম পরিণতি—ধর্ম, সমাজ অবস্থা ও ব্যক্তিগত শত্রুতা বারে বারে নিষ্ঠুর আঘাতে ছিঁড়ে দিয়ে গেছে তাদের জীবনবীণার তার—হাতের দিলরুবা আর দিলের রবাব—দুই-ই। তাই সুরহারা নিষ্প্রাণ হয়ে এ নাটকের ট্র্যাজেডিকে পরিসমাপ্তি দিয়েছে—ছিঁড়ে যাওয়া তার সেই বেদনারই দ্যোতক।

৫.৮ ট্র্যাজেডির উৎস ও পরিণতি : নেপথ্য পরিণাম

(ধর্মীয় সংস্কার/শ্রেণিশত্রুতা/দুর্ভিক্ষ)

'ছেঁড়া তার' নাটকে পঞ্চাশের মন্বন্তরকে পটভূমিতে রেখে উত্তরবঙ্গের একটি কৃষক পরিবারের বিধস্ত হয়ে যাবার কাহিনি বলা হয়েছে। তাদের জীবনের এই মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির জন্য দুর্ভিক্ষের একটা ভূমিকা থাকলেও, ঘটনা পরম্পরায় কাহিনির যে পরিণতি সূচিত হয়েছে, তাতে গ্রামের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিত্তবান এক সমাজপতির শত্রুতা প্রথমে এবং তারপর মুসলিম ধর্মের শরিয়তি বিধানের কিছু অমোঘ সংস্কারই নিয়ন্ত্রণ হয়ে উঠেছে। নাটকের নায়ক রহিম তুলসী লাহিড়ীর আগের বই "দুঃখীর ইমান"-এর নায়ক কি বিজন ভট্টাচার্যের "নবান্ন" নাটকের কুঞ্জের মতো নয়। সে বেশ খানিকটা লেখাপড়া জানা, সংস্কৃতিবান মানুষ—তাই ভালোমন্দ বিচারের ক্ষমতাটা একটু পরিশীলিত। আর সেই জন্যেই হাকিমুদ্দী দেওয়ালের শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সেই গ্রামের মধ্যে প্রথম রুখে দাঁড়াতে পেরেছে; পেরেছে হাদিসের অন্ধ বিধানের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করতে। এই গরীব কৃষক দুর্ভিক্ষে অন্নহীন হবার সূত্রে নিজের স্ত্রীপুত্রকে বাঁচাবার জন্য স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য হয়েছিল। এরই অনুষঙ্গে ধর্মীয় সংস্কারের অমোঘ তাড়নায় তার ও নাটকের ট্র্যাজেডি ঘটেছে।

শরিয়তি বিধান অনুসারে কোনো নারী তালাক পেলে তার সঙ্গে তার প্রাক্তন স্বামীর পুনর্বিবাহ তখনই সম্ভব যদি সে ইতিমধ্যে আর কারুর সঙ্গে নিকাহনামা পড়ে, তার সঙ্গে অন্ততঃ একদিনও ঘর করার পর তালাক নিয়ে আসে। এই জটিল ধর্মীয় বিধানটির সূত্রেই রহিম ও ফুলজানের যে বিচ্ছেদ আপাতভাবে অর্থনৈতিক কারণে ঘটেছিল—তা সম্পূর্ণ অন্ধ সংস্কারের নিয়ন্ত্রণে চলে গেল। এরই ফলে রহিমের আত্মহত্যা (পরবর্তীকালে এর বদলে ফুলজানের মৃত্যু ঘটনা) ও সমগ্র পরিবারটির বিপর্যয়।

এই তালাক কতটা অনিবার্য ছিল? দুর্ভিক্ষের কারণে গ্রামের সব চাষীর মতো রহিমরাও অন্নহীন হয়ে পড়েছিল। গ্রামের দুই মুরুব্বি-পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট আর হাকিমুদ্দী দেওয়ান সরকারী সাহায্যে লঙ্গরখানা খুলে বসে—অবশ্যই গরীব মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়াবার জন্যে নয়—নিজেদের অর্থকরী স্বার্থেই। তারা জানে সরকারী চালডালের বরাদ্দের একটা বড়ো অংশ তারা সরিয়ে ফেলে বুভুক্ষু কৃষক জনতার কাছে নিজেদের প্রতিপত্তি জাহির করতে পারবে—তাদের দুমুঠো পেটের ভাতের জন্য নিজেদের কাছে তাদের মাথা নুইয়ে দিয়ে। আত্মাভিমানী রহিম নিজে তো একেবারেই যায়নি, এমনকি প্রথমে স্ত্রীপুত্রকেও প্রথমে এই লঙ্গরখানায় যেতে দিতে চায়নি। ফুলজানকে সে বলেছে "ফুলজান মোর দুষমণের বাড়ী গেইলে মোর মান যাইবে রে।" (দ্বিতীয় অঙ্ক/তৃতীয় দৃশ্য)। কিন্তু ক্ষুধার্ত সন্তানের কান্না সইতে না

পেরে সে স্ত্রী ও পুত্রকে লঙ্গারখানার অন্ন সংগ্রহের জন্য পাঠাতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু যেহেতু সে চৌকিদারী ট্যাক্স দেয় (অর্থাৎ ধরে নিতে হবে অন্যদের চেয়ে তার অবস্থা নাকি ভালো!); তাই তার স্ত্রীপুত্র লঙ্গারখানার খাবার পাবে না—এই মর্মে এক সরকারী আদেশের দোহাই দিয়ে রহিমের পরম শত্রু হাকিম দেওয়ান তাদের তাড়িয়ে দেয়। এই নির্মম ঘটনাই রহিমের বিচার-বুদ্ধিকে সাময়িকভাবে তছনছ করে দেয়।

সে ভাবে ফুলজানকে তালাক দিয়ে দিলে সে তো আর রহিমের স্ত্রী থাকবে না; তখন সরকারী লঙ্গারখানায় তার পুত্রের খাবার পেতে কোনো বাধা থাকবে না। তাই সে অগ্রপশ্চাত বিবেচনা না করে তালাকনামা লিখে ফুলজানের হাতে ধরিয়ে দেয়। স্পষ্টতই এই তালাকের ঘটনাটি ঘটল হাকিমুদ্দীর কুটিলতা ও অমানবিকতার প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ায়। ফলে দুর্ভিক্ষের অনুষঙ্গ সরে গিয়ে এই পর্যায়ে মুখ্য হয়ে উঠল রহিমের সঙ্গে হাকিমের পুরোনো শত্রুতাটা।

এই তালাকের পরিণামে রহিম ও ফুলজানের মর্মান্তিক বিচ্ছেদে দুজনেই যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে যায়। একদিকে ফুলজানের জ্বলন্ত প্রশ্ন। কি তার দোষ; যার জন্যে স্বামী তাকে তালাক দিল। অন্যদিকে মুহূর্তের বুদ্ধি ভ্রংশের পরিণামে রহিমের মনেও তখন আত্মগ্লানির মমর্ন্তুদ যন্ত্রণা। ঠিক এই পর্যায় থেকেই দুর্ভিক্ষ ও শত্রুতাকে সরিয়ে কাহিনির মধ্যে ধর্মীয় সংস্কার প্রবল মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। যা এরপর আগাগোড়া নিয়ন্ত্রণ করেছে কাহিনি ও রহিমের জীবনকে।

হাদিসের বিধান অনুযায়ী তালাকপ্রাপ্তা ফুলজানের কাছে রহিম হয়ে গিয়েছে পরপুরুষ। তাই তাদের বাক্যালাপ নিষিদ্ধ এমনকী প্রাক্তন স্বামীর ঘরে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়া আপন সন্তানকে দেখার ব্যাপারেও রয়েছে ধর্মীয় বাধা। এই শরিয়তি সংস্কার ফুলজানকে নাটকের বাকি অংশ জুড়ে গ্রাস করে রেখেছে পুরোপুরি। রহিমের মনেও তার প্রভাব খুব কম ছিল না; সে বলেছে "মুসলমান হয়্যা হদীজ অমান্য কইরবার মুই-ও পারি না, তাঁয়ও পারে না।" [তৃতীয় অঙ্ক/প্রথম দৃশ্য]

কিন্তু এটাও সে মেনে নিতে পারে না যে ফুলজানকে অন্নসংস্থানের জন্যে দাসীবৃত্তি করতে হচ্ছে হাকিমের বাড়ীতে, তাদের একমাত্র সন্তান বসির মাকে হারিয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাই মর্মান্তিক যন্ত্রণায় সে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। যার শরিক ফুলজানও।

রহিমের হিতৈষীরা এই ভয়ংকর ধর্মীয় বিধানের ফাঁস থেকে রহিম, ফুলজান এবং বসিরকে মুক্ত করে তাদের জীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনতে চায়। তারা কানা ফকিরকে রাজি করায় ফুলজানকে নিকাহ করে পরদিনই তালাক দেওয়ার ব্যাপারে। বলাইবাহুল্য ফকির এ প্রস্তাবে রাজি হয় যথেষ্ট অর্থের বিনিময়ে।

রহিমের বন্ধুরা স্থির করেছিল ফুলজানকে ফকির তালাক দিয়ে দিলে, তিন মাস দশ দিনের ইদ্দতের কাল ফুরোলে তাকে ও রহিমকে পুনর্বিবাহ দিয়ে সমস্যার সমাধান করবে। কিন্তু এই পরিকল্পনার সূত্রেই কানা ফকিরের সঙ্গে হাকিম দেওয়ানের কুৎসিৎ বিরোধ ঘনিয়ে উঠল। কারণ ফুলজানের ওপর হাকিমের কুনজর থাকায় সে নানান অজুহাতে নিকায় বাগড়া দিতে থাকে ।

গ্রামের উত্তেজিত জনতা হাকিমকে শাসাতে যায় এবং ক্ষিপ্ত রহিম ফুলজানকে হাকিমের বাড়ি থেকে ঠেলে নিয়ে আসে নিজের সন্তানের কাছে। যে আবারও ফুলজানকে বলে, "চল ফুলজান হামরা গাঁও ছাড়ি চলি যাই.....গুনাহ হইবে? আচ্ছা গুনাহগারের আখেরি কথাটা শুনি রাখ। এইটাই তোর ঘর। তোর ছাওয়াল নিয়া তুই এইঠিই থাকবু। [তৃতীয় অঙ্ক/তৃতীয় দৃশ্য]

কিন্তু ফুলজান বলে "এইঠে থাকিলে হাদিজ খেলাপ হয়।" [ঐ]—ধর্মের সংস্কারকে এইবারে রহিম পুরোপুরি

কাটিয়ে উঠতে পারে; সে বলে "নিকার নামে বেইজ্জত হলে হদীজ খেলাপ হয় না। ছাওয়াটাক্ বাঁদীর বাচ্চা বনাইলে হদীজ খেলাপ হয় না। যে মানুষটা একটা মুখের কথা থাকি বাঁচে, তার জিউটা দুই পায়ে থেঁতলাইলে হদীজ খেলাপ হয় না—না?" [ঐ]

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই তার হাতের দিলরুবার তার ছিঁড়ে যায়। শোকে, গ্লানিতে উদ্ভ্রান্ত রহিম ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। ক্রুদ্ধ কৃষক জনতা যখন হাকিমকে মারতে মারতে রহিমের বাড়ি নিয়ে আসে। তখন দরজা ভেঙে দেখা যায় রহিম আত্মহত্যা করেছে।

অর্থাৎ রহিম এবং ফুলজান—দুজনের জীবনের নির্মম ট্র্যাজেডি ঘটবার পেছনে প্রবলতম কারণ হয়ে দাঁড়াল একটি অন্ধ ধর্মীয় সংস্কার-ই। একথা ঠিকই যে দুর্ভিক্ষের অনুষঙ্গেই এই ঘটনার মুখপাত ঘটেছে এবং তারপর বিত্তবান শ্রেণীশত্রুর শয়তানিতে তার পথ প্রশস্ত হয়েছে; কিন্তু পরিণামে অন্ধ ধর্মীয় সংস্কারের যূপকাষ্ঠে 'কোরবানী' হয়েছে একটি দরিদ্র কৃষক পরিবার। ক্রুদ্ধ কৃষক জনতা শয়তান হাকিম দেওয়ানকে রহিম ও ফুলজানের পুনর্মিলনের পথের বিঘ্ন দূর করতে প্রায় বাধ্য করে এনেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত ফুলজানের মনে স্বামীসন্তানের জন্য আকুলতা এবং অন্ধ ধর্মসংস্কার। এই দুয়ের প্রবল লড়াইয়ে দ্বিতীয়টিই জয়ী হয়েছে এবং তারই পরিণামে অনিবার্য হয়ে উঠেছে রহিমের মর্মান্তিক আত্মবিসর্জন। অথচ রহিম কিন্তু পেরেছিল ধর্মীয় অন্ধ সংস্কারকে কাটিয়ে ফেলতে। স্ত্রী ও সন্তানের প্রতি ভালোবাসার টানে। তবু অঘটন ঘটল। আর তার জন্যে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠল ফুলজানের অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্নতা, যা আর সবকিছুকে পরাজিত করল।

এই সূত্রেই আরো একটি কথা আলোচনার প্রয়োজন। ধর্মসংস্কার সংক্রান্ত যে প্রশ্নটি এখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, সেটি মূলত রহিম ও ফুলজানের মানসিকতাকে কেন্দ্র করেই। তারা সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বলেই ধর্মবিশ্বাসটা ও তাদের কাছে গুরুতর একটি বিষয়। কিন্তু তাদের স্বধর্মাবলম্বী হাকিমুদ্দী দেওয়ানের কাছে ধর্ম বিধানটিই অপরকে পীড়নের একটি মোক্ষম হাতিয়ার হয়ে ওঠে। সরকারী নির্দেশকে যেমন সে রহিমের সঙ্গে শত্রুতা করার অছিলা হিসেবে ব্যবহার করেছে। ঠিক তেমনই হাদীসের বিধানকেও সে একইভাবে কাজে লাগাতে চেয়েছে বৈর নির্যাতনের জন্যে। সে এবং রহিম—দুজনেই যে সমধর্মী। তা তার কাছে আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়; অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো এই ব্যাপারটি যে তারা দুজনে দুই পৃথক অর্থনৈতিক শ্রেণির অন্তর্গত যে দুটি শ্রেণির স্বার্থ পরস্পরবিরোধী। তাই মুসলমান হওয়া স্বত্ত্বেও রহিমের লাঞ্ছনা ও পীড়নে হাকিম একটু পরাঙ্মুখ হয়নি; কেননা তার চোখে রহিম এক মারাত্মক শ্রেণিশত্রু, যে তার সামাজিক আধিপত্যে আঘাত হেনেছে নির্ভীক প্রতিবাদের মাধ্যমে। আর এই সূত্রেই রহিম হয়ে উঠেছে হাকিমের ব্যক্তিগত পরমশত্রু। এই চরম ব্যক্তিগত শত্রুতার সম্পর্কটাই তাদের দুজনের মধ্যে সারা নাটক জুড়ে আগাগোড়া ক্রিয়াশীল থেকেছে। ফলতঃ তালাক সংক্রান্ত হাদীসের বিধানটিও যে এই শত্রুতার নিরিখেই হাকিম ব্যবহার করতে চেয়েছে। ধর্মসংস্কারজনিত কারণে নয়—সে বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

তাই এ নাটকে যে তিনটি উপাদান কাহিনীকে চালনা করেছে—দুর্ভিক্ষ, শ্রেণিশত্রুতা ও ধর্মীয় সংস্কার। সেগুলির গুরুত্ব বিচার করলে বোঝা যাচ্ছে দুর্ভিক্ষ দিয়ে সমস্যার সূত্রপাত হলেও, উচ্চবিত্ত হাকিম বনাম নিম্নবিত্ত রহিমের শ্রেণিশত্রুতা, যা পরে ব্যক্তিগত শত্রুতায় পর্যবসিত হয়। সেইটিই অধিক ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। আর এইসব কিছুকে ছাপিয়ে শেষ অবধি নাটকের পরিণতি সূচিত হয়েছে অন্ধ ধর্মসংস্কারের কাছে আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমেই। ফলে নাটকের ট্র্যাজেডির মূল কারণ হয়ে দাঁড়াল ধর্মীয় সংস্কারের বিষয়টিই।

৫.৯ মুখ্য চরিত্রগুলির পর্যালোচনা

(ক) **রহিম :** বাংলা নাটকে সচরাচর যেরকম কৃষক চরিত্র আমরা দেখতে অভ্যস্ত, 'ছেঁড়া তার'-এর নায়ক রহিম তাদের মধ্যে বেশ খানিকটা ব্যতিক্রম। কুচক্রী জোতদার হাকিমুদ্দীর ষড়যন্ত্রে রহিমের বাবা সমস্ত জমিজমা হারিয়ে গরীব হয়ে পড়ে। সে জন্যে ক্লাসের 'ফার্স্ট বয়' হওয়া সত্ত্বেও লেখাপড়া ছেড়ে রহিমকে আত্মনিয়োগ করতে হয় চাষবাসে। নিজের নিষ্ঠা, সততা ও পরিশ্রমের ফলে আবার কিছুটা স্বচ্ছলতাও তার জীবনে এসেছে। ফুলজান তার বিবি, বসির তাদের একমাত্র সন্তান।

রহিম ছোট বয়সে লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে গান-বাজনাতেও পটু ছিল। শিক্ষা, সঙ্গীতপ্রেম, মার্জিত রুচিবোধ, পরিশীলিত বুদ্ধি এবং উন্নত ও প্রবল আত্মাভিমানী ব্যক্তিত্ব তাকে সাধারণের মধ্যে বিশিষ্ট করে তুলেছে। আর সেকারণেই বাংলা সাহিত্যের পরিচিত ছকের কৃষক চরিত্রগুলির মধ্যে সে ব্যতিক্রম। তার জীবনে যে ট্র্যাজিক পরিণতি ঘটেছে সেটির পিছনেও রহিমের মার্জিত রুচিসম্পন্ন সংবেদনশীল মন এবং ব্যক্তিত্ববোধ কিছুটা যে কাজ করেছে তাতে সন্দেহ নেই।

রহিম গ্রামের মানুষের মধ্যে অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদের প্রবণতা জাগাতে চায়। তার দুঃখ "মানুষগুলার হাত-পাও-মাথা সবে আছে। কিন্তুক কাঁও পুরা মানুষ নয়।" সে নিজে উৎপীড়ক হাকিমুদ্দীর সঙ্গে সমানে টক্কর দিতে ভয় পায় না। হাকিমুদ্দীর গরু এসে তার ফুলগাছ মুড়িয়ে খেলে, তাকে সে পিঁজরাপোলে পাঠাতে দ্বিধা করে না।

অথচ এই একই লোক দুর্ভিক্ষের সময় যখন ক্ষুধার্ত গ্রামবাসীরা ক্ষিদের জ্বালায় ওই হাকিমুদ্দীরই গোলা লুট করার কথা বলে, তখন তাদের বোঝাতে চায় যে লুটপাটে আসল সমস্যার সমাধান হয় না; বরং তাতে মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়।

রহিমের চরিত্রের এই দুটি বিশিষ্ট দিক আপাতভাবে পরস্পরবিরোধী। একদিকে আবেগপ্রবণতা, অন্যদিকে যুক্তিনির্ভরতা। যুক্তির মাধ্যমে সে সামাজিক জীবনে নিজের ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় এবং চায় হাকিমুদ্দীর ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করতে। ওই যুক্তি ও বুদ্ধির সাহায্যেই, হাকিম যখন ষড়যন্ত্র করে তাকে মিথ্যে চুরির দায়ে পুলিশে দিতে চায়; সেটা সে ঠেকাতে সক্ষম হয়।

কিন্তু এরই পাশাপাশি তার অতি আবেগপ্রবণ স্বভাবের বশে সে এমন কিছু কাজ করে ফেলে যার পরিণাম হয় সুদূরপ্রসারী। ফুলজানকে তালাক দিয়ে ফেলা, হদীসের বিধান অমান্য করে তাকে নিয়ে দূরে চলে যেতে চাওয়া, কাহিনির শেষে আত্মহত্যা করা এসবের মধ্যে আবেগপ্রবণতার আধিক্যই প্রকাশিত।

তার চরিত্রের তৃতীয় মাত্রাটি হল প্রবল আত্মমর্যাদারবোধ। যা তাকে সর্বদাই সচকিত করে রেখেছে। এর জন্যেই সরকারী লঙ্গারখানা হলেও, সেটি হাকিমের বাড়ীতে বলে স্ত্রীপুত্রকে রহিম সেখানে পাঠাতে চায় না। কিন্তু ক্ষুধার্ত সন্তানের যন্ত্রণা সে সহ্য করতে পারে না। তাই আবেগের বশে সে তাতে এক সময় রাজি হয়ে যায়। এই মুহূর্তের আবেগতাড়না তার জীবনের যাবতীয় বিপর্যয়ের উৎসে। আবার কখনো এই আবেগের পেছনে তার একটি বিচিত্র যুক্তিবোধ ক্রিয়াশীল থাকে। তাই ফুলজানকে তালাক দেওয়ার হঠকারিতার নেপথ্যে তার এই ভাবনা কাজ করে যে : যেহেতু সে চৌকিদারী ট্যাক্স দিয়ে থাকে, তাই অর্থনৈতিকভাবে সে স্বচ্ছল (!)। অতএব সরকারী ফরমানে তার স্ত্রীপুত্র লঙ্গারখানায় খাবার পেতে পারে না। এই নির্মম নির্দেশনামা শুনে তার আবেগ যে অদ্ভুত যুক্তিশৃঙ্খলা খাড়া করল সেটি হলো এই যে—ফুলজানকে তালাক দিয়ে দিলে সে আর রহিমের স্ত্রী থাকবে না। তাহলে লঙ্গারখানায় খাবার পেতেও আর কোনো বাধা রইবে না।

আসলে যুক্তি ও আবেগের সহাবস্থান থাকলেও, রহিমের মন ও ব্যক্তিত্বে দ্বিতীয়টির প্রভাবই অধিক কার্যকরী

হয়েছে জটিল পরিস্থিতিগুলিতে।

রহিম ধর্মবিশ্বাসী যা তার আরো একটি চারিত্রিক মাত্রা। কিন্তু সেটা তার অন্তরের নিরঙ্কুশ বিশ্বাস। হাকিমুদ্দীর মতো সে ধর্মকে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার করে না—ভান করে না ধর্মের। তাই সে হাকিমকে মুখের ওপর বলতে পারে; "শয়তানী করি মানুষ ফাঁকি দেওয়া যায়, খোদাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না।" তাই হাদীস অমান্য করে ফুলজানকে নিয়ে শহরে যাবার পরামর্শে সে শিউরে ওঠে : "মুসলমান হয়া হদীজ অমান্য কইরবার মুইও পারি না, তাঁয়ও পারে না।" ফুলজানকে তালাক দিয়ে সে বেদনায় দীর্ণ হয়ে গেলেও তাকে সে ফিরে পেতে চায় হাদীস-শরিয়ত মেনেই।

কিন্তু যখন সেই সৎ প্রয়াসে নানাধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হল, যথা, হাকিমুদ্দীর শয়তানী, ফুফার অনিচ্ছা, কানা ফকিরের ইতরতা, ফুলজানের ভবিষ্যত নিয়ে হাকিম ও ফকিরের মধ্যে কুৎসিত বিতণ্ডা, এই সময় থেকেই আবার যুক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী রহিম আত্মস্থ হতে শুরু করে। হাদীসের বিধান অমান্য করে সে জোর করে ফুলজানকে নিয়ে আসে নিজের বাড়ীতে একমাত্র সন্তানের আরোগ্য কামনায়। কিন্তু সে পারলেও, ফুলজান পারে না ধর্মের অন্ধ সংস্কারকে এড়াতে।

এই নিরুপায়তায় রহিম আবার অকস্মাৎ চরম আবেগতাড়িত হয়ে পড়ে। যার মর্মান্তিক পরিণতি হয় তার আত্মহত্যা। যেখানে তার যুক্তিবোধ সম্পূর্ণ বিসর্জিত হয়ে গেছিল।

এইভাবে সমস্ত নাটক জুড়েই রহিমের মধ্যে একদিকে যুক্তিবোধ, অন্যদিকে আবেগপ্রবণতা। এ দুয়ের অবিশ্রাম টানাপোড়েন চলেছে। সম্পূর্ণ বিপ্রতীপ দুটি মাত্রার সহাবস্থানের ফলে তার চরিত্রটি নাটকীয় বিচারে নিঃসন্দেহে খুব আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু নাটকের শেষে যখন সারা গ্রামের মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছে হাকিমের বিরুদ্ধে; তখনই টানাপোড়েনের শিকার হয়ে রহিম আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়িয়েছে। নাটকের সমগ্র আয়তন জুড়ে সে প্রায় সর্বময় হয়ে থাকলেও, পরিণামে জীবনের সংগ্রামে এই পরাভব-স্বীকার তার চরিত্রকে ব্যর্থই করে দিয়েছে বলতে হবে।

(খ) **হাকিমুদ্দী :** এ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র নিঃসন্দেহে রহিমুদ্দী। কিন্তু নাট্যচালনার সক্রিয়-মাধ্যম অবশ্যই হাকিমুদ্দী। যাকে এ নাটকের প্রতিনায়কও বলা যেতে পারে। হাকিমুদ্দী এখানে সমাজের সেই বর্গের মানুষদের প্রতিনিধি যারা নিজেদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির জোরে সাধারণ অসহায় মানুষের ওপর অত্যাচার চালায়। তাদের শোষণ করে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্যে। ধর্ম, মানবিক আবেগ, সম্পর্ক, সবকিছুই তাদের কাছে এই স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার মাত্র।

এরকই এক পাষণ্ড খল চরিত্র হলো হাকিমুদ্দী।

আকালের সময় যেখানে গ্রামের সর্বত্র অন্নাভাব, অসহায় মানুষের হাহাকার সেখানে তার বাড়ীতে তিনটি বড়ো বড়ো ধানের গোলা। গ্রামের লোকের ভেঙে পড়া মাটির বাড়ী আর তার দোতলা টিনের ঘর। তাছাড়াও তার চারজন বিবি রয়েছে। মেহেদী রাঙা পাকাদাড়ি শোভিত এই 'রসিক' লোকটি আবার সর্বদা তম্বী নিয়ে ঘোরে আর কথার মাত্রায় থাকেন আল্লা। অথচ শঠতা, কপটতা, মিথ্যাভাষণ কোনো কিছুতেই তার আপত্তি নেই। সুদ নিয়ে কারবার করে, কালোবাজারীতেও তার যোগাযোগ আছে।

গ্রামের অতি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন এই দেওয়ানের সঙ্গে গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়ে রহিম। বস্তুত দুজনেই একই ধর্মাবলম্বী হলেও ব্যক্তিত্বের সংঘাতই তাদের মধ্যে শত্রুতার প্রধান কারণ হয়ে ওঠে। সৎ, প্রতিবাদী রহিম নানান ভাবে বিদ্রোহ করে হাকিমের অনাচার ও অপরাধের বিরুদ্ধে। তার এই 'দুঃসাহস' দেখে যারপরনাই ক্রুদ্ধ হয় হাকিমুদ্দী। তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে সে এমনকী চুরির মিথ্যা মামলাতেও রহিমকে ফাঁসাতে চায়।

গ্রামের লোকের ওপর নিজের আধিপত্য বজায় রাখতে সে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে শহরে গিয়ে বিশেষ দরবার করে নিজের বাড়িতেই সরকারী লঙ্গরখানা বসাবার ব্যবস্থা করে। বুভুক্ষু মানুষকে দুটো মুখের ভাত জোগানোর অছিলায় সে মূলত ফন্দি করে লঙ্গরখানা থেকে সরকারী বরাদ্দ চালডালের বৃহদংশ আত্মসাৎ করে গোলাজাত করবে যাতে কালোবাজারে দুর্ভিক্ষের সময় তার বাড়তি মুনাফা হয়। এ দুরভিসন্ধিতে তার সহায়ক হয় গ্রামের বোর্ড-প্রেসিডেন্ট কারণ দুজনেই বোঝে যে নিরন্ন মানুষগুলোর মুখে সামান্য ভাতটুকু দিলেই তারা সন্তুষ্ট হয়ে ধন্য ধন্য করবে। তাদের দুজনের গোলাভরা ফসলের দিকে ওরা আর নজর দেবে না।

এতেও তার মন ভরল না। তাই গরীব অভুক্ত গ্রামবাসীদের সে ধান কর্জ দিল এক নির্মম শর্তে যা তার স্বভাবের প্রতারক ও অমানবিক দিকটিকেই তুলে ধরে।

এই অমানবিকতা আরো প্রকট হলো যখন সে সরকারী বিধানের অজুহাত দেখিয়ে রহিমের স্ত্রী ফুলজান ও ছেলে বসিরকে লঙ্গরখানা থেকে খাবার না দিয়ে তাড়িয়ে দিল। বস্তুত এখানে রহিমের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত শত্রুতার দিকটাই বড়ো হয়ে উঠল। তাই রহিমকে জব্দ করার জন্যে সে তার প্রাণাধিক স্ত্রী ও সন্তানকে নিপীড়ন করল।

এই ঘটনার ফলশ্রুতিতেই ঘটে গেল "ছেঁড়া তার" নাটকের সবচেয়ে মর্মান্তিক ট্র্যাজেডিটি। অর্থাৎ রহিম-ফুলজানের তালাক যা এরপর থেকে সমগ্র কাহিনিটিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই ভাবে হাকিমুদ্দী তার ক্ষমতার জোরে নাটকের এবং নাটকের মুখ্য চরিত্রের অর্থাৎ রহিমের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারল।

গ্রামের সমস্ত সাধারণ মানুষই হাকিমের নিপীড়নের শিকার হয়েছে নানাভাবে। অথচ তার সরকারী প্রতিপত্তি ও অর্থবলের কারণে কোনো দিনই প্রতিবাদ করতে পারেনি। একমাত্র প্রতিবাদী মানুষ ছিল রহিম। ফুলজানের সঙ্গে বিচ্ছেদে সে-ও আত্মহারা হয়ে ছেলেকে নিয়ে শহরে চলে গেল। এবারে নিষ্কণ্টক হয়ে হাকিম তার অত্যাচার চালিয়ে যেতে লাগল গ্রামের অসহায় মানুষগুলোর ওপর। তালাকপ্রাপ্তা অসহায় ফুলজান আশ্রয় নিতে বাধ্য হল হাকিমের বাড়িতে দুটি পেটের ভাতের জন্য। তার সম্পর্কে হাকিমের কদর্য ব্যভিচারী মনোভাব নানা ইঙ্গিতে প্রকাশ করতে পরাঙ্মুখ হল না চারটি স্ত্রীওয়ালা এই দেওয়ান। এমনকী ফুলজানকে নিকা করে নিজের বাসনা চরিতার্থ করার (এবং অবচেতনে পরমশত্রু রহিমকে আরো অপমান করা) ইচ্ছাও সে পোষণ করত। কিন্তু তার এই আকাঙ্ক্ষায় বাধা পড়লো অকস্মাৎ রহিম গ্রামে ফিরে আসায়।

রহিম ও ফুলজান এবং সর্বোপরি বসিরের বেদনায় মর্মাহত হয়ে রহিমের বন্ধুরা স্থির করেছিল হদীসের নিয়ম মেনে ফুলজানকে কানা ফকিরের সঙ্গে নিকাহ দেওয়া হবে, যাতে কানা ফকির তাকে তালাক দিলে ইদ্দতের কাল শেষ হয়ে গেলে রহিম পুনরায় ফুলজানকে বিয়ে করতে পারে। কানা ফকির অর্থের বিনিময়ে সহজেই রাজী হয়ে যায় এই প্রস্তাবে। এদিকে মুখের গ্রাস লুঠ হয়ে যায় দেখে, হাকিম আর স্থির থাকতে পারে না। সোজা এসে চড়াও হয় রহিমের বাড়ী। অসুস্থ বসিরকে ফুলজানের দেখার ব্যাপারে প্রথমে ইসলাম ও ধর্মীয় বিধানের দোহাই দিয়ে বাধা দিতে চায় যে; তারপর কানা ফকিরের সঙ্গে ফুলজানকে নিয়ে বিকৃত ও ঘৃণ্য দরকষাকষি শুরু করে হাকিম।

তার লালসা, ঘৃণ্য স্বভাব এবং সর্বোপরি রহিমকে সর্ব অর্থে 'জানেপ্রাণে' মেরে ফেলবার ঐকান্তিক প্রয়াস ফুটে ওঠে তার এই আচরণে। প্রয়াস সফলও হয় তার।

আত্মাভিমানী রহিম ফুলজানের এই অপমানে দিশেহারা হয়ে কানা ফকিরকে তাড়িয়ে দিয়ে হাদীস অমান্য করে ফুলজানকে আনতে যায় হাকিমের বাড়ী। একমাত্র সন্তান বসিরকে বাঁচানোর তাগিদে। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। হাকিমের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। হাদীসকে ফুলজান অমান্য করতে পারে না। রহিমের জোরাজুরিতে বাড়ী ফিরে এলেও, সে সেখানে থাকতে রাজি হয় না। সব আশাভরসা শেষ হয়ে যাচ্ছে দেখে রহিম পাগলের মতো হয়ে

যায়। ঘরে ঢুকে আত্মহত্যা করে সে। হাকিমের এক চালে তার শত্রুনিধন হয়ে যায়।

কিন্তু গ্রামের লোকেরা আর নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে পারে না। রহিমের জীবনের এই মর্মান্তিক পরিণতিতে তারা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। তাদের সকলের শ্রেণিশত্রু পরম অত্যাচারী এই নিষ্ঠুর হাকিমুদ্দীর ওপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে তার সব অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে। সৎ এবং অসৎ এর মধ্যে নাটক জোড়া যে দ্বন্দ্ব দুটি প্রতিস্পর্ধীমাত্রার সৃষ্টি করেছে। নাটককে গতি দিয়েছে। রহিমের মৃত্যু আর হাকিমের পরাভবে সূচিত হয়েছে নাটকের সমাপ্তি। আর এই বৃত্তায়ন সম্পূর্ণ হয়েছে হাকিমের সক্রিয় শঠতা ও অসাধু ও কুটিল ষড়যন্ত্রের পরিণামেই। এ নাটকের ভিলেন হয়েও এইভাবেই হাকিমুদ্দী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে নাটকের গতিসঞ্চারে অবয়ব গঠনে।

(গ) **ফুলজান :** রহিম বনাম হাকিমের ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের ঠিক মাঝখানে রয়েছে রহিমের স্ত্রী ফুলজানের চরিত্রটি। নাটকের গোড়ায় রহিমের সঙ্গে হাকিমের সংঘাতটা ব্যক্তিত্বের লড়াই হলেও, তারপর থেকে নাটকের শেষ অবধি তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দু হয়েছিল ফুলজান-ই।

নিরপরাধ এই গৃহবধূ রহিমের সঙ্গে বিয়ের আগে তার ফুফার আশ্রয়ে বড়ো হয়েছে। পিতৃমাতৃহীন এই মেয়েটি একটু সুখের মুখ দেখেছিল রহিমের ঘরণী হয়ে। মুক্তমনা, শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিবান রহিম স্ত্রীকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। নিজের আধুনিক মানসিকতার ছাঁচে তাকে চাইতো সাজাতে। তাই শহর থেকে জুতো কিনে এনেছিল। স্বামীর প্রতি ভালোবাসায় ঘাটতি না থাকলেও গ্রামের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকা ও অশিক্ষার কারণে ফুলজান সংস্কার মুক্ত হতে পারেনি। তাই সে বলে "হামার গেরামের কোন বেটী ছাওয়াটা জুতা পিঁধে?" যুক্তিহীন এই সংস্কারাচ্ছন্নতাই তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো শত্রু হয়ে দাঁড়াল পরে।

আকালের সময় ক্ষুধার্ত ছেলের কান্নায় তার মাতৃ হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়। রহিমের পরমশত্রু হাকিমের বাড়ীতে যায় সে সরকারী লঙ্গরখানায় খাবার পাবার আশায়। যখন ফিরে আসে অপমানিত ও বিতাড়িত হয়ে, তখন তার প্রতি স্বামীর নিখাদ ভালোবাসাই তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো বিপর্যয় ডেকে আনল। স্ত্রীর এই অপমানে দিশেহারা হয়ে রহিম তাকে তালাক দিয়ে বসে, যাতে রহিমের স্ত্রী হবার 'অপরাধে' আর কখনো তাকে বঞ্চিত না হতে হয় দুটি পেটের ভাত জোগাড় থেকে। রহিম সম্পর্কে ব্যক্তিগত আক্রোশবশত হাকিম সরকারী বিধানের ছুতোয় ফুলজানকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তাদের এই পারস্পরিক শত্রুতার বলি হল অসহায় ফুলজান। তার বেদনার মাত্রা তীব্রতর হল কারণ স্বামীর সঙ্গে তার পারস্পরিক আবেগে কোনো ঘাটতি ছিল না তাও তালাক পেল সে। তবু আশা হারায়নি তার। কারণ স্বামী তাকে কথা দিয়েছিল অচিরেই সে সব ঠিক করে দেবে। কিন্তু ফুলজানের বেদনা তাতেও কমে না। ভালোবাসায় গড়া সংসার, স্বামী, একমাত্র সন্তান বসির। তালাকের নিয়মে সবই যে তার কাছে আজ "পর" হয়ে গেছে। তাই আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে তাকে ঠাঁই নিতে হয় হাকিমের বাড়ীতে "বাঁদী" হিসেবে।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরে রহিম ছেলেকে নিয়ে গাঁ ছেড়ে শহরে চলে যায়। ফুলজানকেও নাটকে দীর্ঘক্ষণ আর চাক্ষুষ দেখা যায় না। কিন্তু মায়ের জন্য বসিরের আকুলতা আর মুহূর্তের বিভ্রমে স্ত্রীর প্রতি চরম অন্যায় করে ফেলার অপরাধে রহিমের হাহাকার। এ দুই তীব্র আবেগের মাধ্যমে ফুলজানের অস্তিত্ব জাগরূক হয়ে থাকল নাটকের এ পর্যায়ে তার অনুপস্থিতি স্বত্ত্বেও।

এরপর রহিম গ্রামে ফিরে আসে। হাদিসের বিধান মেনে ফুলজানকে নিকা করে জীবন, সংসার ও সন্তানকে নতুন আশার আলো দেখাতে প্রয়াসী হয় সে।

কাহিনীতে আবারও সক্রিয় হয়ে ওঠে হাকিম। বরং বলা ভালো রহিমের প্রতি হাকিমের বিদ্বেষ। হাদিসের দোহাই দিয়ে সে ফুলজানকে বাধা দেয় রহিমের ঘরে গিয়ে তাদের অসুস্থ সন্তান বসিরকে দেখতে; বলে তালাকের পরে রহিম

তার কাছে "পরপুরুষ"। তাই তার ঘরে গেলে ফুলজানের গুনাহ হবে।

আগেই ফুলজানের সংস্কারাচ্ছন্নতার যে কথা বলা হয়েছে, তা এখানেও ক্রিয়াশীল হয়। 'পাপে'র ভয়ে সন্তান মায়ের বিহনে মৃতপ্রায় জেনেও সে সন্তানের কাছে যেতে পারে না। কিন্তু মাতৃহৃদয় তা মানতে পারে না। তাই রহিমের ঘরের ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে সে লুকিয়ে দেখতে যায় অসুস্থ বসিরকে।

নাটকের শেষ পর্বে ফুলজানের অস্তিত্ব সর্বময় হয়ে ওঠে। তাকে নিকা করার সূত্রে রহিম ও হাকিমের দ্বন্দ্বের ভাগীদার হয় আরেকজন কানা ফকির। আসলে ইসলামী নিয়মমতে কানা ফকিরের সঙ্গে নিকার একদিন পরেই ফুলজানকে সে তালাক দিলে, ইদ্দতের কাল শেষে রহিম আবার তাকে নিজের ঘরণী করতে পারবে। এমনই ব্যবস্থা করেছিল রহিমের বন্ধুরা। বলাবাহুল্য গরীব ও লোভী ফকির বেশ খানিকটা অর্থের বিনিময়ে এ কাজে সহজেই সম্মতি দিয়েছিল। ধর্মীয় বিধানের কারণে নিরুপায় হয়েই এই ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল রহিম এবং ফুলজানও। কিন্তু সমস্যা তৈরি হল, যখন কানা ও রহিমের এই চুক্তির মধ্যে হাকিম নাক গলালো তার ব্যক্তিগত অভিসন্ধি চরিতার্থ করতে। তার চারটি বিবি থাকা সত্ত্বেও ফুলজানের প্রতি কদর্য লালসার কারণে সে উঠে পড়ে লাগল কানার সঙ্গে ফুলজানের নিকাহ ভেস্তে দিতে। অবশ্য এর পেছনে রহিমকে কোনোভাবেই স্থিতি ও সুখ পেতে না দেবার প্রতিহিংসাও ক্রিয়াশীল ছিল যে, তা বলাই বাহুল্য।

এইখান থেকেই ফুলজান যেন হয়ে দাঁড়াল দুটি কামার্ত পশুর লালসার লড়াইয়ের উপলক্ষ। স্বামীর কাছে, সন্তানের কাছে ফিরে যাবার মাশুল হিসেবে সে পরিণত হল লোভের উপকরণে। তাকে নিয়ে ফকির ও হাকিমের নির্লজ্জ দরকষাকষি ও অশ্লীল ইঙ্গিত তার নারীত্ব, মাতৃত্ব এবং সর্বোপরি স্ত্রী মর্যাদা সবকিছুকে যেন ক্লেদাক্ত করে তুলল। অথচ এই পুরো প্রক্রিয়াটায় তার নিজস্ব কোনো ভূমিকা, কি অপরাধ—কিছুই ছিল না।

এই পরিস্থিতিতে অবশেষে তার সমস্ত সংস্কার মুছে ফেলে ভালোবাসার অধিকারে ফুলজানকে জোর করে নিয়ে আসে হাকিমের বাড়ি থেকে তাকে পণ্য করে তোলার অপমান থেকে মুক্তি দিয়ে সন্তানের জননী, আর সংসারের ঘরণী হিসেবে ফিরিয়ে দিতে চায় তার অপহৃত সম্মান। এইভাবে নিজের অপরাধের প্রায়শ্চিত্তও করতে চায় রহিম।

আবেগের টানে ফুলজান চলে আসে, কিন্তু তার পায়ের বেড়ি হয়ে দাঁড়ায় আজন্মলালিত ধর্মীয় কুসংস্কার। অসুস্থ সন্তানকে কোলে নিয়ে সে সাময়িক যন্ত্রণামুক্তি পেলেও, রহিমের ঘরে ফিরে যাবার আহ্বানে সাড়া দিতে পারে না। হৃদয় বনাম আজন্মের সংস্কারের লড়াইয়ে জয়ী হয় দ্বিতীয়টিই। আর এই মর্মান্তিক সত্য অনুধাবনে, অভিমানী রহিম বেছে নেয় আত্মহননের পথ। জীবন পরাজিত হয়, ভালোবাসা হেরে যায়।

ঠিক সেই মুহূর্তে ফুলজানও এক নিমেষে ছিন্ন করতে পারে তার সংস্কারের বন্ধন। পরমপ্রিয় ভালোবাসার মানুষ 'পরপুরুষ' রহিমের মৃতদেহের ওপর আছড়ে পড়ে সে ডুকরে কেঁদে ওঠে সর্বরিক্ত হবার নির্মম আঘাতে। গুনাহের ভয় আর তখন নেই। কিন্তু বড়ো দেরীতে এই মানসমুক্তি ঘটে তার। সৎ, নিরপরাধ, পতিপ্রাণা, স্নেহশীলা মাতা এই অসহায় মেয়েটি একদিকে সমাজপতির ক্ষমতার আর অন্যদিকে ধর্মীয় অনুশাসনের দোরোখা নিপীড়নে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেল। তাই নাটকের শেষে ফুলজানের জন্য পাঠকের অন্তরে সঞ্চারিত হয় অপরিসীম বেদনা ও মমতা।

৫.১০ গৌণ চরিত্রের পরিচয়

(ক) **মহিম :** রহিমের সহপাঠী বাল্যবন্ধু। জীবনে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েও প্রথম বয়সের প্রিয় সুহৃদকে ভোলেনি সে। এখনও তাকে সে খুব ভালবাসে এবং শুধু রহিমের জন্যেই নয়, তার স্ত্রী-পুত্রের জন্যেও খুশি হয়ে উপহার কিনে দেয়। যে দিলরুবাটি এই নাটকের প্রতীকসংকেত বলে গণ্য হতে পারে, সেই বাজনাটিও রহিমের হাতে তুলে দেয় মহিমই। রহিমের চূড়ান্ত দুঃসময়ে মহিমই তাকে সাহায্য করেছে, এমনকি সেই আকালের প্রহরেও তাকে যা হোক একটা চাকুরি জোগাড় করে দিয়েছে। মহিমকে এই নাটকের সর্বার্থেই একটি প্রীতিময় চরিত্র বলে ধার্য করতে পারি।

(খ) **কানা ফকির :** রহিমের সবচেয়ে বড় শত্রুদের মধ্যে এই ফকির দ্বিতীয় জন (প্রথম জন বলাই বাহুল্য, হাকিমুদ্দী)। এই লোকটি হাকিমুদ্দীর খয়ের-খাঁ-গোছের মানুষ ছিল, পুলিশের সামনে হাকিমুদ্দীর আনা চুরির অভিযোগে রহিমের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছিল, যদিও তা ধোপে টেঁকেনি। ফকির হলেও সে অর্থলোলুপ এবং কামাসক্ত, দুশ্চরিত্র। হাকিমুদ্দীয় সঙ্গে ঝগড়ার সময় তার গোপন ঘৃণ্য ব্যাধির কথা ফাঁস হয়ে গেলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। হাকিমের মতো সেও ফুলজানের প্রতি প্রবল লালসাপরায়ণ। আবার রহিমের তালাকী-বিবি ফুলজানকে নিকাহ্ এবং তালাকের জন্যে অসহায় ও দরিদ্র রহিমকে চাপ দিয়ে বেশি টাকা আদায় করতেও সে প্রবলভাবে সক্রিয়। সবদিক দিয়ে বিচার করলে, সে হাকিমুদ্দীয় মতো না হলেও শয়তানিতে বড় কম যায় না।

(গ) গৌণ চরিত্রগুলির মধ্যে কয়েকজনের কথা প্রসঙ্গসূত্রে বলাই যায়। যেমন, সুশান্ত, গোবিন্দ, শ্রীমন্ত, রহিমের মা। মহিমের বন্ধু সুশান্ত ও তার মতনই সহৃদয়, দুঃখী রহিমকে সে কয়েকবারই সান্ত্বনা দিয়ে, সহানুভূতি জানিয়ে তাকে একটু স্বস্তি দিতে চেষ্টা করেছে। গোবিন্দ এবং শ্রীমন্ত—এরা দুজনে রহিমের যথার্থ বন্ধু। নিজেরা দীন-দুঃখী হলেও, রহিমকে তারা যথাসাধ্য চেষ্টায় সাহায্য করেছে বারবার। গোবিন্দ স্বভাবে মজাদার মানুষ, শত দুঃখেও হাসি-ঠাট্টা-গান-গল্প করে সে। কিন্তু গভীর জীবনবোধও আছে তার। শ্রীমন্ত সাধারণ, সরল গ্রাম্য মানুষ। কিন্তু অন্যের কাছ থেকে ধার করে এনেও রহিমকে খাওয়াতে ব্যগ্র হয়েছে সে। দুর্বল স্বভাব, হাকিমুদ্দীকে ভয় পায়। তাকে তোষামোদও করে। কিন্তু মনুষ্যত্ব বিচ্যুত একেবারেই নয়। রহিমের মা দরিদ্র, কিন্তু মানসিকভাবে সম্ভ্রান্ততা আছে তাঁর। না খেয়ে মৃত্যু অনিবার্য, তবু তিনি পরিবারের সম্মান নষ্ট করে শয়তান হাকিমের কাছে অন্নভিক্ষা করেননি ; পরিণামে প্রাণও বিসর্জন দিয়েছেন।

৫.১১ নাটকের প্রাসঙ্গিকতা ও সামগ্রিক মূল্যায়ন

ইংরেজিতে যাকে 'পিরিয়ড-পিস্' (বিশেষ একটি কালকেন্দ্রিত সৃষ্টি, যার মধ্যে সমকালের ইতিহাস সুচিহ্নিত হয়েছে বলে), এমনই একটি নাটক হল 'ছেঁড়া তার'। পঞ্চাশের ভয়াবহ মন্বন্তর নিয়ে যে দুটি বাংলা নাটকের নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত, তাদেরই অন্যতম এটি (আরেকটি হল, বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন')। সেই ভয়াল আকালের ছবি এতে মর্মান্তিক এবং বিশ্বাসযোগ্যভাবেই রূপায়িত হয়েছে। ঐ সময়ের জনজীবনের ইতিহাসকে এই নাটকের মাধ্যমে এতকাল পরেও যথাযথ রূপে চেনা যায়। ঐ দুর্ভিক্ষ যে মানুষের তৈরি ছিল এবং শাসকগোষ্ঠী তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থকে বাড়িয়ে তুলতেই এটির সংঘটন করেছিল, এ নাটক সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। সমাজ ও অর্থনীতির উঠাপড়ার ক্ষেত্রে যাঁরা অভিনিবিষ্ট, তাঁদের কাছে তাই এর আবেদন আজও অক্ষুণ্ণ।

শিল্পগুণ বিচার করলে এ নাটকে অবশ্য খাম্‌তি নেই এমনটা বলা যাবে না। শেষ দিকে মেলেড্রামা বা অতি নাটকীয়তার ছোঁয়া এতে লেগেছে; বিশেষত ফুলজানকে রহিমের তালাক দেবার আকস্মিকতায় কিংবা রহিমের আত্মহননে (পাঠান্তরে, ফুলজানের মৃত্যুতে)। অধিকাংশ চরিত্রই একমাত্রিক। যে মন্দ, সে নিরঙ্কুশভাবে খারাপ। আবার যে ভাল,

তার কোনই ত্রুটি নেই। দুয়েকটি গৌণ চরিত্র অবশ্য এর ব্যতিক্রম।

তবে এ সত্ত্বেও, এ নাটকের আবেদন মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে। 'নবান্ন'-র মতো আশার আলো এর শেষে না দেখা গেলেও, জনপ্রতিবাদ ও প্রতিরোধ এখানেও আছে। সবটাই হতাশায় ভেঙে পড়ে আত্মসমর্পণ নয়। তাই সামগ্রিক মূল্যায়নে এইসব কিছুরই যোগ-বিয়োগ এর বিচার করতে গেলে, করতেই হবে।

৫.১২ এই নাটকের ভাষা, সংলাপ এবং গান

তুলসী লাহিড়ী ছিলেন অবিভক্ত বাংলার উত্তরাঞ্চলের রংপুর জেলার মানুষ এবং তাঁর জীবনের অনেকগুলো বছর সেখানেই অতিবাহিত হয়। এই নাটকে গ্রামের মানুষের মুখে ঐ অঞ্চলের কথ্যভাষাই শোনা যায়। রংপুরী এই বিভাষা সম্পূর্ণতই বাংলার বরেন্দ্রী উপভাষার (ডায়ালেক্ট) অন্তর্গত। বরেন্দ্রীর মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলির সবই এর মধ্যে পাওয়া যায়। 'গাবুর' (যুবক), 'ছাওয়া' (ছেলে), 'খুলীৎ বসি' (ফাঁকা মাঠে বসে), 'ছিড়া ফাটা ছ্যাওটা' (ছেঁড়া শাড়ি), 'চ্যাংড়া' (ছেলেছোকরা), 'কাউটাল' (অশান্তি) ইত্যাদি অজস্র স্থানীয় শব্দ খুব স্বচ্ছন্দেই এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। বরেন্দ্রী উপভাষার সর্বনাম এবং ক্রিয়াপদ বিধান এর সর্বত্রই দেখা যায়; যেমন : 'বাঁচবু', 'পালেয়া যাইবু', 'হাপসাইছো', 'হলু', 'গেছিনো', 'থাইকন্যার', 'খোয়াইবে' (যথাক্রমে, বাঁচব, পালিয়ে যাবে, শোক প্রকাশ করছ, 'হলি', গিয়েছিলাম, থাকতে, খাওয়াবে) ইত্যাদি; এবং 'হামার', 'মোক', 'উয়াত', 'তাঁয়' (আমার, আমাকে, ওতে, তাকে) ইত্যাদি।

সংলাপের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, নাগরিক চরিত্র মহিম, সুশান্ত, মহিমের ছেলেমেয়ে, দারোগা। এরা সকলেই মান্য বাংলা কথ্যভাষায় কথা বলেছে। রহিম যখন মহিমদের সঙ্গে কথা বলেছে, তখন তার শব্দপ্রয়োগ এবং বাগ্‌ভঙ্গী অনেক শীলিত; কিন্তু গ্রামের মানুষজনের সঙ্গে কথা বলার সময়ে তার মুখের সংলাপ ঠিক তাদের মতোই। হাকিমুদ্দীর মুখের ভাষায় একটু আরবি-ফারসি-উর্দুর উপস্থিতি দেখা যায়। ফুলজান এবং রহিমের মায়ের মুখে মেয়েলি শব্দ এবং বাচনভঙ্গি স্বাভাবিকভাবেই বেশি পরিমাণে এসেছে।

স্পষ্টতই, ভাষা এবং সংলাপের ব্যবহার করার সময়ে তুলসী লাহিড়ী বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। আর এ জন্যই 'ছেঁড়া তার'-এর ভাষাগত বাস্তবধর্মিতা এতটা বিশ্বাসযোগ্য।

□

এই নাটকে গানের সংখ্যা মোট আটটি। মহিমের কন্যা মায়া (১টি), রহিম (৩টি), গোবিন্দ (২টি), হাকিমুদ্দীর আধিয়ার (১টি) এবং কালীনাচের দলের জাম্বুবান-সাজা শিল্পী (১টি) এই গানগুলি গেয়েছে। এদের মধ্যে হাকিমুদ্দীর আধিয়ারের (অর্থাৎ, ভাগচাষি) গানটির প্রত্যক্ষভাবে মঞ্চায়ন হয়নি; রহিমের কথার মধ্যে ঐ 'শোল্লোক' (সুরে-বাঁধা ছড়া/গান) উল্লেখিত হয়েছে।

এই গানগুলির মধ্যে মহিমের মেয়ের গানটির ("ভুলের ফুলে ভরেছি মোর সাজি") বিশেষ কিছু তাৎপর্য নেই। সুখী একটি শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত নাগরিক পরিবারের পটভূমিটিকে নাটকের প্রথম দৃশ্যেই যেভাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন তুলসী লাহিড়ী ('দুঃখী' রহিমের সংসারের বিপরীতে), তার অনুষঙ্গে এই গানটি সংযোজিত। ভাব এবং ভাষায় গত শতকের চল্লিশের দশকের চলচ্চিত্রের বা 'আধুনিক' গানের সঙ্গে এই গানের বিশেষ ফারাক নেই।

ঐ দৃশ্যেই রহিমের একটি গান আছে ("ফালি চান্দের নাও ভাসি যায়") যা আবার ভাবে-রূপে ঐতিহ্যবাহী লোকসঙ্গীতের সঙ্গে একাত্ম। উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গানের মধ্যে যেমন সর্বদাই একটা কারুণ্য ভরে থাকে, সেই ভাবটি এখানেও আছে। এই গানটিতে বেশ খানিকটা আধ্যাত্মিকতারও প্রকাশ ঘটেছে; যেমন : "কোন্ খেয়ালী বয়

রে খ্যাওয়া দূর দূরান্তরে,/নয়নে না চিনি তারে চিনি যে অন্তরে।" এই ধরনের গানের বাণী খানিকটা বাউলধর্মীও বটে।

ঐ একই দৃশ্যে রহিমের মুখে আরও একটি গানের কিছু অংশ শুনি আমরা ("বড় মিয়ার বাঁদির সাথে যদি হইল সাদী") যেটি একেবারেই লঘু—ভাব ও ভাষায়। উত্তর বাংলার চট্‌কা গানগুলি এই ছাঁদে রচিত হয়ে থাকে এখনও।

এই ধরনেরই আরেকটি গান পরের দৃশ্যেই আছে ("হাকিমুদ্দীর বুদ্ধিশুদ্ধি চুষি খাওয়ার কায়দাতে")—চট্‌কার ঢঙে তৈরি, তবে এই গানটি মূল কাহিনির সঙ্গে বিষয়গতভাবে সম্পর্কিত। হাকিমুদ্দীর ভাগচাষীই যদি তার সম্ভবন্ধে এ ধরনের তিক্ত টিপন্নী কেটে গান বাঁধে, তাহলে অন্যরা যে তার বিষয়ে কী ভাবে, বলে—সেটা সহজেই বোঝা যায়।

ঐ একই দৃশ্যে কালীনাচের দলের 'জাম্বুবান' সাজা লোকগায়কটির গলায় শোনা যায় যে গানটি ("শুনরে গ্রামের কথা"), তার মধ্যে দারিদ্র্য-দুঃখ-ব্যাধি-অশিক্ষা-শোষণ-ধর্মীয় প্রতারণা ইত্যাদি যে কীভাবে গ্রামের জীবনকে আর্ত করে রেখেছে, সেটির পরিচয় মেলে। এই একটি গানেই সমস্তটুকু আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত প্রমূর্ত হয়ে ওঠে। এদিক থেকে গানটি গুরুত্বপূর্ণ। এর রচনাভঙ্গীকে অনেক পরিমাণেই গম্ভীরা পালার গানের সঙ্গে সমতুল্য বলা যায়।

ঐ দৃশ্যেই রহিমের কণ্ঠে আরেকটি গান শোনা যায় ("স্বপ্নে দ্যাখোঁ মরি যায়া")। আপাত লঘুবাচনে রচিত হলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে এটিও নাটকের ভাবরূপের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। মৃত্যুর পর কী হবে, এমন একটি কল্পনার মধ্যে হাকিমুদ্দীর প্রসঙ্গ এনে রহিম বলেছে, "উয়ার যদি মাফি হয় মোর কোনয় ডর নাই" এবং এই সূত্রে হাকিমের চরিত্রের কালো দিকটাও ইঙ্গিতে ব্যঞ্জিত হয়েছে এই গানে।

দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অঙ্কেরও দ্বিতীয় দৃশ্য দুটিতে গোবিন্দের মুখে দুটি গান শোনা যায়, যার মধ্যে প্রথমটিকে (না-খাওয়া শুটকাটা তার শুটকীক্ ডাকি কয়") 'জাম্বুবানের' গানের পরবর্তী পর্যায় বলেই ধার্য করা যায়। দুর্ভিক্ষের ভয়ঙ্কর ছবি এই মর্মান্তিক সত্যপ্রকাশ করা গানটির মধ্যে আতীব্র যন্ত্রণায় ফুটে উঠেছে। আর পরের গানটি, ("ভুল না রেখ মনে বাঁচবে যত কাল/সোনার দেশে ক্যান এল পঞ্চাশের আকাশ") প্রথমটিরই গম্ভীর-উত্তরসরণ। সমকালীন গণনাট্য আন্দোলনে বিশেষ করে গণনাট্যসঙ্ঘের গানে এই ধরনের ভাষা-চিত্রকল্প ইত্যাদি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

'ছেঁড়া তার' নাটকের বিভিন্ন গানের মধ্যে যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলি এই নাটকের উপজীব্য বিষয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবেই জড়িত। চল্লিশের/পঞ্চাশের দশকে গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে-ঘুরে নবনাট্য-গণনাট্যের শিল্পীরা নাটকাভিনয় করতেন যখন, তখন বাংলা লোকনাটকের ছাঁদে গানের ব্যবহারও হামেশাই করতে হতো তাঁদের গ্রামীণ দর্শক সাধারণের মনের কাছে পৌঁছনোর জন্য। এ নাটকেও তাই গানের এমন প্রচুরায়ত প্রয়োগ হয়েছে।

৫.১৩ বিস্তৃত প্রশ্ন

১। গণনাট্য ও নবনাট্যের আদর্শগত পার্থক্য আলোচনা করে দেখান কিভাবে "ছেঁড়া তার" নাটকটি "নবান্নে"-র থেকে আলাদা মাত্রায় অন্বিত হয়েছে।

২। "ছেঁড়া তার" নাটকটি মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে কি? যুক্তিসহ আপনার বক্তব্য উপস্থাপিত করুন।

৩। "ছেঁড়া তার" নাটকের গঠনাঙ্গিকের অভিনবত্ব রয়েছে এর শেষ দৃশ্যটিতে। প্লট-নিরীক্ষার সূত্রে সেই অভিনবত্বটি কেমন সে বিষয়ে আলোচনা করুন।

৪। "ছেঁড়া তার" নাটকে ধর্ম, সমাজ ও ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব সর্বময় হয়ে থেকেছে মানবিক আবেগের বয়নে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করুন নাটকটির নামকরণ কেন ব্যঞ্জনাধর্মী হল। এই নামকরণটি যথার্থ হয়েছে কি?

৫। রহিমুদ্দী চরিত্রটির বিশ্লেষণ করে দেখান কেমনভাবে চরিত্রে নানান মাত্রার সহাবস্থানে এই মানুষটি নাটকের উজ্জ্বলতম উপস্থিতি হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।

৬। ফুলজান কি শুধুই নাটকের অলংকরণ? নাকি কাহিনির জটিলতার সৃষ্টিতে তার চরিত্রের কোনো বিশেষ গুরুত্ব আছে?

৭। হাকিমুদ্দী কি টিপিক্যাল খলনায়ক, না এই নাটকের শ্রেণিশত্রুদের প্রতিনিধি? আপনার মতামত জানান।

৮। "ছেঁড়া তার" নাটকের ট্র্যাজেডির উৎস কি? যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করুন।

৫.১৪ অবিস্তৃত প্রশ্ন

১। নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করুন।

২। নাটকের প্রথম দৃশ্যের তাৎপর্য বিচার করুন।

৩। মুখ্য না হয়েও কিভাবে ফুফা ও কানা ফকির নাটকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, সে বিষয়ে আলোচনা করুন।

৪। এই নাটকে যে বিশিষ্ট ভাষাভঙ্গী প্রয়োগ করা হয়েছে, সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৫। এ নাটকে একাধিক গানের ব্যবহার আছে, এর যাথার্থ প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় করুন।

৬। এ নাটকের শহুরে চরিত্র মহিম—এই চরিত্রটির উপস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করুন।

৫.১৫ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। "পাতাবাহারটি বাড়ির ভেতরে।"—কার সম্পর্কে, কে, এই উক্তি কার কাছে করেছে?

২। রহিমের দিলরুবার দাম কত ছিল? হাকিমুদ্দী সেটার দাম কত বলেছিল?

৩। জাম্বুবান নাম দিয়ে গান বেঁধেছিল কে? ঐ গানে বলা, "মুখটা ঠোসা প্যাট ড্যাংরা হাত পা ছিনা মড়া"—কথাগুলির মানে কী?

৪। "তাতে তোক্ ফারকৎ করি দেনো।"—এই কথার তাৎপর্য কী?

৫। "নিত্যকালের নয়ত রাহুর বল"—এই কথাটা কোন্ সূত্রে, কোথায় বলা হয়েছে?

৬। "আল্লা, অঁয় কি জুড়াইছে"—কথাটির অন্তর্লীন তাৎপর্য কী?

একক ৬ □ বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'

গঠন

৬.০ উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা

৬.১ প্রস্তাবনা ঃ তপস্বী ও তরঙ্গিনী ঃ প্রাক্-কথন

৬.২ উৎস ও অনুষঙ্গ ঃ সারাংশ ও আলোচনা

৬.৩ পুরাণের পুনর্জন্ম

৬.৪ তপস্বী ও তরঙ্গিনী ঃ আঙ্গিক-বিচার

৬.৫ কাব্যনাট্য হিসেবে 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'

৬.৬ চরিত্রায়ণ

৬.৭ অন্যান্য চরিত্র

৬.৮ অনুশীলনী

৬.৯ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৬.০ উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা

আমি কবি, এ সংগীত রচিয়াছি উদ্দীপ্ত উল্লাসে,
এই গর্ব মোর—
আমি যে রচিব কাব্য, এ উদ্দেশ্য ছিল না স্রষ্টার।
তবু কাব্য রচিলাম। এই গর্ব বিদ্রোহ আমার।

উদ্দীপ্ত তারুণ্যের উদ্ধত এ দাম্ভিক উচ্চারণে একদিন সূচিত হয়েছিল আধুনিক বাংলা কবিতার নবজন্মের ব্রাহ্মমুহূর্ত। 'বন্দীর বন্দনা'য়, আধুনিক কবিতার আন্দোলনের পুরোহিত বুদ্ধদেব বসু স্বয়ং। কবিতা-গল্প-উপন্যাস-কাব্যনাটক-প্রবন্ধ-সমালোচনা, সাহিত্যের প্রায় সব ক'টি শাখা পল্লবিত ও পুষ্পিত হয়েছিল তাঁর সুঅধীত সংবেদী মননের জলসেকে। পত্রিকা-সম্পাদনাও বুদ্ধদেব বসুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত। বাংলা সাহিত্যধারায় বুদ্ধদেব বসু তাই স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট এক অধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত জীবনকথা

বুদ্ধদেব বসুর জন্ম ৩০ নভেম্বর ১৯০৮ (১৫ অগ্রহায়ন ১৩১৫), কুমিল্লায়। পিতা ভূদেবচন্দ্র বসু, মাতা বিনয়কুমারী। 'আমার ছেলেবেলা'য় বুদ্ধদেব জানিয়েছেন—'আমি বিনয়কুমারীর প্রথম ও শেষ সন্তান—আমার জন্মের পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রসবোত্তর ধনুষ্টঙ্কার রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। ... ভূদেবচন্দ্র পত্নীকে হারিয়ে বছর খানেকের জন্য পরিব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। এই দুই কারণে আমি আমার মাতামহ-মাতামহীর ঘরেই

মানুষ হয়েছিলাম—কার্যত তাঁরাই ছিলেন আমার পিতামাতা। ... তথ্যের দিক থেকে হয়তো বলা দরকার যে আমার মাতৃকুল পিতৃকুল দুয়েরই আদিনিবাস ছিল বিক্রমপুরে—গ্রামের নাম যথাক্রমে বহর ও মালখানগর। পরবর্তীকালে যে কন্যাকে বিবাহ করলাম তাঁর পিতৃভূমিও বিক্রমপুরেরই অন্তর্ভুক্ত।"

১৯২৩ সালে প্রাক্-ম্যাট্রিক শেষ দুটি ক্লাস পড়বার জন্য ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হন। ঢাকার 'তোষিণী' পত্রিকায় প্রথম কবিতা মুদ্রিত হয়। ১৯২৪-এর অক্টোবরে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মর্ম্মবাণী' প্রকাশিত হয়। ১৯২৫-এ ম্যাটিক পরীক্ষার প্রথম বিভাগে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন ও ঢাকা ইন্টারমেডিয়েট কলেজে ভর্তি হন। ১৯২৬-এ 'কল্লোল' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩) পত্রিকায় 'রজনী হল উতলা' গল্প প্রকাশিত হলে আধুনিক সাহিত্যের প্রতিপক্ষ 'শনিবারের চিঠি'র আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে ওঠেন বুদ্ধদেব বসু। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে অনার্সসহ বি.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। এই সময়েই প্রকাশিত হয় 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যগ্রন্থ, 'সাড়া' উপন্যাস। ১৯৩১-এ ইংরেজিতে এম.এ-পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং এবছরই ঢাকা ছেড়ে চলে আসেন কলকাতায়।

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুলাই বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন রাণু (প্রতিভা) সোমের সঙ্গে। ঐ সময়েই রিপন কলেজে (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। ১৯৩৫-এ ১ অক্টোবর ত্রৈমাসিক 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের যুগ্ম সম্পাদনায়। সহকারী সম্পাদক ছিলেন সমর সেন। তারপর একে একে প্রকাশিত হয়েছে কঙ্কাবতী, নতু পাতা, দময়ন্তী, দ্রৌপদীর শাড়ি, শীতের প্রার্থনা, বসন্তের উত্তর প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ; নির্জন স্বাক্ষর, মৌলিনাথ, রাত ভ'রে বৃষ্টি-র মতো উপন্যাস। অনুবাদ করেছেন কালিদাস এবং শার্ল বোদলেয়ার; প্রকাশিত হয়েছে 'সঙ্গঃ নিঃসঙ্গতা ও রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য' কিংবা 'An Acre of Green Grass' প্রভৃতির মতো সমালোচনা গ্রন্থ। ইতিমধ্যে পেনসিলভেনিয়ায় একবছর অধ্যাপনা করেছেন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে প্রধান অধ্যাপক পদে যোগ দিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন; আমন্ত্রণ পেয়েছেন স্বদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৬৭ সালে 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' কাব্যনাটকের জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন। বস্তুত, কালসন্ধ্যা, অনাম্নী-অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ কাব্যনাটকগুলি বুদ্ধদেবের কবিপ্রতিভাকে অন্য এক মাত্রায় ধারণ করে আছে। ১৯৭০-এ ভারত সরকার কর্তৃক তিনি 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ১৮ মার্চ কলকাতার স্বগৃহে কবির মৃত্যু হয়। 'স্বাগত বিদায়' কাব্যগ্রন্থের জন্য মরণোত্তর রবীন্দ্র পুরস্কার প্রদান করা হয় তাঁকে।

৬.১ প্রস্তাবনা ঃ তপস্বী ও তরঙ্গিনী ঃ প্রাক্‌কথন

'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'র বিষয়বস্তু অনেকদিন ধরেই যে বুদ্ধদেবের কল্পনালোকে লালিত হয়েছে তার প্রমাণ 'কবিতার শত্রু ও মিত্র' গ্রন্থে এই নাটক রচনার পশ্চাৎপট নিয়ে তাঁর অভিমতে। সেখানে তিনি লিখেছেন—

"একবার একটা নাটক ভেবেছিলাম সাবিত্রীকে নিয়ে—বহুকাল ধরে লালন করেছিলাম মনে-মনে। অবশেষে সেটা পর্যবসিত হল একটা দীর্ঘ কবিতায়, রোম আর কীট্‌স-এর মৃত্যু দিয়ে যার আরম্ভ এবং যার শিরোনামায়

সাবিত্রীর নাম উল্লিখিত হয়নি। কিন্তু আরো ভালো উদাহরণ হয়তো 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'-এ নাটকটাকেও কাব্য জাতীয় রচনা বলে ধরে নিচ্ছি—সেটা আমি লিখেছিলাম আটান্ন বছর বয়সে, কিন্তু প্রথম যখন ভেবেছিলাম তখন আমি সবে মাত্র উত্তর তিরিশ। সেই আমি প্রথম নিচ্ছি কালীপ্রসন্নর মহাভারতের আস্বাদ; সব বিস্তার ও অনুপুঙ্খ সমেত ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান পড়ে চমকে উঠেছি—এর আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা'র বাইরে কিছু জানতাম না। দুর্ভিক্ষের পশ্চাৎপট, গাঁয়ের মেয়েরা, অজ্ঞান কিশোর তপস্বী ও বিদগ্ধ চতুর বারাঙ্গনার প্রথম দৃষ্টি বিনিময়ের আশ্চর্য মুহূর্ত—এ সবই আমার কল্পনায় ধৃত হয়েছিল তখন, রূপকল্পের আভাস জুগিয়েছিল এলিয়েটের 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রেল' নাটকটা। মনে পড়ে লিখেও ফেলেছিলাম গাঁয়ের মেয়েদের মুখের প্রথম দুটো লাইন—সে-দুটো দিয়েই তপস্বী ও তরঙ্গিনীর আরম্ভ, যদিও সাতমাত্রা ছন্দ ও প্রথম দুটো শব্দ ছাড়া আদি লেখনের আর কিছুই সেখানে রক্ষিত হয়নি। এক্ষেত্রে আমি বোধ হয় জানি, আগে লিখে উঠতে পারিনি কেন, কেন আমাকে বা রচনাটিকে—এত দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল। প্রথম পরিকল্পনার সময় আমি ঋষ্যশৃঙ্গ বিষয়ে যথেষ্ট জানতাম না, বিষয়টির মর্মস্থলে প্রবেশ করিনি তখনও, সেটিকে একটি স্বকীয় রচনায় জীবন্ত করে তোলার মতো তহবিল আমার ছিল না। সেগুলি সংগৃহীত হল নানা দেশে ঘুরে বেড়াবার ও ক্লাসে পড়াবার সময়, পড়াবার জন্য অনেক বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে বিশ্ব পুরাণে আমার বিবর্ধমান কৌতূহলবশত। যাকে গবেষণা বলে সেটা পণ্ডিতমহলের মনোপলি নয়, মাঝে মাঝে কাব্য রচনাতেও তার প্রয়োজন ঘটে, এই কথাটি বোঝার জন্য আমাকে অনেকগুলো বন্ধুর বছর বাঁচতে হয়েছিল।"

'তপস্বী ও তরঙ্গিনী', 'দেশ' পত্রিকার এপ্রিল ১৯৬৬-র পাঁচটি সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। 'ঈষৎ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন' করার পর গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ আগস্ট, তথা শ্রাবণ ১৩৭০-এ, আনন্দ পাবলিশার্স থেকে।

লেখকের মন্তব্যটি এখানে স্মরণীয়—

"এই নাটকের অনেকখানি অংশ আমার কল্পিত, এবং রচনাটিও শিল্পিত—অর্থাৎ, একটি পুরাণ কাহিনিকে আমি নিজের মনোমতো করে নতুনভাবে সাজিয়ে নিয়েছি, তাতে সঞ্চার করেছি আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ববেদনা। বলা বাহুল্য, এ-ধরনের রচনায় অন্ধভাবে পুরাণের অনুসরণ চলে না; কোথাও-কোথাও ব্যতিক্রম ঘটলে তাকে ভুল বলাটাই ভুল। আমার কল্পিত ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনী পুরাকালের অধিবাসী হয়েও মনস্তত্ত্বে আমাদেরই সমকালীন; এটা যদি গ্রাহ্য হয়, তাহলে 'ত্রেতা' যুগের চরিত্রের মুখে 'দ্বাপর' যুগের উল্লেখ থাকলেও কোনো মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।"

এই সূত্র ধরেই আমরা পৌঁছে যেতে পারি 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'-র উৎস-সন্ধানে।

৬.২ উৎস ও অনুষঙ্গ ঃ সারাংশ ও আলোচনা

পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ও বৌদ্ধজাতকে নিহিত 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'-র উৎস। রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' কবিতাও এই কথাবস্তুর আধার। এছাড়াও জেসি ওয়েস্টনের From Ritual to Romance গ্রন্থটিতে বিধৃত

বিভিন্ন আদিকল্প কাহিনিও বুদ্ধদেব বসুকে সম্ভবত প্রাণিত করেছিল। বইটি যে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিল চিঠিপত্রে তার প্রমাণ আছে।

পুরাণ-বর্ণিত ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনি রাজা দশরথকে শুনিয়েছিলেন তার মন্ত্রী ও সারথি সুমন্ত্র, রামায়ণে তার উল্লেখ আছে। সেখানে কাহিনিটি এইরকম—

অঙ্গদেশের রাজা ছিলেন লোমপাদ। সে রাজ্যে অনাবৃষ্টিজনিত বিপর্যয় দেখা দিলে তাঁর মন্ত্রীরা লোমপাদকে পরামর্শ দিলেন, মায়াবলে ঋষ্যশৃঙ্গাকে রাজ্যে নিয়ে আসতে পারলে তবেই এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। কেননা, তাঁরা জেনেছিলেন আজন্ম কুমার ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্য ভঙ্গ করে তাঁকে নগরে আনতে পারলেই রাজ্যে বৃষ্টি নামবে। তাই ছলাকলায় পটীয়সী বারাঙ্গানাদের ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্যহরণের কাজে নিযুক্ত করলেন তাঁরা। বারাঙ্গনার দল নানাভাবে ঋষ্যশৃঙ্গাকে মুগ্ধ করে তাঁর কৌমার্য হরণ করলো। সঙ্গম-পরিতৃপ্ত ঋষ্যশৃঙ্গা অঙ্গরাজ্যে প্রবেশ করলেন। তখন নামল বৃষ্টি। আর রাজকন্যা শান্তার সঙ্গে বিবাহ হল ঋষ্যশৃঙ্গের।

মহাভারতের বনপর্বের ১১১ সংখ্যক অধ্যায়ে ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনি রয়েছে। লোমশমুনি বনবাসী রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই উপাখ্যানটি বিবৃত করেন। সংক্ষেপে সে কাহিনি এইরকম—

ঋষি বিভাণ্ডকের পুত্র কুমার ঋষ্যশৃঙ্গ। মৃগীর গর্ভে মাথায় একটি শৃঙ্গসহ তাঁর জন্ম। অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মিথ্যাচার এবং পুরোহিতদের প্রতি অত্যাচার করলে ইন্দ্রদেব রুষ্ট হয়ে তাঁর রাজ্যে বর্ষণ বন্ধ করে দিলেন। ফলে রাজ্যে দেখা দিল খরা, দুর্ভিক্ষ ও হাহাকার। তখন কোনো তপস্বী রাজাকে উপদেশ দিলেন—সরলস্বভাব এবং নারী-পরিচয় বর্জিত আজন্ম বনবাসী ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্য ভঙ্গ করে তাঁকে নগরে আনতে পারলেই অঙ্গাদেশে বৃষ্টি নামবে, ফসল ফলবে। তাই ছলনার দ্বারা ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্য হরণ করে অঙ্গারাজ্যে তাঁকে নিয়ে আসার জন্য নিয়োগ করা হল চতুরা বারাঙ্গানাদের। কিন্তু, তারা ভয় পেল ঋষ্যশৃঙ্গের তপোবলকে, ধ্বংস হবার ভয়ে শেষ পর্যন্ত সম্মত হল না এই দুরুহ কার্যে। অবশেষে এক প্রবীণা বারাঙ্গানা প্রচুর উপঢৌকনের শর্তে এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হয়। সেই প্রবীণার পরামর্শে রূপযৌবনবতী একদল বারাঙ্গানা বিলাস-বিভ্রমে মুগ্ধ, সম্মোহিত করে ঋষ্যশৃঙ্গাকে নগরে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। ঋষ্যশৃঙ্গের নগরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় বৃষ্টি, রাজা লোমপাদ কন্যা শান্তার সঙ্গে বিবাহ দেন ঋষ্যশৃঙ্গের। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গের-জনক বিভাণ্ডক প্রথমে তাঁর পুত্রকে স্বধর্ম ভ্রষ্ট করবার জন্য রাজা লোমপাদকে অভিযুক্ত করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পরে পুত্রের রাজৈশ্বর্য-বৈভব দেখে খুশি হয়ে তাঁকে রাজপুরীতে বসবাসের অনুমতি দেন। ঋষ্যশৃঙ্গা ও শান্তার সন্তান জন্মাবার পর দুজনেই রাজধানী ত্যাগ করে অরণ্য-আশ্রমে ফিরে যান।

বৌদ্ধজাতকের অন্তর্গত 'অলম্বুষা জাতক' ও 'নলিনিকা জাতক'-এ ঋষ্যশৃঙ্গ কাহিনির উল্লেখ পাই আমরা। অলম্বুষা জাতকে ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম, তাঁর তপস্যার তেজে ইন্দ্রের আতঙ্ক এবং তপস্যা ভঙ্গের জন্য অলম্বুষা নামে এক অপ্সরাকে প্রেরণ এবং অপ্সরার আলিঙ্গনে ঋষ্যশৃঙ্গের ব্রহ্মচর্য নাশ, কিছুদিন তপোভ্রষ্টভাবে ঋষ্যশৃঙ্গের জীবনযাপন, শেষে আত্মসংযমের মাধ্যমে কামানুরাগ পরিহারপূর্বক তপোবল পুনর্লাভের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

আর 'নলিনিকা জাতকে'-ও ঋষ্যশৃঙ্গের তপস্যায় ইন্দ্রের আতঙ্ক ও তপস্যাভঙ্গের জন্য রমণী প্রেরণের কথা আছে। তবে প্রথম জাতকের কাহিনির মতো সে-রকণী কোনো অপ্সরা নয়। সে-নারী রাজকুমারী নলিনিকা। নির্দেশমতো এই রাজকন্যা নলিনিকা 'নরনারী সম্পর্কে ভেদ জ্ঞান দান' করে, ঋষ্যশৃঙ্গাকে বিলাস-বিভ্রমে বিমুগ্ধ করে 'শীলভ্রষ্ট' করা মাত্রই ইন্দ্রদেব বারাণসী রাজ্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটালেন।

Jessie Weston তাঁর From Ritual to Romance গ্রন্থে প্রাসঙ্গিকভাবে মহাভারতের এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় The Freeing of Water অংশে 'গ্রেল লিজেন্ড' এর আদিপর্বের আখ্যানরূপে ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনিকে দেখেছেন। সি ওয়েস্টন অবশ্য এই আখ্যান ভাগ গ্রহণ করেছেন ভন শ্রোয়েডার-এর মহাভারতীয় কাহিনির উল্লেখ থেকে সরাসরি মহাভারত থেকে নয়। The Freeing of Water-এর কথাবস্তুর সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটকের কাহিনি-পরিকল্পনার যেন কোথাও নৈকট্য রয়েছে। রাজ্যে অনাবৃষ্টি, নারী সম্পর্কে একেবারে অনবহিত ব্রহ্মচারীকে নারীর লাস্যে বিভ্রান্ত করে নগরীতে নিয়ে আসার কল্পনা আপাতভাবে মহাভারতের অনুসারী। কিন্তু মিস ওয়েস্টনের কাহিনিতে আছে এক বৃদ্ধা গণিকা কার্যসিদ্ধি ঘটালেন। তবে কিছু সুন্দরী নারীর সাহায্যে নয়, তাঁরাই সুন্দরী ও স্বৈরিণী কন্যার সাহায্যে। ওয়েস্টন লিখেছেন—An old woman, who has a fair daughter of irregular life, undertake the seduction of the hero এবং আরো জানিয়েছেন, ভন শ্রোয়েভারের উল্লিখিত কাহিনিতে রাজকন্যা স্বয়ং প্রলোভনকারিণীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। From Ritual to Romance গ্রন্থটি কবির ব্যক্তিগত সংগ্রহে ছিল এবং এই কাহিনির সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন এবং তরঙ্গিনীর দ্বারা ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্য হরণের ব্যাপারে এই উল্লেখের দ্বারা তিনি চালিত হয়েছেন। আর তাঁকে প্রবুদ্ধ করেছিল রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' কবিতা, এই কবিতা-পাঠেই তিনি প্রথম ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনির সঙ্গে পরিচিত হন। বস্তুত ঋষ্যশৃঙ্গের এই উপাখ্যানের মধ্যে কবিতা ও নাটকের যুগপৎ সম্ভাবনাকে প্রথম আবিষ্কারের কৃতিত্ব অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের। মূল রামায়ণে ঋষ্যশৃঙ্গাকে অঙ্গরাজ্যে আনার জন্য কোনো বিশেষ বারাঙ্গনার কথা বলা হয়নি। একদল বারাঙ্গানার কথা বলা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই একদল বারাঙ্গানার মধ্যে থেকে একজনকে কল্পনা করেছেন কাব্যবিষয়রূপে—মূল রামায়ণে বারাঙ্গানাদের কারো নাম পরিচয় নেই, তারা শুধু সমষ্টি, ব্যবহারেও তারা সামষ্টিক। 'অনুমেয় রূপান্তরের সম্ভাব্যতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে বিদ্ধ করেছেন শুধু একজন। 'পতিতা' নাটকীয় একোক্তি-র (Dramatic Monologue) স্বভাবমিশ্র কবিতা, এখানে তার আত্মপরিচয়ে নামের প্রয়োজনে হয়নি। শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট হয়েছে—

ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিরে ভুলাতে
পাঠাইলে বনে যে কয়জনা
সাজায়ে যতনে ভূষণে রতনে,
আমি তারি এক বারাঙ্গনা।

বুদ্ধদেব বসু এই বারাঙ্গানাকে তরঙ্গিনী নাম পরিচয়ে চিহ্নিত করেছেন, তাকে বিশেষ পটভূমিতে স্থাপন করেছেন। বাল্মীকি বা কৃত্তিবাস কেউই কোনো একক বারাঙ্গানার মানসিক ভাবন্তরের ('বিপরীত দিকে পরিবর্তন) উল্লেখমাত্র করেননি। তা প্রথম উদ্ভাসিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কল্পনায়। ঋষ্যশৃঙ্গাকে ছলনা করতেই এসেছিল সে রূপাজীবী, কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গের পবিত্র সুন্দর দৃষ্টিতে তার নবজন্ম ঘটল।

তাপস কুমার চাহিলা আমার
মুখপানে করি বদল নত।
প্রথম-রমণী-দরশ-মুগ্ধ
সে দুটি সরল নয়ন হেরি
হৃদয়ে আমার নারীর মহিমা
বাজায়ে উঠিল বজ্র ভেরী।
কহিলা কুমার চাহি মোর মুখে—
কোন দেব আজি আনিলে দিবা!
তোমার পরশ অমৃত সরস,
তোমার নয়নে দিব্য বিভা।'

এই অ-পূর্ব অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয়েই সে রাজমন্ত্রির কাছে ফিরিয়ে দিতে এসেছে সব উপঢৌকন অলংকার। এই 'পতিতা' নামহীনা নায়িকা, কার্যসিদ্ধির জন্য প্রাপ্ত উপহার সে অক্লেশে ফিরিয়ে দিতে চায়, কেননা পরিবর্তে সে পেয়েছে অমৃতময় এক স্পর্শ। তুচ্ছ উপহারের থেকেও অনেক বড় অনেক গভীর কিছু অর্জন করেছে সে। রাজপুরুষের উপহাসের প্রত্যুত্তরে সে ব্যক্ত করেছে তার অভিজ্ঞতা।

মধুরাতে কত মুগ্ধ হৃদয়
স্বর্গ মেনেছে এ দেহখানি—
তখন শুনেছি বহু চাটুকথা,
শুনিনি এমন সত্য বাণী।
আমিও দেবতা, ঋষির আঁখিতে
এনেছি বহিয়া নূতন দিবা
অমৃতসরস আমার পরশ
আমার নয়নে দিব্য বিভা।
কহিলা কুমার চাহি মোর মুখে
'আনন্দময়ী মুরতি তুমি,
ফুটে আনন্দ বাহুতে তোমার
ছুটে আনন্দ চরণ চুমি।'

এই পরশপাথর বদলে দিল সেই 'পতিতা'-কে, প্রমোদ শিখর থেকে চিরজন্মের মতো নির্বাসন ঘটল তার, দেবত্বে উত্তীর্ণ হল সে,—তার নারীসত্তা। সুন্দরের সংস্পর্শে তার জন্মান্তর ঘটে গেল, কাম রূপান্তরিত হল প্রেমে, ঋষ্যশৃঙ্গই এককভাবে উদ্ধার করলেন এই 'পতিতা'কে। রবীন্দ্র-রচনায় এইভাবে দেহজ কামনা বিশুদ্ধ অ-লৌকিক সৌন্দর্যস্তরে সমুত্তীর্ণ হয়েছে এবং এই বিষয়টি প্রবুদ্ধ করেছিল বুদ্ধদেব বসুকে। 'আনন্দ তোমার নয়নে

আনন্দ তোমার চরণে'—বারবার স্মরণ করছে তরঙ্গিনী তার উদ্দেশে উচ্চারিত ঋষ্যশৃঙ্গের এই উক্তি। বুদ্ধদেব তাঁর কাব্যনাটকে রবীন্দ্র-কল্পনাকে মান্য করেছেন এবং তারপরেও তিনি নিজস্বতা বজায় রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথ শুধু তরঙ্গিনীর জন্মান্তর-অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, আর বুদ্ধদেব উভয়েরই অর্থাৎ তপস্বী ও তরঙ্গিনী উভয়েরই নবজন্মের কথা বলেছেন। কাম থেকে প্রেমে উত্তরণ ঘটল দুজনেরই, ঋষ্যশৃঙ্গ এবং তরঙ্গিনী, আত্মদর্শনের পথে নিষ্ক্রমণ ঘটল দুজনেরই।

রামায়ণ, মহাভারত কিংবা বৌদ্ধ জাতকে আমরা একই কাহিনির অল্পবিস্তর পার্থক্য দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ এই কাহিনিকে একভাবে রূপান্তরিত করেছেন। আর বুদ্ধদেব বসু এই সমস্ত উৎসকে অঙ্গীকার করেও তাকে নিজস্বতায় পুনর্নির্মাণ করেছেন। বুদ্ধদেবের লেখনীতেই ঘটেছে পুরাণের পুনর্জন্ম।

৬.৩ পুরাণের পুনর্জন্ম

লিখিত পুরাণ কাহিনি বা তারও পূর্বযুগের পুরাণের বীজস্বরূপ লোকশ্রুতিনির্ভর গল্প কাহিনিগুলিকে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মিথ্ বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই আখ্যানগুলি 'আদিম পুরাণ-কথা'। কিংবদন্তীমূলক ইতিবৃত্ত ও কল্পনামিশ্রিত কাহিনির সঙ্গে ঐ মিথগুলির কিছুটা পার্থক্য আছে। এই কাহিনিগুলিতে অলৌকিকতার মধ্যেও বিদ্যমান আবহমানকালের মানবজীবনের সত্যরূপ। তবে সাংকেতিকভাবে বিন্যস্ত এই অলৌকিকতার মর্মোদ্ধার করতে পারলেই ঐ শাশ্বত জীবনসত্যের রূপ বোঝা সম্ভব হয়। কখনো কবি তথা শিল্পী লিখিত ঐ পুরাণ-কাহিনিকে নবযুগের পটে পুনর্লিখিতভাবে প্রকাশ করেন। শিল্পসৌন্দর্য ও চিরন্তন মানবরসের সম্মিলনে তখন যথার্থই পুরাণের পুনর্জন্ম ঘটে। পুরাণরসের সঙ্গে যুগচৈতন্য ও শিল্পীর আত্মচেতনার রঙ মেলে সেই রচনায়। কিন্তু কোনো কোনো রচনায় শিল্পী পুরাণ-কাহিনির অন্তরালে আদিম-পুরাণের সত্য বা মিথ-কাহিনির আবিষ্কার করতে চান। নিজের রচনাকে সেই পুরাতন সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলতে চান। রবীন্দ্রনাথের 'অহল্যার প্রতি' কবিতাটিকে এখানে আমরা স্মরণ করতে পারি। মিথ-পুরাণের ব্যবহার এখানে আখ্যানধর্মী হয় না, প্রতীকধর্মী হয়ে ওঠে।

বস্তুত, শিল্পী জগৎ ও জীবনকে যেভাবে দেখতে চান—বাস্তব জীবনে তিনি সর্বদা সেই কল্পনার লীলার প্রতিরূপ দেখতে পান না। তাই বাস্তবকে মিথের কল্পজগতে সঞ্চারিত করে দেখতে চান বা ভাষান্তরে তিনি তাঁর কল্পনাগুলিকে মিথ-পুরাণের বাস্তবসত্যের পটে প্রতিফলিত করেন কিংবা 'কল্পনাগুলিকে এক নূতন বাস্তবতায় রূপায়িত করেন'। তার ফলে পুরাণের পুনর্জন্মের পাশাপাশি মহাকাল বা বিশ্বনিয়তির একটি ব্যাপ্ত প্রেক্ষাপটও রচিত হয় আর শিল্পীর সৃজনলীলা নিছক ব্যক্তিক সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বজনীন জীবনস্বপ্ন হয়ে ওঠে।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'দময়ন্তী', 'দ্রৌপদীর শাড়ি ও অন্যান্য কবিতা', 'যে আঁধার আলোর অধিক' 'মরচে-পড়া পেরেকের গান' কাব্যের অনেকগুলি কবিতাতেই পুরাণের প্রচ্ছদের অন্তরালে মিথের সত্য আবিষ্কার করতে চেয়েছেন এবং সেই নূতনতর বাস্তবতার নির্মাণে অলৌকিকতার বিভায় নিজের শিল্পী সত্তাকেই নানারূপে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তাছাড়া যুদ্ধোত্তর কালের অনেক বিশিষ্ট কবি-শিল্পীর মধ্যেই যে জীবনসমস্যাটি রয়েছে বুদ্ধদেব

বসুর মধ্যেও তা প্রবলভাবে বিদ্যমান। তা হল এক তীব্র একাকিত্ব বা নিঃসঙ্গতাবোধ। এই বিরূপ বিশ্বে ও জড়বাদী সভ্যতায় সংবেদপ্রবণ অনুভূতিশীল চৈতন্যবান কবি-শিল্পী তাঁর নিজের অস্তিত্বের সার্থকতা সন্ধান করতে চেয়ে শুধু কাতরই হন। দ্বন্দ্ব বাধে কেবল জড়প্রকৃতির সঙ্গে নয়, জৈব প্রকৃতির সঙ্গেও। 'বন্দীর বন্দনা'র 'মানুষ' কবিতায় যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছিল তা' প্রলম্বিত হয়েছে 'মরচে-পড়া পেরেকের গান' কবিতায় 'প্রাণ ও মন—এক অন্তহীন বিতর্কের অংশ' কবিতা পর্যন্ত। অথচ মনে হয়, কবিতা ও কাব্যনাটকে। সমস্ত জীবন ধরে যে চিন্তাগুলি, অর্থাৎ দেহ ও মনের দ্বন্দ্ব, শিল্পীজীবনের সমস্যা, দাম্পত্য ও বিবাহোত্তর প্রেম, মানবজীবনে ও সভ্যতায় বৈনাশিক প্রহরের প্রভাব প্রভৃতিকে তাঁর কবিতা ও কথাসাহিত্যে রূপ দিয়েছেন, তাঁর মিথ-পুরাণবিত্তিক কাব্যনাটকগুলিতেই সেই ভাবগুলি যেন সাগরসঙ্গমের চরিতার্থতা লাভ করল। অমলেন্দু বসুর কথায় ... বুদ্ধদেব বসুর সম্পূর্ণ সৃজনীকর্মে প্রথম থেকে প্রবাহিতা একটি অনতিপ্রশস্ত তরঙ্গিনী যেন—ক্রমেই প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর মহানদীতে পরিণত হয়েছে।' অতীতের পথপরিক্রমার সমান্তরালভাবে বর্তমানের জীবন-অন্বেষাকে মিলিয়ে দিতে বুদ্ধদেব যে আগাগোড়া আগ্রহী, মহাভারতের কথার অভিনব বিশ্লেষণে তার স্বাক্ষর আছে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধে একবার বলেছিলেন, ব্যক্তি অভিজ্ঞতা শাশ্বত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যতক্ষণ না মিলতে পারছে ততক্ষণ তা সাহিত্যে মূল্যহীন। আর এজন্য একমাত্র সহায়ক হচ্ছে মিথের সঙ্গে নৃতাত্ত্বিক অভিজ্ঞানের সঙ্গে, ব্যক্তি অভিজ্ঞতার সমন্বয়। প্রাচীনকালেও প্রায় একই উদ্দেশ্যে মিথের ব্যবহার ছিল বলে মনে করেন বিষ্ণু দে। তাঁর মতে 'সাহিত্যে ব্যক্তির স্বায়ত্তশাসন ও সমাজসত্তার অসঙ্গতি এড়াবার জন্যে সেকালের সাহিত্যে পৌরাণিক গল্পের মাহাত্ম্য থাকতো।' একালের সাহিত্যে শুধুমাত্র সমাজসত্তার সঙ্গে অসঙ্গতি এড়াবার জন্যেই মিথের ব্যবহার হয় না, পুরাণের রূপক-চেতনার দ্বারাই বর্তমান জটিল বিশ্বের দ্বার উন্মোচন করতে চান একালের কবি। সাম্প্রতিক জীবনাভিজ্ঞতা যখন একটি বিশ্বের অভিজ্ঞানের জন্ম দেয়, তখনই কবি ফিরতে চান মিথের কাছে। কারণ, মিথ মানবপ্রজাতির সত্তার অভিজ্ঞানের আধার। আধুনিক 'ফাঁপা' মানুষের ছিন্নমূল উদ্বাস্তু সত্তা ও খণ্ডিত জীবনবোধে মিথ চেতনাই সঞ্চারিত করতে পারে শাশ্বত 'মানবমূল্যবোধ'।

মধুসূদনের কাব্যে কিংবা আরো পরে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমরা পুরাণ ব্যবহার দেখেছি। কিন্তু ত্রিশের পরবর্তী কবিদের মধ্যে মিথ ব্যবহারের প্রাণনা যুগিয়েছিল পাশ্চাত্যের এলিয়ট, এজরা পাউন্ড, জেমস্ জয়েস, টমাস মান, কাফকা প্রমুখ কবি-শিল্পী। জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে এবং বুদ্ধদেব তাঁদের রচনায় দেশি ও বিদেশি মিথের সার্থক ব্যবহার করতে চেয়েছেন। তবে বুদ্ধদেব বসু ভারতীয় পুরাণেই সমধিক উৎসুক, যদিও গ্রীকপুরাণের ইলেক্ট্রা কাহিনি তাঁর 'কলকাতার ইলেকট্রা'য় ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর এই মিথ-আশ্রমের কারণ খুঁজতে গিয়ে মাহবুব সাদিক বলেছেন—'বুদ্ধদেব বসু আধুনিক বস্তুবিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে একক ও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি সত্তা। অভিযোজন সামর্থ্যের অভাবের কারণে তিনি জনবিচ্ছিন্ন। তাঁর অন্তর্মানসের বিশিষ্টতার জন্যেও তিনি বিচ্ছিন্ন। জনবিচ্ছিন্ন এই একক ব্যক্তিসত্তা বহির্জাগতিক দ্বন্দ্বময় গতিশীল পৃথিবীতে কোন শক্ত বহিরাশ্রয়ের সন্ধান না পেয়েই মিথাশ্রয়ী হয়েছে।'

বুদ্ধদেব বসু স্বয়ং বলেছেন, 'পুরাণ কথার ধর্মই এই যে, তা একই বীজ থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী

পেরিয়ে, ভৌগলিক সীমান্ত ছাড়িয়ে বহু বিভিন্ন ফুল ফোটায়, অনেক ভিন্ন ভিন্ন ফল ফলিয়ে তোলে।' সেই সূত্রেই নানাভাবে তাঁর রচনায় মিথের নিপুণ বিন্যাস। আমাদের আলোচ্য 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'-ও তার ব্যতিক্রম নয়। বুদ্ধদেবের কবিসত্তার প্রথমাবধি অনুসন্ধান কাম ও প্রেমের সম্পর্ক। কামনাময় যৌবনের যজ্ঞবেদীর অনলসম্ভূত যে প্রেম, তা-ই কবির, অদ্বিষ্ট। কাম থেকে নিরন্তর উত্তরণ-সতৃষ্ণ এক সত্তা, পৃথিবীর রূপমহলে শাশ্বত সৌন্দর্য ও প্রেমের স্বর্গপুরী নির্মাণে সর্বদা প্রয়াসী, সেই ভাবনাই মিলতে চাইল পুরাণের ঋষ্যশৃঙ্গ আখ্যানের মধ্যে। আলোচ্য নাটকের ভূমিকায় বুদ্ধদেব লিখেছেন—"... এই নাটকের অনেকখানি অংশ আমার কল্পিত; এবং রচনাটিও শিল্পিত—অর্থাৎ একটি পুরাণ কাহিনিকে আমি নিজের মনোমত করে নতুনভাবে সাজিয়ে নিয়েছি, তাতে সঞ্চার করেছি আধুনিক মানুষের মানসতা ও দ্বন্দ্ববেদনা। বলাবাহুল্য, এ ধরনের রচনায় অন্ধভাবে পুরাণের অনুসরণ চলে না; কোথাও কোথাও ব্যতিক্রম ঘটলে তাকে ভুল বলাটাই ভুল। আমার কল্পিত ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনী পুরাকালের অধিবাসী হয়েও মনস্তত্ত্বে আমাদেরই সমকালীন।" আর কাম থেকে প্রেমে উত্তরণের ইতিহাস এই কাহিনিতে যেভাবে রয়েছে, তাই বুদ্ধদেবকে আকৃষ্ট করেছিল। নাটকটি 'প্রযোজনার জন্য পরামর্শ' অংশে তিনি লিখেছেন—"লোকেরা যাকে 'কাম' নাম দিয়ে নিন্দে করে থাকে, তারই প্রভাবে দু'জন মানুষ পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হল—নাটকটির মূল বিষয় হল এই। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে নায়ক-নায়িকার বিপরীত দিকে পরিবর্তন ঘটলো; একই মুহূর্তে জেগে উঠলো তরঙ্গিনীর হৃদয় এবং ঋষ্যশৃঙ্গের ইন্দ্রিয় লালসা; একই ঘটনার ফলে ব্রহ্মচারীর হল 'পতন', আর বারাঙ্গনাকে অকস্মাৎ অভিভূত করলে 'রোমান্টিক প্রেম'—যেভাবে রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা'য় বর্ণিত আছে, সেইভাবেই। 'রোমান্টিক প্রেম'—যেভাবে রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা'য় বর্ণিত আছে, সেইভাবেই। 'রোমান্টিক প্রেম' অর্থ হল কোনো বিশেষ একজন ব্যক্তির প্রতি ধ্রুব, অবিচল অবস্থা নির্বিশেষ, এবং প্রায় উন্মাদ হার্দ্য আসক্তি—যার প্রতীক পাশ্চাত্য সাহিত্যে ট্রিস্টান এবং আমাদের সাহিত্যে রাধা।"

ঋষ্যশৃঙ্গ তরঙ্গিনীর মধ্যে দিয়ে প্রথম পেয়েছিলেন এযাবৎ অনাস্বাদিত এক অভিজ্ঞতা, জেনেছিল 'নারী'কে। বর্ষণহীন দেশে বৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে আসবেন ঋষ্যশৃঙ্গ, কৌমার্যভঙ্গের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি আসবেন। নারী-পুরুষের শরীরী মিলনের অনুষঙ্গ যৌনতা সব পুরাণের উর্বরতার সঙ্গে যুক্ত—এ কাহিনিতে তার দ্যোতনা আবিষ্কার করেছিলেন বুদ্ধদেব। জেসি ওয়েস্টন তাঁর From Ritual to Romance গ্রন্থে বলেছেন—"There is no doubt that ceremonial marriage very frequently formed a part of 'Fertility' ritual and was supposed to be specially efficacious in bringing about the effect desired." বৃষ্টি নামানোর জন্য, ফসলের উৎপাদন ব্যবস্থার জন্য আদিম মানব সমাজে যে জাদুক্রিয়ামূলক আচরণ ছিল তার প্রধান উপচার ছিল একটি পুরুষ ও একটি নারীর যৌন মিলনের ভূমিকা। আদিম উপজাতি ওয়াট মাঙিস তাদের বসন্তকালীন উৎসবে মাটিতে একটা গর্ত খুঁড়ে ঝোপেঝাড়ে তাকে আবৃত করে তার চারদিকে উদ্যত বর্শা হাতে ঘুরে ঘুরে নাচত এবং সেই গুল্মাবৃত গহ্বর বিদ্ধ করতো তারা বর্শায়। বলা বাহুল্য, তাদের কাছেও এই আচরণবিধিতে গুল্মাবৃত গহ্বরটি স্ত্রী যোনি ও উদ্যত বর্শা ছিল পুরুষাঙ্গের প্রতীক। আদিমকাল থেকেই মানব সমাজের চেতনায় পুরুষের বীর্য এবং আকাশের বৃষ্টি পরস্পরের পরিপূরক। সেই বিশ্বাস থেকেই তরঙ্গিনীর সংলাপে রচিত হয় যৌনমিলনের শব্দচিত্র—

জাগ্রত হোক সুপ্তেরা। সুপ্ত হোক যারা জাগ্রত।

গলিত হোক শিলা। মুক্ত হোক প্রবাহ। ব্যাপ্ত হোক গতি।
পূর্ণ হোক বৃত্ত। জয়ী হোক প্রাণ। জয়ী হোক মৃত্যু।
ক্ষেত্রে বীজ, ক্ষেত্রে হল; গর্ভে বীজ, গর্ভে জল।
... ...
জাগলো জন্তু। ভাঙলো নিদ্রা। সুপ্ত হলো যারা
জাগ্রত ছিলো। চঞ্চল হলো মনোরথ, উচ্ছল হলো
নির্ঝর। মেঘ জমলো আকাশে, চমক দিলো বিদ্যুৎ,
বিলোল হল বজ্র।
নামলো বৃষ্টি। জাগলো ধ্বনি-প্রতিধ্বনি। প্রাণ থেকে প্রাণে,
অঙ্গ থেকে অঙ্গে, তৃষ্ণা থেকে তৃষ্ণায়—প্রতিধ্বনি।
মৃত্তিকায় তৃষ্ণা, আকাশ দেয় তৃপ্তি। অন্তরীক্ষে তৃষ্ণা,
ধরণী দেয় তৃপ্তি। ...
তুমি আমার তৃষ্ণা, তুমি আমার তৃপ্তি।
আমি তোমার তৃষ্ণা, আমি তোমার তৃপ্তি।
সর্প তোলে ফণা ফেনিল হয় সমুদ্র
চলে মন্থন—মন্থন—মন্থন।
দীর্ণ মেঘ, তীব্র বেগ, রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিপূর্ণ ধরণী
বর্ষণ—বর্ষণ—বর্ষণ।

এইভাবে সুপ্রাচীন মিথকে যোগ্য আধারে প্রতিস্থাপন করেন কবি। ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনীর আখ্যান তাঁর কাছে হয়ে ওঠে এক আর্কেটাইপ, তাঁর অভিজ্ঞতা ও ধ্যানের যে যোগ্য আর্কেটাইপ ছিল তার অন্বিষ্ট। আবার মিথ-উদ্বৃত্ত নানা ঘটনা, যেমন ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহিত জীবনের অতৃপ্তি, বিষাদ অবসন্নতা কিংবা তরঙ্গিনীর সেই মুখশ্রীর সন্ধান। বস্তুত, একালের বন্ধ্যাত্ব অনুর্বরতা হতাশা কামপীড়িত যন্ত্রণার মধ্যে এক জীবনের আশ্বাসে উত্তরণের ইশারাই বুদ্ধদেব খুঁজে পেয়েছেন ঋষ্যরূপ পুরাণের মধ্যে।

৬.৪ তপস্বী ও তরঙ্গিনী ঃ আঙ্গিক-বিচার

প্রত্যেকটিতেই পাঁচটি করে অনু-দৃশ্য সম্বলিত চার অঙ্গে বিন্যস্ত 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'। আমরা একবার দেখে নিই এর ঘটনাক্রম—

প্রথম অঙ্ক

অণু-দৃশ্য ১. গাঁয়ের মেয়েদের গান থেকে প্রস্থান পর্যন্ত

২. রাজদূতদ্বয়ের সংলাপ থেকে প্রস্থান পর্যন্ত

৩. রাজমন্ত্রী ও রাজপুরোহিতের সংলাপ থেকে প্রস্থান পর্যন্ত

৪. শান্তার প্রবেশ ও প্রস্থান

৫. রাজমন্ত্রী ও লোলাপাঙ্গী-তরঙ্গিনীর কথোপকথন ও যবনিকাপাত পর্যন্ত

দ্বিতীয় অঙ্ক

১. ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমে ঋষ্যশৃঙ্গের একোক্তি থেকে তরঙ্গিনীর একোক্তি পর্যন্ত

২. ঋষ্যশৃঙ্গের পুনরাগমন থেকে তরঙ্গিনীর প্রস্থান পর্যন্ত

৩. বিভাণ্ডকের প্রবেশ থেকে প্রস্থান অবধি

৪. ঋষ্যশৃঙ্গের স্বগতকথন থেকে তরঙ্গিনীকে আলিঙ্গানে আবদ্ধ করা ও মঞ্চে অন্ধকার নামা অবধি

৫. আবার মঞ্চে আলো জ্বলা থেকে বৃষ্টিপাত ও যবনিকাপতন পর্যন্ত

তৃতীয় অঙ্ক

১. ঋষ্যশৃঙ্গের যৌবরাজ্যে অভিষেকের ঘোষণা থেকে চন্দ্রকেতু ও লোলাপাঙ্গীর প্রস্থানাবধি

২. লোলাপাঙ্গী ও তরঙ্গিনীর কথোপকথন ও লোলাপাঙ্গীর প্রস্থানাবধি

৩. চন্দ্রকেতুসহ লোলাপাঙ্গীর পুনঃপ্রবেশ থেকে তরঙ্গিনীর কক্ষান্তর গমনাবধি

৪. চন্দ্রকেতু ও লোলাপাঙ্গীর সংলাপ ও প্রস্থান পর্যন্ত

৫. তরঙ্গিনীর স্বগতোক্তি থেকে যবনিকাপতন অবধি

চতুর্থ অঙ্ক

১. রাজবেশে অলিন্দে দণ্ডায়মান ঋষ্যশৃঙ্গ-এই সূচনা থেকে শান্তার অন্তঃপুরে প্রস্থানবধি

২. বিভাণ্ডকের প্রবেশ ও প্রস্থান

৩. ঋষ্যশৃঙ্গের একোক্তি থেকে তরঙ্গিনীর প্রস্থান

৪. অংশুমান-শান্তার সংলাপ, রাজমন্ত্রী শান্তা ও অংশুমানের প্রস্থানবধি

৫. চন্দ্রকেতু ও লালাপাঙ্গীর প্রবেশ থেকে যবনিকাপাত পর্যন্ত

প্রথম অঙ্কের সূচনা গাঁয়ের মেয়েদের বৃষ্টির জন্য প্রার্থনাই—

আকাশে সূর্যের অটল আক্রোশ, জ্বলছে রুদ্রের রক্তচক্ষু,
মাটির ফাটে বুক, শুকনো জলাশয়, ধুঁকছে, নির্বাক পশুরা;

শস্যহীন মাঠ, বন্ধ্যা সধবারা, দিনের পর দিন দীর্ণ, শূন্য—
বৃষ্টি নেই!

মেয়েদের এ সংলাপে দগ্ধ গ্রামাঞ্চলের বিশুষ্ক দীর্ণ শূন্য ছবি। শুধু শস্যহীনতার সমস্যাই নয়, তারা বুঝতে পারে না 'এ কোন্ অভিশাপ লাগলো!' তাই তাদের হাহাকার তীব্র হয়ে ওঠে বন্ধ্যা পাথুরে সভ্যতার পিপাসার কথায়। বুদ্ধদেব নিজেই বলেছেন এই অংশে 'রূপকল্পের আভাস জুগিয়েছিল এলিয়টের মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রেল নাটকটা'। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তও জানিয়েছেন, 'The background of famine, village women, the exalted moment of the first exchange of glances between the boyish mendicant and sphisticated prostitute—all these were seized by the author's imagination in the light of Eliot's Murder in the Cathedral' (Buddhadev Bose, Alokranjan Dasgupta, Sahitya Akademi) 'বৃষ্টি নেই' এই আর্তি গিয়ে পৌঁছেছে তাদের সংলাপের শেষে 'বৃষ্টি দাও' এই প্রার্থনায়। ২০ পঙ্‌ক্তিতে বিন্যস্ত এই সংলাপে কে কোন্ অংশ বলবে তা' নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী' নাটকে আমরা আগেই দেখেছি এ রীতি। তবে প্রযোজনার জন্য পরামর্শে বুদ্ধদেব এ ব্যাপারে একেবারে উদাসীন থাকতে পারেননি, বরং আরম্ভের গাঁয়ের মেয়েদের প্রথম ভাষণটা কী-ভাবে আবৃত্তি করা হবে, সে বিষয়ে তাঁর ধারণা ব্যক্ত করেছেন।

প্রথম স্তবক ঃ প্রথম মেয়ে
দ্বিতীয় স্তবক ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি ঃ দ্বিতীয় মেয়ে
তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তি ঃ তৃতীয় মেয়ে
তৃতীয় স্তবক ঃ প্রথম পঙ্‌ক্তি ঃ প্রথম মেয়ে
দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি ঃ দ্বিতীয় মেয়ে
তৃতীয় পঙ্‌ক্তি ঃ
'ব্যাঙের ছাতা কবে সাজাবে পৃথিবীরে?' ঃ তৃতীয় মেয়ে
'ডাকবে উল্লাসে দর্দুর' ঃ দ্বিতীয় মেয়ে
চতুর্থ পঙ্‌ক্তি ঃ প্রথম মেয়ে
চতুর্থ স্তবক ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি ঃ দ্বিতীয় মেয়ে
তৃতীয় পঙ্‌ক্তি ঃ তৃতীয় মেয়ে
চতুর্থ পঙ্‌ক্তি ঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় মেয়ে সমস্বরে
পঞ্চম স্তবক ঃ প্রথম পঙ্‌ক্তি ঃ প্রথম মেয়ে
দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি ঃ দ্বিতীয় মেয়ে
তৃতীয় পঙ্‌ক্তি ঃ তৃতীয় মেয়ে
চতুর্থ পঙ্‌ক্তি ঃ তিনজনে সমস্বরে

নাটকের প্রারম্ভেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে দেশে অনাবৃষ্টির সংবাদ। দুই রাজদূতের সংলাপ থেকে আরো

জানা যায় যে, এই দুর্ভিক্ষের প্রতিকারকল্পে রাজা লোমপাদ বিভিন্ন দেশের সাহায্য চেয়েছিলেন, কিন্তু নানা দুর্বিপাকে সেসব সাহায্য পথিমধ্যেই বিনষ্ট হয়েছে—বঙ্গদেশ থেকে মহিষপৃষ্ঠে যা আসছিলো, দস্যুরা তা' হরণ করে নিলে। ঝড়ে ডুবলো তাম্রলিপ্তির অর্ণবপোত। কামরূপের বাহকেরা পরিণত হলো শ্বাপদের খাদ্যে। ..."

রাজপথগুলি দস্যুতে পরিকীর্ণ।
গ্রাম-সীমান্ত বন্য পশুতে উপদ্রুত।
কখনো দেখিনি এত মৃত মার্জার—
শৃগালের এমন বিকট চীৎকার কখনো শুনিনি।

সার্বিক এই বিনষ্টিতে ভীত ত্রস্ত প্রজার প্রশ্ন 'কী দোষ করেছি আমরা—কেন দেয়া নির্দয়'? 'কেন এই শাস্তি'? দূতদের কথায় চলে আসে গ্রীক পুরাণের কাহিনি, কখনো আসে দেবতায় সন্দেহ, ধর্মে অবিশ্বাস। তবে ব্রাহ্মণকে অপমান করার জন্য যে অঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ, এ সম্ভাবনা তারা নস্যাৎ করেছে। বরং ইঙ্গিত দিয়েছে এই বর্ষণহীনতা মোচনের—কোনো এক বারাঙ্গনাই হবে তাদের 'প্রাণদাত্রী'। রাজমন্ত্রী দূতদের আদেশ করে 'গণিকা লোলাপাঙ্গী ও তার কন্যা তরঙ্গিনীকে' রাজ্যে এনে উপস্থিত করতে। তরঙ্গিনী ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্য ভঙ্গ করে তাকে রাজধানীতে নিয়ে এলেই বাঞ্ছিত বর্ষা আসবে। রাজপুরোহিতের উক্তিতে তারই ইঙ্গিত—

কুমার-অপাপবিদ্ধ-ঋষ্যশৃঙ্গ-তরুণ-
ধ্বংস করো, ধ্বংস করো তাঁর কৌমার্য্য;
রাজা যদি রিক্ত, তবে লুণ্ঠন করো তপস্বীকে,
সিক্ত হোক নারী ও পুরুষ, ব্যক্ত হোক মৃত্তিকার প্রতিভা।

শান্তার প্রবেশে অংশুমানের সঙ্গে তার প্রণয় সম্পর্কের বিষয়টি দর্শকের গোচরে আসে। অংশুমানের অঙ্কশায়িনী হতে উৎসুক শান্তা, কিন্তু দৈবাদেশে তাকে হতে হবে ঋষ্যশৃঙ্গের। রাজমন্ত্রী দেশের এই দুর্দিনে দেশেরই হিতৈষায় পুত্র অংশুমানকে দিনকয়েকের জন্য কারারুদ্ধ করতে দ্বিধা করেন না। কারণ ঋষ্যশৃঙ্গের আগমনকালে শান্তাকে থাকতে হবে 'অনাহত ও প্রস্তুত'। আর বলেন 'তরঙ্গিনীর খ্যাতি যদি মিথ্যা না হয়, লোলাপাঙ্গীর অর্থলোভ যদি লেলিহান থাকে, তাহলে আবার সমৃদ্ধ হবে অঙ্গদেশ, কেউ থাকবে না বুভুক্ষু বা আর্ত। ... ঋষ্যশৃঙ্গকে রতিরহস্যে দীক্ষিত করবে তরঙ্গিনী; তার ফলভোগ করবে শান্তা।' ... মন্ত্রী ঠিকই বুঝেছিলেন, 'কাম একবার প্রজ্বলিত হলে সহজে থামে না'; আর এইভাবেই দ্বন্দ্বের বীজটি নাট্যক্ষেত্রে বপন করা হয়েছিল, প্রথম অঙ্কেই। এছাড়া, গদ্যের শরীরেও কাব্যিক বিভঙ্গ এনে কাব্যনাটকের যোগ্য পুরোভূমি তৈরি করার প্রয়াস লক্ষ করা যায় এখানেই।

নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের ঘটনা ঘটেছে ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমে। প্রধান দুটি চরিত্র, তপস্বী ও তরঙ্গিনী এখানে উপস্থিত। তারপরে এসেছেন বিভাণ্ডক। পিতাপুত্রের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তরঙ্গিনীকে একভাবে উপলব্ধি করবেন ঋষ্যশৃঙ্গ। এরপর তরঙ্গিনীর কাছে ঋষ্যশৃঙ্গের সচেতন আত্মসমর্পণ ও তরঙ্গিনীর সঙ্গে তার

নগরগমনের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নামার পরিকল্পনায় এই অঙ্কের সমাপ্তি।

ঊষাকালে আশ্রমে দন্ডায়মান ঋষ্যশৃঙ্গের স্বগত-কথনে এই অঙ্কের সূচনা। সূর্য বায়ু বৃক্ষ চর আর জড় চেতন সকলকে তার বন্দনা, প্রণাম সেই পরম অব্যয় ব্রহ্মকে। তার প্রাত্যহিক ক্রিয়ার বর্ণনায় আমরা জেনে যাই ঋষ্যশৃঙ্গের শাস্ত্রনিষ্ঠ জীবনযাপন। কিন্তু মাঝে মাঝে এই কঠোর তাপসের মনেও জাগে কী এক অনির্দেশ্য বেদনা—

"... মর্ত্যলোকে কিছুই অবিচ্ছেদ নয়, আমারও মাঝে মাঝে আসে দুর্দিন। সেদিন মনে হয়, আমার দিনব্যাপী ক্রিয়াকর্ম যেন অভ্যাসমাত্র, কিছুই আমার অন্তঃকরণে অনুভূত হচ্ছে না। সেদিন অগ্নি দেয় না উজ্জ্বলতা, অনিল স্তব্ধ হয়ে থাকে, বেদমন্ত্র ধ্বনিত হয় না হৃদয়ে। আবার কোনো কোনোদিন স্বচ্ছ হয়ে যায় দৃষ্টি, সব মনে হয় সার্থক ও উজ্জীবিত, এক দিব্য বিভা চিদাকাশে ছড়িয়ে পড়ে। আজ তেমনি একটি শুভদিন আমার।"

তারই আকাঙ্ক্ষার মধুর শব্দরূপ বাহিত হয় যেন দূরাগত বাঁশির সুরে, 'মরাল যেমন কৈলাসের জন্য আকুল,.... তেমনি আমার ঔৎসুক্য জাগছে', তারপর ঋষ্যশৃঙ্গাকে অভিভূত করে উপস্থিত হয় তরঙ্গিনী। জন্মাবধি পিতা ও শাস্ত্র, ধর্মাচরণ ও নিসর্গ ছাড়া আর কিছু জানে না ঋষ্যশৃঙ্গ। তাই তরঙ্গিনীকে তার মনে হয় 'চিন্ময় জ্যোতিঃপুঞ্জ'। বলে, — 'যে মনস্বীরা তিমিরের পারে আলোকময়কে দেখেছিলেন, আপনি যেন তাঁদেরই একজন।' বলে 'সুন্দর আপনার আনন, আপনার দেহ যেন নির্ধূম হোমানল, আপনার বাহু, গ্রীবা, কটি যেন ঋক্‌ছন্দে আন্দোলিত। আনন্দ আপনার নয়নে, আনন্দ আপনার চরণে, আপনার ওষ্ঠাধরে বিশ্বকরুণার বিকিরণ। তাকে পাদ্যর্ঘ্য দিয়ে বন্দনায় উদ্যোগী হন ঋষ্যশৃঙ্গ।

'আনন্দ তোমার নয়নে, আনন্দ তোমার চরণে' বারবার ধ্রুবপদের মতো উচ্চারিত হয় তরঙ্গিনীর সংলাপে। তখনও তরঙ্গিনী নিজের কার্যসিদ্ধির অহংকারে গর্বিত; আমরা পরে দেখবো, কি ভাবে এই শব্দমন্ত্র ভিতরে ভিতরে বদলে দিয়েছে তরঙ্গিনীকে। অনঙ্গাব্রতে তপস্বীকে আত্মদান করে তরঙ্গিনী, তার মন্ত্রের নাম রতি, যজ্ঞের নাম প্রীতি, ধ্যানের বিষয় আনন্দযোগ—আলিঙ্গানে চুম্বনে সে ব্রতপালন করে ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে যৌথভাবে। সে মিলনের শব্দচিত্র রচনায় বুদ্ধদেব বসুর দক্ষতা প্রশ্নাতীত।

'জাগলো জন্তু। ভাঙলো নিদ্রা। সুপ্ত হলো যারা জাগ্রত ছিলো। চঞ্চল হলো মনোরথ, উচ্ছল হলো নির্ঝর। মেঘ জমলো আকাশে, চমক দিলো বিদ্যুৎ। বিলোল হল বজ্র। নামলো বৃষ্টি। জাগলো ধ্বনি-প্রতিধ্বনি। প্রাণ থেকে প্রাণে, অঙ্গ থেকে অঙ্গে, তৃষ্ণা থেকে তৃষ্ণায়—প্রতিধ্বনি। মৃত্তিকায় তৃষ্ণা, আকাশ দেয় তৃপ্তি। অন্তরীক্ষে তৃষ্ণা, ধরণী দেয় তৃপ্তি। সাগর থেকে বাষ্প, বাষ্পে জমে মেঘ, মেঘ নামে বর্ষণে। বিদ্যুৎ জ্বলে অঙ্গ থেকে অঙ্গে, শোণিতে জাগে জ্বালা, বজ্রপাতে চূর্ণ হয় চেতনা। এসো তিমির, এসো তন্দ্রা, এসো দাবানল, এসো ধারাজল। তুমি আমার তৃষ্ণা, তুমি আমার তৃপ্তি। আমি তোমার তৃষ্ণা, আমি তোমার তৃপ্তি। সর্প তোলে ফণা, ফেনিল হয় সমুদ্র। চলে মন্থন—মন্থন—মন্থন। দীর্ণ মেঘ, তীব্র বেগ, রন্ধ্রে-রন্ধ্রে পরিপূর্ণ ধরণী। বর্ষণ—বর্ষণ—বর্ষণ।'

নারী-পুরুষের যৌন মিলনের এ এক কাব্যময় চিত্রল বর্ণনা। তৃষ্ণা তৃপ্তি, তৃপ্তি তৃষ্ণা শব্দের উপর্যুপরি

ব্যবহার, মেঘ বর্ষণ বিদ্যুৎ বজ্র, দাবানল, ধারাজল এইসব শব্দের, কিংবা বলা যায় বিপরীত শব্দের সার্থক প্রয়োগে, ফণা-উদ্যত সর্পের প্রতিমায়, মন্থনক্ষুব্ধ ফেনিল সমুদ্রের ছবিতে ঋষ্যশৃঙ্গের এবং তরঙ্গিনীর মিলনকে শব্দচিত্রে উপস্থাপন করেছেন কবি।

বিভান্ডকের প্রবেশে স্বভাবতই ক্ষুণ্ণ হয় এই মায়াবী আবহ। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গের অভিভবের গাঢ়তায় মিশে যায় এক অ-পূর্ব অভিজ্ঞতা। ভাবান্তরিত ঋষ্যশৃঙ্গ বলেন, তপোবনে সেদিনের অতিথি 'এক আশ্চর্য ব্রহ্মচারী। দীর্ঘকায় নন, খর্বকায় নন, দেবতার মতো কান্তিমান। কনকতুল্য তাঁর বর্ণ, দেহ সুঠাম ও সংকেতময়; ... শঙ্খের মতো গ্রীবা, ... আনন যেন উদ্ভাসিত ঊষা; ... তাঁর বাহু, বক্ষ ও পদযুগল নির্লোম, বক্ষে দুটি মনোহর মাংসপিন্ড নৈবেদ্যের মতো বর্তুল। ...' '... আমার দেহে জাগলো অজ্ঞাতপূর্ব পুলক, আমার সত্তায় সঞ্চারিত হলো অমৃতশ্পর্শ...' ঋষ্যশৃঙ্গ জানলো 'সে নারী'। 'নূতন নাম, নূতন রূপ, নূতন ভাষা। নূতন এক জগৎ। ...' ঋষ্যশৃঙ্গ, বিরহক্লিষ্ট ঋষ্যশৃঙ্গ চাইল সেই 'মোহিনী মায়াবিনী ঊর্বশী' নারীকে, তার পিতার নিষেধ সত্ত্বেও।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি জেনেছি তুমি কে। তুমি নারী।

তরঙ্গিনী। কুমার, আমি তোমার সেবিকা।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি জেনেছি আমি কে। আমি পুরুষ।

তরঙ্গিনী। তুমি আমার প্রিয়। তুমি আমার বন্ধু। তুমি আমার মৃগয়া। তুমি আমার ঈশ্বর।

ঋষ্যশৃঙ্গ। তুমি আমার ক্ষুধা। তুমি আমার ভক্ষ্য। তুমি আমার বাসনা।

তরঙ্গিনী। আমার হৃদয়ে তুমি রত্ন।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমার শোণিতে তুমি অগ্নি। ...

তরঙ্গিনী। বলো, তুমি চিরকাল আমার থাকবে!

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি তোমাকে চাই—তুমি প্রয়োজন!

তরঙ্গিনী। তবে চলো-চলো আমার সঙ্গে। ...

ঋষ্যশৃঙ্গ। কোথায় যাই কী এসে যায়? কোথায় থামি কী এসে যায়? আমি চাই তোমাকে। আমি চাই তোমাকে।

তরঙ্গিনী। এসো প্রেমিক, এসো দেবতা—আমাকে উদ্ধার করো।

ঋষ্যশৃঙ্গ। এসো দেহিনী, এসো মোহিনী—আমাকে তৃপ্ত করো।

এই পারস্পরিক কথোপকথনে একটু কান পাতলেই শোনা যায় তপস্বী ও তরঙ্গিনীর রূপান্তরের অনুভব। একদিকে ঋষ্যশৃঙ্গের আজন্মের সাধনা, ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য সুকঠিন তপস্যা, আরেকদিকে সদ্য-পরিচিত নারীর দেহমনের মোহিনী বৈভব—এর কোন্ দিকে যাবেন তিনি? "তাঁর চিত্তে নিশ্চয়ই দুই চৈতন্যের সংঘর্ষ হয়েছিল। নিশ্চয়ই দীর্ঘক্ষণ দ্রুত শোণিত সঞ্চালিত হৃৎপিন্ডের ধ্বনি তাকে ব্যাকুল করে তুলেছিল, কোন দিকে তিনি যাবেন। তপস্যা, সংযম, ব্রহ্মজ্ঞান, পিতার উপদেশ নাকি নারী মোহিনী মায়াবিনী। একদিকে আশৈশব আচরিত

তপস্যা অন্যদিকে অকস্মাৎ বিস্ময়"।

বলা বাহুল্য, উভয়ের সংলাপে ভাবান্তরের যে সূত্রটুকু আছে তা পরবর্তী পর্যায়ে আরো স্পষ্ট হবে। তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কে দেখা যাবে বিবর্তিত তরঙ্গিনী ও ঋষ্যশৃঙ্গাকে। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে মঞ্চে অস্পষ্ট আলোয় মুহূর্তের জন্য দেখা যাবে আলিঙ্গানাবদ্ধ তপস্বী ও তরঙ্গিনীকে। তারপর অন্ধকার। আবার মঞ্চে আলো জ্বললে চম্পানগরের রাজপথে বৃষ্টিমুখরিত পরিবেশে নারীপুরুষের হর্ষধ্বনির মধ্যে তরঙ্গিনী ও তার সখীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ঋষ্যশৃঙ্গের রঙ্গামঞ্চ পার হয়ে যাওয়ার দৃশ্য।

তৃতীয় অঙ্কের শুরুতেই রাজপথপাশে তরঙ্গিনীর গৃহাভ্যন্তরে দেখা যাবে বিস্রস্ত যত্নহীন উন্মনা এক নারীকে, সে তরঙ্গিনী। রাজপথে ঘোষক রাজাদেশ ঘোষণা করে, 'আগামী মঙ্গালবার, শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে, পুষ্পা নক্ষত্রে, মহারাজ তাঁর জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবেন।' এ সংবাদে প্রথম প্রতিক্রিয়া তরঙ্গিনীর অস্ফুট অথচ তীব্র উচ্চারণে 'লোমপাদের জামাতা। যুবরাজ!' পুরবাসী উল্লসিত কেননা তাদের গোলা-ভরা ধান, পুকুর-ভরা মাছ। বিমর্ষ চন্দ্রকেতু আর অংশুমান। উভয়েরই ক্ষোভ-বিষাদের উৎসে রয়েছে ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনী, যদিও ভিন্নভাবে, কিংবা বলা যায়, তাদের বিরাগের লক্ষ্য একজনই, সে ঋষ্যশৃঙ্গ। কেননা, ঋষ্যশৃঙ্গাকে মোহিত করার পর তরঙ্গিনী 'নিজে আর স্বচ্ছ নেই'। চন্দ্রকেতু আর তার নাগাল পায় না। আর তরঙ্গিনী কৌমার্যভ্রষ্ট ঋষ্যশৃঙ্গাকে নগরে নিয়ে আসাতেই শান্তাকে হারাল তার প্রেমিক অংশুমান। দুই তরুণেরই তাই মনের কথা—'যদি ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম কখনো না-হতো! যদি এখনো ঋষ্যশৃঙ্গের অস্তিত্ব মুছে যায়!'

চন্দ্রকেতু বৃদ্ধা লোলাপাঙ্গীকে উপহার দেয়, তরঙ্গিনীর কাছে পৌঁছবার জন্য। লোলাপাঙ্গী আর তরঙ্গিনীর কথোপকথনে উন্মোচিত হয় জীবনের আরো কিছু সত্য। লোলাপাঙ্গী তখন একইসঙ্গে জননী আর দূতীর ভূমিকা পালন করেছে, কিংবা দূতীর ভূমিকা হয়তো একটু বেশিই পালন করেছে। 'চন্ডালিকা'র প্রকৃতির জননীর মতো তারও কন্যার কাছে যেন একই প্রশ্ন 'বাছা মন্ত্র করেছে কে তোকে?' বহুভোগ্যা সে বৃদ্ধা অর্থ বোঝে, রত্ন চেনে, রূপ ভোগ করে; শুধু বুঝতে পারছে না ছলনাবৃত্তি পালন করতে গিয়ে কিভাবে বদলে গেল তরঙ্গিনীর সমস্ত জীবন, এক জন্মেই কিভাবে জন্মান্তর ঘটে গেলো তার। তরঙ্গিনী বুঝতে পারে অঙ্গাদেশে বৃষ্টি আনার জন্য সে যন্ত্র বা উপায় রূপে ব্যবহৃত। পরাজয়ের বেদনায় সে ম্লান। ঋষ্যশৃঙ্গ বিভান্ডককে জিজ্ঞাসা করেছিল, কেমন ছিলেন তার জননী? তরঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করে লোলাপাঙ্গীকে হঠাৎই—'মা, আমার পিতা কে ছিলেন তা কি তুমি জানো?' লোলাপাঙ্গী স্মরণ করে তার বিগত যৌবনের কথা, আর তরঙ্গিনী সে-কথার ফাঁকে উচ্চারণ করে তার প্রেমানুভূতি—" ...প্রথম যখন দেখা হলো—তিনি কি মুগ্ধ ছিলেন? কেমন করে তাকাতেন তোমার দিকে? তোমার মনে পড়ে? কখনো কি তোমাকে বলেছিলেন—'তুমি ছদ্মবেশী দেবতা, তুমি মূর্তিমতী আনন্দ?' তোমার মনে পড়ে? ... তুমি কি কেঁপে উঠেছিলে, তাঁর চোখে তোমার চোখ পড়লো যখন তোমার কি তখন মনে হয়েছিল তুমি অন্য কেউ?"

চন্দ্রকেতুর সঙ্গে সংলাপে আরো স্পষ্ট করে দেওয়া হয় যে ঋষ্যশৃঙ্গ ছাড়া অন্য সব পুরুষই এখন তরঙ্গিনীর কাছে ম্লান, সাধারণ, আভ্যাসিক জীবনের শৃঙ্খলে বাঁধা। ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে সেই বিনিড় মুহূর্তের অনুভূতির স্মৃতিতে সর্বদা স্নাত তরঙ্গিনী, সে কি করে আর গ্রহণ করবে অন্য পুরুষকে! তরঙ্গিনীর তখন

কাম্য আনন্দ, প্রতি মুহূর্তে রোমাঞ্চ। 'আমি চাই সেই দৃষ্টি, যার আলোয় আমি নিজেকে দেখতে পাবো। দেখতে পাবো আমার অন্য মুখ, যা কেউ দ্যাখেনি, অন্য কেউ দ্যাখেনি।' যেন তন্দ্রা থেকে জেগে উঠে তার এ উক্তি, তারপর চন্দ্রকেতুর কাছ থেকে বিদায়গ্রহণ।

তরঙ্গিনীর কক্ষান্তরগমনের পর চন্দ্রকেতু ও লোলাপাঙ্গীর কথাবার্তায় বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে তরঙ্গিনী এক দুর্বোধ্য অসুখের শিকার। হয়তো বা ঋষির তপোভঙ্গের কারণেই তাঁর দ্বারা অভিশপ্ত সে, শিবের তপোভঙ্গের কারণে মজনঙস্মের ঘটনাটি উল্লেখ করে চন্দ্রকেতু তার বক্তব্যকে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে। ঋষ্যশৃঙ্গ প্রার্থীদের দর্শন দেবার সময় তাঁর কাছেই যে তারা প্রতিষেধক চাইবে, এ কথা জানা যায় ঘোষকের ঘোষণার পরেই। চন্দ্রকেতু ও লোলাপাঙ্গীর নিভৃত পরামর্শের জন্য স্থানান্তর গমনের পরই রঙ্গামঞ্চে আবার প্রবেশ করে তরঙ্গিনী। এবারে সে সুসজ্জিতা প্রসাধিতা, অবিকল দ্বিতীয় অঙ্কের মতো তার বেশ এবং হাতে একটি স্বর্ণখচিত দর্পণ। তরঙ্গিনী যে ঋষ্যশৃঙ্গের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে গ্রস্ত তা' বোঝাতেই যেন এই অংশের পরিকল্পনা। দর্পণে প্রতিবিম্বিত আত্মরূপ দেখে তরঙ্গিনীর দীর্ঘ একোক্তির মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তার মনস্তাত্ত্বিক সংকট অনবদ্য এক ভাষায়—দর্পণ, বল, সে কি আমার চেয়েও রূপসী? সে কি দীর্ঘাঙ্গী আমার চেয়ে? আরো তন্বী? তার অধর আরো রক্তিম? বক্ষ আরো সুগন্ধি? ... অঙ্গে-অঙ্গে লাস্য আরো উচ্ছল? ... রাজকুমারী শান্তা! জামাতা! যুবরাজ! তুমি কি তৃপ্ত? ... আমি রিক্ত, আমি সর্বস্বান্ত। ... (দর্পণে গভীরভাবে তাকিয়ে) এই কি সেই মুখ, যা তুমি দেখেছিলে? 'তাপস, তুমি কে? কোনো স্বর্গের দূত? কোনো ছদ্মবেশী দেবতা?' এই মুখ, এই দেহ, এই বসন, এই অলংকার। তুমি কি আমাকেই দেখেছিলে? এই আমাকে? ...

আর কেন দৃষ্টিপাত করো না? আমি স্বপ্নে দেখি তোমার দৃষ্টি—জাগরণে দেখি তোমার দৃষ্টি। কিন্তু তুমি যা দেখেছিলে তা আমি দেখি না কেন? ...

বল, দর্পণ, সে কে? এক মুখ—একই মুখ ফুটে ওঠে বার-বার—অন্য মুখ নেই? ... মিথ্যাবাদী! ... (দর্পণ ছুঁড়ে ফেললো।)

আমি কি তবে স্বপ্ন দেখেছিলাম? সব কি আমার মতভ্রম—সেই আকাশ, তরুণ সূর্য, আমার হৃদয়ে সেই সূর্যোদয়? না-মতিভ্রম নয়—নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর বাস্তব। তিনি আজ যুবরাজ—তিনি আজ লোকপাল। ...'আমি তোমাকে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখবো।' পাপিষ্ঠা, কপটভাষিণী, পারলি কই? অন্যের হাতে অর্পণ করলি, সঁপে দিলি শান্তার বাহুবন্ধে!

তরঙ্গিনীর আকুতি যেন তীব্র হাহাকারে উচ্চকিত হয়ে ওঠে—

প্রিয়, আমার প্রিয়, আমার প্রিয়তম, কেন আমি তোমাকে নিয়ে চ'লে যাইনি—দূরে, বহুদূরে যেখানে শান্তা নেই, লোলাপাঙ্গী নেই, চন্দ্রকেতু নেই—

দীর্ঘ এই সংলাপে আমরা দেখি কিভাবে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয় তরঙ্গিনীর মনোভবনের প্রতিটি প্রকোষ্ঠ! কাব্য ও নাটকের যথার্থ মেলবন্ধন এখানে ঘটেছে। তরঙ্গিনীর লজ্জা, গর্ব, যন্ত্রণা; তার আনন্দস্মৃতি বিষাদ দুঃখ, তার জয়, তারই পরাজয়, আত্মধিক্কার। তার ঈর্ষা এবং অহংকারী আত্মরতি পর্যায়ক্রমে অভিব্যস্ত হয়েছে

তার একোক্তিতে। আর তা' চূড়ান্ত শীর্ষ স্পর্শ করেছে তখনই যখন তরঙ্গিনী বলে উঠেছে—

... আমি পারি—এখনো পারি—এখনো আমি তরঙ্গিনী। ... আমি, তরঙ্গিনী, তপস্বীকে লুণ্ঠন করেছিলাম, আর আজ কি এক তুচ্ছ জামাতাকে জয় করতে পারবো না!

তরঙ্গিনীর উচ্চ হাসির মধ্যে নেমে আসতে থাকে মঞ্চের যবনিকা। তরঙ্গিনী আবার কি পারবে ঋষ্যশৃঙ্গাকে জয় করতে?—দর্শকের এই কৌতুহল নাটকীয় সম্ভাবনায় আর একবার উৎকর্ণ হয়ে ওঠার মধ্যেই তৃতীয় অঙ্কের সমাপ্তি।

তৃতীয় অঙ্ক যেখানে তরঙ্গিনীর মানসতা প্রকাশ করেছে, চতুর্থ ও শেষ অঙ্ক সেখানে মুখ্যত ঋষ্যশৃঙ্গের আত্মানুসন্ধানের কথাই বলেছে। বাইরে আকাশে পড়ন্ত বেলা। রাজপ্রাসাদের অলিন্দে রাজবেশে ঋষ্যশৃঙ্গ দণ্ডায়মান, কক্ষাভ্যন্তরে উপবিষ্ট শান্তা কেশপ্রসাধনরত, তার সামনেও দর্পণ। অর্থাৎ দর্পণে আত্মপ্রতিকৃতি কি চরিত্রগুলির আত্মোপলব্ধির সহায়ক হিসেবে প্রযুক্ত হচ্ছে? ঋষ্যশৃঙ্গের দর্শনলাভে ধন্য পুরবাসী। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে এ-সব কিছু নিরর্থক, বিস্বাদ—

বিস্বাদ—বিস্বাদ এই রাজপুরী, বিস্বাদ জনতা, আমার মন্ত্রপুত বিবাহ বিস্বাদ,

বিবর্ণ দিন, তিক্ত কাম, উৎপীড়িত রাত্রি।

আমি যেন পিঞ্জরিত জন্তু, জীবনের বলাৎকারে বন্দী।

ওরা জানে না, কেউ জানে না—আমি দেখি অন্য এক স্বপ্ন।

শান্তার গান আর ঋষ্যশৃঙ্গের সংলাপ পরপর বিন্যস্ত। কক্ষ এবং অলিন্দের ব্যবধান তো খুব বেশি ছিল না। কিন্তু এই গান আর কথা তারা পরস্পর কি শুনতে পেলো না? হয়তো বুদ্ধদেব দেখাতে চেয়েছেন, উভয়ের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভৌগোলিক ব্যবধান খুব বেশি না হলেও মানসিকতার ব্যবধান দুস্তর। একইকালে ঋষ্যশৃঙ্গ ভাবছে 'সেই আবির্ভাব—সেই আবির্ভাব—সেই ঊষা—সেই উন্মোচন।/... আমার রক্তে আগুন, রোমকূপে বিদ্যুৎ, শ্রবণে উতরোল সমুদ্র।/... তার আলিঙ্গনে লুপ্ত হয়ে, তার বৈভবের অন্তরালে। ...' আর শান্তা কাতর তার প্রণয়ী অংশুমানের জন্য—

আসে যায় দিন-রজনী
আসে জাগরণ তন্দ্রা
শুধু নেই হৃৎস্পন্দন,
লুণ্ঠিত সব স্বপ্ন।

উভয়েই আত্মমগ্ন তাদের নিজস্ব অনুভবে। সুরে আর স্বরে এখানে সংলাপে বৈচিত্র্য এসেছে।

অলিন্দে শান্তার প্রবেশ, স্বামীর সঙ্গে তার কথোপকথনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে রাজপুরীর গতানুগতিক জীবনের ক্লান্তিকর দিক। ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গের সেই অপাপবিদ্ধ সত্যবাদী সরল মুখ যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। শান্তার সঙ্গে তাঁর বার্তাবিনিময় সতর্ক সুচতুর, কৃত্রিম। ঋষ্যশৃঙ্গ যেখানে শান্তার বেশবাসের প্রশংসা করেন, তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে কথা বলেন, তখন বোঝা যায় 'নাগরিক' 'যুবরাজ' দ্রুত কথা শেষ করতে আগ্রহী। শান্তাকে প্রসাদননিমিত্ত অন্তঃপুরে পাঠিয়ে আরো কিছু মুহূর্ত ঐ সূর্যাস্তকালে একা আত্মসাৎ করতে চান ঋষ্যশৃঙ্গ।

এরপরই বিভাণ্ডকের প্রবেশে পিতা-পুত্রের সংলাপে উদ্‌ঘাটিত হয় আর এক সত্য। পিতা এসেছেন পুত্রকে তপোবনাশ্রমে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গ অসম্মত—'আমি আজ যুবরাজ'। যৌবরাজ্যের সমাদর-সম্মান ছেড়ে যেতে চান না তিনি। কিন্তু শুধু কি তাই? বিভাণ্ডকের ভর্ৎসনার উত্তরে ঋষ্যশৃঙ্গ স্পষ্ট করে দেন পিতার 'পতন', যেদিন লোমপাদের কাছ থেকে পনেরটি গ্রাম আর পৌত্রের রাজ-উত্তরাধিকারের প্রতিশ্রুতি পেয়ে প্রশমিত হয়েছিল বিভাণ্ডকের রোষানলে। ঋষ্যশৃঙ্গ তো তারই 'সুযোগ্য' পুত্র। ঋষ্যশৃঙ্গ দেখলেন তার পিতাও 'অলঙ্ঘনীয় নিয়তি' বশত 'পাপের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করেছেন'। তার উচ্চারণ তাই নির্মম, তিক্ত, বিরক্ত। ঋষ্যশৃঙ্গ পিতাকে ফিরিয়ে দেন, না রাজৈশ্বর্য তার কাম্য নয়, কাম্য নয় ব্রহ্মসাধনাও। ঋষ্যশৃঙ্গ আরো কিছু খোঁজেন যেন দৃঢ় শপথের মতো উচ্চারণ করেন—

'কিন্তু আমারও কিছু প্রয়োজন আছে পিতা। আমি চাই—... কী চাই, জানি না। ... না, আমি ফিরে যাবো না। আমি এখানেই থাকবো। অন্য এক প্রতীক্ষায়—অন্য এক প্রতিজ্ঞায় আমি আবদ্ধ। ...'

বিবর্ণ বিফল মনোরথ বিভাণ্ডক ফিরে গেলেন, ঋষ্যশৃঙ্গ নিয়োজিত হলেন আত্মানুসন্ধানের আরেকদিকে—'পতি—পিতা-যুবরাজ-আমি? ব্রহ্মচারী—বনবাসী—আমি? না—না—আমি তোমার। অসহ্য নগর—অসহ্য জনতা—কিন্তু এখানেই আমার অপেক্ষা—তোমার জন্য। তোমার জন্য।' আত্মপীড়নের মধ্যে দিয়েই ঋষ্যশৃঙ্গ নিজেকে চিনতে চেয়েছেন ক্রমশ।

এরপরই অংশুমানের প্রবেশ, ঋষ্যশৃঙ্গের প্রতি তার সরাসরি অভিযোগ এবং অংশুমান ও শান্তার সংলাপের মধ্যে দিয়ে অকস্মাৎ নাটকীয়ভাবেই উভয়ের সম্পর্ক উন্মোচিত হবে ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে। সহজভাবেই বরণ করেছেন এই সত্যকে। নাটকীয়তার আরো এক স্তর ঘনীভূত হয়েছে লোলাপাঙ্গী ও চন্দ্রকেতুর আগমনে। এদের বিপন্নতা তরঙ্গিনীর দুর্বোধ্য অসুখ নিয়ে। একসময় নিজের অজ্ঞাতসারেই ঋষ্যশৃঙ্গ উচ্চারণ করেছিলেন সে নাম—'তরঙ্গা থেকে তরঙ্গে আমি চঞ্চল'—আর আজ জরতী গণিকার কাছ থেকে শুনেছে তরঙ্গিনী নাম্নী এক বারাঙ্গনাই রাজমন্ত্রীর নির্দেশে ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্যহরণ করেছিল, 'তরঙ্গিনী। তার নাম তরঙ্গিনী'। এরই মধ্যে দ্বিতীয় অঙ্কের মতো সেই লাস্যময়ী বেশে অলংকৃতা তরঙ্গিনী প্রবেশ করে রঙ্গামঞ্চে। দাঁড়ায় একেবারে ঋষ্যশৃঙ্গের সামনে, বলে—

'...আমি তোমাকে আর একবার দেখতি এলাম। আমাকে তুমি চিনতে পারছো না?...' তারপর বদলে যায় তার স্বরভঙ্গি—

'তোমার দৃষ্টি আজ অন্যরূপ কেন? তোমার সঙ্গে কেন বল্কল নেই? কেন তোমার চোখের কোলে ক্লান্তি?'...

চম্পানগরে প্রবেশের পর প্রায় বৎসরকাল অতিবাহিত হয়েছে, ঋষ্যশৃঙ্গ পিতা হয়েছেন, কেন এর মধ্যে তিনি সেই নারীর খোঁজ করলেন না বা তরঙ্গিনীরই কেন যুবরাজের কাছে পৌঁছতে এত সময় লাগল, কোনো কোনো সমালোচক সে প্রশ্ন তুলেছেন। বলা বাহুল্য, বুদ্ধদেব অতি দ্রুত যেন নাট্যসমাপ্তির দিকে এগিয়ে যেতে চেয়েছেন। তরঙ্গিনীর এই অভিসারে শান্তা কিংবা অংশুমান বিরক্ত হয়, চন্দ্রকেতু, লোলাপাঙ্গী বিভ্রান্ত হয়। কিন্তু সকলকে স্তব্ধ করে দিয়ে উচ্চারিত হয় ঋষ্যশৃঙ্গের স্বীকারোক্তি—

'...শোনো—আমি সকলের সামনে বলছি, এই যুবতী আমার ঈপ্সিতা। এই অঙ্গদেশ যেখানে আমি হর্ষধারা নামিয়েছি, আমি সেখানে শুষ্ক ছিলাম। দগ্ধ ছিলাম তারই বিরহে, তোমরা যাকে তরঙ্গিনী বলো। আমি জানতাম না কাকে বলে নারী, আমি যে পুরুষ তাও জানতাম না। সে আমাকে জানিয়েছিলো। আমি তাই কৃতজ্ঞ...। সে আমার পরিত্যাজ্যা নয়, সে আমার—অন্তরঙ্গা। তার কাছে—অঙ্গদেশে একমাত্র তার কাছে আমি ত্রাতা নই, অনুদাতা নই, যুবরাজ নই, মহাত্মা নই—... কোনো উদ্দেশ্যসাধনের উপায় নই আমি। একমাত্র তারই কাছে আমি অনাবিলভাবে ঋষ্যশৃঙ্গ।...'

এতদিনে তিনি স্বীকার করেছেন, রাত্রে অন্ধকারে বাহুবন্ধে ধরা দিত যে শান্তা, সে-মুহূর্তে ঋষ্যশৃঙ্গ ভাবত, সে শান্তা নয়, 'সেই অন্য নারী'। হয়তো শান্তাও ঋষ্যশৃঙ্গাকে কল্পনা করত অংশুমান রূপে। এইভাবে এতদিনে আত্ম-উপলব্ধির বিশেষ স্তরে উপনীত হলেন ঋষ্যশৃঙ্গ। তরঙ্গিনী একদিন ঋষ্যশৃঙ্গাকে সারল্যের স্বর্গ থেকে নির্বাসিত করেছিল, আজও সে তাকে মুক্তি দিল আত্মপরতার সংকীর্ণতা থেকে। যে মুখ বারবার দেখতে চাইল তরঙ্গিনী তা ঋষ্যশৃঙ্গাকে প্রথমে সংশয়-বেদনায় কাতর করলেও পৌঁছে দিল প্রশান্তিতে। রাজবেশ বদল করে ঋষ্যশৃঙ্গ পরিধান করলেন তপস্বীর বল্কল, শান্তাকে ফিরিয়ে দিলেন কৌমার্য, অংশুমানকে রাজত্ব, তারপর বেরিয়ে পড়লেন পথে—বললেন—'আমি ঘুমন্ত ছিলাম, সে আমাকে জাগিয়েছিল। আবার আমি ঘুমিয়ে পড়ছিলাম, আবার আমাকে জাগিয়ে দিয়ে গেলো সে। সেই আমার বন্ধন। সে-ই আমার মুক্তি। আমার সর্বস্ব'। অন্ধকারে শূন্যতায় ডুবতে চেয়ে তার পথচলা। তরঙ্গিনীকে সে সঙ্গে নিল না, আশ্রম তার গন্তব্য নয়।

'কেউ কি কোথাও ফিরে যেতে পারে, তরঙ্গিনী? আমরা যখনই যেখানে যাই, সেই দেশই নূতন। আমার সেই আশ্রম আজ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। সেই আমি লুপ্ত হয়ে গিয়েছি। আমাকে সব নূতন করে ফিরে পেতে হবে। আমার গন্তব্য আমি জানি না, কিন্তু হয়তো তা তোমারও গন্তব্য। ... কিন্তু তোমার পথ তোমাকেই খুঁজে নিতে হবে তরঙ্গিনী। ... বাধা দিয়ো না, ... তুমি তোমার পথে যাও। হয়তো জন্মান্তরে আবার দেখা হবে।'

ঋষ্যশৃঙ্গ অলিন্দ পার হয়ে চলে গেলেন। চলে গেল তরঙ্গিনীও তার সব অলংকার ত্যাগ করে— আত্ম-আবিষ্কারের পথে দু'জনেরই যাত্রা শুরু হল। শান্তা-অংশুমান বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবে। চন্দ্রাকেতু লোলাপাঙ্গী জীবনযাপনেরই কোনো এক অমোঘ আকর্ষণে পরস্পরের অবলম্বন হয়ে রয়ে গেল।

প্রয়োজনার জন্য পরামর্শে বুদ্ধদেব চতুর্থ অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গের চরিত্রায়ণের গভীরতার কথা বলেছেন, বলেছেন চরিত্রটির যথার্থ পরিস্ফুটন শ্রমসাধ্য কেননা বিভিন্ন ভাবের সন্নিপাতে 'দ্বিতীয় অঙ্কের সরল তপস্বী এখন জটিল সাংসারিক চরিত্র হয়ে উঠেছেন।' তাছাড়া এই অংশে '... যেন দ্বিতীয় অঙ্কের ঘটনাটি উল্টে গেলো—অর্থাৎ ঋষ্যশৃঙ্গোই চাইলেন তরঙ্গিনীকে 'ভ্রষ্ট' করতে, আর তরঙ্গিনী খুঁজলো ঋষ্যশৃঙ্গের মুখে সেই স্বর্গ যা দ্বিতীয় অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গ তার মুখে দেখেছিলেন এবং যার পুনরুদ্ধারে সে বদ্ধপরিকর। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ঋষ্যশৃঙ্গাই তরঙ্গিনীকে বুঝিয়ে দিলেন, কোথায় মানুষের সব কামনার চরম সার্থকতা। নায়ক-নায়িকার এই বিবিধ পরিবর্তন-প্রসূত উদ্বর্তন যতটা কৃতিত্বের সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা যাবে ততটাই এই নাট্যাভিনয়ের সাফল্যের সম্ভাবনা।'

বলেছেন বুদ্ধদেব, লোলাপাঙ্গী চরিত্রটিও যেন কখনোই 'কমিক' হয়ে না ওঠে, 'সমগ্র নাটকে তার বেদনার দিকটা ভুলে গেলে চলবে না', অর্থলোভ ও প্রগল্‌ভতা যেমন তার স্বভাবসিদ্ধ, মাতৃস্নেহও তারঅকৃত্রিম। কিন্তু জীবনের গ্রাস শেষপর্যন্ত অপ্রতিরোধ্য। তাই সচেতনে-অচেতনে আত্মপ্রতারণা কিছুটা করলেও তাদের বেঁচে থাকতে হবে, তরঙ্গিনীকে হারাবার পরও। তারা অনুকম্পার যোগ্য কিন্তু উপহাসাস্পদ নয়।

বুদ্ধদেব বলেছিলেন, 'লোকেরা যাকে কাম নাম দিয়ে নিন্দে করে থাকে তারই প্রভাবে দু'জন মানুষ পুণ্যের পথে নিষ্ক্রান্ত হলো—নাটকটির মূল বিষয় হলো তাই।' তপস্বী ও তরঙ্গিনীর ক্ষেত্রে একথা এককভাবে সত্য, কিন্তু নাটকের শেষে অন্য চরিত্রগুলি যেমন লোলাপাঙ্গী ও চন্দ্রকেতুর ক্ষেত্রেই সত্য নয়। আসলে, একদিক থেকে এ তপস্বী ও তরঙ্গিনীর আত্ম-অন্বেষণের নাটক, কাম থেকে তাদের যাত্রা শুরু প্রেমে, তাদের উত্তরণ। শেষপর্যন্ত পার্থিব সবকিছুকে অগ্রাহ্য করে নিরুদ্দেশের পানে যাত্রা, নতুন লক্ষ্যপথের সন্ধানে। 'জীবনের পথে মানুষ যাত্রা করে নিজেকে খুঁজে পাবার জন্য,' সেদিকে লক্ষ রেখেই চারটি অঙ্ক পরিকল্পিত নানা অনু-দৃশ্যের সমবায়ে। বিচ্যুতি নেই এমন নয়, কিন্তু চরিত্র-পরিকল্পনায়, আবহরচনায়, সংলাপের ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে কাব্যনাটকের উপযোগী পরিবেশ গ্রন্থনে নাট্যকারের নৈপুণ্য অনস্বীকার্য।

৬.৫ কাব্যনাট্য হিসেবে 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী

সাধারণ বিবেচনায় কাব্যে লেখা নাটককেই কাব্যনাটক বলা যায়। কাব্যনাটক বা কাব্যনাট্য, ইংরেজিতে Verse Play বা Poetic Drama-র সাধারণ অর্থ তাই। কিন্তু ছন্দে রচিত রচনামাত্রই যেমন কবিতা নয়, তেমনই নাটক কাব্য লেখা হলেই তা' কাব্যনাটক হয় না। কাব্য ও নাটক—উভয়েরই শর্তপূরণ এবং পরস্পরের মধ্যে আত্মস্থ ও অপরিহার্য হয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করে যে শিল্পমাধ্যম তাই কাব্যনাটক। উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রারম্ভিক কাল পর্যন্ত ইংল্যান্ড ও ইউরোপীয় বাস্তবতাবাদী বন্ধ্যা নাট্যকলার প্রতিক্রিয়ার ফলে এলিয়ট প্রমুখের মধ্য দিয়ে কাব্যনাটকের তত্ত্ব ও প্রকরণের বহুল প্রচার ঘটে। কিন্তু আদিতে পৃথিবীর দুটি শ্রেষ্ঠ নাট্যযুগ, গ্রীক ও এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যকলাই ছিল কাব্যনাটকের। যদিও তখন কাব্যনাটক কথাটির পৃথক প্রচলনের প্রয়োজন হয়নি, কারণ কাব্যে নাটক রচনাই ছিল তখনকার সাধারণ রীতি।

কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাস্তবতার দাবিতে ইবসেন প্রমুখর নাট্যচর্চায় গদ্যভাষা ব্যবহৃত হলো, কিছু পরেই আবার ইবসেন কিংবা বার্নাড শ'-এর সমাজচর্চাকে ঈষৎ অগ্রাহ্য করে পরা-বাস্তব-সন্ধানী প্রতীকসম্বল এক লেখকগোষ্ঠীর আবির্ভাব হলো। তাঁরা শুধু পদ্যভাষা নয়, মঞ্চে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এলেন কবিতাকে। ক্রমশ এক নতুন অর্থে কবিতা হলো নাটকের অপরিহার্য অন্বেষণ। কেননা, রহস্যময় আত্মিক এবং সাঙ্গীতিক জগতের ধ্যান ও সন্ধান, এই হলো ইয়েটস্ প্রমুখ নাট্যকারদের বিষয় বা থিম। এই বিষয়ের জন্য যোগ্য ভাষা প্রয়োজন, কবিতার মেদুরতা তাই অত্যাবশ্যক। প্লট বা কাহিনি এ-সব রচনার পক্ষে গৌণ হয়ে এলো, গভীরতর সত্যসন্ধানের উপযুক্ত থিমই তখন পুরোবর্তী হয়ে দেখা দিল। কাব্যনাট্যে গদ্যভাষাও ব্যবহৃত হতে পারে কিনা তা-ও বিবেচ্য হলো। বিশেষত, ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে এলিয়টের Murder in the Cathedral প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কাব্য-নাট্যের নতুন যুগ দৃঢ় প্রতিষ্ঠাভূমি অর্জন করল। ইয়েটসের রচনায় কবিতার আধিপত্য, বিপ্রতীপে নাট্যস্বভাবে লিয়ট সাধারণভাবে অনেকখানি অগ্রসর।

বস্তুত, যে-কোনো মুহূর্তে ভাবনা বা অনুভব অনুকূল গাঢ়তায় প্রবেশ করতে পারে, এমন কাব্যভাষা নির্মাণ করতে হবে কাব্যনাট্যে। তার জন্য স্থিতিস্থাপক, নম্য এক ছন্দের প্রয়োজন এবং এর দ্বারা একদিকে যেমন নাটকে জীবনচিন্তার সাময়িকতা ও কবিকল্পনার চিরন্তনতা যুক্ত হবে, অন্যদিকে তেমনই কবিতার জগৎও প্রসারিত হবে বহুদূর। একটি মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত কাল বিধৃত, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একটি বিন্দুতে এসে মিলে যায়। এই মুহূর্তের উপলব্ধি ও বিস্তার, ত্রিস্তরিক এই সময়ের উদ্‌ঘাটন কেবলমাত্র কাব্যনাট্যেরই বিষয় হতে পারে। অর্থাৎ বিষয়ে এবং বিশেষ ছন্দের বিন্যাসে সময়ের সুদূরপ্রসারী দ্যোতনায় কাব্যনাট্য বিশেষ মাত্রা অর্জন করে নিতে পারে। এমনকি কাব্যভাষা শুধু নয়, গদ্যের প্রত্যেক স্পন্দনে কবিতার নিঃশ্বাস জড়িয়ে গেলে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর'-এর মতো গদ্যনাটকও কাব্যনাট্যের অভিধা পেতে পারে।

বুদ্ধদেব বসুর 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' মূলত গদ্যভাষায় লেখা হলেও এই নাটক এত বেশি কবিত্বমন্ডিত যে অনায়াসেই কাব্যনাট্যের আলোচনার সীমানায় এসে যেতে পারে। পুরাণের পুনর্জন্মে কবি-কল্পিত 'ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনী পুরাকালের অধিবাসী হয়েও মনস্তত্ত্বে আমাদের সমকালীন।' মূল পুরাণকাহিনির নির্দ্বন্দ্ব গণিকা চরিত্রটির ভাবান্তর প্রথম রবীন্দ্রনাথই লক্ষ করেছিলেন, তারপর বুদ্ধদেব চরিত্রটিকে নতুন করে আবিষ্কার করেছিলেন। বুদ্ধদেবের তরঙ্গিনী আত্মসংকটে ক্ষতবিক্ষত, নতুন বোধে উত্তীর্ণ এক নারী। অন্যদিকে, যে 'কাম' ঋষিকুমার ঋষ্যশৃঙ্গের সাধনাকে বিনষ্ট করে দিয়েছিল, তাই আবার তাঁকে নতুন এক জীবনের সন্ধান দিল। ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনীর জীবনে কাম থেকে বিবিধ স্তর-পরম্পরা ও নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে প্রেমে ও অবশেষে পুণ্যের পথে নিষ্ক্রমণের মাহাত্ম্যেই দুটি মানুষের আত্ম-আবিষ্কার সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। পুরাণ-কাহিনির অনুসরণ সত্ত্বেও তার মধ্যে নিজস্ব জীবন-অভিজ্ঞতার আর্কেটাইপ আবিষ্কার করে কল্পনাসমৃদ্ধ চার অঙ্কে বিভক্ত 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' নাটকে কাহিনি চরিত্র ও ঘটনাবর্ণনায় আধুনিক যুগের আধুনিক মানুষের জীবনযন্ত্রণা ও তার উত্তরণকে কবি কাব্যময় অভিব্যক্তি দান করেছেন।

সূচনায় গাঁয়ের মেয়েদের সঙ্গীত রচনায় বুদ্ধদেব এলিয়টের Murder in the Cathedral নাটকের কোরাসের গানের দ্বারা যথেষ্ট প্রাণিত হয়েছিলেন। From Ritual to Romance-এর কাহিনির অনুরূপ এই গানও আমাদের এক অনুর্বর পোড়ো জমির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বন্ধ্যাভূমির প্রেক্ষাপটে আধুনিক মানুষের বিচ্ছিন্ন রিক্ত, শূন্য অবস্থানটিকে কবি প্রকাশ করতে চেয়েছেন এইভাবেই।

কাব্যনাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে বারাঙ্গনা তরঙ্গিনী নানা কৌশল এবং সুদক্ষ অভিনয়ের দ্বারা ঋষ্যশৃঙ্গের কামস্পৃহার উদ্রেকে তাঁর তপস্বী-সত্তাকে জয় করলেও স্বধর্মচ্যুত হয়ে সে নিজেও পরাজিত হয়েছে। বুদ্ধদেব বলেছেন, এই একটি ঘটনাতেই নায়ক-নায়িকার 'বিপরীত দিকে পরিবর্তন' ঘটলো, তপস্বীর মনে জেগে উঠলো ইন্দ্রিয়-বাসনা, আর বারাঙ্গনার মধ্যে জেগে উঠলো 'রোমান্টিক প্রেম'। আর এই পারস্পরিক আকর্ষণের নিগূঢ় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় দুজনেরই আত্ম-জাগরণ ঘটে গেলো। উভয়ের চোখেই ফুটে উঠলো 'অন্য এক স্বপ্ন', দুজনেই তাদের প্রকৃত স্বরূপ—সেই হারিয়ে ফেলা মুখের খোঁজে উৎকণ্ঠ হল।

তরঙ্গিনীকে প্রথম দেখার পর ঋষ্যশৃঙ্গের যে অভিভব তা অসাধারণ কাব্যময় সংলাপের আধারে অভিব্যক্ত—'সুন্দর আপনার আনন, আপনার দেহ যেন নির্ধূম হোমানল, আপনার বাহু, গ্রীবা ও কটি যেন ঋক্‌ছন্দে আন্দোলিত। আনন্দ আপনার নয়নে, আনন্দ আপনার চরণে, আপনার ওষ্ঠাধরে বিশ্বকরুণার বিকিরণ' ...'আমার মনে হচ্ছে, আপনি চিন্ময়, জ্যোতিঃপুঞ্জ, প্রতিভার দিব্যমূর্তি। যে-মনস্বীরা তিমিরের পারে আলোকময়কে

দেখেছিলেন, আপনি যেন তাঁদেরই একজন।' ...

এই উক্তি তরঙ্গিনীর ভিতরকার সংকটকে ঘনীভূত করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা'-ও শুনেছিল, ভেবেছিল এই কথা—'আনন্দময়ী মুরতি তুমি/ফুটে আনন্দ বাহুতে তোমার/ছুটে আনন্দ চরণে চুমি।' এই আলোড়িত অনুভবই বুদ্ধদেবের রচনায় প্রসারিত হয়েছে। বন্ধ্যা নগরীতে বৃষ্টি নামার পূর্ব-মুহূর্তে দেহমিলনের বর্ণনা প্রতীকী পাৎপর্যে এবং কাব্যসৌন্দর্যে অতুলনীয় হয়ে উঠেছে—

"জাগলো জন্তু। ভাঙলো নিদ্রা। সুপ্ত হলো যারা জাগ্রত ছিলো। চঞ্চল হলো মনোরথ, উচ্ছল হলো নির্ঝর। মেঘ জমলো আকাশে, চমক দিলো বিদ্যুৎ, বিলোল হলো বজ্র। নামলো বৃষ্টি। জাগলো ধ্বনি—প্রতিধ্বনি। প্রাণ থেকে প্রাণে, অঙ্গ থেকে অঙ্গে, তৃষ্ণা থেকে তৃষ্ণায়—প্রতিধ্বনি। ... তুমি আমার তৃষ্ণা, তুমি আমার তৃপ্তি। আমি তোমার তৃষ্ণা, আমি তোমার তৃপ্তি। সর্প তোলে ফণা, ফেনিল হয় সমুদ্র। চলে মন্থন—মন্থন—মন্থন। দীর্ণ মেঘ, তীব্র বেগ। রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিপূর্ণ ধরণী। বর্ষণ—বর্ষণ—বর্ষণ।"

অনভিজ্ঞ পুরুষের জীবনে কামনার প্রথম শিখা তরঙ্গিনী আর অভিজ্ঞ বারাঙ্গনার জীবনে প্রেমের স্পর্শ ঋষ্যশৃঙ্গ। মিলনের তটভূমিতে দাঁড়িয়ে দুজনের ভাষা তাই পৃথক। আবেগ ব্যঞ্জনার বৈপরীত্যে বাহুমাত্রিক অর্থদ্যোতনায় দুজনের সংলাপ দুলে উঠেছে—

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি জেনেছি তুমি কে। তুমি নারী।

তরঙ্গিনী। কুমার, আমি তোমার সেবিকা।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি জেনেছি আমি কে। আমি পুরুষ।

তরঙ্গিনী। তুমি আমার প্রিয়। তুমি আমার বন্ধু। তুমি আমার মৃগয়া। তুমি আমার ঈশ্বর।

ঋষ্যশৃঙ্গ। তুমি আমার ক্ষুধা। তুমি আমার ভক্ষ্য। তুমি আমার বাসনা।

তরঙ্গিনী। আমার হৃদয়ে তুমি রত্ন।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমার শোণিতে তুমি অগ্নি।

তরঙ্গিনী। আমার সুন্দর তুমি।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমার লুণ্ঠন তুমি।

... ...

তরঙ্গিনী। এসো প্রেমিক, এসো দেবতা—আমাকে উদ্ধার করো।

ঋষ্যশৃঙ্গ। এসো দেহিনী, এসো মোহিনী—আমাকে তৃপ্ত করো

এ সংলাপে ঋষ্যশৃঙ্গের দাহ যেমন তীব্র, তরঙ্গিনীর প্রেম উপলব্ধিও তেমন গাঢ়. ফলে বুদ্ধদেবের ভাষ্যেরই জের টেনে সমালোচক বলেন—"একই ঘটনার ফলে ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনীর এই বিপরীত যাত্রা—একজনের সরলতা থেকে কামে, অন্যজনের কাম থেকে প্রেমে—যেন এক বিন্দুতে দুই বিপরীত শক্তির সঙ্গম, যার আঘাতে নাটকে এল এক দুর্লভ ঘনতা। পাশাপাশি দাঁড়ানো দুই বিপরীতমুখী জেটপ্লেনের মতো কম্পমান

তরঙ্গিনী ও ঋষ্যশৃঙ্গ।" —(দর্পণে দুই মুখ ঃ অমিয় দেব)

তৃতীয় অঙ্কে তরঙ্গিনী ও লোলাপাঙ্গীর গদ্য-সংলাপ কবিতাকে ধারণ করে আছে খুব গভীরে। লোলাপাঙ্গীর কথায় আছে লৌকিক ভয়, উদ্বেগ-ঈর্ষা, অর্থলোভ, আবার মাতৃস্নেহ, কন্যাকে না বোঝার অসহায়তাজাত বেদনা। লোলাপাঙ্গী গদ্যভাষিণী, তার সংলাপে এসবেরই প্রচ্ছায়া. আর তরঙ্গিনীর কথায় অকল্পনীয় আনন্দ ও বেদনার যুগপৎ বিচ্ছুরণ। বাস্তবজীবনের অভিঘাত সত্ত্বেও এ গদ্য মাঝে মাঝেই কাব্যময়। চতুর্থ অঙ্কে দেখি, শান্তার সঙ্গে বৎসরাধিক কাল বিবাহিত জীবনযাপন, যৌবরাজ্যে অভিষেক, রাজপ্রাসাদের ভোগবিলাস-বৈভব, জনতার জয়ধ্বনি, চাটুকারিতা সত্ত্বেও ঋষ্যশৃঙ্গ নিঃস্ব নিঃসঙ্গ বিষাদখিন্ন—কোন্ এক হারিয়ে যাওয়া মুখের অন্বেষণে রত। নিজের উদ্বেলিত হৃদয় ভাষা পায় এইভাবে—

বিস্বাদ-বিস্বাদ এই রাজপুরী, বিস্বাদ জনতা, আমার মন্ত্রপূত বিবাহ বিস্বাদ,
বিবর্ণ দিন, তিক্ত কাম, উৎপীড়িত রাত্রি।
আমি যেন পিঞ্জরিত জন্তু, জীবনের বলাৎকারে বন্দী।
ওরা জানে না, কেউ জানে না—আমি দেখি অন্য এক স্বপ্ন।

কিংবা নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে আমি ব্যাপ্ত,
তরঙ্গ থেকে তরঙ্গে আমি চঞ্চল—
তার আলিঙ্গনে লুপ্ত হয়ে, তার বৈভবের অন্তরালে।
সে কোথায়? সে কে? তার নাম পর্যন্ত জানি না।

অথচ একবারও কি মনে হয় না, রাজর্ষির তরঙ্গ ...' উক্তির মধ্যে তাঁর অজ্ঞাতসারেই তরঙ্গিনীর নাম উচ্চারিত হলো! বাইরে ঋষ্যশৃঙ্গের জীবনে বৈভব-বৈদগ্ধ, অন্তরে তার অসহায়তা; বাইরে সকলের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের অন্তরে তিনি একাকী হয়ে গেছেন। অংশুমানের সঙ্গে কথোপকথনে তাঁর এই মনোভাব গদ্যসংলাপের দ্বৈততায় ধরা পড়েছে।

অংশুমান। আমি সত্যবাদী। আপনাকে একটি মর্মান্তিক কথা বলতে এসেছি।

ঋষ্যশৃঙ্গ। মর্মান্তিক? তা হলে নির্ভয়ে বলুন। আমি এক বৎসর যাবৎ স্তুতি শুনেছি—শুধু স্তুতি, জয়ধ্বনি, অভিনন্দন। এই ঘৃতান্ন-ভোজে আমার অগ্নি-মান্দ্য হয়েছে। আপনি তা প্রশমিত করুন।

অংশমান। অভিনন্দনে আপনার কোনো অধিকার নেই।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমার দুর্ভাগ্য—আপনি ছাড়া কেউ তা বোঝে না।

কথার কৌশলে গদ্য সংলাপে এখানে বক্রোক্তির মাত্রা এসে লাগে। গদ্যধর্মী উক্তি-প্রত্যুক্তির সংঘাত-সমন্বয়ের মধ্যেই কবিতা তার নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে। বহুকথিত কাম ও প্রেমের দ্বন্দ্বকে শান্তিময় সহাস্তানে চিহ্নিত করে কবি যেন দেখাতে চাইলেন, কাম ও প্রেমের মধ্যে কোথাও কোনো বিরোধ নেই, বরং একে অপরের পরিপূরক, তা মানুষকে আত্ম-অন্বেষণে প্রবুদ্ধ করেছে।

এই নাটকে আগাগোড়া গদ্যের ন্যায়সম্মত ধরনকে বজায় রেখেও বুদ্ধদেবের ভাষা গূঢ় উপলব্ধির জগতে

কবিতার ব্যঞ্জনায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। গদ্যভাষায় কবিতার শব্দবন্ধ ও অলংকার সৃজনে, পঙ্‌ক্তি বিন্যাসের অসমমাত্রিক পদ্ধতিতে। অত্যুক্তি ও বক্রোক্তির অলংকরণে, তৎসম ও চলিত শব্দের স্বচ্ছন্দ মিলন-সাধনে, শব্দের বিস্ময়কর শৃঙ্খলা ও সংযম রক্ষায়, নাটকীয় গতি আনার জন্যে প্রয়োজনবোধে কথ্যভাষার মধ্যে থেকে ক্রিয়াপদ ও শব্দ আমদানি ও শব্দ আমদানি করে বুদ্ধদেব এমনই কাব্যবিভা সঞ্চার করেছেন যা—'reflects the speed of life, the pressure of life, its very essence'. এইভাবেই সার্থক কাব্যনাট্যের লক্ষণাক্রান্ত হয়ে উঠেছে তপস্বী ও তরঙ্গিনী।

৬.৬ চরিত্রায়ণ

'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' নাটকে মুখ্য চরিত্র এই দুজন, তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ এবং 'বারাঙ্গনা' তরঙ্গিনী। কাম ও প্রেমের দ্বন্দ্ব এবং তারপর পুণ্যের পথে তাদের নিষ্ক্রমণে আরো যারা নানা পর্যায়ে সাহায্যকরেছে, তারা হলেন ঋষ্যশৃঙ্গ-জনক বিভাণ্ডক, ঋষ্যশৃঙ্গ পত্নী শান্তা, তরঙ্গিনীর জননী লোলাপাঙ্গী এবং দুই প্রণয়ী যুবক—অংশুমান ও চন্দ্রকেতু, যথাক্রমে শান্তা ও তরঙ্গিনীর প্রণয়প্রার্থী। রাজমন্ত্রী এবং রাজপুরোহিতও অবশ্য আছেন, আছে তরঙ্গিনীর সখীরা, গাঁয়ের মেয়েরা, রাজদূত এবং ঘোষক। তবে তরঙ্গিনীর সখীদের যেমন কোনো সংলাপ নেই, তেমনই 'ঘোষক' একটি চরিত্র মাত্র। রাজদূত কিংবা ঘোষক কর্তব্য পালন করেছে, নাটকে তাযপর্য পায়নি। আমরা ঋষ্যশৃঙ্গ এবং তরঙ্গিনী চরিত্র এবং শান্তা-অংশুমানের কাহিনিবৃত্ত থেকেই তাদের চরিত্র আলোচনা করতে পারি।

ঋষ্যশৃঙ্গ

পুরাণ-কথিত এই ঋষ্যশৃঙ্গ চরিত্রে আধুনিক মানসের সংকট ও যন্ত্রণা সঞ্চার করে বুদ্ধদেব বসু চরিত্রটিকে একটা বিস্তৃতি দিয়েছেন। আলোচ্য নাটকে আমরা দেখি, জীবনের কয়েকটি পর্যায় অতিক্রমণে ঋষ্যশৃঙ্গ বহুমাত্রিক একটি চরিত্র হয়ে উঠেছেন। প্রথম পর্বে বিভাণ্ডক-পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ অপাপবিদ্ধ, শুদ্ধাচারী, তাপস। দ্বিতীয় স্তরে দেখি, প্রথম 'নারী' সংসর্গে জেগেছে তাঁর এযাবৎ প্রসুপ্ত পৌরুষ, রূপাজীবার শরীরী স্পর্শ তাঁর মধ্যে অনাস্বাদিত অ-পূর্ব এক অনুভূতিকে জাগিয়ে দিয়েছে, যাকে বলতেই পারি 'কাম'। তৃতীয় পর্বে আমরা দেখি 'বিবাহিত' এবং রাজ-জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গকে—ক্লান্ত, বিবর্ণ, নাগরিক এবং এই সময়েই সেই 'প্রথম' নারীর মুখ খুঁজে পেতে চাইছেন, ফিরে পেতে উৎসুক। চতুর্থ এবং শেষ পর্বে লক্ষ করি, আত্ম-স্বরূপ 'আবিষ্কার' ও যথার্থ আত্ম-অনুসন্ধানের তাড়নায় ঋষ্যশৃঙ্গের মহানিষ্ক্রমণ-পুণ্যের পথে, সেখানে আকাঙ্ক্ষিতা সেই 'প্রথমা'কেও পিছনে ফেলে যান তিনি।

পুরাণে ঋষ্যশৃঙ্গকে 'নারী'-অভিজ্ঞতা বা যৌন-অভিজ্ঞতার বাইরে রাখা হয়েছে। এর যৌক্তিকতা যাই হোক নারী সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতায় একটা অভিনবত্ব আছে এটুকু স্বীকার্য। এই অজ্ঞতা যেমন কখনো সুন্দর তেমনই কখনো তো অভিশাপ হয়েও উঠতে পারে। ঋষ্যশৃঙ্গের ক্ষেত্রে তা-ই ঘটেছিল, নারী কি—তা না জানার ফলেই পিতার নিষেধের গণ্ডি তিনি যে অতিক্রম করেছিলেন তা তাঁর পক্ষে বোঝা সম্ভবই হয়নি। সেই

অজ্ঞতা থেকেই অসংকোচে তিনি পিতার কাছে বিবৃত করেন তাঁর প্রথম যৌন অভিজ্ঞতা—

'তিনি এক আশ্চর্য ব্রহ্মচারী। দীর্ঘকায় নন, খর্বকায়, নন, দেবতার মতো কান্তিমান। কনকতুল্য তাঁর বর্ণ, দেহ সুঠাম ও সংকেতময়; তাঁর মস্তকে নীল নির্মল সংহত জটাভার। শঙ্খের মতো গ্রীবা, দুই কর্ণ যেন উজ্জ্বল কমণ্ডলু। নয়ন তাঁর আয়ত ও স্নিগ্ধ; আনন যেন উদ্ভাসিত ঊষা; বালার্কের মতো অরুণবর্ণ তাঁর কপোল। তাঁর বাহু, বক্ষ ও পদযুগ নির্লোম; বক্ষে দুটি মাংসপিন্ড মনোহর নৈবেদ্যের মতো বর্তুল। ...'' সেই দেবতুল্য ব্রহ্মচারীকে দেখে ঋষ্যশৃঙ্গ অভিভূত, যে অনঙ্গব্রতে তরঙ্গিনী অঙ্গীকৃত, তার পণ আত্মদান, মন্ত্র রতি, যজ্ঞ প্রীতি, ধ্যান আনন্দযোগ, দ্বৈতবাদী সে। ঋষ্যশৃঙ্গ সেই অনুভূতির স্মৃতিচারণ করে বিভান্ডকের কাছে—

''সেই আলোকলক্ষণ ব্রহ্মচারী আমাকে আলিঙ্গান করলেন—যেমন বৃক্ষকে আলিঙ্গান করে লতা। ... তাঁর ... অধরের সঙ্গে অধরের সংযোগে চুম্বন করলেন আমাকে—যেমন পুষ্পকে চুম্বন করে ভৃঙ্গ। আমার দেহে জাগলো অজ্ঞাতপূর্ব পুলক, আমার সত্তায় সঞ্চারিত হলো অমৃতস্পর্শ।''

সেই ''ব্রহ্মচারী'র অদর্শনে ঋষ্যশৃঙ্গ খিন্ন, ব্যাকুল। সে যে 'নারী' একথা জেনে তার প্রশ্ন—'নারী? পিতা, নারী কাকে বলে? তারপর ঋষ্যশৃঙ্গের মোহমুগ্ধ উচ্চারণ—'নারী। ... নারী। ... নারী। নুতন নাম, নুতন রূপ, নূতন ভাষা। নূতন এক জগৎ। ... মোহিনী, মায়াবিনী, উর্বশী। নূতন জপমন্ত্র আমার। ... তুমি নারী, আমি পুরুষ। ...'

অস্নাত অভুক্ত অনিদ্র থাকতে চেয়েছে ঋষ্যশৃঙ্গ, সেই নারীর অঙ্গস্পর্শ, চুম্বনের অনুভূতি যাতে লুপ্ত না হয়ে যায়। পিতার নির্দেশ ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করে তপস্যার, কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গের এই অস্থির আর্ত সময়েই আবার এগিয়ে এল সেই নারী—তখন অনেক পিছনে পড়ে রইল পিতার সতর্কবাণী। একবার যিনি জেনেছেন, পেয়েছেন অনঙ্গব্রতের অধিকার; তখন আর ফেরবার পথ রইল না।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি জেনেছি তুমি কে। তুমি নারী।

তরঙ্গিনী। কুমার, আমি তোমার সেবিকা।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি জেনেছি আমি কে। আমি পুরুষ।

তরঙ্গিনী। তুমি আমার প্রিয়। তুমি আমার বন্ধু। তুমি আমার মৃগয়া। তুমি আমার ঈশ্বর।

ঋষ্যশৃঙ্গ। তুমি আমার ক্ষুধা। তুমি আমার ভক্ষ্য। তুমি আমার বাসনা।

তরঙ্গিনী। আমার সুন্দর তুমি।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমার লুণ্ঠন তুমি।

তরঙ্গিনী। বলো, তুমি চিরকাল আমার থাকবে।

ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি তোমাকে চাই—তুমি প্রয়োজন!

উভয়ের সংলাপে মনোযোগ দিলে দেখি কি অসাধারণ বিপ্রতীপতায় চিহ্নিত হয়ে যাচ্ছে উভয়ের মানসলোক। বারাঙ্গনার কাছে এই এক পুরুষ 'ঈশ্বর', আর তপস্বীর কাছে এই এক নারী 'বাসনা'। কাম থেকে

প্রেমের মহতী ভুবনে ঊর্ধ্বায়ত হয়ে যাচ্ছে তরঙ্গিনী বলেছে—'বলো, তুমি চিরকাল আমার থাকবে!' আর ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে নারী হয়ে উঠছে 'প্রয়োজন'। তরঙ্গিনী কামনার আবর্ত থেকে অব্যাহতি চেয়ে বলেছে—'এসো প্রেমিক, এসো দেবতা—আমাকে উদ্ধার করো।' আর সারল্যের স্বর্গ থেকে নির্বাসন চেয়ে কামনার তীব্র আশ্লেষে আবিষ্ট ঋষ্যশৃঙ্গের আর্তি—'এসো দেহিনী, এসো মোহিনী—আমাকে তৃপ্ত করো।' বুদ্ধদেব এইজন্যই বলেছিলেন, এখানে "নায়ক-নায়িকার বিপরীত দিকে পরিবর্তন ঘটলো; একই মুহূর্তে জেগে উঠলো তরঙ্গিনীর হৃদয় এবং ঋষ্যশৃঙ্গের ইন্দ্রিয়লালসা; একই ঘটনার ফলে ব্রহ্মচারীর হলো 'পতন' আর বারাঙ্গনাকে অকস্মাৎ অভিভূত করলে 'রোমান্টিক প্রেম'—"

তরঙ্গিনীর সঙ্গে নগরে প্রবেশ করেন ঋষ্যশৃঙ্গ, কাঙ্ক্ষিত বৃষ্টি নামে, জনপদবাসীর সমবেত উল্লাসের মধ্যেই 'রাজকীয় চক্রান্তে' তরঙ্গিনীর সঙ্গচ্যুত হন ঋষি, ঋষ্যশৃঙ্গ এক অর্থে তখন 'রাজবন্দী'। বলা বাহুল্য, একদিন স্বেচ্ছায় যে ব্রতপালনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তরঙ্গিনী, তা' পালন করা ছাড়া তারও আর কোন উপায় ছিল না। তারপর তৃতীয় অঙ্গ জুড়ে রয়েছে তরঙ্গিনীর বিরহব্যাকুলতার ছবি। ঘোষকের কাছ থেকে তরঙ্গিনীর মতো আমরাও জানতে পারি, আগামী শুভলগ্নে রাজা লোমপাদ তাঁর জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবেন। চতুর্থ অঙ্গে আমরা আবার দেখি ঋষ্যশৃঙ্গকে—প্রথম মিলনের স্মৃতিতে আতুর, বর্তমান জীবনের সংস্কারে বিদ্ধ, ভবিষ্যতের জন্য উৎসুক ঋষ্যশৃঙ্গকে।

মধ্যবর্তী এই একটা বছর ঋষ্যশৃঙ্গের সাক্ষাৎ আমরা পাইনি। এখন তাঁকে আমরা দেখি ক্লান্ত, বিমুখচিত্ত, শান্তার সঙ্গে তাঁর বিবাহিত জীবনের একবছর অতিক্রান্ত, অথচ কোনো এক গূঢ় যন্ত্রণায় ক্রমশ অসহনীয় হয়ে উঠেছে ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে তার 'রাজকীয়' জীবন, প্রজাদের প্রণামেও তিনি উদাসীন—

বিস্বাদ—বিস্বাদ এই রাজপুরী, বিস্বাদ জনতা, আমার মন্ত্রপূত বিবাহ বিস্বাদ,

বিবর্ণ দিন, তিক্ত কাম, উৎপীড়িত রাত্রি।

আমি যেন পিঞ্জরিত জন্তু, জীবনের বলাৎকালে বন্দী।

(লক্ষ করি, তপস্বীর ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছ—'জীবনের বলাৎকারে বন্দী।')

একই সময়ে লেখা 'মরচে-পড়া পেরেকের গান'-এ ঋষ্যশৃঙ্গের জবানীতে বুদ্ধদেব লিখেছিলেন—

"আমার কাছে রাজপুরী বিস্বাদ, বিস্বাদ আমার পরিণীতা রাজকন্যা, বিবর্ণ দিন, প্রেমহীন, তিক্তকাম রাত্রি। তিক্ত আমার মন্ত্রপুত মিলন, উৎপীড়িত আমার বীজস্রোত যার তেজে বৃষ্টি নামে, ফসল ফলে, যে দেশে আমি হর্ষধারা নামিয়েছি একা আমি শুকনো।"

শান্তার নৈঃসঙ্গ্য তার গানে আর ঋষ্যশৃঙ্গের নৈরাশ্য তার সংলাপে পরপর এখানে ধরা পড়েছে। শান্তার সঙ্গে কথোপকথনে আমরা দেখি 'অন্য' এক ঋষ্যশৃঙ্গকে যাঁর 'জিহ্বা মসৃণ' 'শব্দকোষ বিশাল'; সুতরাং রাজোচিত 'বাক্যপ্রয়োগ' বা শ্রবণে তাঁর যুগপৎ অনীহা অপ্রকাশ্য রাখার কৌশল করায়ত্ত, কেননা 'যেখানে বক্তব্য কিছু নেই, সেখানে বাক্যে কী এসে যায়?' নাগরিক বাক্‌চাতুর্য তখন তাঁর অধিগত।

এই সময় বিভাণ্ডকের আগমনে এবং পুত্রকে তাঁর ভর্ৎসনায় ঋষ্যশৃঙ্গের অন্তরের শূন্যতা যেন আরো বেশি করে ফুটে ওঠে। বিভাণ্ডকে বলেন যে, ঋষ্যশৃঙ্গ আজ ভ্রষ্ট, স্খলিত—'এত্ত কি সম্ভব যে এই রাজপুরী-

নগর-এই বিস্তীর্ণ কামরশ্মি—এই উজ্জ্বল কালান্তক উণাজাল—তুমি এরই মধ্যে মক্ষিকার মতো বন্দী হয়ে থাকবে—তুমি, ঋষ্যশৃঙ্গ?' পিতার এই ধিক্কার ঋষ্যশৃঙ্গকে সচেতন করে, উন্মুখ করে তোলে কোনো এক অনির্দেশ্য অথচ ধ্রুব লক্ষ্যের প্রতি। ঋষ্যশৃঙ্গ, পরিবর্তিত ঋষ্যশৃঙ্গ পিতাকেও বিরূপবচনে বিদ্ধ করেছে, কিন্তু পিতৃআজ্ঞা পালন করে নি। কেননা ঋষ্যশৃঙ্গ তখন অপেক্ষমান—

'আমারও কিছু প্রয়োজন আছে, ... আমি চাই—... কী চাই, জানি না ... কিন্তু এখানেই আমার অপেক্ষা—তোমার জন্য, তোমার জন্য।'

বস্তুত, তরঙ্গিনী একদিন তাঁর মধ্যে যে জাগরণ ঘটিয়েছিল তারই আলোকে এবার নিজের অস্তিত্বকে খুঁজতে চাইছেন ঋষ্যশৃঙ্গ। কেননা "আর সকলে তাকে এক একটা খোপে বন্দী করতে চেয়েছে—কেননা ছোটো কোনটা বা বড়ো, দিতে চেয়েছে এক একটা সংজ্ঞার্থে ভূমিকা—ত্রাতা, অন্নদাতা, যুবরাজ, মহাত্মা, কোনো না কোনো উদ্দেশ্য সাধনের উপায়। একমাত্র তরঙ্গিনীর কাছে সে জানতে পেরেছে তার অবিকলত্ব।"—(আধুনিক জীবন ও পুরাণ ছায়া, 'প্রসঙ্গ অনুষঙ্গ'/সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়) এই বিপন্নতার কথা, যন্ত্রণার কথা সর্বসমক্ষে স্বীকারও করেছেন ঋষ্যশৃঙ্গ, তরঙ্গিনীও স্পন্দিতবক্ষে শুনেছে তার পক্ষে গৌরবময় এই স্বীকারোক্তি। ঋষ্যশৃঙ্গ বলেছেন—"শোনো—আমি সকলের সামনে বলছি, এই যুবতী আমার ঈপ্সিতা। এই অঙ্গদেশ—যেখানে আমি হর্ষধারা নামিয়েছি, আমি সেখানে শুষ্ক ছিলাম। দগ্ধ ছিলাম তারই বিরহে, তোমরা যাকে তরঙ্গিনী বলো। আমি জানতাম না কাকে বলে নারী। আমি যে পুরুষ তাও জানতাম না। সে আমাকে জানিয়েছিলো। আমি তাই কৃতজ্ঞ তার কাছে। সে আমার পরিত্যাজা নয়, সে আমার—অন্তরঙ্গা। তার কাছে—অঙ্গদেশে একমাত্র তার কাছে—আমি ত্রাতা নই, অন্নদাতা নই, যুবরাজ নই, মহাত্মা নই—একমাত্র তারই কাছে কোনো উদ্দেশ্য সাধনের উপায় নই আমি। একমাত্র তারই কাছে আমি অনাবিলভাবে ঋষ্যশৃঙ্গ। অতএব আমি তাকে আমার অধিকারিণারূপে স্বীকার করি।'

এইখানেই হয়তো ঋষ্যশৃঙ্গ চরিত্রের সবচেয়ে জটিলতম ব্যাসকূট স্পর্শ করেছেন নাট্যকার। তরঙ্গিনী ঋষ্যশৃঙ্গকে দেখে বিপন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেছে—

'তোমার দৃষ্টি আজ অন্যরূপ কেন? ... কেন তোমার চোখের কোলে ক্লান্তি? ... ঋষ্যশৃঙ্গ, তোমার চোখের আলোয় আবার আমি নিজেকে দেখতে চাই। ... কিন্তু কোথায় তুমি? তুমি কেন হারিয়ে যাচ্ছো? তোমার চোখের সেই দৃষ্টি আর কি ফিরে আসবে না? ...'

তরঙ্গিনীর এই কথাতেই ঋষ্যশৃঙ্গের আত্ম-দর্শনের সূচনা—সিদ্ধান্ত নেন তিনি। বলেন—'আমি ঘুমন্ত ছিলাম, সে আমাকে জাগিয়েছিলো। আবার আমি ঘুমিয়ে পড়ছিলাম, আবার আমাকে জাগিয়ে দিয়ে গেলো সে।'

তরঙ্গিনীই তার বন্ধন, তরঙ্গিনীই তার মুক্তি, তার সর্বস্ব। তরঙ্গিনীর প্রশ্ন তীক্ষ্ণভাবে বিদ্ধ করেছে ঋষ্যশৃঙ্গকে। 'তুমি কেন হারিয়ে যাচ্ছো?' সত্যই, আমরা তো দেখছি 'এক বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে ঋষ্যশৃঙ্গ বাইরের দিক থেকে অনেক বদলে গিয়েছেন, শিখেছেন রাজপুরোহিত বৈদগ্ধ ও কপটতা, বেঁকিয়েও

ব্যঙ্গের সুরে কথা বলতে শিখেছেন', অথচ তাঁর যে সহজাত শুদ্ধতা তখনো অস্পৃষ্ট, তারই জন্য এযাবৎ যাপিত জীবনের প্রায়শ্চিত্ত করতে তপস্বীকে রাজগৃহ ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়তে হবে। আত্ম-সংশোধন নয়, আত্ম নির্মাণ তাঁর উদ্দেশ্য। তাই তরঙ্গিনীর আহ্বানেও ঋষ্যশৃঙ্গের প্রত্যাবর্তন আর সম্ভব নয়।

'হয়তো আমার সমিধকাষ্ঠে আর প্রয়োজন হবে না। অগ্নিহোত্রে আর প্রয়োজন হবে না। মেধা নয়, শাস্ত্রপাঠ নয়, অনুষ্ঠান নয়—আমাকে হতে হবে রিক্ত, ডুবতে হবে শূন্যতায়।'

এই অভিভব থেকেই তপস্বী-বেশী ঋষ্যশৃঙ্গ তরঙ্গিনীকেও চিহ্নিত করে দেন তার পথ। রাজগৃহে নয় আশ্রমে নয়, হারিয়ে যাওয়া 'মুখ' খুঁজতে ঋষ্যশৃঙ্গ তখন এক অজানা পথের পথিক। তরঙ্গিনীকে উদ্দেশ্য করে এ তো তাঁর নিজেরই স্বগত উচ্চারণ—'কেউ কি কোথাও ফিরে যেতে পারে তরঙ্গিনী? আমরা যখনই যেখানে যাই, সেই দেশই নূতন। আমার সেই আশ্রম আজ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। সেই আমি লুপ্ত হয়ে গিয়েছি। আমাকে সব নূতন করে ফিরেপেতে হবে। আমার গন্তব্য আমি জানি না, কিন্তু হয়তো তা তোমারও গন্তব্য। যার সন্ধানে তুমি এখানে এসেছিলে, হয়তো তা আমারও সন্ধান। কিন্তু তোমার পথ তোমাকেই খুঁজে নিতে হবে, তরঙ্গিনী।'

তারপর কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গ বলেন, 'হয়তো জন্মান্তরে আবার দেখা হবে'। অর্থাৎ ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনীর বৃত্ত কোথাও অপেক্ষা করে থাকবে। এখানেই, এই অতৃপ্তি আর আকাঙ্ক্ষার মধ্যে পুরাণ-কথা আধুনিক মানসের দ্বন্দ্ব-সংকটে অন্য মাত্রা পেয়ে যায়। তরঙ্গিনীকে এই প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে তপস্বী ও তরঙ্গিনী দুজনেই উপলব্ধি করেন কোথায় প্রাণের আরাম, আত্মার শান্তি—নিজেকে খুঁজে পাবার জন্য তাই যাত্রা শুরু হয় আবার, এত বাসনা এত সাধনা কোথায় গিয়ে মেশে, পথের শেষে কী আছে সেটাই তখন অন্বিষ্ট হয়ে ওঠে।

তরঙ্গিনী

'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'-র সব কয়টি দৃশ্যে যার উপস্থিতি, যার জয়ের আনন্দ, যার হারাবার বেদনা, আত্ম-স্বরূপের সন্ধানে যার অভিযাত্রা আগাগোড়া নাটকটিকে উদ্বেল করে রেখেছে, সে তরঙ্গিনী—বারাঙ্গনা হিসেবে যার নাটকে 'আবির্ভাব', প্রেমিকা হিসেবে উত্তরণ এবং শেষপর্যন্ত তপস্বিনী রূপে তার পরিণতি। পুরাণবৃত্তে কোথাও তার নাম ছিল না, ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্যভঙ্গ করেছিল এক গণিকা, এইমাত্র। কার্যসিদ্ধির পর তাকে আর কোথাও দেখা যায়নি। সেই 'পতিতা' রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে অন্যতর মহত্তর এক মাত্রা পেয়েছিল। বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের দ্বারা ভাবিত হলেও তিনি আরো একটু যেন এগিয়ে গেলেন, 'পতিতা'-র শ্রেণিপরিচয় থেকে তাকে উদ্ধার করে বিশেষ নাম দিলেন—'তরঙ্গিনী'! ঋষ্যশৃঙ্গকে কেন্দ্র করে যে কাহিনী-বলয় নির্মিত হয়, একটা প্রধান ভূমিকা নিয়েছে সেখানে তরঙ্গিনী।

রাজা লোমপাদের রাজ্যে অনাবৃষ্টিজনিত হাহাকার নিরাকরণের জন্য রাজপুরোহিত ও রাজমন্ত্রীর পরামর্শে তরুণ ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্য-নাশের জন্য নির্বাচিত তরঙ্গিনী—চম্পানগরীর গণিকাশ্রেষ্ঠা, তার জননী

লোলাপাঙ্গীর শিক্ষায় লাস্যময়ী নায়িকা, মোহিনী, কলাবতী, ছলনানিপুণ। রাজপুরোহিত বলেছেন—"এইমাত্র নগরপাল আমাকে জানালেন যে চম্পা নগরের গণিকাদের মধ্যমণি এখন তরঙ্গিনী। রূপে লাস্যে ছলনায় তার নাকি তুলনা নেই। আবাল্য তার মাতারই ছাত্রী, সর্বকলায় বিদগ্ধ। শোনা যায়, লোলাপাঙ্গীর কাছে শিক্ষা পেলে বিকৃত দংষ্ট্রা কুরূপাও বৃদ্ধের ধনক্ষয় ঘটাতে পারে, আর তরঙ্গিনী স্বভাবতই মোহিনী।"

বহুর পরিচর্যায় যে অভ্যস্ত, বিশেষের প্রতি পক্ষপাতহীন এই নারীই পারবে ঋষিকে বিহ্বল করতে, তাই প্রিয়া নয়, জায়া নয়; একান্তই মোহিনী রমণী তরঙ্গিনী এইভাবেই রাজকীয় ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়ে। সেদিন অনেক গর্ব করেই বোধ হয় তরঙ্গিনী বলেছিল—'আমার ধর্ম বহুর পরিচর্যা। ... যে আমাকে মূল্য দেয় তারই জন্য আমি অর্ঘ্য সাজিয়ে রাখি—শূদ্র, ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, যুবা, রূপবান, কুৎসিত আমার কাছে সকলেই সমান।' কিন্তু সেদিন বিধাতা বোধ হয় অলক্ষে হেসেছিলেন। তাই তপস্বীকে 'পরিচর্যা'র পর তরঙ্গিনীরি সব হিসেব বদলে গেল। অপাপবিদ্ধ তরুণ জানতেন না কাকে বলে নারী, কাকেই বা বলে পুরুষ। তরঙ্গিনী তাঁকে জানালো আর আশ্চর্যজনকভাবে একইসঙ্গে তিনি নিজেও জানলেনসে কে বা সে কি। ঋষিই জানালেন তাকে, তার গণিকা-বৃত্তির গাঢ় অভ্যন্তরে ক্ষীণপ্রাণ দীপশিখা অকস্মাৎ উজ্জ্বল দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠলো। 'পতিতা'র ঋষিকুমার বলেছিলেন—

'কোন্ দেব আজি আনিলে দিবা
তোমার পরশ, অমৃত সরস
তোমার নয়নে দিব্য বিভা।'

কিংবা 'কহিলা কুমার চাহি মোর মুখে
আনন্দময়ী মুরতি তুমি
ফুটে আনন্দ বাহুতে তোমার
ছুটে আনন্দ চরণ চুমি।'

বুদ্ধদেবের ঋষিকুমার বললেন—

'আপনি কি কোন শাপভ্রষ্ট দেবতা? কী দীপ্ত আপনার তপোপ্রভা, কী স্নিগ্ধ আপনার দৃষ্টিপাত, আপনার ভাষণ কী লাবণ্যঘন। আপনাকে দেখে আমি দুর্লভ চিত্তপ্রসাদ অনুভব করছি। ...

আমার মনে হচ্ছে, আপনি চিন্ময় জ্যোতিঃপুঞ্জ, প্রতিভার দিব্যমূর্তি। ...সুন্দর আপনার আনন, আপনার দেহ যেন নির্ধুম হোমানল, আপনার বাহু, গ্রীবা ও কটি যেন ঋক্‌ছন্দে আন্দোলিত। আনন্দ আপনার নয়নে, আনন্দ াপনার চরণে, আপনার ওষ্ঠাধারে বিশ্বকরুণার বিকিরণ।"

এই 'অভিবাদন' আশিরনখ আলোড়িত করল তরঙ্গিনীকে। এতদিন সে অনেক পুরুষের প্রশংসা শুনেছে। কিন্তু এই 'স্তব' শোনেনি কোনোদিন। এতদিন পরে তরঙ্গিনী আরেকভাবে চাইলো নিজের দিকে—সে শুধু

কামনার ধন নয়, আরাধনার লক্ষ্য। প্রথমে ঋষির বন্দনাকে তির্যক ব্যঙ্গে প্রতিহত করেছিল তরঙ্গিনী—'সত্যি কি তিনি ভাবছেন আমি মুনি, বা ছদ্মবেশে দেবতা? (মৃদুস্বরে হেসে ওঠে) বালক, বালক। কখনো কোনো নারী দ্যাখেন নি কখনো কোনো যুবাও দ্যাখেন নি।' কিন্তু ভিতরে ভিতরে "মনস্তত্ত্বের স্বাভাবিক নিয়মেই ভূমিক্ষয় হচ্ছিল তরঙ্গিনীর সচেতন ছলনার নীরন্ধ্র প্রাচীরে।" ঋষির অবোধ প্রশংসায় যথার্থই মুগ্ধ হয়েছিল এই মোহিনী নারী। ঋষ্যশৃঙ্গও তার কাছে প্রতিভাত হয়েছিলেন অনিন্দ্যসুন্দর এক পুরুষরূপে "কিন্তু এই বনে কি সরোবর নেই? কোনো ভাদ্রের নির্বাত অপরাহ্নে, কোনো সরোবরের স্থির স্বচ্ছ জলে তিনি কি নিজেকেও দেখেননি কখনো? 'সুন্দর তোমার আনন, তোমার দেহ যেন নির্ধূম হোমানল'। কে কাকে বলছে!"

মুনির এই একটি কথাতেই তরঙ্গিনীর এই জনমেই জন্মান্তর ঘটে গেল। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে আমরা দেখলাম এক 'নূতন' তরঙ্গিনীকে—নাট্যকার যথার্থই বলছেন—"দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে নায়ক নায়িকার বিপরীত দিকে পরিবর্তন ঘটলো; একই মুহূর্তে জেগে উঠলো তরঙ্গিনীর হৃদয় এবং ঋষ্যশৃঙ্গের ইন্দ্রিয় লালসা; একই ঘটনার ফলে ব্রহ্মচারীর হলো পতন আর বারাঙ্গানাকে অকস্মাৎ অভিভূত করলে 'রোমান্টিক প্রেম'—" এই 'বিপরীত দিকে পরিবর্তনের স্পষ্ট ইঙ্গিত উভয়ের সংলাপে। ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে নারী তখন 'ক্ষুধা-ভক্ষ্য-বাসনা' 'শোণিতে অগ্নি' 'প্রয়োজন'; আর তরঙ্গিনী বলে—

'কুমার, আমি তোমার সেবিকা।

... তুমি আমার প্রিয়, তুমি আমার বন্ধু। তুমি আমার মৃগয়া। তুমি আমার ঈশ্বর।

... আমার হৃদয়ে তুমি রত্ন।

... আমার সুন্দর তুমি।

... বলো চিরকাল তুমি আমার থাকবে!

তপস্বীকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যেতে চায় তরঙ্গিনী, যেখানে তার 'ঈশ্বর'কে 'বুকের মধ্যে লুকিয়ে' রাখতে পারবে। তার গভীর আকুলতা তখন—

এসো প্রেমিক, এসো দেবতা—আমাকে উদ্ধার করো।

—তপস্বীর সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা রণিত হয় তারপরই—

এসো দেহিনী, এসো মোহিনী—আমাকে তৃপ্ত করো।

আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয় উন্মুখ এই দু'জন। তারপর নাট্য—পরামর্শে আমরা দেখি বৃষ্টিমুখর পরিবেশে জনতার সমবেত উল্লাসের মধ্যে তরঙ্গিনী ও তার সখীদের দ্বারা পরিবৃত ঋষ্যশৃঙ্গ চম্পানগরে প্রবেশ করবেন।

দ্বিতীয় অঙ্কের সঙ্গে তৃতীয় অঙ্কের ব্যবধান এক বছরের, তরঙ্গিনীর ভাবান্তরের জন্য এই কালগত ব্যবধানটুকু দেখানো প্রয়োজন ছিল। কেননা, ঋষ্যশৃঙ্গকে 'জয়' করে নগরে আনার 'চক্রান্তে' একসময় তরঙ্গিনীই ছিল অংশীদার। কিন্তু যে তরঙ্গিনী তার 'প্রেমিক' ঋষ্যশৃঙ্গকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল সে অন্য

জন, তবু তাকেই ঋষ্যশৃঙ্গকে সমর্পণ করতে হলো রাজকীয় চক্রান্তে। কেননা সেই মুহূর্তে এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না তার। তারপর তরঙ্গিনীর আত্মসংকট ও আত্ম-দর্শনের সূচনা।

ঘোষকের ঘোষণায় তরঙ্গিনীর অস্ফুট অথচ তীব্র স্বগতোক্তি—'লোমপাদের জামাতা। যুবরাজ'! রাজ্যে অর্ধমাসব্যাপী উৎসব, প্রজারা উৎফুল্ল, আনন্দিত। শুধু নিরানন্দ তরঙ্গিনী, অংশুমান-চন্দ্রকেতু। ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিনী নানাভাবে এদের সুখের অন্তরায় হয়েছে। যাই হোক, লোলাপাঙ্গী কন্যাকে বলেছে—'তুই ঋষ্যশৃঙ্গকে জয় করেছিলি, ... আর সেইজন্যই তো এই সৌভাগ্য আজ সারা দেশের। তোরই জন্য।' কিন্তু তরঙ্গিনী যেন এতদিনে হৃদয়ঙ্গম করেছে সেই সত্য—'... আমি কেউ নই। শুধু যন্ত্র, শুধু উপায়।' কিন্তু শুধু যন্ত্র হয়ে থাকতে চাইবে কেন এই নবজাগ্রত অনুভব! তাই নিজেকে খুঁজে পেতে শুরু হয় তারই নিজস্ব জগতে এক পরিক্রমা। একবার জননীকে বলেছে—'আমার যেন মনে হয় তোমার মুখের তলায় অন্যমুখ লুকিয়ে আছে। আমার পিতা তা-ই দেখেছিলেন।' আরেকবার প্রণয়প্রার্থী চন্দ্রকেতুকে বলেছে—'সত্যি বলো—আমি রূপবতী? ... দ্যাখো—নিবিড় চোখে তাকিয়ে দ্যাখো আমার দিকে। আমার মনে হয় আমার মুখের তলায় অন্য এক মুখ লুকিয়ে আছে। তুমি দেখতে পাচ্ছো? ... আমার মনে হয় আমার অন্য এক মুখ ছিলো—আমি তা হারিয়ে ফেলেছি। আমি খুঁজি—আমি খুঁজি সেই মুখ। তুমি তা ফিরিয়ে দিতে পারো?...'

বস্তুত তরঙ্গিনী ফিরে পেতে চাইছে তার একবছর আগের অভিজ্ঞতা। ঋষ্যশৃঙ্গ তাকে যে ভাষায় অভিবাদন করেছিলেন সেই ভাষাতে সঞ্জীবিত হতে চাইছে সে। কিন্তু কাব্য-পড়া চন্দ্রকেতুর সাধ্য কী তাকে সেই ভাষায় নন্দিত করে! কিন্তু সেই অলঙ্কারিক ভাষা বহুব্যবহৃত হতে হতে জীর্ণ হয়ে গেছে তরঙ্গিনীর কাছে। এখন তার কাঙ্ক্ষিত আনন্দ—"... আমি চাই আনন্দ—প্রতি মুহূর্তে আনন্দ। আমি চাই রোমাঞ্চ—প্রতি মুহূর্তে রোমাঞ্চ। আমি চাই সেই দৃষ্টি, যার আলোয় আমি নিজেকে দেখতে পাবো। দেখতে পাবো আমার অন্যমুখ, যা কেউ দ্যাখেনি, অন্য কেউ দ্যাখেনি। ..."

এইসব ভাবনায় নিজের বৃত্তি থেকে সরে এসেছে তরঙ্গিনী, বহুর পরিচর্যা এখন আর তার ব্রত নয়। লোলাপাঙ্গীর বৈষয়িক বুদ্ধি তাতে আহত হয়, চন্দ্রকেতু যে-কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকে। লোলাপাঙ্গী তাকে বোঝায়, ভয়ও দেখায়, কিন্তু তার কন্যা আজ অন্য গ্রহের যেন অধিবাসী। সে বলে—"তুই পারিস জ্যোতির্ময়ী সতী হতে, কিংবা হতে পারিস বারমুখীদের মুকুটমণি। অন্য কোন পথ নেই তোর।" কিন্তু এই সব হিসেবের বাইরে, চেনা পথের বাইরে 'অন্য কোনো পথে'ই যাত্রা শুরু তরঙ্গিনীর।

তাই তার মোহিনী বেশভূষা, দর্পণকে তার জিজ্ঞাসা।

'দর্পণ, বল, সে কি আমার চেয়েও রূপসী? সে কি দীর্ঘাঙ্গী আমার চেয়ে? আরো তন্বী? তার অধর আরো রক্তিম? বক্ষ আরো সুগন্ধি? তার বাহুতে কি আরো বিশাল অভ্যর্থনা? ...'

এইপর্বে স্তরে স্তরে উন্মোচিত হয়েছে তরঙ্গিনীর অস্থির মনের জটিল গ্রন্থি।

তুমি কি আমাকেই দেখেছিলে? এই আমাকে? ... আর কেন দৃষ্টিপাত করো না? ... আমি স্বপ্নে দেখি

তোমার দৃষ্টি—জাগরণে দেখি তোমার দৃষ্টি। কিন্তু তুমি যা দেখেছিলে তা আমি দেখি না কেন? ...'

কখনো রাজকুমারী শান্তার প্রতি ঈর্ষায়, কখনো ঋষিপুত্রের জন্য লজ্জায়, কখনো গর্বে কখনো যন্ত্রণায় তরঙ্গিনীর এই স্বাভিজ্ঞান খুঁজে ফেরা। কখনো আত্মধিক্কারে জর্জরিত করে নিজেকে—

'আমি তোমাকে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখবো।' পাপিষ্ঠা, কপটভাষিণী, পারলি কই? অন্যের হাতে অর্পণ করলি, সঁপে দিলি শান্তার বাহুবন্ধে। ... যন্ত্রণাময় তার উচ্চারণ—'প্রিয়, আমার প্রিয়, আমার প্রিয়তম, কেন আমি তোমাকে নিয়ে চলে যাইনি—দূরে, বহু দূরে—যেখানে শান্তা নেই, লোলাপাঙ্গী নেই, চন্দ্রকেতু নেই—যেখানে তোমার নামে কেউ জয়কার দেয় না?" ...

এইসব বিপরীতমুখী ভাবনার মধ্যে থেকেই জন্ম নিতে থাকে আর এক তরঙ্গিনী—স্থির ঋদ্ধ অকম্পিত প্রত্যয়ে সে বলে—

কিন্তু আমি পারি—এখনো পারি—এখনো আমি তরঙ্গিনী! ...

আমি, তরঙ্গিনী, তপস্বীকে লুণ্ঠন করেছিলাম, আর আজ কি এক তুচ্ছ জামাতাকে জয় করতে পারবো না!

উচ্চস্বরে হেসে ওঠে তরঙ্গিনী। আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করি তরঙ্গিনীর জীবনের পরিণতির জন্য। অজ্ঞাতসারে চাই তার প্রেমেরই জয় হোক। কিন্তু জীবনের এই প্রত্যাশা কি শিল্প পূরণ করতে পারবে। চতুর্থ অঙ্কে আমরা তপস্বী ও তরঙ্গিনীর জীবনের আরো গভীর, আরো জটিল সমস্যার মুখোমুখি হই।

চতুর্থ অঙ্কে তপস্বীর জীবনে তরঙ্গিনীর প্রলম্বিত প্রতিক্রিয়া অন্যান্য চরিত্রের অজ্ঞাতসারে অথচ পাঠকের জ্ঞাতসারে অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকে। তারপর তরঙ্গিনীর 'আগমন'। অধ্যাপক অমিয় দেবের অনুধাবনে বিষয়টি ধরা পড়েছে এইভাবে—

"চতুর্থ অঙ্কের তরঙ্গিনী এক উদ্‌ভ্রান্ত রোমান্টিক প্রেমিকা, তার অন্বিষ্ট সেই তপস্বী, যে তাকে সরলতায় দীক্ষিত করেছে। অন্যপক্ষে ঋষ্যশৃঙ্গ এখন অভিজ্ঞ প্রণয়ী। প্রথম সাক্ষাতে পরস্পরের যে ভূমিকা ছিল, তা এখানে উল্টে গিয়েছে—তরঙ্গিনীই যেন খানিকটা তপস্বী, আর তপস্বী 'তরঙ্গিনী'।"

কিন্তু তপস্বী যে সম্পূর্ণতই 'তরঙ্গিনী' এমনও নয়। তরঙ্গিনী তাকে জয় করতে এসেছিল কিন্তু রাজপুরীর বিলাসে অভ্যস্ত, নাগরিক বাক্‌শিল্পী, জটিল ঋষ্যশৃঙ্গকে দেখে তরঙ্গিনীর যেন স্বপ্নভঙ্গ হলো—

"আমি স্বপ্নে দেখেছি সেই চোখ, জাগরণে দেখেছি সেই চোখ। আর এখন আমি তোমাকে দেখছি। ... তোমাকে? সত্যি তোমাকে? কিন্তু কোথায় তুমি? তুমি কেন হারিয়ে যাচ্ছো? তোমার চোখের সেই দৃষ্টি কি আর ফিরে আসবে না?"

তপস্বীর কাছে এই আঘাতটুকু জরুরি ছিলো। এইখান থেকেই তপস্বীর আত্ম-সন্ধানের সূচনা, এইখান থেকেই তরঙ্গিনীরও অন্যতর এক সাধনার সূত্রপাত। ঋষ্যশৃঙ্গ যথার্থই বলেন—"তরঙ্গিনী, আমার শেষ কথা তোমারই সঙ্গে। তুমি আমাকে যে উপহার দিলে আমি এখনো তার নাম জানি না। কিন্তু হয়তো তার মূল্য বুঝি। আমি তোমার কাছে চিরকাল ঋণী থাকবো। তোমাকে আমি অভিনন্দন করি।" এই ঋষ্যশৃঙ্গ তো আর তরঙ্গিনীর কাছেও ফিরে যেতে পারেন না; তরঙ্গিনীও উপলব্ধি করে এই 'পুরুষ' তার সেই স্বপ্নের তপস্বী নন। তখন সে-ও-এক অকুল অসীম শূনতায় ডুবে যায়। আকুল তার আর্তি—'প্রিয়, আমার

প্রিয়তম, আমি কি আর কোনোদিন তোমাকে দেখবো না?" ঋষ্যশৃঙ্গ বলেন—' ... তোমার পথ তোমাকেই খুঁজে নিতে হবে, তরঙ্গিনী। ... আমাকে বাধা দিয়ো না, তরঙ্গিনী। তুমি তোমার পথে যাও। হয়তো জন্মান্তরে আবার দেখা হবে।' এইভাবে এক অর্থে হয়তো তরঙ্গিনীর 'অভিসার' ব্যর্থ হয়, কিন্তু আবার হয়ও না। তরঙ্গিনী একে একে ত্যাগ করে তার সব অলংকার-আভরণ; তপস্বী যেদিন যেমন করে জাগিয়েছিলেন তরঙ্গিনীকে, আজও জাগিয়ে দিলেন তাকে আর-একভাবে—তাই সামনে সকলকে রেখেও এ যেন তার স্বগতোক্তি—

আমি কী হবো তা জানি না। আমার কী হবে তা' জানি না। শুধু জানি, আমাকে যেতে হবে।

যে পথে তার যাত্রা সে পথে লোলাপাঙ্গী নেই, চন্দ্রকেতু নেই, শান্তা নেই, রাজমন্ত্রী-রাজপুরোহিত নেই, রাজা-রাজধানী নেই, সেখানে আছে এক স্বপ্নমেদুর মন্ত্রধ্বনি—"সুন্দর তোমার আনন, তোমার দেহ যেন নির্ধূম হোমানল। ... আনন্দ আপনার নয়নে, আনন্দ আপনার চরণে, আপনার ওষ্ঠাধারে বিশ্বকরুণার বিকিরণ।'

এই কথাগুলি জপমন্ত্রের মতো আশ্রয় করেই তরঙ্গিনীর নিষ্ক্রমণ—নাট্যকারের মতে, 'পুণ্যের পথে'; হয়তো আত্ম-দর্শনরূপ সেই পুণ্যের পথে তাদের দুজনেরই যাত্রা। তপস্বী ও তরঙ্গিনী উভয় উভয়কেই জাগিয়ে দিয়ে গেলো মোহনিদ্রা থেকে, নিজেকে না চেনার অন্ধকার থেকে। এবার নিজেকে খুঁজে পাবার আকুতি থেকে তাদের যাত্রা। তরঙ্গিনী তার এই জন্মে জন্মান্তরের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয়ে হয়ে উঠেছে এ নাটকের নায়িকা!

শান্তা

তপস্বী তরঙ্গিনীর লাস্যে প্রলুব্ধ হয়ে কৌমার্য হারিয়ে যে রাজ্যে বৃষ্টি নিয়ে এলেন, সেই অঙ্গরাজ্যের অধিপতি লোমপাদের কন্যা শান্তা। নাটকের প্রথম অঙ্কে আমরা যখন তাকে প্রথম দেখি, তখন সে রাজমন্ত্রীর পুত্র অংশুমানের প্রেমিকা, ব্যক্তিত্বময়ী, সাহসী উচ্চারণে দৃপ্ত, প্রত্যয়ী। আবার সাধারণ নারীর মতোই তার আকাঙ্ক্ষা—রাজমন্ত্রীকে সে বলেছে—

"তাত, আমি প্রকৃতি নই, আমি শান্তা—সামান্যা এক যুবতী। দেহে ও অন্তঃকরণে আমার সঙ্গে কৃষক বধুর পার্থক্য নেই। আমিও চাই পতি, সন্তান, গৃহ—চাই প্রেম-পরিণতি-বন্ধন—চাই সেবা ও স্নেহবৃত্তির স্থায়ী সার্থকতা।"

নিজের জীবন সম্বন্ধে এই বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই সে ঋষ্যশৃঙ্গকে বিবাহ করতে অসম্মত এবং স্পষ্ট ভাষায় সে কথা প্রকাশও করেছে মন্ত্রীর কাছে—

'আমি স্বয়ংবরা হতে চাই'। অংশুমান যে তার প্রণয়ী একথাও জানিয়ে দেয় সে। তার আশঙ্কা—"এমন যদি হয় যে আদ্যাশক্তিকে অর্ঘ্যদান করে, তারপর ঋষ্যশৃঙ্গ আমাকে ত্যাগ করলেন? যদি তাঁর মনে হয় যে ব্রহ্মজ্ঞানের তুলনায় নারী তুচ্ছ, জায়াপুত্র নিতান্ত অলীক?" এই আশঙ্কা নাট্যশেষে বাস্তবায়িত হয়েছে এমনই দেখি। মনে হয়, নাট্যকার সুকৌশলে প্রথম অঙ্কেই নাট্য-পরিণতির বীজবপন করে রেখেছিলেন।

শান্তা অকপট সারল্যে রাজমন্ত্রীর কাছে বিবৃত করে অংশুমানের সঙ্গে তার প্রণয়-কথা, বিবাহ-অভিলাষ। আর এই অকপট উচ্চারণের জন্যই তার ভবিষ্যৎ 'নির্ধারিত' হয়ে যায় রাজমন্ত্রীর কৌশলী চক্রান্তে—

"আমি আজ রাত্রেই অংশুমানকে বন্দী করবো, কয়েকটা দিন কারাগারে কাটালে তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে না। পুরস্ত্রীরা শান্তার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন। ঋষ্যশৃঙ্গের আগমনকালে তাকে থাকতে হবে অনাহত ও প্রস্তুত।"

শান্তাকে আশ্বস্ত করেন তিনি কুশলী বাক্‌চাতুর্যে—"কল্যাণী, তুমি স্বদেশের কল্যাণদাত্রী হও। তোমার পতিব্রত্যের ফলাফল থেকে অঙ্গারাজ্যের শাপমোচন।' অথচ মনে মনে তিনি জানেন, "ঋষ্যশৃঙ্গকে রতিরহস্যে দীক্ষিত করবে তরঙ্গিনী; তার ফলভোগ করবে শান্তা।"

অতএব, শান্তার সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ রাষ্ট্রের মঙ্গালে। শান্তাও এখানে রাষ্ট্রর হাতে 'ক্রীড়নক' মাত্র। একদিন যে সদম্ভে ঘোষণা করেছিল—'আমি অংশুমান ভিন্ন অন্য কারো অঙ্কশায়িনী হবো না।' তাকেই নাটকে আমরা দেখি, ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে বিবাহিত জীবনযাপন করে পুত্রের জননী হতে। তার উপস্থিতি আবার আমাদের সচকিত করে চতুর্থ অঙ্কে। দৃশ্যসূচনায় আমরা দেখি, রাজপ্রাসাদের একটি অলিন্দ, সংলগ্ন কক্ষের অংশ। অলিন্দে দন্ডায়মান ঋষ্যশৃঙ্গ রাজবেশে, শান্তা কক্ষে উপবিষ্ট; কেশবিন্যাসরত, তার সামনে দর্পণ, প্রসাধনী। বাইরে আকাশে পড়ন্ত বেলা।

শান্তা গুঞ্জনস্বরে গান গাইছে, ঋষ্যশৃঙ্গের স্বগত-কথন অলিন্দে; যদিও দু'জনে দু'জনের কথা কিংবা গান কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না। শান্তার গানে আমরা শুনি যেন তার হৃদয়ের নিহিত হাহাকার—

সুন্দর তুমি, পেটিকা,
অন্তরে নেই রত্ন।
পাত্র এখনো মণিময়,
নিঃশেষ তার সৌরভ।
উজ্জ্বল তুমি, চক্ষু,
কেন ভুলে গেলে বার্তা?
রঙ্গিনী আজও কবরী,
অঙ্গুলি শুধু ক্লান্ত।
আসে যায় দিন-রজনী,
আসে জাগরণ, তন্দ্র
শুধু নেই হৃৎস্পন্দন

লুণ্ঠিত সব স্বপ্ন।

শান্তার গানে ব্যস্ত হয়েছে অংশুমান-হীন তার লুণ্ঠিত স্বপ্ন জীবনের রিক্ততা। রাষ্ট্রের কাছে দায়বদ্ধতায়, পরিবারের কাছে, সমাজের কাছে, দায়বদ্ধতায় শান্তার জীবনের সহজ সুখটুকু হারিয়ে গেছে—আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের ভার কেড়ে নিয়েছে তার কৃষক-বধুসুলভ 'সুখী' জীবনের স্বপ্ন। বাহ্যিক বৈভবের আবরণে আবৃত হয়ে গেছে তার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা। ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে অভ্যস্ত জীবনের ফাঁকিটুকু এরপর আর আমাদের অগোচরে থাকে না। কিন্তু 'স্বামী'র কাছে তাকে গোপন রাখতে হয় এই দ্বিচারিতা। তাই ঋষ্যশৃঙ্গকে বলতে হয়, 'আপনার গৌরবে গর্বিত আমি, প্রভু।' ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে তার কথোপকথনে কান পাতলেই ধরা পড়ে 'জিহ্বা মসৃণ, শব্দকোষ বিশাল' 'কর্তব্য অফুরান' কিন্তু 'বক্তব্য স্বভাবতই বিরল'। বস্তুত, এ তো আধুনিক মানুষের সংকট, সংযোগের সমস্যা। পৌরাণিক চরিত্র তো স্বভাবতই আদর্শায়িত, নীতিপুষ্ট, আলঙ্কারিক। এই হৃৎস্পন্দন-হীন নিঃশেষিত সৌরভ লুণ্ঠিত-স্বপ্ন জীবনে শান্তা স্বভাবতই অ-সুখী, ক্লান্ত; ঋষ্যশৃঙ্গেরও দিন বিবর্ণ, জীবন বিস্বাদ। তবু তো 'আসে যায় দিন-রজনী' 'আসে জাগরণ, তন্দ্রা', গভীর নিষ্ঠায় প্রাত্যহিকতার 'পালন'! আর হঠাৎই প্রিয় পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে উৎকর্ণ শান্তার আকস্মিক প্রতিক্রিয়া—"এ যে সেই! আমি কোথায় লুকোবো? কোথায় পালাবো? কোথায় গেলে কেউ আমাকে দেখতে পাবে না?"

অংশুমানের উপস্থিতিতে শেষপর্যন্ত শান্তার সব প্রতিরোধ ভেঙে যায়। শান্তা প্রথমে প্রতিহত করতে চেষ্টা করে—'অংশুমান, আমি এখন পরস্ত্রী! আমি পুত্রবতী—মাতা!' এমনকী একসময় 'স্বামী'-কেই বর্ম হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছে সে—"আমি পরিণীতা! স্বামী, আপনি কেন নীরব? আমাকে রক্ষা করুন। ... আমি অসহায়—আপনি আমাকে আশ্রয় দিন।" কিন্তু 'সত্য ছাড়া যে আর আশ্রয় নেই, তাই হয়তো কোন অসতর্ক মুহূর্তেই উচ্চারিত হয় সেই 'সত্য'—

'অংশুমান—আমাকে দয়া করো, আমাকে ক্ষমা করো। আমার জীবন নষ্ট হয়েছে হোক, কিন্তু তুমি যেন শান্তি পাও এখনো আমার দিবানিশি এই প্রার্থনা।'

তারপর হঠাৎ সে কী বললো তা উপলব্ধি করে—'স্বামী, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আত্মহারা হয়েছি—কী বলেছি তা জানি না।

ঋষ্যশৃঙ্গও এই 'শুভ' লগ্নে ভারমুক্ত হতে চেয়েছেন—'আমারও একটি গোপন কথা তোমাকে বলি।' কেননা শান্তা তো কোনো 'অপরাধ' করেনি, 'সত্য' বলেছে মাত্র।

নাটকে শান্তা অংশুমানের প্রেমিকা, ঋষ্যশৃঙ্গের স্ত্রী, আবার অংশুমানের 'ভার্যা'। এই শেষতম পরিচয়ের আভাস আছে, বিস্তার নেই। জায়া বা জননী হিসেবে তার গর্ব বা সুখ অনেকটাই আনুষ্ঠানিক, তাই অংশুমানের দাবি-প্রতিষ্ঠার মুহূর্তে সামাজিক লোকাপবাদের ভয়ই বড় হয়ে উঠেছে। তরঙ্গিনী আসার পর কিংবা লোলাপাঙ্গীর কাতরতায় বারবার সে 'স্বামী'কে 'সহধর্মিনী' হিসেবে কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গ অবিচল, আর কোনো 'ছলনা' তাঁকে আত্মবিস্মৃতির অতলে ডুবিয়ে দেবে না। তাই ঋষ্যশৃঙ্গের নিষ্ক্রমণ,—যাবার আগে তিনি শান্তাকে ফিরিয়ে দেন তার কৌমার্য, 'শান্তা ও অংশুমান পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ঋষ্যশৃঙ্গকে বিনতি' করে। প্রশ্ন

স্বভাবতই জাগে, শান্তা চরিত্র কি একেবারেই নির্দ্বন্দ্ব এখানে? অংশুমানকে ফিরে পাওয়া তার নতুন জীবন অবশ্য নাটকের 'বিষয়' নয়। বস্তুত, শান্তা চরিত্রটি তার প্রেমে, দ্বিচারিতায়, অসহাতায়, সারল্যে বেদনায় জীবন্ত, বিস্মৃত জায়গা সে হয়তো পায়নি, কিন্তু তা' বলে সে উপেক্ষিতও নয়।

৬.৭ অন্যান্য চরিত্র

'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' নাটকে গৌণ চরিত্রসমূহও প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করেছে। তরঙ্গিনীর জননী লোলাপাঙ্গী, প্রণয়প্রার্থী চন্দ্রকেতু, শান্তার প্রণয়ী মন্ত্রীপুত্র অংশুমান, রাজমন্ত্রী, রাজপুরোহিত প্রতিটি চরিত্রই নাটকের পরিণতিদানে তৎপর। লোপাপাঙ্গী নগর-গণিকাপ্রধানা, কলানিপুণ, বাক্‌পটীয়সী এবং অর্থ-লিপ্সু। তাই কন্যাকে মূলধন করেও সে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য অর্থ-উপার্জন করে নিতে চায়। ঋষ্যশৃঙ্গ-মিলনে বিবশ বিহ্বল তরঙ্গিনীকে সে বারবার ফিরিয়ে নিতে চেয়েছে তার পুরাতন অভ্যস্ত জীবনাচরণে, কেননা 'বারাঙ্গনারা স্মৃতি নিয়ে বিলাস করে না'। কোনো অন্তর্দ্বন্দ্ব-জটিলতা ছাড়াই সে মাতা এবং দূতীর যুগ্ম ভূমিকা পালন করেছে। চন্দ্রকেতুর দেওয়া আঙটি পরে কন্যার কাছে উপস্থিত হয়েছে, কেননা 'স্বকর্মে যাদের নিষ্ঠা আছে' তাদের কাছে পারিবারিক বা সামাজিক কোনো সম্পর্কই গ্রাহ্য নয়, একথা লোলাপাঙ্গী জানে এবং মানে। হয়তো গভীরতার অভাব থেকেই সে বিশ্বাস করে তপস্বীর কৌমার্য ভঙ্গের অপরাধেই তরঙ্গিনী শাপগ্রস্ত, অন্যমনা এবং সেজন্যই চতুর্থ অঙ্কে ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে উপস্থিত হয়। নিজের কন্যার মানস-সংকটের সমস্যাটি লোলাপাঙ্গীর কাছে স্পষ্ট হতে পারেনি। নাটকের শেষে লোলাপাঙ্গী এবং চন্দ্রকেতুর পরস্পর নির্ভরতা, লোলাপাঙ্গীর গৃহেই চন্দ্রকেতুর আবাহন নারী-পুরুষ সম্পর্কের এক জটিলতার ইঙ্গিত। এ ব্যাপারে বুদ্ধদেব বসুর অবলোকনটি প্রণিধানযোগ্য ঃ "... তাদের দুঃখটা মেকি নয়, কিন্তু তাদের পক্ষে জীবনের গ্রাস অপ্রতিরোধ্য। কিছুটা চেতন, কিছুটা অচেতনভাবে আত্মপ্রতারণা করছে তারা, কেননা তরঙ্গিনীকে হারাবার পরেও তাদের বেঁচে থাকতে হবে। তারা ঘৃণা অথবা উপহাসের পাত্র নয়, বরং ঈষৎ করুণ; যেহেতু তারা সাধারণ এবং পরাজিত, তাই আমাদের অনুকম্পা তাদের প্রাপ্য।"

তরঙ্গিনীর জননী রূপাজীবী লোলাপাঙ্গীর পাশাপাশি আমরা লক্ষ করি ঋষ্যশৃঙ্গ-পিতা বিভাণ্ডক মুনিকে। পুত্রকে তিনি শিখিয়েছেন, 'আমরা ব্রহ্মচারী। কঠিন আমাদের নিষ্ঠা, দুর্জয় আমাদের নিয়ম।' কিন্তু 'নারী' কি এ শিক্ষা তিনি পুত্রকে দেননি, এবং সেই অনভিজ্ঞতাই ঋষ্যশৃঙ্গকে 'অভিজ্ঞ' করে তুললো। নাট্যকার বিভাণ্ডক চরিত্রে দুটি দিকে আলোকপাত করতে চেয়েছেন—একটি তাঁর পুত্রস্নেহ, অন্যটি পুণ্যলোভ। মহাভারতীয় চরিত্র কিছুটা রূপান্তরিত হয়েছে এখানে। মহাভারতে দেখি, বিভাণ্ডক লোমপাদের প্রতি ক্ষুব্ধ হলেও পরে রাজধানীতে এসে পুত্রের বৈভব দেখে তুষ্ট হন এবং বলেন, 'পুত্র, তোমার পুত্র, উৎপন্ন হইলে ভূপতির প্রিয় কার্য সকল সর্বপ্রযত্নে সম্পাদন করিয়া কাননে গমন করিবে।' 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' নাটকেও দেখি পুত্রের প্রতি তার ক্ষোভ প্রকাশ পেলেও তিনি পুত্রার্থে কাতর—বারবার অনুরোধ করেছেন ঋষ্যশৃঙ্গকে ফিরে পাবার জন্য। কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁকে ফিরিয়ে দেন শূন্যহাতে। ঋষ্যশৃঙ্গ পিতার লোভের ইঙ্গিত দিলে

বিভাণ্ডক বলেন, শুধু 'পঞ্চদশ গ্রামের জন্য নয়, সে সময়ে অঙ্গদেশের দুর্দশা দেখে আমি দয়া পরবশ হয়েছিলাম। তাই তোমাকে বলপূর্বক প্রত্যাহরণ করিনি। নাট্যউপান্তে পুত্রের কাছে পিতার বিদায়গ্রহণ মর্মস্পর্শী।

রাজমন্ত্রীর পুত্র অংশুমান রাজকন্যা শান্তার প্রণয়মুগ্ধ। উভয়ের প্রেম সেদিন সার্থকতা পেলো না। কেননা রাজ্যের দুর্দিন। ঋষ্যশৃঙ্গ শান্তার বিবাহ সাধিত হল রাষ্ট্রিক কল্যাণে, সেদিন অংশুমান রইলো কারাগারে বন্দি হয়ে। কারামুক্ত অংশুমানের কাছে শত্রু একজন—ঋষ্যশৃঙ্গ। তরঙ্গিনীর প্রণয়প্রার্থী চন্দ্রকেতুর কাছেও শত্রু একজন—ঋষ্যশৃঙ্গ। এই দুটি পুরুষ চরিত্রই অনেকাংশে সাধারণ। অংশুমান তপস্বীকে অভিযুক্ত করেছে, ভর্ৎসনা করেছে; তারপর শান্তাকে ফিরে পেয়ে ঋষিকে প্রণাম জানিয়েছে। ঋষ্যশৃঙ্গ শান্তার কুমারীত্ব ফিরিয়ে দিয়েছেন, অংশুমান তাকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছে। তপস্বিনী তরঙ্গিনীকে অজানার পথে নিষ্ক্রান্ত হতে দেখে চন্দ্রকেতু অনায়াসে লোলাপাঙ্গীর অনুগমন করেছে। অংশুমান প্রণয়িনীকে ফিরে পেয়ে প্রশ্নহীন, চন্দ্রকেতু প্রণয়িনীকে হারিয়েও প্রশ্নহীন। অথবা এ তাদের অসহায়তা। রাজমন্ত্রীর কূটনীতি, চাতুর্য, রাজ-আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা নাটকে স্পষ্ট—বৃহত্তর স্বার্থে নিজের পুত্রের প্রতিও তিনি নির্মম। আবার ঋষ্যশৃঙ্গের বরে কৌমার্য ফিরে পাওয়া শান্তাকে অংশুমানের সঙ্গে বিবাহের আয়োজনেও তিনি তৎপর। রাজমন্ত্রী এই বিবাহে যেটুকু দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন তা' অবসিত হয় রাজপুরোহিতের কালদর্শী প্রাজ্ঞ উচ্চারণে—

তোমরা অবতীর্ণ মঞ্চে—প্রার্থী, মাতা, অমাত্য;
কেউ কামার্ত, কেউ সহৃদয়, কেউ রাষ্ট্রপাল;
চক্রনেমির মুহূর্ত-বিন্দুতে ঘূর্ণিত হবে তোমরা
বহু মঞ্চে, বহু ভূমিকায়, যতদিন আয়ু না হয় নিঃশেষে, ...

৬.৮ অনুশীলনী

- 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী'-তে বুদ্ধদেব বসুর লেখনীতে পুরাণের পুনর্জন্ম কীভাবে সাধিত হয়েছে? আলোচনা করুন।
- ঋষ্যশৃঙ্গ চরিত্রে আধুনিক যুগের মানসতা ও দ্বন্দ্ববেদনার স্বরূপটি পরিস্ফুট করুন।
- 'পতিতা' তরঙ্গিনী নাট্যশেষে 'তপস্বিনী' তরঙ্গিনীতে রূপান্তরিত—আলোচনা করুন।
- 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' কাব্যনাটক হিসেবে কতটা সার্থকতা লাভ করেছে দেখান। নাটকটির নামকরণ সার্থকতা বিচার করুন।
- শান্তা চরিত্রের দ্বৈধতা স্বল্প পরিসরেই তাঁকে রক্তমাংসের জীবন্ত চরিত্র করে তুলেছে—আলোচনা করুন।

- 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' নাটকে গৌণ চরিত্রগুলির ভূমিকা বিচার করুন।
- রবীন্দ্রনাথের পতিতা এবং বুদ্ধদেব বসুর তরঙ্গিনীর তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৬.৯ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

- তপস্বী ও তরঙ্গিনী—বুদ্ধদেব বসু, আনন্দ পাবলিশার্স
- আধুনিক বাংলা কাব্যনাট্য—উদ্ভব ও বিকাশ—কণিক সাহা, সাহিত্যলোক
- বুদ্ধদেব বসু ঃ মননে অন্বেষণে—তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পুস্তক বিপণি
- বুদ্ধদেব বসু ঃ নানা প্রসঙ্গ—সম্পাদনা—আনন্দ রায়, বর্ণালী
- তপস্বী ও তরঙ্গিনী ঃ কয়েকটি প্রসঙ্গ—লায়েক আলি খান, বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩।

বাংলা (ষষ্ঠ পত্র)

স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

পর্যায় ঃ ৩

একক ৭ ☐ অঙ্গার

পর্যায় ৩ একক ৭

৭.০ প্রস্তাবনা

৭.১ উৎপল দত্তের জীবনকথা

৭.২ অঙ্গার নাটকের উৎস ও কাহিনি

৭.৩ অঙ্গার নাটকের অভিনয়

৭.৪ অঙ্গার নাটকের নামকরণ

৭.৫ অঙ্গার নাটকের প্রান্তিক দৃশ্য

৭.৬ অঙ্গার নাটকের চরিত্র

৭.৭ অনুশীলনী

৭.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৭.০ প্রস্তাবনা

উৎপল দত্ত আমাদের হাজার বছর ব্যাপী ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির জগতে চেতনা বা দার্শনিকতার এক বৈপ্লবিক উত্তরণ। রাজনৈতিক থিয়েটারের অন্বেষণে তাঁর অক্লান্ত পথচলা। আধুনিক ভারতীয় থিয়েটারের ইতিহাসে নির্দেশক, অভিনেতা ও নাট্যকার হিসেবে তাঁর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ় আস্থা এবং শ্রমিক-কৃষক-আন্দোলন বা গণবিপ্লব প্রায়ই হয়েছে তাঁর নাটকের বিষয়। তাঁর জীবনী থেকে জানা যায় যে গভীর নিবিড় পঠনপাঠনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল তাঁর জীবনদর্শন। মার্কসবাদের বিকাশশীল চিন্তাধারার স্তর বিন্যাসকে বোঝার পাশাপাশি সাহিত্য শিল্প নাট্যাভিনয় নিয়ে গভীর অধ্যয়ন করেছেন। ফলে জীবিতকালেই তিনি এক প্রতিষ্ঠান রূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন।

মিনার্ভা থিয়েটারের দিনগুলিতে অঙ্গার, ফেরারী ফৌজ, কল্লোল, তীর-এর মত বিখ্যাত রাজনৈতিক নাট্যগুলি রচিত ও প্রযোজিত হয়। বাংলা থিয়েটারে এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়।

৭.১ উৎপল দত্তের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা

অধুনা বাংলাদেশের বরিশালে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে মার্চ উৎপল দত্তের জন্ম, যদিও তাঁর শৈশবের শহর শিলং-কেই তিনি নিজের জন্মস্থান বলতে পছন্দ করতেন। পিতা গিরিজারঞ্জন দত্ত ও মাতা শৈলবালার আট সন্তানের (পাঁচ ভাই, তিন বোন) মধ্যে উৎপল ছিলেন ষষ্ঠ।

শিলং-এর সেন্ট এডমণ্ড স্কুলে শৈশবে তাঁর শিক্ষা শুরু। পরে দশ বছর বয়সে কলকাতার বালিগঞ্জে বসবাস উপলক্ষ্যে ভর্তি হন সেন্ট লরেন্স স্কুলে। শেষে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হন সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে এবং তারপরে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। সেখানেই নাটকে তাঁর প্রথম অভিনয় এবং এখান থেকেই শুরু হয় নাটক ও মঞ্চাভিনয় প্রসঙ্গে নিবিড় আগ্রহ ও অধ্যয়ন।

সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ার সময়ই বন্ধু প্রতাপ রায় ও সতীর্থ ইহুদি বন্ধুদের নিয়ে গড়ে তোলেন কলকাতার অন্যতম ইংরেজি নাট্যাভিনয়ের দল—দি অ্যামেচার শেকসপীরিয়ান্‌স্। ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট এই নাট্যগোষ্ঠীর প্রথম অভিনয় শেকসপীয়রের "রিচার্ড দ্য থার্ড"। এ সময়েই শেকসপীয়ারানা ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানির জেফ্রি কেণ্ডাল তাঁর পেশাদার দলে যোগদানের জন্য উৎপলকে আহ্বান জানান। সেই দলে 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' নাটকের অ্যান্টোনিও চরিত্রে তাঁর পেশাদার মঞ্চাভিনয় শুরু। ইতিমধ্যে নিজের দল নাম পরিবর্তন করে 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' নামে পরিচিত হয়।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে চলচ্চিত্র পরিচালক মধু বসুর ছবি 'মাইকেল মধুসূদন'-এর নামভূমিকায় অভিনয় করে প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করেন। এবছরই এদেশের কমিউনিস্ট পার্টির ওপর নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে বিজয়োৎসবের নাটকে অংশগ্রহণ করেন এবং সলিল চৌধুরী ও নিরঞ্জন সেনের আগ্রহে গণনাট্য সংঘে যোগদান করেন। এ সময় তাঁর নিজের উপলব্ধি "গণনাট্য সংঘ আমাকে জনতার মুখরিত সখ্যে নিয়ে গেল। একটা ঘুম ভেঙে গেল।"

১৯৫২-তে গণনাট্য সংঘ ছেড়ে দেন, নতুন করে লিটল থিয়েটার গ্রুপের (LTG) নাটক অভিনয়ের আয়োজন করতে থাকেন। ১৯৫৮-তে উৎপল দত্তের প্রথম নাটক 'ছায়ানট' রচিত হয়। LTG-র দ্বিতীয় নাট্যোৎসবে 'ওথেলো' ও 'ছায়ানট' মঞ্চস্থ হয়। ১৯৫৯-এর ৩রা জুলাই LTG মিনার্ভা মঞ্চের লীজ নেয় এবং উৎপল দত্তের নাট্য নির্মিতি ও প্রযোজনা এখানে এক নতুন অধ্যায় সূচিত করে।

এই পর্বেই রচিত হয় 'অঙ্গার' এবং ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর অঙ্গারের প্রথম প্রদর্শনী বাংলা মঞ্চের ইতিহাসে অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়। 'অঙ্গার' পপুলার লাইব্রেরি কর্তৃক ঐ বছরই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৬০-এর ২৯শে মে 'অঙ্গারে'-র শততম রজনী পূর্ণ হয়। ইতিমধ্যে অভিনেত্রী শোভা সেনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯৬১-র ৩০শে এপ্রিল ৩০০ রজনীতে অঙ্গার নাটকের শেষ প্রদর্শন হয়, যদিও ১৯৬২-তে আবার মিনার্ভা মঞ্চে 'অঙ্গার' প্রদর্শিত হ'তে থাকে। বড়াধেমো কয়লাখনির ভয়ঙ্কর জল প্লাবনে শ্রমিকের মৃত্যুর কাহিনিভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলনের নাটক 'অঙ্গার' পেশাদারি মঞ্চের সমস্ত শর্তকে ভেঙে দিয়ে সাফল্যের নয়া ইতিহাস তৈরী করেছিল এবং মিনার্ভা থিয়েটার ও উৎপল দত্তকে দিয়েছিল খ্যাতি, যশ ও প্রতিষ্ঠা। 'অঙ্গার' মঞ্চস্থ করার সময় উৎপল দত্তকে কয়েকটি বিষয় ভাবতে হয়েছিল। পেশাদারি তথা ব্যবসায়িক মঞ্চের প্রধান শর্তগুলিকে মনে রেখে তাঁকে এগোতে হয়েছিল। প্রতি সপ্তাহে চারটি অভিনয়কালে কিভাবে দর্শক আকর্ষণ করে হল ভরাতে হবে সেকথা তিনি মাথায় রেখেছিলেন। তাই শ্রমিক আন্দোলনের মার্কসীয় তত্ত্ব ভাবনার সঙ্গে মঞ্চে কয়লাখনিতে আগুন লাগা বা জনপ্লাবনের চমকপ্রদ দৃশ্যকে মিশিয়ে তিনি পেশাদারির মঞ্চে আনতে চেয়েছিলেন এক পরিবর্তন এবং সর্বাংশে সার্থক হয়েছিলেন।

৭.২ অঙ্গার নাটকের উৎস ও কাহিনি

'অঙ্গার' নাটকের পটভূমি রাণিগঞ্জ-আসানসোল অঞ্চলের কোলিয়ারির ধূসর পৃথিবী। চিনাকুড়ি, বড়াধেমো, দামুরিয়া, কোলব্রুক কোলিয়ারিতে একের পর এক যে ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটেছে—তারই প্রতিরূপ অঙ্গার নাটকে পরিবেশিত। কয়লাখনির শ্রমিকরা নিজেদের দাবি নিয়ে আন্দোলনে নেমেছে, আর কয়লাখনিরই তলার জলে তাদের ডুবিয়ে দেবার 'দুর্ঘটনা'র ছক এঁকেছে মালিকপক্ষ। বড়াধেমো কয়লাখনির এই ঘটনাকে নাটকে উপস্থাপিত করার জন্যে উৎপল দত্ত বড়ধেমো কয়লাখনি অঞ্চল ঘুরে দেখে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। সমকালীন জীবন থেকে তুলে আনা ঘটনাকে নাট্যিক উপকরণ হিসাবে সার্থক ব্যবহার করলেন উৎপল দত্ত। শিল্পের শর্তে জীবনকে ব্যবহার করা শিল্পীরই দায় ও দায়িত্ব। দায়বদ্ধ শিল্পী তা-ই করেন। একেবারে সাম্প্রতিককালে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে (২০০৪) প্রদর্শিত হয়েছে চিলির ছবি Sub-Terra (বা সুড়ঙ্গ), সেখানেও কয়লাখনির শ্রমিকদের দুঃসহ জীবন ও শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস উঠে এসেছে। 'অঙ্গার' নাটকের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে খনি অঞ্চলের 'শেলডন কোলিয়ারি'-কে ঘিরে। এই

কয়লাখনির শ্রমিক কর্মচারীদের প্রচলিত ব্যারাকের মত বাসগৃহকে নাট্যকার বলেছেন—"সারবন্দী সৈনিকের মত বৈশিষ্ট্যহীন, ক্লান্ত বৃদ্ধ"।

এই বাসগৃহের একটিতে থাকে "বিনু", তার মা ও বোনকে নিয়ে। বিনু কয়লাখনির শটফায়ারার। 'বিনু'-কে এ নাটকের নায়ক বলা যেতে পারে, যদিও প্রকৃতপক্ষে মজুরশ্রেণিই এ নাটকের প্রধান চরিত্র। দীননাথ ও হাফিজের মত শটফায়ারার এবং আরিফ, মোস্তাক, দয়াল, জয়মুদ্দির মত মালকাটারা সবাই মিলে বাঁচার জন্য সংগ্রাম করে আবার 'কালোহীরে' তোলার ফাঁকে ফাঁকে জীবনের গান গায়। টাইমকীপার যজ্ঞেশ্বরের মেয়ে 'রূপা'-র পরিচয় দিয়েছেন নাট্যকার—"একটি স্বপ্ন দেখা মেয়ে"। বিনু আর রূপার মিলিত স্বপ্ন কিংবা মা ও বোন সুমিকে নিয়ে শুশুনিয়া পাহাড়ের কাছে ছোট্ট একটুকরো বাগানঘেরা খড়ের চালের বাড়ি তৈরির জন্য বিনুর স্বপ্ন শেষপর্যন্ত অধরা থেকে যায়।

খনিতে বিস্ফোরণ ঘটলে মালিকপক্ষ সেটাকে সামান্য বলে এড়িয়ে যেতে চায়। দীননাথ এবং তার সহকারী কালু সিং-এর মৃত্যু হয়, কারণ বিনা ল্যাম্পে খনিতে তাদের শট ফায়ারিং করতে পাঠানো হয়েছিল যেখানে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা না নেওয়ায় খনি হয়েছিল বারুদের গাদার মত বিপজ্জনক। নিজেদের অন্যায় ঢাকতে দেহ দুটিকে সরিয়ে ফেলে নিষ্ঠুরভাবে তাদের মুখকে ভারী অস্ত্র দিয়ে বিকৃত করে দেওয়া হয়েছিল। তাদের সনাক্ত না করা গেলে ক্ষতিপূরণ দেবার দায়ও কোম্পানি এড়াতে পারবে। নিয়মমাফিক এক তদন্ত কমিটি গঠিত হয় এবং অ্যাডভোকেট দুর্গাদাস সাহার সওয়ালে সত্য উদ্‌ঘাটিত হলেও তাকে কৌশলে চাপা দিয়ে কোম্পানি বেকসুর নির্দোষ প্রমাণিত হয়। আইনের প্রহসনও এই দৃশ্যে প্রকাশ করেন নাট্যকার। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে মিনার্ভায় অভিনয়কালে এই বিচার দৃশ্যটি বর্জিত হয়েছিল।

এরপরে সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক ইউনিয়ন "দীনু মুখুজ্যের হত্যাকারীদের শাস্তি চাই" বলে দেওয়ালে পোস্টার লাগায় এবং কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পথে এগোয়। ইতিমধ্যে খনির ভিতরে বিষাক্ত গ্যাস জমে উঠলে শ্রমিকরা আন্দোলন করে এবং যতক্ষণ না গ্যাস পরিষ্কার হচ্ছে ততক্ষণ ঐ মরণফাঁদে কেউ পা দেবে না বলে কাজ বন্ধ করে। কাজ বন্ধ হয়ে যায় এবং মজুরির অভাবে শ্রমিকদের সংসারে নেমে আসে নিদারুণ দারিদ্র্য। ইউনিয়নের সম্পাদক কুদরৎ নানাভাবে অভাবী মজুরদের সংসারকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে কোম্পানির পক্ষ থেকে অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার মিঃ দত্ত সুবাদার মহাবীরকে নিয়ে শ্রমিকদের কাছে এক প্রস্তাব দেয়। জানায় যে গ্যাসের রিডিং-এর রিপোর্টে বলছে গ্যাস জমে নেই। তাই কোম্পানি চায় একজন শট ফায়ারার ও এক গ্যাং মালাকাটা যেন খনির নীচে যায়। তাদের প্রত্যেককে ৫০০ টাকা করে স্পেশ্যাল বোনাস দেওয়া হবে, স্ট্রাইক চলার সময়ের পুরো পাওনাও দেওয়া হবে। মজুররা রাজি হয় না, তাদের ধারণা লোকসানের জন্য অস্থির হয়ে কোম্পানি কিছু লোককে জীবন্ত কবর দেবার ব্যবস্থা করেছে। শেষপর্যন্ত সুবাদার মহাবীর সিং নিজে শ্রমিকদের সঙ্গে খনির নীচে যেতে চায়—খনিগর্ভ যে সম্পূর্ণ নিরাপদ এটা বোঝাতেই তার এই প্রস্তাব। কোম্পানির চক্রান্ত হতে পারে জেনেও অভাবী শ্রমিকের দল খনিগর্ভে নামার প্রস্তাবে রাজী হয়। স্থির হয় শট ফায়ারার হিসেবে বিনু যাবে এবং সঙ্গে থাকবে জয়নুল, সনাতন, আরিফ, মোস্তাক, হরিদাস ও রমজান। শ্রমিকের দল খনিতে নামার আগে ঘোষিত টাকা চাইতে গেলে মহাবীর বলে আগে টাকা দেবার হুকুম নেই, তবে না ফিরলে শ্রমিকদের পরিবারের হাতে সে টাকা তুলে দেওয়া হবে। শ্রমিকরা মালিকপক্ষের দেওয়া কাগজে সই করে, কেউ কেউ টিপছাপ দেয়। এমন সময় খবর আসে ইউনিয়নের নেতা কুদরৎকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তখনই শ্রমিকপক্ষ দুভাগ হয়ে যায়। বিনু, হাফিজ, জলু, খাদে না নামার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু আরিফ, হরি, মোস্তাক, জয়নুল টাকার লোভে ইউনিয়নের শর্ত ভুলে খাদে নামতে চায়। বিনু স্থির করে খাদে নামবে না। কিন্তু অভাবের তাড়নায় তার মা অধীর হয়ে বিনুকে আক্রমণ করেন—এতগুলো টাকা হাতের কাছে এসেও পাওয়া যাবে না। মার সঙ্গে বিনুর ভুল বোঝাবুঝি হয়। শেষপর্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিনু খাদে নামতে বাধ্য হয়। মাকে প্রণাম করে সই করা কনট্র্যাক্ট-এর

কাগজ মার হাতে দিয়ে বিনু খাদে চলে যায়। কাহিনির পরিণতি ঘনিয়ে আসে অনিবার্য ট্র্যাজেডির ইশারা নিয়ে। বিনুরা নীচে নামার পর সর্বধ্বংসী বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়, সাইরেন বেজে ওঠে। সমবেত মানুষজনের সংলাপে বোঝা যায় খনির নীচে গ্যাস জমেছিল। স্বয়ং ম্যানেজার বলেন যে উদ্ধারকারী দলকে নীচে পাঠানো অর্থহীন। কারণ মনে হয় কেউ-ই বেঁচে নেই। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে বিপজ্জনক জায়গাটুকু ঘিরে রাখা হয়েছে। একপাশে বড়কর্তারা জটলা করছে, অন্য কোণে কয়েকটি অসহায় মানুষ বিনুর মা, রূপা, সুমি, রুকমি, হরিদাসের বউ জলু, হাফিজ, জয়নুলের বৃদ্ধা মা, গফুর—অপেক্ষা করে আছে। রেসকিউ টিম এক একটি মৃতদেহ তুলে আনছে আর কান্না, চিৎকারে ভারী হয়ে উঠছে বাতাস। শেষকালে কোম্পানি স্থির করে বারুদ ফাটিয়ে রাস্তা করবে তাই জল ছেড়ে দেয়। বন্যাধারায় ভাসিয়ে দেওয়া হয় খাদকে। অপেক্ষামান মানুষরা বুঝতে পারে মালিকপক্ষ খনিগর্ভে জল ছাড়ছে—ভয়ে, বিস্ময়ে, বেদনায় তারা পাগল হয়ে ওঠে ; অন্যদিকে খনির ম্যানেজার মিঃ ওয়েবষ্টার নিশ্চিন্ত গলায় ঘোষণা করেন—"Fine Works. Thank you, sir, the whole mine will be flooded in fifteen minutes."

ষড়যন্ত্র করে অসহায় শ্রমিকদের খাদে পাঠিয়ে খনিগর্ভ জলমগ্ন করে কোম্পানি তাদের নির্বিচারে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। শেষ দৃশ্যে গভীর অন্ধকারে ঢাকা খাদ-অভ্যন্তরে দেখা যায় প্রাণপণে রাস্তা খুঁজছে সাতটি প্রাণী। পাথর কেটে এগোতে চায় তারা, কিন্তু বিষবাষ্পে ক্রমেই ভারী হয়ে উঠছে খাদের অভ্যন্তর। খাদের নীচের মানুষগুলি বুঝতে পারে খনির মুখ ওপর থেকে 'সীল' করে দেওয়া হয়েছে। এখানে বাতাসও বেশি নেই। গাঁইতি দিয়ে রাস্তা কাটা যাচ্ছে না বলে বিনু বারুদ ফাটাবার কথা চিন্তা করে। তাদের মাথার বারোহাজার ফুট ওপরে মাটি, গাছপালা, বাড়িঘর কেমন যেন ঘোরলাগা স্বপ্নের মত মনে হয়। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও এরা খাদের মারণ ফাঁদে আটকেও ব্যাঞ্জো বাজায়, গান করে, তাস খেলে। আশা ও আশ্বাসে বলে তারা—বড়াধেমো কয়লাখনিতে খাদের তলায় ১৯ দিন পর্যন্ত মানুষ বেঁচেছিল। তারাও বাঁচবে। তাদের আশা যে মালিকপক্ষ জল ছাড়বে না। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাদের আশঙ্কা সত্যি হয়। টপটপ করে জলের ফোঁটার আওয়াজ আসতে থাকে, সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রতি ফোঁটার শব্দ যেন প্রতিধ্বনিসহ ভয়াবহ রূপ ধারণ করে।

ইতিমধ্যে মহাবীর মালিকপক্ষের লোক হয়েও বুঝে গেছে যে এদের সঙ্গে সে-ও কোম্পানির ষড়যন্ত্রের শিকার। সাহেবের ওপর অবিচলিত ভক্তি হারিয়ে সে বলে ওঠে, "সাহেবও আমাকে ঠকিয়েছে।"

মহাপ্রলয়ের সামনে এসে তারা কাগজে চিঠি লিখে রেখে যেতে চায়—সবাই নিজ নিজ প্রিয়জনকে শেষ কথা নিবেদন করে যায়। তাদের মৃত্যুকালীন ইচ্ছাপত্রে ধ্বনিত হয় আশা আর স্বপ্নের বেদনামধুর সুর। হিন্দু, মুসলমান শ্রমিকরা খনিগর্ভে একটিমাত্র পরিচয়ে যেন বেঁচে ওঠে—সে পরিচয় নিপীড়িত শোষিত মানুষের পরিচয় কয়লাখনির অন্ধকারই তাদের জীবন-আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নপূরণের হাতিয়ার। কালো হীরের মতই তাদের আত্মার অমলিন জ্যোতি-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তারা ভালোবাসার কথা বলে। জলের তোড়ে ভেসে যাবার আগের মুহূর্তে সনাতন অন্যদের নিয়ে গান ধরে—"এ আল্লা, দয়া নি করিবা আল্লা রে"। আর বিনু সর্বগ্রাসী বন্যায় ভেসে যাবার আগে চীৎকার করে ওঠে—"মা, আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম, মা।"

৭.৩ অঙ্গার নাটকের অভিনয়

অঙ্গার নাটকের প্রথম অভিনয় হয়েছিল মিনার্ভা থিয়েটারে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৫৯। নাটক ও পরিচালনা—উৎপল

দত্ত। সুর—পণ্ডিত রবিশঙ্কর। লোকসঙ্গীত—নির্মল চৌধুরী। দৃশ্যসজ্জায় ছিলেন নির্মল গুহরায় এবং উপদেষ্টা—তাপস সেন, উৎপল দত্ত অভিনয় করেছিলেন গফুর চরিত্রে। বিনুর মা শোভা সেন এবং বিনু শ্যামল সেন। প্রায় পঞ্চাশজন শিল্পী নিয়ে অঙ্গার মিনার্ভা মঞ্চে তিনশত রজনীর অধিককাল অভিনীত হয়েছে। এর আঙ্গিক ও দৃশ্য সজ্জার চমকপ্রদ বহিরঙ্গ রূপের পাশাপাশি অন্তরঙ্গ বেদনার ট্র্যাজেডি ও গণআন্দোলনের স্বরূপ দর্শকচক্ষে উদ্ভাসিত হয়েছিল।

৭.৪ অঙ্গার নাটকের নামকরণ

নামকরণ শিল্পের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নামকরণই নাট্যবস্তুর স্মারক যার মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ নাট্যঅবয়ব আলোকিত হয়ে ওঠে। সচেতন সাহিত্যিক নামকরণের তারে সমগ্র কাহিনির সুরকে বেঁধে রাখেন। এরই ফলে ঘটে সাহিত্য সৃষ্টির অন্তর্লোক উদ্‌ঘাটন।

উপন্যাস বা নাটক-সর্বক্ষেত্রেই চরিত্রভিত্তিক নামকরণ বহুল প্রচলিত পদ্ধতি। প্রাচীন গ্রীক নাট্য থেকে শেকসপীরীয় ট্র্যাজেডি কিংবা প্রাচীন সংস্কৃত নাট্য সাহিত্য অথবা বাংলা নাট্য সাহিত্য—সর্বত্রই প্রধান চরিত্রের নামবাহী নামকরণ লক্ষ্য করা যায়। কালক্রমে এর সঙ্গে সমস্যাকেন্দ্রিক, ভাববাহী, অঞ্চল নির্ভর, রূপকাশ্রয়ী ও সংকেতধর্মী নামকরণ দেখা গেছে।

আধুনিককালে যখন ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডির জায়গায় গোষ্ঠীর ট্র্যাজেডি বা গণসাহিত্যের প্রসার দেখা গেল, তখন স্বভাবতই এক নায়কত্ব থেকে সরে এসে কাহিনি গোষ্ঠী বা জনচেতনার উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠল এবং নামকরণেও পড়লো তার অনিবার্য ছায়া। পাঠকের মনে পড়তে পারে বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যের অগ্রদূত হিসেবে ১৮৬০ সালে দেখা দিয়েছিল 'নীলদর্পণ' নাটক যা নামকরণেও এক বিশেষ আন্দোলনকে চিহ্নিত করেছিল। গ্রামীণ মানুষের সংঘবদ্ধ চেতনার রূপধৃত আরও একটি নাটক নায়ক চিহ্নিত না হয়ে 'নবান্ন' নামকরণে খুঁজে পেয়েছিল ঈপ্সিত ব্যঞ্জনা।

আধুনিককালের প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব উৎপল দত্ত তাঁর যুগোপযোগী রাজনীতি সচেতন ও জীবনানুগ বাস্তব নাট্যসমূহের নামকরণে এই ব্যঞ্জনাগর্ভ নামকরণের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। অঙ্গার, ফেরারী ফৌজ, মেঘ, রাইফেল, সীমান্ত, ঘুম নেই, কল্লোল, তীর—এই শ্রেণির নামকরণের নিদর্শন—যার মধ্যে চরিত্র ও ঘটনা, পরিবেশ ও রসপরিণাম পেয়েছে প্রত্যাশিত ব্যঞ্জনা।

'অঙ্গার' পি. এল. টি.-র সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়, মঞ্চ সফল নাট্যগুলির অন্যতম। বাংলা নাটক ও মঞ্চের ইতিহাসে নবদিগন্ত সৃষ্টিকারী 'অঙ্গার' বাস্তব পরিবেশে অনবদ্য শৈল্পিক রূপায়ণ।

উৎপল দত্ত কেবল নট ও নাট্যকারই নন, তিনি নাট্য পরিচালক প্রযোজক, নাট্যশিক্ষক ও রঙ্গামঞ্চ অধিকর্তা; এ বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের তিনি উত্তরসূরী। নাট্যশিক্ষার সঙ্গে মঞ্চ সাফল্যের দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল সজাগ এবং খুব সঙ্গতভাবেই টিকিট ঘরের আনুকূল্যের দিকেও তাঁকে দৃষ্টি দিতে হত। ফলে নতুন বিষয় ও অভিনব আঙ্গিক দিয়ে দর্শক আকর্ষণের চেষ্টা তাঁকে করতে হয়েছে—অবশ্যই শিল্পের শর্ত মনে রেখে।

এ সবেরই পরিণতি ১৯৫৯-এ মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে 'অঙ্গার' নাটকের অভিনয়। পেশাদারী নাট্যশালায় শ্রমিক আন্দোলনকে আনলেন প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসেবে। আবার চমকপ্রদ দৃশ্যসম্ভভার এলো যার দ্বারা দর্শক তৃপ্তি পায়। বিস্মিত চমকে মুগ্ধ হয়। কয়লাখনির এই দুই শর্তই পূরণ করতে পারবে এই আশায় বড়াধেমো কয়লাখনির দুর্ঘটনাকে মঞ্চে উপস্থাপিত করলেন। এর সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে মিশে রইল তাঁর বিবেকী দায়বদ্ধতা জীবনের কাছে, জনগণের কাছে। তাই কয়লাখনির শ্রমিকরা উঠে এল মঞ্চে, আবার তাদের জলের তলায় ডুবিয়ে দেবার শোষক মালিক শ্রেণির

ষড়যন্ত্রকেও তুলে ধরলেন। ব্যবসায়িক থিয়েটারের প্রতি চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য সেসময় কয়লাখনি কেলেঙ্কারীর চেয়ে প্রাসঙ্গিক আর কিছুই হতে পারতো না।

এই প্রসঙ্গ পরিবেশ ও শিল্পের দায়বদ্ধতা থেকে 'অঙ্গার' নাটকের জন্ম। কয়লাখনির ভিতর ও বাহিরমহল নিয়ে রচিত এই নাটকের প্রথম নাম ছিল—কালোহীরে। কয়লার ইংরেজী বিশেষণ Black Diamond-এর আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ এই শীর্ষনাম স্বয়ং নাট্যকারের দেওয়া এবং এটি অসার্থকও নয়, তবু শেষপর্যন্ত নামটি বদলে যায়। থিয়েটার গ্রুপের সভাপতি চিত্ত চৌধুরী, যাঁকে এ নাটকের মঞ্চ রূপায়ণের প্রধান ঋত্বিক বলে উৎপল দত্ত শ্রদ্ধা জানিয়েছেন—'অঙ্গার' নামটি তাঁরই দেওয়া। স্বয়ং নাট্যকারের মতে 'অঙ্গার' নামকরণ করে চিত্ত চৌধুরী নাটকের অন্তর্নিহিত অর্থটিকে নাট্যকারের কাছে স্পষ্ট করে তুলেছেন। নাট্যকারের এই সকৃতজ্ঞ উক্তির মধ্যেই নিহিত আছে নামকরণের সার্থকতার ইঙ্গিত।

কয়লাখনির ঘটনা নিয়ে রচিত এ নাটকে একক প্রাধান্য তেমনভাবে কোনো চরিত্রকেই দেওয়া হয়নি, যদিও বিনু ও তার মা এসেছে নাটকের কেন্দ্রে। তবু যেহেতু সামগ্রিকভাবে কয়লাখনির সংগ্রামী শ্রমিকরা এ নাটকের কুশীলব তাই একক নামকরণ সঙ্গত কারণেই করা হয়নি। 'কয়লা'-কেই চিহ্নিতকরণ মানসে 'কালোহীরে' নামকরণ হয়েছিল। অর্থাৎ হীরের মতই মূল্যবান এক আকরিক সম্পদকে তার পারিপার্শ্বিক পটভূমিসহ তুলে ধরা হয়েছিল। এর মজুরদের কালিমাখা চেহারার পিচনে অনমনীয় ঔজ্জ্বল্যকে 'হীরে' বিশেষণে ভূষিত করে অন্যতর ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত করা হয়েছিল। তবু মনে হয় 'কালো হীরে' নামটি একান্তভাবে বাচ্যার্থকে নির্দেশ করতো। কালোহীরে কয়লার প্রতিশব্দমাত্র। অঙ্গার সেখানে বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে বৃহত্তর ব্যঞ্জনায় সার্থক হয়ে উঠেছে। 'অঙ্গার' শব্দটির মধ্যে হীরকদ্যুতি নেই বটে, কিন্তু অন্তরস্থিত আগুনের আভাস আছে। কৃষ্ণবর্ণ এই আকরিক রত্ন যে তার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে দাহিকা শক্তি, সম্ভাবিত করে রেখেছে আগুনের উত্তাপ ও শিক্ষা—এই গূঢ় অন্তর্নিহিত ভাবের দ্যোতনায় নামকরণটি বিশেষ অর্থবহ হয়ে উঠেছে। কয়লাখনির বিষয় হিসেবেও 'অঙ্গার' নামকরণটি বিষয়কে নির্দিষ্ট করে উপকরণধর্মী নামকরণ হয়ে উঠেছে। আবার এই আপাত দৃশ্যমান বহিরঙ্গ নামকরণের অন্তরালে নাটকের চরিত্রগুলির অন্তর্লোকও আভাসিত ও আলোকিত হয়ে উঠেছে।

চরিত্রগুলি সকলেই যেন জীবনের সংগ্রামী উত্তাপে দগ্ধ হয়ে যাওয়া অঙ্গার। যারা কয়লা তোলে তারা কয়লারই মত ভেতরে জাগিয়ে রেখেছে দহনের সম্ভাবনা। নিজেদের দগ্ধ করেই তারা জীবনের রসদ সংগ্রহ করছে; নিজেদের শেষ করে জীবনের উত্তাপকে ধরে রাখছে। তাই প্রাণ ধর্মে তারা অঙ্গার। আবার বাইরের কালো রূপের আড়ালে তাদের অগ্নিগর্ভ হৃদয় যন্ত্রণাও এই নামকরণে আভাসিত। শেষপর্যন্ত কয়লাখনির গহ্বরে নিজেদের নিঃশেষ করে তারা যে প্রতিবাদের আগুন জ্বালিয়ে গেল, অগ্নিগর্ভ অক্ষরে জীবনের লিপি লিখে গেল—তাতেই 'অঙ্গার' নামকরণ তাৎপর্যমণ্ডিত ও সার্থক হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রতিটি শোষিত নিপীড়িত শ্রমিক যেন অঙ্গার—জ্বলে ওঠাই তাদের নিয়তি। প্রতিবাদের আগুনে জ্বলে উঠে তারা ছাই হয়ে যায়—শুধু সেই অগ্নিগর্ভ উত্তাপ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, ছড়িয়ে পড়েছে বিদ্রোহ বহ্নি রূপে। এখানেই নামকরণটি সার্থক হয়ে উঠেছে।

৭.৫ অঙ্গার নাটকের প্রান্তিক দৃশ্য

উৎপল দত্তের 'অঙ্গার' নাটক ছিল ব্যবসায়িক থিয়েটারের শর্তের প্রতি চ্যালেঞ্জ। এই নাটকের মাধ্যমেই নির্দেশক, অভিনেতার পাশাপাশি শুরু হলো নাট্যকার উৎপল দত্তের লেখনী স্রোত। 'অঙ্গার' নাটকের ইতিহাস সবার জানা; বড়াধেমো কোলিয়ারি জলধারায় প্লাবিত হলে সেই ঘটনার অনুবৃত্তিকারী শ্রমিক আশ্রিত নাটক অঙ্গার রচিত হয় এবং পেশাদারি মঞ্চের শর্তকে ভেঙে নতুন বিজয় বৈজয়ন্তীতে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল পেশাদার মিনার্ভা এবং উৎপল দত্তকে।

কিন্তু 'অঙ্গার' নাটক লেখবার সময় এই প্রোপ্রাইটার নাট্যকারকে মনে রাখতে হয়েছিল আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির কথা। এই সংকটের সমস্যাকে একেবারে ভিন্নপথে মীমাংসা করতে চেয়েছিলেন উৎপল দত্ত। তিনি বিস্ময়করভাবে পেশাদার মঞ্চকে ব্যবহার করেছিলেন রাজনৈতিক মতবাদ গঠনের ও প্রচারের ভূমি হিসাবে।

এজন্য তাঁকে আঙ্গিক প্রাধান্যের দিকে নজর রাখতে হয়েছিল। সেই সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনকে তুলে ধরতে চাইলেন। তাঁর নিজের মতে spectacular production করতে চেয়েছিলেন, যাতে দর্শকের চোখকেও তৃপ্তি দেওয়া যায়, চমক দেওয়া যায়। তখন কয়লাখনির বিষয়টি তাঁর মাথায় আসে। কয়লাখনির শ্রমিকরা তখন নিজেদের দাবি নিয়ে আন্দোলন করছিল। আর অন্যপক্ষে কয়লাখনির তলার জলে তাদেরই ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল মালিকপক্ষের কারসাজিতে। সেই সঙ্গে কয়লাখনিতে আগুন লাগার মত ঘটনাকেও হাতিয়ার করা গেল।

এরই চূড়ান্ত রূপ দেখা গেল অঙ্গার নাটকের প্রান্তিক দৃশ্য পরিকল্পনায়। স্বভাবতই এ দৃশ্যে আঙ্গিকের প্রাধান্য ছিল চমকপ্রদ, সংলাপ ছিল আবেগ ও উত্তেজনাদীপ্ত। শ্রমিকের প্রতিবাদ জলকল্লোলে চাপা পড়ে গেলেও তার আর্তনাদের রেশ, নিরুপায় জীবনতৃষ্ণা দর্শকদের বিমোহিত ও অভিভূত করেছিল। ট্র্যাজিক পরিণতির সঙ্গে চরিত্রের ক্ষোভ মিলে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, তা একান্ত বাস্তব।

কোনও পেশাদারি মঞ্চে মার্কসবাদী চেতনায় শ্রমিকশ্রেণীকে এভাবে ব্যবহার ও তার জীবনযাপন উপস্থাপনার যে প্রচেষ্টা এই নাটকে উৎপল দত্ত দেখিয়েছিলেন তা এর আগে কখনও বাংলা মঞ্চে দেখা যায়নি। তাদের বৈভবহীন জীবনের নগ্ন ছবিকে তুলে ধরা যেন মঞ্চমায়ার কাছে এক চ্যালেঞ্জ এবং সেই পথ ধরেই মালিক শ্রমিকের অসম লড়াইয়ে শেষপর্যন্ত শ্রমিককে শোচনীয় মৃত্যুবরণ করতে হয়, যা আসলে হত্যারই নামান্তর।

পাঠকের মনে আসতে পারে সুবোধ ঘোষের অসামান্য গল্প 'ফসিলে'-র কথা; দু'য়েরই পরিণতি এক।

উৎপল দত্ত সামাজিক-রাজনৈতিক দায়বদ্ধ এক বিবেকী নাট্যকার, যিনি শিল্পের কাছেও দায়বদ্ধ। তাই 'অঙ্গার' বাস্তবকে স্বীকার করেই শেষ হয় জলবন্দী শ্রমিকদের আর্তনাদে। এই নিষ্ঠুর সত্য বাস্তবকে তুলে ধরলেও নাট্যকারের আদর্শবাদ হয়তো যন্ত্রণা দগ্ধ হয়। তাই এক স্মৃতিকথায় লিটল থিয়েটার গ্রুপের নাট্য আন্দোলন প্রসঙ্গে অঙ্গারের প্রান্তিক দৃশ্য সম্পর্কে তাঁর মনের বেদনাকে প্রকাশ করে বলেছিলেন—

"আজ পেছনের দিকে তাকিয়ে 'অঙ্গার' নাটককে আমার অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। যে নাটক ডুবন্ত মজুরদের আর্তনাদে শেষ হয়, তার রচনার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারলে আজ বড় আনন্দিত হতাম।"

—এই উক্তি এক সংগ্রামী ব্যক্তিত্বের বেদনাদীর্ণ চিত্তের দহনকে তুলে ধরে ঠিকই কিন্তু দর্শক ও নাট্যপাঠক এ নাটককে পরাজিত মানুষের আর্তনাদেই শেষ বলে মেনে নেন না। তাঁরা উপলব্ধি করেন এক বিবেকী সৎ নাট্যকারের ভাবনা ও আন্তরপ্রেরণাকে। ঘটনাকে যথাযথ দেখিয়েছেন নাট্যকার, কিন্তু তাই বলে শ্রমিকের পরাজয়কে তিনি বড় করে দেখাননি; দেখাতে চেয়েছেন তাদের বাঁচবার অদম্য প্রয়াস ও জীবনাকাঙ্ক্ষাকে। তাই সনাতনের কণ্ঠ শয়তান ঐশ্বর্যলিপসু মানুষের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে, মোস্তাক মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও বলে "গান ধরো"। তারা গায় জীবনের গান মৃত্যুর প্রান্তে এসে—তা' হয়ে যায় মৃত্যুঞ্জয়ী উচ্চারণ। বিনু বলে 'আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম মা'। তার স্বপ্নের উচ্চারণ জলের ঢেউ-এ ভেসে গেলেও মৃত্যু উত্তীর্ণ অনুভবে দর্শককে অভিভূত করে। এই আর্তনাদে নাটক বহিরঙ্গে শেষ হলেও আসলে উৎপল দত্ত জীবনকেই জয়যুক্ত করতে চান। তাই তাঁর বেদনাদগ্ধ উচ্চারণ মনে রেখেও আমরা বলি এ নাটক মৃত্যুর নয়—জীবনের শপথ। মৃত্যুর কালো আঁধারে জীবনের আগুন।

৭.৬ অঙ্গার নাটকের চরিত্র

দীনবন্ধু মিত্র রচিত 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে। বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যের অগ্রদূত হিসেবে তার ঐতিহাসিক মর্যাদা স্বীকৃত। নীলদর্পণেই দেখা গিয়েছিল বাংলা নাটকে গোষ্ঠীরর ট্র্যাজেডি। আধুনিক জনমুখী চেতনা ও সংঘবদ্ধ আন্দোলনের প্রাথমিক রূপাভাসও মিলেছিল তাতে। তাই প্রথাগত নায়ক চরিত্রের চেয়ে সাধুচরণ, রাইচরণ, গোপীনাথ, তোরাপ, পদীময়রানী, আদুরী বা রাইয়ত-রা টাইপ চরিত্র হিসেবে অধিকতর আকর্ষণীয়। বিচিত্রমুখী চরিত্রের দেখা মিলেছিল এ নাটকে। পরবর্তীকালে 'নবান্ন' যে গণনাট্য আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল তার ফলে মঞ্চে দেখা গেল বহু মানুষের মিছিল। একনায়কত্বর পরিবর্তে গণসাহিত্যমুখী চেতনা দেখা গেল।

উৎপল দত্ত রাজনীতিমনস্ক সচেতন নাট্যকার। তিনি 'অঙ্গার' নাটকে কয়লাখনির শ্রমিকদের সামগ্রিক ছবি আঁকলেন। এজন্য তাঁকে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়নি; সমকালীন খনি অঞ্চলের দুর্গতি ও দুর্গতজনকে কাছ থেকে দেখেছেন। বড়াধেমো কোলিয়ারীর ঘটনা ও দুর্ঘটনার তথ্য তিনি সেখানে গিয়ে সংগ্রহ করেছেন। তাই তত্ত্ব কথা নয়, তথ্য ও জীবনের সত্যকে রূপায়িত করতে পেরেছেন।

চরিত্রগুলি কল্পনাশ্রিত নয়; কাল্পনিক যদি বা হয়, তার ভিত্তি বাস্তব। চরিত্রগুলি নাট্যকার উৎপল দত্তের মনোলোকের সৃজন, কিন্তু এগুলি দেশকাল পাত্রাতীত শোষিত মুজরশ্রেণির বাস্তব চিত্রায়ণ। কুশীলবের পরিচয়লিপিতে (প্রথম অভিনয় রজনীর) আছে মোট বিয়াল্লিশ জনের নাম। এদের মধ্যে বিনু, দীননাথ, হাফিজ, গফুর, সনাতন, আরিফ, রমজান, মোস্তাক, জয়নুদ্দি, জলু, কুদরৎ, দয়াল, মহাবীর প্রত্যেকের ভূমিকা বিশিষ্ট। বিনুকে প্রধান চরিত্র বলা গেলেও এদের অপ্রধান বলা যাবে না। প্রথম থেকে শেষ দৃশ্য পর্যন্ত এদের ভূমিকা অত্যন্ত সক্রিয় ও তাৎপর্যপূর্ণ।

নারী চরিত্রের মধ্যে বিনুর মা, সুমনা, রূপা, রুকমির ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ।

বিনু এ নাটকের প্রধান চরিত্র। তার মা ও বোন সুমনা এবং প্রেমিকা রূপাকে ঘিরে তার অনেক স্বপ্ন, আশা ও বঞ্চনা। বিনু একেবারে অশিক্ষিত নয়—সে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। তাই কোলিয়ারীর হিসেবে সে 'লিটারেট', 'শটফায়ারার' থেকে সর্দার, ওভারম্যান পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। বিনুর মার আশা, ম্যাট্রিক পাশ বিনু হয়তো অফিসের কাজ পেতে পারতো। তখনই দীননাথ বলেছে—"কেরানী হয়ে কলম পিষে নস্যি নিয়ে ষাট বছরে আড়াইশ টাকা পাবে—সেটাই চাই? আমার এতদিনের ট্রেনিংটা বৃথা নষ্ট করবে?"

শটফায়ারিং সর্দার দীননাথ মুখুজ্যে স্বল্পকালীন উপস্থিতিতে এ নাটকের এক বিশিষ্ট চরিত্র। মাত্র প্রথম দৃশ্যে সে এসেছে—বিনুকে সে শটফায়ারিং-এর ট্রেনিং দিচ্ছে। বিনোদ বা বিনুর পরিবারের সঙ্গে দীননাথের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। মিথেন গ্যাস জমা খনির অভ্যন্তরে ৩১ নভেম্বরে শটফায়ারিং চলার সময় বিস্ফোরণে দীনুর মৃত্যু ঘটে। তার মৃতদেহকে খনি গহ্বর থেকে সরিয়ে কোলিয়ারী থেকে দূরের রাস্তায় ফেলে আসা হয় এবং কর্তৃপক্ষের গাফিলতি ও অব্যবস্থাকে ধামাচাপা দেবার জন্য এক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তদন্ত কমিশন বসে। তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দীনু সমস্ত শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করে যায়। প্রথম দৃশ্যে দীনুর মৃত্যু থেকে শেষ দৃশ্যে খনিগর্ভে বিনু-সহ সাতজনের মৃত্যু যেন এক সূত্রে বাঁধা। কোম্পানির মুনাফার বিনিময়ে শ্রমিকশ্রেণি এভাবেই চিরকাল প্রাণ দিয়েছে। নিজেদের প্রাণের উত্তাপ নিয়ে এরাই যেন খনিগর্ভের কালোহীরে। মালিকপক্ষের অন্যায় অত্যাচারে দগ্ধপ্রাণ আলোককণাই তো অঙ্গার।

বিনুর মুখ দিয়ে নাট্যকার উচ্চারণ করিয়েছে, "কয়লা যুগ যুগ ধরে তিল তিল করে সঞ্চয় করল উত্তাপ, বজ্রের শক্তি-পৃথিবীর থেকে, সূর্যের কিরণ থেকে। চেহারা হল পোড়া কালো কর্কশ, ভেতরে রইল অগ্নি সম্ভাবনা, ঠিক যেমন খেটে খাওয়া মানুষ"

কয়লার মত সংগ্রামের আগুনে পোড়া মানুষগুলোই 'অঙ্গার' নাটকের শ্রমিক দল। এই সংগ্রামের উত্তাপ লেগেছে নারীচরিত্রসমূহেও। বিনুর মা এ নাটকের প্রধান চরিত্র। শ্রমিকের মা হিসেবে তার সাধ অতি সামান্যই—শুশুনিয়া পাহাড়ে ধারে একটুকরো জমিতে খড় ছাওয়া একখানি মাটির ঘর, যেখানে তুলসীতলায় রোজ প্রদীপ জ্বলবে।

সেই সামান্য সাধও অপূর্ণ থেকে যায়।

এই ছোট্ট স্বপ্নই খাদের তলায় জলমগ্ন হবার মুখে বিনুকে আকুল করে তোলে। প্রথম দৃশ্যের এই স্বপ্নমাখা সংলাপই শেষ দৃশ্যে আকুল হাহাকারে উচ্চারিত হয়; বেদনার বৃত্ত হয় সম্পূর্ণ। রূপা, সুমি ও রুকমি ছোট চরিত্র হয়েও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত। রুকমিকে ঘিরে আরিফ আর রমজানের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ দৃশ্যে মৃত্যুর মুখোমুখি এসে বন্ধুত্বের বাঁধনে শেষ হয়।

পঞ্চম দৃশ্যে খনিতে সর্বধ্বংসী বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। চোখে পড়ে পিট হেডের বিধ্বস্ত দৃশ্য। সেখানে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে বিপজ্জনক জায়গাটুকু ঘিরে রাখা। একপাশে বড়কর্তারা জটলা করছেন, অন্য কোণে কয়েকটি অসহায় প্রাণী—বিনুর মা, রূপা, সুমি, রুকমি, হাফিজ, গফুর, জয়নুলের বৃদ্ধা মা, মোস্তাকের বুড়ো বাবা, জলু। এদেরই প্রিয়জনেরা নীচে চাপা পড়েছে। উৎকণ্ঠিত অসহায় মানুষগুলির টুকরো সংলাপে, উদ্বিগ্ন আচরণে, কখনো বা এলোমেলো কথায় ফুটে ওঠে তাদের মানসক্রান্তি। তারা বুঝতেও পারে না তাদের চোখের সামনে তাদের একান্ত জনদের জীবন্ত কবরস্থ করার ব্যবস্থা করছে শেলডন কোম্পানি। তার পরিবর্তে ওদের হাতে তুলে দিয়েছে একটুকরো কাগজ—সাতশো টাকা, জীবনের দাম। তারই বিরুদ্ধে ধিক্কার গর্জে ওঠে রুকমির সংলাপে—"দু'টুকরো কাগজ দু'টো জীবনের দাম। জ্যান্ত মানুষগুলোকে জলে ডুবিয়ে মেরেছে। ওদের টাকায় থুথু দিই আমি"

মিছিলের মুখে এই কথাই যেন শোষক মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে উচ্চকিত শ্লোগান হয়ে জেগে থাকে। তাই ডুবন্ত মানুষের আর্তনাদে নয়—মালিকপক্ষের প্রতি ধিক্কৃত ঘৃণার সংলাপেই 'অঙ্গার' হয়ে দাঁড়ায় সর্বকালের প্রতিবাদী এক নাটক।

৭.৭ অনুশীলনী

১। অঙ্গার কোন শ্রেণির নাটক?

২। অঙ্গার নাটকের উৎস ও কাহিনী আলোচনা করুন।

৩। অঙ্গার নাটকের নামকরণ সার্থকতা বিচার করুন।

৪। অঙ্গার নাটকের প্রধান চরিত্র কে বা কারা? উল্লেখযোগ্য দুটি চরিত্র বিশ্লেষণ করুন।

৫। নাটকটির প্রান্তিক দৃশ্যের নাট্যসঙ্গতি বিচার করুন।

৬। অঙ্গার-এর নাট্যপ্রকৃতি ও তার মঞ্চরূপের মধ্যে সামঞ্জস্য কতটা তা বিচার করুন।

৭.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১। The Story of the Calcutta Theatres, 1753-1980 : Sushil Kumar Mukherjee.

২। Towards a Revolutionary Theatre : Utpal Dutta.

৩। চায়ের ধোঁয়া : উৎপল দত্ত।

৪। বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস : অজিত কুমার ঘোষ।

৫। নবান্ন থেকে লালদুর্গ : শোভা সেন।

একক ৮ □ চাঁদবণিকের পালা

পর্যায় ৩ একক ৮

৮.০ প্রস্তাবনা

৮.১ শম্ভু মিত্র ও বাংলা থিয়েটার

৮.২ চাঁদবণিকের পালা : উৎস সন্ধানে

৮.৩ চাঁদবণিকের পালা : সারাংশ

৮.৪ চাঁদবণিকের পালা : আধুনিক রূপায়ণ

৮.৫ চাঁদবণিকের পালা : তত্ত্বানুসন্ধান

৮.৬ চাঁদবণিকের পালা : চরিত্র বিচার

৮.৭ অনুশীলনী

৮.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৮.০ প্রস্তাবনা

আধুনিক বাংলা নাট্যমঞ্চের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব শম্ভু মিত্র রচিত 'চাঁদবণিকের পালা' সর্বার্থেই এক অনন্যসাধারণ নাটক। রবীন্দ্রনাথ, ইবসেন, সফোক্লেস এবং আধুনিক নাট্যপরিক্রমার শেষে শম্ভু মিত্র পৌঁছে গেলেন এক মধ্যযুগের কাহিনি-নির্ভর সৃজনে—তার নাম 'চাঁদবণিকের পালা'। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, যে শম্ভু মিত্র বাংলা নাট্যমঞ্চে সর্বার্থে আধুনিক মন ও মননের দাবিদার, যিনি প্রথম বাংলা নাট্যমঞ্চে রবীন্দ্রনাথকে সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন, যিনি অত্যন্ত অনায়াস ভঙ্গিমায় ইবসেন, সফোক্লেসকে বাঙালির অন্তরে প্রোথিত করে দিতে পারেন—সেই শম্ভু মিত্র কেনই বা জীবনের সায়াহ্নে মধ্যযুগে—মনসামঙ্গাল আকৃষ্ট হলেন? এই প্রশ্নকে সামনে রেখেই 'চাঁদবণিকের পালা' নাটকের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার ও বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হবো আমরা।

৮.১ শম্ভু মিত্র ও বাংলা থিয়েটার

আমরা একথা জানি যে চল্লিশের দশকে যে 'শম্ভু মিত্র' একটি নামমাত্র, পঞ্চাশের দশকে সেই নাম একাই একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত। সেই সময় শম্ভু মিত্রের নিজের হাতে নির্মিত 'বহুরূপী' এবং 'শম্ভু মিত্র' সমার্থক। ঊনত্রিশ বছরের যুবক, যাঁর নাম শম্ভু মিত্র, তিনি নাটককে ভালোবেসে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের 'নবান্ন' নাটক নির্দেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। বস্তুত সেদিনের সেই তরুণ শম্ভু মিত্র 'নবান্ন' নাটকে যে 'আবেগ-নিঃসঙ্গাতা-ভালোবাসা' মিশ্রিত কাব্যিক আবহ নির্মাণ করেছিলেন—পরবর্তীকালে সেই কাব্যরসসিক্ত সৃজন তাঁরই নির্দেশনায় নানা নাটকে আমরা লক্ষ্য করেছি। বস্তুত পরিচালক বা নির্দেশক হিসেবে 'রিয়েলিটি'-র গভীরতাসন্ধানে শম্ভু মিত্রের ছিল সযত্ন-সতর্ক অভিনিবেশ। এই কারণেই আমরা লক্ষ্য করি যে আর পাঁচজনের কাছে 'নবান্ন' নাটকের হাহাকার

যখন মুখ্য ; তখন শম্ভু মিত্রের কাছে নবান্ন-র হাহাকার বড় কথা নয়। 'নবান্ন' এক গভীরতর বেদনার কাব্য এই বোধে-ই উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন শম্ভু মিত্র। ভারতীয় গণনাট্যসংঘের প্রযোজনায় 'নবান্ন'-র অভিনয় সে ইতিহাস সৃষ্টি করলো, তারই ধারাপথে পরিচালক শম্ভু মিত্র অনিবার্যভাবেই এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলেন।

আমরা একথাও ভুলে যেতে পারি না যে চল্লিশের দশকে পেশাদার থিয়েটারে যোগ দিয়েও শম্ভু মিত্র সেখান থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। কিন্তু, কেন? বস্তুত কোনো এক গভীরতর অতৃপ্তি তাঁকে যেন ভেতর থেকে 'অন্য কোথাও অন্য কোনোখানে' এই উচ্চারণে অস্থির করে তুলেছিল। তাই ভারতীয় গণনাট্যসংঘে শম্ভু মিত্রের যোগদান ও 'নবান্ন' নাটকের মঞ্চায়ন বাংলা নাটকের জগতে তৈরি করেছিল নতুন প্রয়োগ নৈপুণ্যের পথনির্দেশ। ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ এই সংক্ষিপ্ত পর্বে গঠিত হবার মতন স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করলো ভারতীয় গণনাট্যসংঘ। আর তার মধ্যমণি হিসেবে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত হলেন শম্ভু মিত্র।

উপরোক্ত প্রেক্ষিতে শম্ভু মিত্রের নতুন জীবন, বলা ভালো নাট্যজীবন শুরু হলো 'বহুরূপী' প্রতিষ্ঠায়। প্রতিষ্ঠার কয়েকবছরের মধ্যেই 'পথিক', 'উলুখাগড়া', 'ছেঁড়া তার' ও 'চার অধ্যায়' বাংলা থিয়েটারে নতুন দিকনির্দেশ করে দিল। এই প্রসঙ্গে 'বহুরূপী' প্রতিষ্ঠা পর্বের দেশ ও কাল বিশেষভাবে স্মরণীয়। বস্তুত বাংলা নাটকে পৌরাণিক, আধা-ঐতিহাসিক, মেলোড্রামাটিক পারিবারিক আবেগ সর্বস্বতা ইত্যাদি যে গতানুগতিক নাট্যভাবনার রূপায়ণ চলে আসছিল—হঠাৎ যেন এক লহমায় সমসাময়িক জীবন ও জীবনসংগ্রামের উপস্থাপনায় বাংলা নাটক অন্যরূপে উপস্থিত হল।

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে শম্ভু মিত্রের হাত ধরে 'বহুরূপী'-র প্রতিষ্ঠা। দেশ তখন সদ্য স্বাধীনতা পেয়েছে,—সাম্প্রদায়িক হানাহানির উত্তপ্ত বাতাস তখনও মিলিয়ে যায়নি। উদ্বাস্তু সমস্যা দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে তৈরি করেছে এক নতুন সঙ্কট। এমনই এক অদ্ভুত কঠিন পরিস্থিতিতে শম্ভু মিত্র বাংলা নাটকে নতুন বাতাস এনে দিলেন।

বাংলা নাটকের অভিনয়ের ইতিহাসে শম্ভু মিত্র প্রথম পরিচালক ও অভিনেতা যিনি বাংলাভাষার কথ্যরূপকে সফলভাবে মঞ্চে নিয়ে এলেন। শম্ভু মিত্র প্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন যে নাকটকটা দুই তরবারির খেলায় বা বিপরীত চাপে নির্মিত হয় না ;—বরং বাঙালির একত্র কথোপকথন, বিভিন্ন কথ্যভঙ্গিমা, গতিভঙ্গিতে তৈরি হয় বাংলা নাটক। বাঙালির উচ্চারণের এমন নাটকীয় বৈচিত্র্য শম্ভুবাবুর পূর্বে বাংলামঞ্চে কেউ আমাদের এমন স্পষ্টাকারে দেখাতে পারেননি। শুধু তাই নয়, এতদিনের অভ্যস্ত ভঙ্গিতে আমরা যে রবীন্দ্রনাথের নাটকের সংলাপ ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারিনি ; তা অবিশ্বাস্যভাবে বাঙ্ময় হয়ে উঠল শম্ভু মিত্র নির্দেশিত-অভিনীত-উচ্চারিত 'বহুরূপী'-র রবীন্দ্র নাটক প্রযোজনায়। রবীন্দ্র নাটক অভিনয়যোগ্য নয় এমন প্রচলিত ধারণাকে শম্ভুভু মিত্র নস্যাৎ করলেন নিজস্ব দক্ষতায়। রবীন্দ্র নাটক ছাড়াও ইবসেন, সোফোক্লেসকে বাঙালি মন ও মননের আলোতে এমনভাবে নির্মাণ ও মঞ্চস্থ করলেন যে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হলাম।

নাট্যপরিচালক ও অভিনেতা হিসেবে শম্ভু মিত্রের খ্যাতি ও বাংলা থিয়েটারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। এহেন শম্ভু মিত্রকে আমরা নাট্যকার রূপেও লক্ষ্য করি। অন্য নাটকের অনুবাদকর্মে তাঁর সফলতাও লক্ষ্যণীয়। ইবসেন-এর 'ডলস্ হাউস'-এর অনুবাদ 'পুতুলখেলা', 'এনিমি অফ দ্য পিপ্‌ল'-এর অনুবাদ 'দশচক্র', সোফোক্লেসের 'কিং ঈডিপাস'-এর অনুবাদ 'রাজা অয়াদিপাউস' এবং ইউজিন ও নীল-এর নাটক 'হোয়্যার দা ক্রস ইজ মেড'-এর অনুবাদ 'স্বপ্ন',—বস্তুত শম্ভু মিত্রের অনুবাদ ক্ষমতার অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

নাট্যকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের নাট্যরূপ দান শম্ভু মিত্রর বিশেষকর্ম হিসেবে আজও চিহ্নিত হয়ে আছে। মৌলিক নাটকও উপহার দিয়েছেন তিনি। সেগুলি হলো : 'উলুখাগড়া', 'একটি দৃশ্য', 'বিভাব', 'কাঞ্চনরঙ্গা',

'গর্ভবতী বর্তমান', 'ঘূর্ণি', 'অতুলনীয় সংবাদ' এবং আমাদের আলোচ্য 'চাঁদবণিকের পালা'।

৮.২ চাঁদবণিকের পালা : উৎস সন্ধানে

আমরা পূর্বেই একথা বলেছি যে নাট্যপরিচালনা ও অভিনয়ের জগতে কিংবদন্তী মানুষ শম্ভু মিত্র নাট্যরচনাকর্মে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছিলেন। 'উলুখাগড়া' বা 'পুতুলখেলা'-র রূপান্তর, 'রাজা অয়াদিপাউস'-এর অনুবাদ ইত্যাদি কর্মে শম্ভু মিত্রর অন্য এক সৃজনক্ষমতা আমরা লক্ষ্য করেছি।

আমাদের আলোচ্য 'চাঁদবণিকের পালা' এক আশ্চর্য সুন্দর সৃষ্টি! আমরা একথা জানি যে রবীন্দ্রনাটকের 'রাজা'-র মহড়া-র সময়েই মনসামঙ্গালের চাঁদসদাগর চরিত্রের ভাবনা শম্ভু মিত্রকে ঘিরে ধরেছিল। আমরা একথা জানি যে পুরাণ এবং ইতিহাসের কাহিনি অবলম্বন করে সাহিত্য রচনা আধুনিক সাহিত্যের বিশিষ্ট দিক। কিন্তু, মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, আধুনিক সময়ের শিল্পীরা পুরাণে বা ইতিহাসে ফিরে যান কেন? এই ফিরে যাওয়া কী নিছক ঐতিহ্যের অনুবর্তন? আমাদের মনে হয়, পুরাণ বা ইতিহাসের চেনা ছবির মাধ্যমে আধুনিক সময়ের জীবন ও জীবনের জটিলতা বা সংকটকে রূপদানের প্রাথমিক ইচ্ছে থেকেই আধুনিক শিল্পীদের পুরাণ বা ইতিহাসে ফিরে যাওয়া। পুরাণ কাহিনি বা ইতিহাসের আধুনিকীকরণ ঘটে, নতুন নতুন মাত্রা ও ব্যঞ্জনায় পুরাণ বা ইতিহাস ধরা দেয়।

আধুনিক সময়ের নাট্যকার শম্ভু মিত্র তাঁর 'চাঁদবণিকের পালা' নাটকটির নির্মাণকল্পে যখন মধ্যযুগের সাহিত্য মনসামঙ্গাল পৌঁছে যান,—তখন আমরা অনুভব করি যে, নিশ্চিতভাবেই শম্ভু মিত্র-র এই মনসামঙ্গাল, বিশেষত চাঁদসদাগরে পৌঁছে যাওয়া দীর্ঘদিনের চিন্তালালিত কোনো পরিকল্পনার-ই অঙ্গ। আমাদের পরিচিত মনসামঙ্গালের কাহিনিতে চাঁদসদাগর একজন গোঁয়ার, অহংসর্বস্ব, ব্যবসায়ীমাত্র। যার একগুঁয়ে, জেদি মনোভাবে পরিবার বিপর্যস্ত, ধ্বংসের মুখোমুখি সকলে। তবু চাঁদসদাগর, যে শিবের উপাসক, সে কোনোক্রমেই মনসার পুজো দিতে নারাজ। আপন প্রতিজ্ঞায় অটল সেই চাঁদসদাগর চরিত্র আধুনিক সময়ের নাট্যকার শম্ভু মিত্রকে বিশেষভাবে ভাবিয়েছিল। শম্ভু মিত্র মনসামঙ্গালের চাঁদসদাগর চরিত্রের মধ্যে এক বিস্ফোরক সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছিলেন। মনসামঙ্গাল বর্ণিত ও মনসামঙ্গালের রচয়িতাদের কলমে উল্লেখিত জেদি, গোঁয়ার, অহঙ্কারী চাঁদসদাগর চরিত্রের মধ্যে বস্তুত শম্ভু মিত্র খুঁজে পেয়েছিলেন অন্যতর এক ব্যঞ্জনা,—আজকের কবির ভাষায় যে চাঁদসদাগর 'আপন মুদ্রাদোষে, সকলের মাঝে বসে হতেছে আলাদা'! নাট্যকার শম্ভু মিত্রের মনে হয়েছিল, মধ্যযুগে মনসামঙ্গালে চাঁদসদাগরের জীবনে যে সংকট নেমে এসেছিল, সেই সংকটের মূলে আছে ব্যক্তিত্বের সংকট, আপন আদর্শে বিশ্বাসে অটল ব্যক্তিত্বের সংকট! আজও, আধুনিক সময়েও সেই সংকট বর্তমান। সেই সংকটের চেহারা হয়তো বদলে গেছে, সংকটের রূপ ও মাত্রা একইরকম নয়,—কিন্তু শম্ভু মিত্র-র মনে হয়েছে সেই সংকট আজও রয়ে গেছে। তাই আধুনিক সময়ে, আধুনিক জীবনে আপন আদর্শে-বিশ্বাসে অটল ব্যক্তিত্বের নিদারুণ সংকটের চিত্ররূপায়ণের নাট্যকার শম্ভু মিত্র মনসামঙ্গালের কাহিনি-নির্ভর চাঁদসদাগর চরিত্র নির্বাচনে আগ্রহী হলেন,—সেই কারণে শম্ভু মিত্রের নাটকের শিরোনাম 'চাঁদবণিকের পালা'।

৮.৩ চাঁদবণিকের পালা : সারাংশ

নাট্যকার শম্ভু মিত্র-র 'চাঁদবণিকের পালা' নাটকের মূল উৎস মধ্যযুগের 'মনসামঙ্গাল' হলেও নাট্যকার কাহিনি নির্মাণে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতার স্বাক্ষর রেখেছেন। নাট্যকার শম্ভু মিত্র আলোচ্য নাটকে তাঁর দৃষ্টি যে সম্পূর্ণত চাঁদবণিকের

প্রতি এই কথা প্রমাণের জন্য 'মনসামঙ্গাল'-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র 'দেবীমনসা'-কে এ নাটকে সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন। তৎসহ বর্জিত হয়েছে মনসামঙ্গলের আর এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র 'নেতা ধোপানি'।

'চাঁদবণিকের পালা' নাটকটি শুরু হচ্ছে চাঁদবণিকের বাণিজ্যযাত্রার প্রস্তুতিতে। এই দৃশ্য নির্মাণে নাট্যকার প্রথমেই স্পষ্ট করে দেন যে চাঁদবণিক অপরাপর বাণিজ্যযাত্রীদের নেতা,—নেতৃত্বদায়ী অগ্রপথিক। এহেন সূচনার পরই নাট্য ঘটনার ঘনঘটা। চাঁদের সহযাত্রীদের মধ্যে মনসা-র ভীতি, প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির ভয়ঙ্করতার জন্য দ্বিধা-দুর্বলতা ক্রমশ যতই প্রকট হয়ে ওঠে,—ততই চাঁদবণিকের লড়াই তীব্রতর হয়। আরাধ্য শিবের উপাসক হিসেবে চাঁদবণিক বাণিজ্যযাত্রার যাবতীয় প্রস্তুতি নিয়েও ক্রমশ সঙ্গীহীন হয়ে পড়ে। আধুনিক সময়ের প্রেক্ষিতে অদৃশ্যে দেবীমনসা,—তার প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির প্রতিনিধি হিসেবে বেণীনন্দন, চাঁদবণিকের বাণিজ্যযাত্রার যাবতীয় পরিকল্পনা বিপর্যস্ত করে দিতে চায়। নাট্যকার এই প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির ভয়ঙ্করতা বোঝানোর জন্য নির্মাণ করেন এক অভিনব চরিত্র। যাঁর নাম আচার্য বল্লভ। এই আচার্য বল্লভ চাঁদের শিক্ষাগুরু। কিন্তু তিনিও পারিবারিক কারণে অনন্যোপায়চিত্তে আপোষে বাধ্য হন। চাঁদের সংকট ও অসহায়তা আরো তীব্র হয়ে ওঠে। আলোচ্য নাটকে অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে লখিন্দর-বেহুলা ও সনকা চরিত্র-ত্রয়। লখিন্দর বাবা চাঁদবণিককে প্রথমে ভুল বোঝে। সে ভাবে, বুঝি বাবার জন্যই তাদের পরিবারে নেমে এসেছে এমন বিপর্যয়; তাই অক্লেশে বাবাকে ব্যঙ্গ করে সে বলতে পারে, "নাটুয়ার রাজার মতন রাজা সেজ্যে ভাব্যাছিলে সত্য বুঝি রাজা হয়্যা গ্যাছো"!

এহেন লখিন্দরের ক্রমশ পরিবর্তনও সম্পূর্ণ অভিনব। তার এই পরিবর্তনের মূলে বেহুলা। বেহুলা চরিত্রটি নাট্যকার সম্পূর্ণভাবে আধুনিক নারীরূপে চিত্রিত করেছেন। বেহুলা এই নাটকের একমাত্র চরিত্র যে প্রথমাবধি তার শ্বশুর চাঁদবণিকের আদর্শ কর্ম সম্পর্কে দ্বিধাহীনভাবে সশ্রদ্ধ। তারই প্রভাবে লখিন্দরের জীবনে পরিবর্তন আসে।

অন্যদিকে সনকা যেন আমাদের বাঙালি পরিবারের সাধারণ জননী ও গৃহবধূর চিত্র। সাংসারিক মঙ্গাল কামনায় সনকা তাই স্বামীর অগোচরে মনসাকে পুজো করে।

প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির ভয়ঙ্করতা থেকে রেহাই পায় না চাঁদবণিকের বাণিজ্য ডিঙ্গি। চাঁদের পুত্র লখিন্দরকে সর্পদংশনে মৃত্যুবরণ করতে হয়। পুরাণ অনুসরণে বেহুলা স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে যাত্রা করে। অবশেষে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনে বেহুলা এই শর্তে যে তার শ্বশুর চাঁদবণিক মনসার পুজো দেবে।

এরপরই নাট্যকার সম্পূর্ণ অভিনব উপায়ে এমন এক দৃশ্য নির্মাণ করেছেন যা অভাবনীয় ও সম্পূর্ণ আধুনিক চেতনাসম্পন্ন। লখিন্দর-বেহুলা-র আত্মহত্যার দৃশ্য আলোচ্য নাটকে অসাধারণ মাত্রা যোজনা করেছে। পঙ্কিল-কর্দমাক্ত-নীতিহীন-আদর্শহীন সমাজে বাঁচা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় এবং মৃত্যুর অধিকার তথা আত্মহত্যা-র অধিকার ঘোষণার মধ্য দিয়ে নাট্যকার এ নাটকে যে করুণ আবহ তৈরি করেন তা অতুলনীয়।

সব হারিয়ে চাঁদবণিক কিন্তু শেষপর্যন্ত রিক্ত চিত্তে গ্লানিপূর্ণ হৃদয়ে যাত্রার প্রস্তুতিতে পুনর্বার মনোযোগী হয়। এভাবেই একজন ব্যক্তিস্বাধীনতাপ্রিয়, আদর্শবাদী, সত্যনিষ্ঠ মানুষের লড়াইয়ের কাহিনির সমাপ্তি ঘটে।

৮.৪ চাঁদবণিকের পালা : আধুনিক রূপায়ণ

মধ্যযুগের মনসামঙ্গাল কাব্যে মনসামঙ্গালের কবি দেবী মনসার মাহাত্ম্য প্রচারে-ই সর্বাধিক মনোযোগী ছিলেন। দেবী মনসার প্রতি ভক্তি নিবেদনে জীবনের চরম ও পরম সার্থকতা এই বাণী-ই মনসামঙ্গলকাব্যে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত। স্বাভাবিকভাবেই দৈব মহিমা যে কাব্যের মূল অবলম্বন এবং দেবী মনসার মাহাত্ম্য প্রচার যে কবির মুখ্যকর্ম,—সেক্ষেত্রে অন্য ঘটনা ও অন্য চরিত্র তুলনামূলকভাবে গুরুত্বহীন হয়ে যায় সেকথা বলাইবাহুল্য। মধ্যযুগের যুগরুচি ও প্রতিবেশ

এমন এক দৈবমহিমাযুক্ত কাব্যরচনার অনুকূল ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর একজন প্রথিতযশা নট-নাট্যকার-পরিচালক যখন মধ্যযুগের সেই কাহিনিকে অবলম্বন করেন, তখন আমাদের মধ্যে ঔৎসুক্য জাগে। আমরা আকুল আগ্রহে লক্ষ্য করতে চাই যে শম্ভু মিত্রের মতন আধুনিক জীবনবোধসম্পন্ন একজন নাট্যব্যক্তিত্ব আধুনিক সময়ে মনসামঙ্গালের কাহিনিকে কীভাবে রূপদান করেন!

আমরা পূর্বেই একথা বলেছি যে শম্ভু মিত্র তাঁর 'চাঁদবণিকের পালা' রচনায় মনসামঙ্গালকে অবলম্বন করলেও মূলত তিনি মনসামঙ্গালের চাঁদসদাগর চরিত্র সম্পর্কেই সবিশেষ আগ্রহী ছিলেন। শম্ভু মিত্র মনসামঙ্গালের চাঁদসদাগর চরিত্রে যেটুকু লড়াই, আপোষহীন মনোভঙ্গিমা, আপন আদর্শে অটল থাকার ইচ্ছা লক্ষ্য করেছিলেন—তাকেই আধুনিক সময়ে একজন সত্যনিষ্ঠ-আদর্শবান-ব্যক্তি-স্বাধীনতাপ্রিয় চরিত্রের মধ্যে সমাপতিত করতে চেয়েছেন। মনসামঙ্গালের কবিকুল চাঁদসদাগরের পতনের জন্যে যেখানে মনসার প্রতি তার আনুগত্যহীনতা, জিদ (যাকে একগুঁয়েমি বলেছেন তাঁরা), অহংবোধ ইত্যাদিকে দায়ী করেছেন—সেখানে শম্ভু মিত্র চাঁদবণিকের পতনের জন্যে প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির স্বৈরাচর, ব্যক্তি-স্বাধীনতাপ্রিয়-আদর্শবান চাঁদবণিকের আপোষহীন মনোভঙ্গিমাকে দায়ী করছেন। বস্তুত চাঁদবণিক আলোচ্য নাটকে এক নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্নে বিভোর। যে সমাজে গণতন্ত্রের কোনো মূল্য নেই, ব্যক্তি-স্বাধীনতার কোনো স্বীকৃতি নেই, সেই স্থবির সমাজকে ভাঙতে ও নতুন করে গড়তে চেয়েছে শম্ভু মিত্রের চাঁদবণিক। এখানেই মনসামঙ্গালের চাঁদসদাগরের সঙ্গে শম্ভু মিত্রের চাঁদবণিকের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়,—"ভাইরে, আমরা কি সেই নিডরিয়া বাপ-পিতেমহদের বংশের সন্তান?.....প্রাণ দিয়্যা তারা নিজ প্রাণটারে সওদ্যা করেছে—আর আমরা কী করি? (হাঁক দিয়ে বলে) এ চম্পকনগরীর যত নিডরিয়া সদাগর ভাই,—সেই সব আত্মার তর্পণ আজ আমাদের কাজ। আমাদের পথ সত্য, চিন্তা সত্য, কর্ম সত্য। আমাদের জয় কেউ ঠেকাতি পারে না।"

চাঁদসদাগরের বাণিজ্যযাত্রা, আরাধ্য শিব ছাড়া মনসাকে পুজো না করার অটল ঘোষণা যেখানে মঙ্গালকাব্যের কবির কাছে নিছকই মূর্খামি ও গেঁয়ারতুমি,—সেখানে শম্ভু মিত্র চাঁদের এই আচরণকে বস্তুত একজন আদর্শবাদী আত্মবিশ্বাসী মানুষের সত্যনিষ্ঠা হিসেবে চিহ্নিত করছেন। গড্ডালিকাপ্রবাহে গা ভাসিয়ে আপোষকামিতায় জীবন কাটানো তো অত্যন্ত সহজকর্ম। কিন্তু তার বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে চাঁদবণিকের উচ্চারণ যেন আধুনিককালের আদর্শবাদী ব্যক্তিস্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের সাহসী ঘোষণা,—"ভাইরে, দেশ তো এখন মনসার পূজারীরা কুক্ষিগত কর্য্যে নেছে। সত্যকার দেশের অন্তর এখন তো খালি বেঁচ্যে আছে আমাদের বুকে।" এখানে লক্ষ্যণীয় 'দেশ' শব্দটি! মনসামঙ্গালে দেশ বা দেশের ভাবনা দেবী মনসার পুজোর মধ্যে সমাহিত। আধুনিক সময়ের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সংকটকে শম্ভু মিত্র দেখতে চেয়েছেন চাঁদের জীবন সংকটে। দেবী মনসা তাই শম্ভু মিত্রের আলোচ্য নাটকে চরিত্র হিসেবে অনুপস্থিত। কেননা আধুনিককালে প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি নেপথ্যে থেকে তার প্রতিনিধিদের মাধ্যমে আপন কর্তৃত্ব কায়েম রাখে। সেজন্য বেণীনন্দন বা আচার্য বল্লভ নানাভাবে চাঁদবণিকের বাণিজ্যযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা জারি করে। চাঁদবাণিকের বিরুদ্ধে গড়ে তোলে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র :—

"বল্লভ॥—ও।—চন্দ্রধর সম্পর্কে তোমার মনোগত অভিপ্রায় কী?

বেণী॥ (জিভকেটে)—আমার তো ব্যক্তিগত কোনো অভিপ্রায় থাকাই উচিত নয়, প্রভু। অভিপ্রায় শাসনবিধির। সে বিধির কাজ হোল, সমাজের যে আকার আছে তারে এক নিয়মের শৃঙ্খলে বেঁধে পরিপাটী করে রাখা। এই নিয়মভঙ্গের উচ্ছৃঙ্খল প্রবণতা কখনো তো কোনো সমাজেই প্রশ্রয় পেতে পারে নাক!"

আলোচ্য নাটকে চাঁদের একদা শিক্ষাগুরু আচার্য বল্লভের সময়ের স্রোতে মানসিক পরিবর্তনটুকু একান্তভাবে লক্ষ্যণীয়—"অর্থহীন জীবনের এই কালীদহে শুধু যেন ঘূর্ণাচক্র ঘোরে। সেই চক্রে সূর্য বলো, চন্দ্র বলো, তারা বলো, সব যেন বুদ্বুদের মতো মুহূর্তেই লুপ্ত হয়্যা যায়। সত্য শুধু অন্ধকার, 'মনসার সর্পিল আন্ধার!" আচার্য বল্লভের এই

উচ্চারণ যে অনন্যোপায় আত্মসমর্পণ তাই শুধু নয়, চাঁদবণিকের শিক্ষাগুরুর এই আপোষ চাঁদবণিকের লড়াইকে আরো কঠিন করে তোলে। শুধু তাই নয়, চাঁদবণিকের সহধর্মিনী, স্ত্রী সনকা-ও আদর্শগতভাবে চাঁদবণিকের থেকে বেশ কিছুটা দূরে। সনকাকে মনসামঙ্গালের ঘেরাটোপের বাইরে টেনে এনেছেন শম্ভু মিত্র। তাই মেঘনাদবধকাব্যের চিত্রাঙ্গাদা-র মতই সনকা আপন সংসারের মঙ্গালার্থে যা খুশি বলতে পারে, করতে পারে,—"সদাগর, তুমি ভালো করো বিবেচনা করো—জীবনের সব অর্থ গণনায় কই পাওয়া যায়? দিনমানে যে আলোক দেখি, সেইট্যা তো জীবনের একমাত্র সত্য নয়!" আবার লখিন্দর আধুনিক সময়ের যুবকের মতই পিতাকে প্রথমদিকে অভিযুক্ত করেছে তীক্ষ্ণভাবে, "কেন তুমি এই পথ বেছ্যে নিয়্যেছিলে? ঘর পেলে? শান্তি পেলে? সমাজে সম্মান পেলে? উপরন্তু তোমার কারণে আমার মায়েরে কেন অপমান হতে হয়?" বাস্তবে চাঁদের এই সংকট, এহেন সর্বব্যাপ্ত প্রতিপক্ষ—এঁরা যেন মনসারই প্রতিনিধি আধুনিক সময়ে। এহেন সংকটে চাঁদের পাশে দাঁড়াবার মতোন কেউ নেই। চাঁদ নিঃসঙ্গ, শুধু আদর্শ আঁকড়ে থেকেছে,—যেমন থেকেছিলেন নাট্যকার শম্ভু মিত্র—জীবন সংকটের মধ্যে—একাকী, নিঃসঙ্গ।

মনসামঙ্গালের চাঁদ সদাগরের কাহিনি এখানে নিছক চাঁদের সংকটের কাহিনি নয়, স্বতন্ত্র চম্পকনগরীর কাহিনিমাত্র নয়,—আধুনিক সময়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সংকটরূপে চিহ্নিত, আধুনিক স্বার্থমগ্ন জীবনের কুটিল রাজনীতি পুরাণের আবহ অতিক্রম করে আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় মিলে যেতে চায়,—"আর চতুর্দিকে হাওয়ারও অবস্থা দেখ্যা—বেণীও বুঝ্যেছে, যে মানুষের অভিযানে বাধা দিতে নাই। বরঞ্চ সহায়তা করাটাই গদিরক্ষণের উচিত কর্তব্য। বুঝ্যেছ না?"। এমন পরিবেশে বেমানান চাঁদবণিককে তাই আচার্য বল্লভ বলতে পারে, "সে অনেক রাজনীতি চন্দ্রধর, তুমি তার হদিশ পাবে না।" আলোচ্য 'চাঁদবণিকের পালা' নাটকটির আধুনিক রূপায়ণের ক্ষেত্রে নাট্যকার শম্ভু মিত্র এমনকিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছেন যা একান্তভাবেই সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গিমার প্রতিফলন, যেমন : চাঁদের পুনর্বার অভিযানে রাজনীতি, লখিন্দরের যাত্রার আয়োজন, বেহুলা-লখিন্দরের আত্মহত্যা, বিশ্বকর্মার পরিবর্তে তারাপতি কর্মকার।

৮.৫ চাঁদবণিকের পালা : তত্ত্বানুসন্ধান

শম্ভু মিত্রের 'চাঁদবণিকের পালা' নাটকে চাঁদের সংকট, ক্রমিক পতন, হতাশার অন্ধকারে ক্রমশ ডুবে যাওয়া—এ সমস্তই ভয়ঙ্কর একাকীত্বের সূচক হয়ে দাঁড়ায়। 'শাশ্বত রাত্রির বুকে' চাঁদবণিক 'অনন্ত সূর্যোদয়ের' সাধনা করেছে। জীবনানন্দের মতোই চাঁদ যেন বলতে চায়, "একটি আলোক নিয়ে বসে থাকা চিরদিন

নদীর জলের মতো স্বচ্ছ এক প্রত্যাশাকে নিয়ে।" ('আবহমান' : জীবনানন্দ)।

চাঁদবণিকের অভিযান আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থ, কিন্তু সেই ব্যর্থ অভিযানই অনুপ্রেরণা জোগাবে নতুন অভিযাত্রীদের—"পাড়ি দেও। এ আন্ধারে চম্পকনগরী তবু পাড়ি দেয় শিবের সন্ধানে।" চাঁদবণিকের অভিযানের ব্যর্থতা এই চম্পকনগরীর পতনের সীমানা নয়, ব্যাপকভাবে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে স্বার্থপরতা, ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব একজন ব্যক্তিস্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে,—তাকেই স্পষ্ট করেছেন নাট্যকার শম্ভু মিত্র।

আমাদের মনে হয়, বাংলা নাটকে 'চাঁদবণিকের পালা'-র প্রাসঙ্গিকতা বিচারে তত্ত্বগত বাধা একটি বড় বাধা। তবু এই নাটকের তত্ত্বানুসন্ধানেই নাটকটির শিল্পকর্মের সার্থকতা খুঁজে নেওয়া সম্ভব। কেননা আপাত বিরোধিতার বা আপাত অসঙ্গাতির ফলে যে বিচিত্র সংকটপূর্ণ বাস্তবতা শিল্পকর্মে স্পষ্ট হয়, তত্ত্বের পথ ধরে তাকে সহজে ধরা যায়। যদিও শিল্প থেকে তত্ত্বেও, আবার সেখান থেকে শিল্পে ফিরে যাওয়া যেকোনো শিল্পকর্মবিচারে চট্-জলদি পথ হিসেবে চিহ্নিত হয়। বস্তুত আলোচ্য 'চাঁদবণিকের পালা' নাটকে এমনই চট্-জলদি পথের হাতছানি রয়েছে। কখনো বা মনে হয়, শিল্পের

যে জীবন তা অনেকটাই যেন সেই তত্ত্বের সঙ্গতিতে সজ্জিত।

আমরা দেখেছি চম্পকনগরীর ঐতিহ্য চাঁদ স্বীকার করেছে, আবার চম্পকনগরী স্বীকার করে নিয়েছে চাঁদবণিকের পতনের বর্তমানকে। আলোচন্য নাটকের তিনটি পর্বজুড়ে সেই পতনের ক্রমিক তীব্র বেগ-ই যেন নাটক হয়ে ওঠে।

৮.৬ চাঁদবণিকের পালা : চরিত্র বিচার

'চাঁদবণিকের পালা' নাটকটি চাঁদবণিক কেন্দ্রিক। নাট্যকার শম্ভু মিত্র আধুনিক সময়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা, গণতন্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে নিজস্ববোধ স্পষ্ট করতে গিয়ে চাঁদবণিক চরিত্রকে তাঁর নাটকের ভরকেন্দ্রে স্থাপন করেছেন। অপরাপর চরিত্রগুলি চাঁদ চরিত্রকে উজ্জ্বলতর করার প্রক্রিয়ায় সামিল হয়েছে। নাট্যকার শম্ভু মিত্র আলোচ্য নাটকটির নামকরণের মধ্য দিয়েই স্পষ্ট করে দিয়েছেন তাঁর নির্দিষ্ট লক্ষ্য, গন্তব্য।

চাঁদবণিক : 'চাঁদবণিকের পালা' নাটকের সূচনাংশে চাঁদের একটি সংলাপের মধ্য দিয়ে চাঁদ চরিত্রের উন্মোচন,—"কিন্তুক, এটাও যেন ভাই, বেভ্‌ভুল না হয়, যে, আমাদের পথে হল দুরন্তর বাধা। সমাজে, সংসারে,—দেখো, সবায়েতো আমাদের খালি অপবাদ দিবে। আপন ঘরের লোকে, আত্মীয়স্বজনে, আমাদের খালি গালমন্দ দিবে। কেননা, তুমি যে শিবের ভজনা করো। যেটা সত্য মনে করো সেটারে যে তুমি মন খুল্যে সত্য বলো—এই ট্যাই অপরাধ।..... আমাদের পথ সত্য, চিন্তা সত্য, কর্ম সত্য, আমাদের জয় কেউ ঠেকাতি পারে না।" সততা ও নিষ্ঠাকে সম্বল করে সমুদ্রের বুকে পাড়ি দেবার সংকল্পে চাঁদবণিক এগিয়ে এসেছিল। চাঁদবণিকের স্বপ্ন ছিল তার ভাবনা নিশ্চয়ই বাস্তবায়িত হবে। আলোচ্য নাটকের ঘটনা পরম্পরায় আমরা লক্ষ্য করি যে চাঁদবণিকের স্বপ্নপূরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় দেবী মনসা,—আধুনিক সময়ের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিরূপে সবার অলক্ষ্যে মনসা চাঁদের অভিযান ব্যর্থ করে দিতে চায়। কারণ? কারণ এই, চাঁদবণিক শিবের ভজনা করে। কিন্তু মনসার সর্বাতিশয়ী আধিপত্যে চাঁদবাণিকের আনুগত্যহীনতা মনসা সহ্য করতে পারে না। এরই নাম বুঝিবা ক্ষমতায় অন্ধ স্বৈরাচার! তাই ব্যক্তিগত আরাধনায় চাঁদের ব্যক্তিস্বাধীনতা স্বীকারে রাজি নয় মনসা ও তার দলবল। ক্ষমতার প্রতাপে অন্ধ মনসা ও তার দলবল চাঁদকে ধনে-প্রাণে শেষ করতে চায়। শুরু হয়ে যায় চাঁদবণিকের কঠিন লড়াই। হীন, ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের শিকার চাঁদবণিক একে একে হারাতে থাকে অভিযানসঙ্গী, পরিবার, অস্তিত্ব রক্ষার বাস্তবভূমি!

চাঁদবণিক যেহেতু সত্যনিষ্ঠ, তাই সে মানতে পারে না যে সত্য পরাজিত হবে,—"মিথ্যা যতোই প্রতাপশালী হোক, তবু সে ভঙ্গুর, অবশেষে সত্য জয়ী হয়? জীবনে সত্যের জয় অবশ্য নিশ্চিত?" চাঁদবণিকের এই ভাবনার উত্তরে আচার্য বল্লভ (যিনি চাঁদের শিক্ষাগুরু) অবস্থার চাপে যিনি বদলে গেছেন, তিনি উত্তর দেন,—"ভুল, ভুল, মহাভুল,—.....ইতিহাস খুল্যে দেখো, অবশেষে চিরকাল মিথ্যা জয়ী হয়্যা এল। রামচন্দ্র জানকীরে উদ্ধারের লেগ্যে পুণ্যযুদ্ধ করে, কিন্তু, সে জয় তো সাময়িক। প্রজাদের মিথ্যা কুৎসা শুন্যা গর্ভবতী পত্নীট্যায়রে পুনরায় বনবাসে দিতে হয়। সেই হোল অবশেষে। কার জয় হয়? সেই অবশেষে?" একদা শিক্ষাগুরু আচার্য বল্লভের এই কথায় চাঁদ বড় কষ্ট পায়। চাঁদ গভীর মনোবেদনায় লক্ষ্য করে কীভাবে 'আমাদের মানুষিতা নষ্ট হয়্যা যায়'। মন্যুষত্ব নষ্ট হবার ইতিবৃত্তে আচার্য বল্লভের সংযোজন চাঁদকে এক অন্যতর অনুভবে পৌঁছে দেয়। চাঁদ অনুভব করে যে এমন এক সময় উপস্থিত হয়েছে যেখানে জ্ঞানের সম্মান নেই, সুভদ্র মানুষ নেই, আপন স্বার্থ ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা মানুষের নেই। সেই কারণেই নাটকের প্রথমদিকে চাঁদের সন্তান লখিন্দরও অভিযোগ করে,—"নাটুয়ার মতো রাজা সেজ্যে ভেব্যেছিলে সত্য বুঝি রাজা হয়্যা গেছ"!

কিন্তু যাবতীয় সততা, সাহস, পরিশ্রম সত্ত্বেও চাঁদবণিক ক্রমাগত বিপর্যস্ত হতে হতে শেষপর্যন্ত মিথ্যার কাছে, যুক্তিহীনতার কাছে, ক্ষমতার প্রতাপের কাছে অনন্যোপায় আপোষ করতে বাধ্য হয়েছে,—"আমি পূজা দিব। পূজা দিব। জানিনে তো সে মানুষ আছি কী না। তবু পূজা দিব।" অবশেষে বাধ্য হয়ে চাঁদবণিক মনসার পুজো দেয়। পুজো দিতে হয়। সর্বগ্রাসী ক্ষমতালোলুপতার কাছে হার মানে সৎ, পরিশ্রমী, সাহসী ব্যক্তি চাঁদবণিক!!

সনকা ও বেহুলা

শম্ভু মিত্রের 'চাঁদবণিকের পালা' নাটকের দুই নারী চরিত্র সনকাও বেহুলা ব্যক্তিগত সম্পর্কে শাশুড়ী-পুত্রবধূ হলেও জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিমায় একেবারে বিপ্রতীপ অবস্থানে নাট্য অভিপ্রায় সিদ্ধ করেছে!

সনকা চাঁদবণিকের স্ত্রী, লখিন্দরের মা, বেহুলার শাশুড়ী। ভারতীয় গৃহবধূর দৈনন্দিন আচার-আচরণের সর্বোত্তম প্রকাশে সনকা এখানে অকুণ্ঠ। চাঁদের আদর্শ, সততা, অভিযান ইত্যাদি কোনোকিছুতেই সনকার ব্যক্তিজীবনকে প্রভাবিত করেনি। সংসারের মঙ্গলকামনায়, পরিবারের কল্যাণে যেকোনোরকম আপোষে বিশ্বাসী সনকা। এখানেই স্বামী চাঁদবণিকের সাথে তার ঠাণ্ডা লড়াই। চাঁদবণিক চায় যে তার সহধর্মিণী অন্তত তার আদর্শের সম্মান করুক, তার তীব্র কঠিন লড়াইয়ে সামিল হোক। কিন্তু তা তো হবার নয়। চাঁদের মতোন চিন্তার উচ্চক্ষমতা, আদর্শে অটল থাকার তীব্র সহ্যশক্তি, সততায় অকুণ্ঠ থাকার মানসিক জোর সনকার নেই। তাই সনকার একমাত্র কামনা—

"এ গৃহে কল্যাণ হোক, পাপ দূর হোক।
সর্ববিধ অমঙ্গল দূরীভূত হোক॥
স্বামীর মঙ্গল হোক, পুত্রের মঙ্গল।
লক্ষ্মীর প্রসাদে যাক সর্ব অমঙ্গল॥"

এমনকি মনসার পুজো করতে নারাজ স্বামী চাঁদবণিকের প্রতি সনকার ক্ষোভ সনকা আপন ভাষায় অকুণ্ঠ চিত্তে ব্যক্ত করেছে—".....আগুকার কথা হোল তুমি অহঙ্কারী। আপনার অহঙ্কার তোষণের তরে তুমি লড়াই করেছ। শিব সেথা উপলক্ষ্য মাত্র।" বস্তুত, চাঁদের কারণে সনকার পরিবার যে বিপন্ন এই বাস্তব সত্য সনকাকে কখনো কখনো সম্পূর্ণভাবে স্বামীবিরোধী অবস্থান নিতে সাহায্য করেছে। সনকার ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন এই যে তার সংসার যেন অটুট থাকে, মঙ্গল ও শান্তি যেন সর্বদা সংসারে থাকে। তাই স্বামীর জীবনদর্শন সনকার কাছে নিছকই চাঁদের অযথা অহঙ্কারের ক্ষেত্রমাত্র,—".....পত্নী বলো, পুত্র বলো, তোমার সংসার বলো,—সকলেরে সর্বদা তুমি তোমার গর্বের যূপকোষ্ঠে বলি দিয়্যা পাড়ি দিতে গেছ।" অথবা, ".....আদর্শ নিষ্ঠার অন্তরালে যে-মানুষ আছে, সেটা ওই অহঙ্কারী কুচরিত্র চাঁদসদাগর।"

বস্তুত চাঁদের লড়াই কঠিন থেকে কঠিনতর হয়েছে ঘরের প্রতিবন্ধকতায়, সনকার বিরোধিতায়। কিন্তু লখিন্দর ও বেহুলার আত্মাহুতির পর সনকা যখন সম্পূর্ণ একা হয়ে যায়, তখন তার কণ্ঠস্বরে সংসার বাঁচানোর প্রাণান্তকর ব্যর্থ চেষ্টার ক্লান্ত সুর শোনা যায়,—".....হায়, একী হোল সদাগর! তুমি শিবভক্ত, শিবপূজ্যা কর্য়া গেছ;—আমি তোমার বিরুদ্ধে মনসার পূজ্যা কর্য়া গিছি—শত্রু পরস্পর! তবু দেখ আজ দুজনাই বস্যা আছি অসার্থক জীবনের শটিত জঞ্জাল নিয়্যা। কেন ওই পরিণতি হোল সদাগর? তাইলে কি জীবনে কোথাও কোনো সত্য নাই?.....এট্টা কিছু কও সদাগর। তুমি ছাড়া আর আমার কেউ তো এখন নাই।"

অন্যদিকে বেহুলা যেন আধুনিক সময়ের প্রতিনিধি। বস্তুত এক সর্বব্যাপী আশ্বাসহীন, বিশ্বাসহীন ভয়ঙ্কর অন্ধকারে স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিমূর্তিরূপে চাঁদের যে ধ্বংসচিত্র আলোচ্য নাটকে চিত্রিত, সেখানে বেহুলা চরিত্রের উপস্থিতি যেন এই বাক্য উচ্চারণ করে, "জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণাধারায় এসো"। মনসামঙ্গালের আবহ থেকে সম্পূর্ণ

স্বতন্ত্র ভঙ্গিমাতে উপস্থিত বেহুলা। তাই বেহুলা আলোচ্য 'চাঁদবণিকের পালা' নাটকে নিছক লখিন্দরের স্ত্রী অথবা চাঁদবণিকের পুত্রবধূ হিসেবে উজ্জ্বল নয়। মনসামঙ্গাল কাব্যের বেহুলা যেখানে একমাত্রিক স্থিরকলা ভারতীয় আদর্শে পতিব্রতা নারীর পরিচয়ে অবগুণ্ঠিতা হিসেবে আমাদের দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যায়,—সেখানে আমাদের আলোচ্য 'চাঁদবণিকের পালা' নাটকের বেহুলা যেন আধুনিক সময়ের চিন্তা-ভাবনা সমৃদ্ধ উচ্চকণ্ঠ এক আধুনিক নারী। এক নিতান্ত আটপৌরে মধ্যবিত্ত পরিবারের শান্তিপূর্ণ জীবনের মধ্যমণি ছিল যে বেহুলা,—সে চাঁদবণিকের সংকটপূর্ণ জটিল ঘূর্ণাবর্তের সংসারে এসে নিজস্ব বিচারবোধের দ্বারা চালিত হয়েছে।

সেই কারণে বেহুলাকে বেহুলার শাশুড়ী সনকা যখন প্রাণাধিক লখিন্দরকে পিতার পথ অনুসরণে নিবৃত্ত করার আপ্রাণ চেষ্টায় বলে, "...এই বেরে পিতা তার যতো চেষ্টা পাক, লখাই তো আর কভু পাটনে যাবে না।—আজ রাতে এই কথা বুঝ্যায়ে সম্মত করো স্বামীরে তোমার। প্রতিজ্ঞা কর্যাবে—সর্বদা তোমারে যেন নিকটে-নিকটে রাখে।"—তখন বেহুলা উত্তর দে,—"কিন্তুক, চাঁদবণিকের বংশধরে আমি পাড়ি দেওনের পথে কেমনে মা বাধা দিব? সেইট্যা তো অন্যায় হবে।" বেহুলার এহেন উচ্চারণ যে পক্ষান্তরে চাঁদবণিকের লড়াইয়ের প্রতি তার সমর্থন ঘোষণা তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

আলোচ্য 'চাঁদবণিকের পালা' নাটকে চাঁদবণিক পাড়ি দিয়েছিল।—কিন্তু 'বহর' নিয়ে ফিরতে পারেনি। লখিন্দর তো পাড়ি দিতেই পারে না। শুধুমাত্র এক বালিকাবধূ, যার নাম বেহুলা, যার কপালে বাসরের সিঁদুর, সে কলার মান্দাসে পাড়ি দেয় এক অমোঘ-আত্মবিশ্বাসী উচ্চারণে,—

"স্বামীরে সঙ্গাতি লয়্যা ত্রিকাল জাগর হয়্যা—
জীয়নের মন্ত্র খুঁজে ফিরিবে অন্তর।
খুঁজিব কোথায়, কবে, এ বিষ নামিয়া যাবে
একেবারে সুস্থ হবে স্বামীর শিয়র।"

অবশেষে সেই বালিকাবধূ বিজয়িনী হয়ে চম্পকনগরীতে ফিরে আসে। যে জয়ের অভাবে চাঁদবণিক 'ইতহাস' থেকে স্থলিত হয়েছিল চম্পকনগরীতে,—সেই জয় এই বালিকাবধূ বেহুলা তার নির্বাচনের অধিকারে তুচ্ছ করে দেয়। বেহুলা তার সৎ দ্বিধা ও সৎ লজ্জা নিয়ে চাঁদবণিকের কাছে তাই বলে, "কতো গর্ব কর্যেছিনু মনে চাঁদবণিকের মতো বিরাট মানুষ আমার শ্বশুর হবে। আর তোমারি এ চিরজীবনের অটল প্রতিজ্ঞা ভ্যাঙ্গ্যায়েছি আমি। জীবনেতে কোন পথে চল্যা কোথায় যে পৌঁছ্যায় মানুষ (আবার কাঁদে)। শেষপর্যন্ত লখিন্দরের সাথে একযোগে বিষপানে বেহুলার আত্মবিসর্জন এ নাটকে সবচাইতে চমকপ্রদ ঘটনা। আত্মবিসর্জনের অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বেহুলা যেন তার শ্বশুরের ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে অন্যমাত্রায় পৌঁছে দেয়।

লখিন্দর : আমরা 'মনসামঙ্গাল' কাব্যে লখিন্দর চরিত্রের যে উপস্থিতি লক্ষ্য করি, তা নেহাৎ-ই নগণ্য। সেখানে লখিন্দর চাঁদবণিকের পারিবারিক বৃত্তের অন্তর্গত যেন এক উপেক্ষিত চরিত্র। এই চরিত্রের সেখানে কোনো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, ব্যক্তিপরিচয় তেমনভাবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি। আসলে 'মনসামঙ্গাল' কাব্যে লখিন্দর যেন এক বৃহত্তর অভিপ্রায় পূরণে 'উপলক্ষ্য' মাত্র। সেখানে লখিন্দরের সর্পদংশনে মৃত্যু ও বেহুলার দ্বারা কলার মান্দাসে ভেসে যাওয়া এটুকু ছাড়া লখিন্দরের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কোনো আলাদা পরিচয় নেই।

কিন্তু আলোচ্য 'চাঁদবণিকের পালা' নাটকে লখিন্দর চরিত্রকে সম্পূর্ণ অন্য মাত্রা দান করেছেন নাট্যকার শম্ভু মিত্র। লখিন্দর চরিত্রের ক্রমিক বিবর্তন ও পরিণতি লক্ষ্য করার মতো। সনকা চাঁদবণিকের প্রবল আদর্শনিষ্ঠতাকে সংসারের খাতিরে যেমন মেনে নিতে পারেনি, তেমনই প্রথমদিকে লখিন্দর তার পিতার কর্মকাণ্ডকে নিছক এক ব্যক্তির আপন

গোঁয়ার্তুমি হিসেবেই দেখেছিল। তাই সে পিতা চাঁদবণিককে প্রশ্ন করেছিল তীব্রভাবেই—"কেন তুমি এই পথ বেছ্যে নিয়্যেছিলে? ঘর পেলে? শান্তি পেলে? সমাজে সম্মান পেলে? উপরন্তু তোমার কারণে আমার মায়েরে কেন অপমান হতে হয়? মোরে কেন অপমান হতে হয়? তোমার এ উন্মত্ত আদর্শের দায়ে আমাদের সহজে বাঁচ্যার পথ কেন রুদ্ধ হয়?....."। লখিন্দরের এই উক্তি থেকেই প্রমাণিত যে প্রথমদিকে সে নিছক 'মায়ের ছেলে' হিসেবে আর পাঁচটা সাধারণ ছেলের মতোই পারিবারিক দুর্যোগে পিতাকে দায়ী করেছে। তাই লখিন্দরের উপরোক্ত অভিযোগের জবাবে যখন চাঁদবণিক বলতে চায়,—"..... লখিন্দর! অপরাধবোধ ঢোকাসনে অন্তরে আমার। তাইলে আমার সব শক্তি ভেঙে যাবে। আমি কোনো অপরাধ করি নাই।" পিতার এই জবাবে তখনও সন্তুষ্ট হয় না লখিন্দর। সে চাঁদের দিকে তাকিয়ে আঙুল তুলে প্রত্যেকটা কথাকে বিশিষ্ট করার মতো করে বলে—"নিজেরে যে মানুষের চায়্যা কিঞ্চিৎ বিরাট-আকৃতি বল্যে মনে কর্য়েছিলে এই অপরাধ। নাটুয়ার মতো রাজা সেজ্যে ভেব্যেছিলে সত্য বুঝি রাজা হয়্যা গেছ,—বিষ্ঠার ঢিবিতে খাড়া হয়্যা ভেব্যেছিলে ডিঙ্গি মেরে বুঝি আকাশটা ছুঁয়ে দেয়া যায়,—এই অপরাধ।.....এ তোমার পাপ। বুঝ্যেছ কি?—বোঝো আর নাই বোঝো, মানো বা না মানো, আমাদের সর্বনাশে দায়িত্ব তোমার। (ক্ষুব্ধ ব্যঙ্গে) হে পিতৃপুরুষ, তোমার এ আত্মঘাতী যজ্ঞের বহ্নিতে আমরা আহুতিমাত্র তোমার ও কৃতাঞ্জলিপুটে।"

পারিবারিক বিপর্যয়ে লখিন্দর যে কতটা বিপর্যস্ত তা তার উক্ত বক্তব্য থেকে আমরা বুঝতে পারি। এই লখিন্দর পিতার আজ্ঞাবহ মধ্যযুগীয় পুত্র সন্তান নয়। আধুনিক সময়ের সন্তান। তাই পিতার কারণে সংসারে যে বিপর্যয় তা পিতাকে সরাসরি জানাতে লখিন্দরের কোনো দ্বিধা নেই। নাট্যকার শম্ভু মিত্র অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই পুত্র লখিন্দরের ক্ষোভের প্রকাশ বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ লখিন্দর চরিত্রটি প্রথমাবধি ছাঁচে ঢালা চরিত্র নয়। তাই চরিত্রটির বিবর্তন লক্ষ্য করার মতো। ক্রমশ কালের অমোঘ নিয়মে লখিন্দর অনুভব করে যে পরিস্থিতির জন্য পিতাকে একা দায়ী করা ভুল হচ্ছে। পরিবারে-প্রতিবেশে-দেশে যে অদ্ভুত আঁধার নেমে এসেছে তার জন্যে তার পিতা দায়ী নয়। বরং পিতাও এই আঁধারের শিকার, তাই তিমিরবিনাশী হতে চেয়ে পিতা চাঁদবণিক পাড়ি দিতে চায়। লখিন্দর বুঝতে পারে যে তার পিতা চাঁদবণিক নিজ আদর্শে অবিচল থেকে পাড়ি দিতে চায় এটাই তার একমাত্র অপরাধ! তাই লখিন্দরের অকপট 'কনফেসন্' বা স্বীকারোক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য,—"আমারে মার্জনা কোরো। অকারণ বহু কটুকথা কয়্যেছি তোমারে। এতোদিন শুধু অপরে কী করে নাই তাই নিয়্যা অভিযোগ কর্য়া গেছি। ব্যঙ্গ কর্য়া কয়্যেছি যে, পিতৃপুরুষেরা অদ্ভুত পৃথিবী এক রেখ্যে গেছে আমাদের তরে।.....তুমি পুনর্বার পাড়ি দেও পিতা।"

'চাঁদবণিকের পালা' নাটকের দ্বিতীয়পর্বের শেষ দৃশ্যটি পিতা-পুত্রের আবেগঘন সংলাপে, আন্তরিক উচ্চারণে একেবারে অন্যতর। এখানেই মনসামঙ্গল কাব্যের লখিন্দর চরিত্রের তুলনায় আলাদা হয়ে যায় আমাদের আলোচ্য 'চাঁদবণিকের পালা' নাটকের লখিন্দর চরিত্র। তাই তাকে আমরা বলতে শুনি,—"পিতা,—আশৈশব কল্পনার পিতা তুমি,—বীর পিতা,—ধন্য লখিন্দর তুমি তার পিতা,—পাড়ি দেও পিতা। আমি অনুচর হয়্যা সাথে সাথে যাব। আমারে তোমার অনুচর কর্য়া নেও পিতা।" এই উক্তিতেই লখিন্দর হয়ে ওঠে সবার্থেই আধুনিক সময়ের পুত্র সন্তান। যুক্তির কষ্ঠিপাথরে পিতা চাঁদবণিকের কার্যক্রম বিশ্লেষণে লখিন্দরের কাছে এই সত্য ধরা পড়ে যে প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির (এখানে মনসা) অন্যায় আচরণে পিতা চাঁদবণিক প্রতিস্পর্ধী শক্তি হিসেবে বিরোধী হওয়ায় এই দুর্ভোগ। আধুনিক চিন্তার স্বচ্ছতায় লখিন্দরের কাছে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে যায় পিতার আদর্শায়িত পথ ও মনসার প্রতিবন্ধকতা। এরপরেই আলোচ্য নাটকে লখিন্দর-বেহুলার বাসরঘরের দৃশ্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। লখিন্দর তার বাসরশয্যায় নববধূর পাশে শুয়ে যে কথা উচ্চারণ করে, তা ক্রমশ আলোচ্য নাটকে লখিন্দরের জীবনে ধ্রুবপদ হোয়ে দাঁড়ায়,—".....জানো না কি চারিদিকে কতো হিংসা, কতো লোভ,—তুমি জানো না বেহুলা, জীবনের প্রতিযোগিতায় পদে-পদে এতো দ্বন্দ্ব, এতো গ্লানি, এতো কুটিলতা,—পৃথিবীর বুক থিক্যা এরা যেন 'প্রেম' অনুভবট্যারে নষ্ট কর্য়ে দিতি বদ্ধপরিকর। ঠিক। এবার বুঝ্যেছি আমি।

ইয়াদের সাথে ইয়াদের রণনীতি অনুসারে যুদ্ধ কর্য়ে জয়লাভ করণের আশাটাই ভ্রান্তপথ। তাতেই প্রথমে প্রেমট্যারে বলি দিতি হয়। কেননা যে জয়ী হতে হবে। যেকোনো উপায়ে তখন তো জয়লাভ করাটাই প্রধান কর্তব্য হয়। এইট্যাই ভ্রান্তপথ"। লখিন্দরের এই উক্তি গভীরতার জীবনবোধের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়! আলোচ্য নাটকে যে সংঘাতকে কেন্দ্র করে নাট্য কাহিনির বিস্তার। তাকে যেন চিহ্নিত করে দেয় লখিন্দর।

অতপর বাসরঘরে সর্পদংশনে লখিন্দরের মৃত্যু। মৃত লখিন্দরকে নিয়ে কলার ভেলায় বেহুলার যাত্রা, দেবদেবীদের সন্তুষ্ট করে লখিন্দরের প্রাণ নিয়ে বেহুলার ফিরে আসা এসবই মনসামঙ্গাল সূত্রে আমাদের অত্যন্ত পরিচিত ঘটনা। কিন্তু যে ঘটনা আমাদের জ্ঞানের অতীত তা হলো নতুন জীবন নিয়ে ফিরে আসা লখিন্দরের অন্যতর অনুভবের তীব্র প্রকাশ—".....আমারি কারণে মোর পিতা মনসার পূজা দিল, তার পাছে সসম্মানে বেঁচ্যে রব আমি? মনসার দোরে যায়্যা অসম্মানে ভিক্ষা কর্য়া তুমি ব্যাঁচালে আমারে,.....বাসরের রাত্রে একবার মনে হয়্যেছিল দুইজনা মর্য়ে যাই। বেহুলারে, আজ সেই বাসরের রাত হোক।.....কোন্ পরিচয় নিয়্যা লখিন্দর বেঁচ্যে রবে চাস তুই বল্?"

লখিন্দরের এই উক্তি এবং এর পরের ঘটনা নাট্যকার শম্ভু মিত্রের অনন্য সাধারণ ভাবনার প্রকাশ বলেই চিহ্নিত হয়। লখিন্দর তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আত্মহননে সামিল হয়। লখিন্দরের স্ত্রী বেহুলা-সহ আত্মহত্যা এক প্রবল প্রতিবাদ ও পিতার আদর্শে অটলভাবে নিজেকে ধরে রাখার আকুতি হিসেবে চিহ্নিত হয়।

অন্য একটি অপ্রধান চরিত্র : 'চাঁদবণিকের পালা' নাটকে অন্যান্য অপ্রধান চরিত্রগুলোর মধ্যে নিজগুণে বল্লভাচার্যের চরিত্রটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় চরিত্র। বল্লভাচার্য একদা চাঁদবণিকের শিক্ষাগুরু ছিলেন। তাঁর প্রতি চাঁদবণিকের ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। সেই শিক্ষাগুরু বল্লভাচার্য শেষপর্যন্ত অনন্যোপায় আপোষ করেছেন অন্যায়ের সাথে, অনাদর্শের সাথে,—মনসার রাষ্ট্রশক্তির সাথে। এই কারণেই চরিত্রটির গুরুত্ব আছে। নাট্যকার আলোচ্য নাটকে এমন এক সময়ের কথা বলতে চান, যেসময়ে বল্লভাচার্যের মতো মানুষ গড্ডালিকাপ্রবাহে প্রবল শক্তিধরের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য হয়। অন্যদিকে সেই প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি আপন কার্যসিদ্ধির অভিপ্রায়ে বল্লভাচার্যকে ব্যবহার করতে থাকে। তারই চমকপ্রদ নিদর্শন আলোচ্য নাটকের প্রথম পর্বে আমরা লক্ষ্য করি। এখানে বল্লভাচার্য রাজশক্তির প্রতিনিধিরূপে চাঁদবণিকের কাছে এসে বলেন,—".....চন্দ্রধর, এই অভিযান তুমি পরিত্যাগ করো।" তখন চাঁদ জবাবে বলে,—"কেন প্রভু? বেণীনন্দনের ডরে?" চাঁদবণিকের এই প্রশ্নের উত্তরে বল্লভাচার্য যা বলেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য,—".....বেণী নয় চন্দ্রধর, ঘটনার ডরে। জগতে এ যেন এক অন্ধকার অকাল নেম্যেছে, তারই ডরে। দেখোনা, জ্ঞানের সম্মান নাই, বিদ্যার মর্যাদা নাই, সুভদ্র আচার নাই, সুভাষণ নাই, মাংসসুখ ছাড়া অন্য কোনো সুখ-চিন্তা নাই,—ভুল্যে যাও, চন্দ্রধর, মহৎকার্যের কথা ভুল্যে যাও। শুধু কোনোমতে নিজেরে বাঁচেয়্যা রাখো। আদর্শের পাছে ছুট্যে কোনো লাভ নাই।"

বল্লভাচার্যের এই উক্তি এক লহমায় দেশ ও কালকে চিনিয়ে দেয়। বল্লভাচার্য আলোচ্য উক্তির মধ্য দিয়ে এই কথাই বলতে চান যে এক ভয়ঙ্কর সময় ও অবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছেন সকলে। এহেন অবস্থায় কোনোক্রমে বেঁচে থাকা-ই মানুষের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।—বল্লভাচার্যের কাছেও আজ একটাই লক্ষ্য, তা হলো বেঁচে থাকা। এই কারণে আদর্শপ্রিয় চাঁদবণিক যখন বল্লভাচার্যের ঐ উক্তিতে বিস্মিত হয়ে গুরুদেবের এমন পরিবর্তন না মানতে পেরে বলে যে সবকিছু সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত জীবনে সত্যের জয় অবশ্য, নিশ্চিত। তখন কিন্তু বল্লভাচার্য যা বলে তা সত্যই কালের অভিঘাতে পরিবর্তিত এক মানুষের কণ্ঠস্বর বলেই বোধহয়,—".....ইতিহাস খুল্যে দেখো, অবশেষে চিরকাল মিথ্যা জয়ী হয়্যা এল।" শুধু তাই নয়, বল্লভাচার্যের এহেন অদ্ভুত পরিবর্তন যে পরিবারকে বাঁচানোর জন্যে সেকথার উল্লেখ করেন বল্লভাচার্য। বস্তুত বল্লভাচার্যের চরম দারিদ্র্য, প্রাণাধিক পুত্র সূর্যের অকালমৃত্যু, পত্নীর দুরারোগ্য ব্যাধি তাঁকে রাজশক্তির সাথে অনন্যোপায় আপোষে বাধ্য করেছে। সেই কারণে নিজস্ব জীবনের উপলব্ধিতে বল্লভাচার্য বুঝেছেন যে তিনি ঘটনার দাসমাত্র, ঘটনা-ই নিয়তি। বল্লভাচার্যের এহেন নিরুপায় রূপান্তর যে বুকের ভিতরে বেদনার আগুন ধিকিধিকি জ্বালিয়ে

রেখেছে তার প্রমাণ পাই তাঁরই করুণ উচ্চারণে,—".....এ জীবন অর্থহীন। অর্থহীন জীবনের এই কালীদহে শুধু যেন ঘূর্ণাচক্র ঘোরে। সেই চক্রে সূর্য বলো, চন্দ্র বলো, তারা বলো, সব যেন বুদ্বুদের মতো মুহূর্তেই লুপ্ত হয়্যা যায়। সত্য শুধু অন্ধকার। মনসার সর্পিল আন্ধার। এই অভিযান তুমি ছেড়্যে দেও চন্দ্রধর, আদর্শের পাছে ছুট্যে কোনো লাভ নেই।"

বল্লভাচার্যের এহেন চরিত্রাঙ্কণে বস্তুত নাট্যকার আলোচ্য নাটকে চাঁদবণিকের লড়াই যে কতখানি দুর্বিষহ, কঠিন তা যেন চোখের সামনে জীবন্তভাবে দেখাতে চেয়েছেন। চাঁদের শিক্ষাগুরুর এহেন অনন্যোপায় পরিবর্তন সামাজিক পতনের করুণ চিত্রকেই উদ্‌ঘাটিত করেছে এখানে।

৮.৭ অনুশীলনী

১। 'চাঁদবণিকের পালা' নাটক কোন্ শ্রেণির রচনা?

২। চাঁদবণিকের পালা' নাটকে কোনো তত্ত্বভাবনা লুকিয়ে আছে কি? থাকলে তা আলোচনা করে বুঝিয়ে দিন।

৩। 'চাঁদবণিকের পালা' নাটকটি মধ্যযুগের কাহিনি নির্ভর অথচ আধুনিক—আলোচনা করুন।

৪। 'চাঁদবণিকের পালা' নাটকের নায়ক কে বিচার করুন।

৫। 'চাঁদবণিকের পালা' নাটকের সনকা-বেহুলা দুই বিপরীত আদর্শের প্রতীক—আলোচনা করুন।

৬। 'চাঁদবণিকের পালা' নাটকে নাট্যকার চাঁদ চরিত্রই শুধু নয়, অপ্রধান চরিত্র চিত্রণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।—আলোচনা করুন।

৮.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১। নাট্যভাষ : শম্ভু মিত্র।

২। কাকে বলে নাট্যকলা : শম্ভু মিত্র।

৩। শম্ভু মিত্র : নির্মাণ ও সৃজন : কুমার রায়।

৪। বাংলা নাটকে রবীন্দ্রনাথ, গণনাট্য ও শম্ভু মিত্র : অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়।

একক ৯ ❑ গল্প হেকিম সাহেব : মনোজ মিত্র

পর্যায় ঃ ৩ একক ঃ ৯

৯.১ ❑ নাট্যকার মনোজ মিত্র : জীবন ও সাহিত্যকৃতি

৯.২ ❑ মনোজ মিত্রের নাট্যকৃতি

৯.৩ ❑ মনোজ মিত্র রচিত অভিনীত নাটক

৯.৪ ❑ 'গল্প হেকিমসাহেব' নাটকের সংক্ষিপ্তসার

৯.৫ ❑ গল্প হেকিমসাহেবের নামকরণ

৯.৬ ❑ নাটকের চরিত্র বিশ্লেষণ

৯.৭ ❑ গল্প হেকিমসাহেবের সংলাপ ও ভাষা

৯.৮ ❑ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 'গল্প হেকিম সাহেব' সম্পর্কে নানা প্রতিক্রিয়া

৯.৯ ❑ গল্প হেকিম সাহেব : মঞ্চায়ন সম্পর্কিত তথ্যাবলী

৯.১০ ❑ প্রশ্নাবলী

৯.১১ ❑ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৯.১ নাট্যকার মনোজ মিত্র : জীবন ও সাহিত্যকৃতি

এ সময়ের অন্যতম প্রতিভাবান, শক্তিশালী ও জনপ্রিয় নট ও নাট্যকার মনোজ মিত্র। সাহিত্য জীবনের প্রথম দিকে গল্প লিখতে শুরু করেন। বসিরহাটের কাছে দণ্ডীরহাট স্কুলে এবং কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ার সময় গল্প লিখতেন। "বসুমতী", "ছোটদের পাঠশালা" 'মশাল' ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর গল্প ছাপা হতো। বন্ধুদের টাকায় প্রকাশ করেছিলেন 'অন্যলোক' নামে গল্প সংকলন। সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি। ভূমিকা লিখেছিলেন তৎকালীন সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে নাটক ও থিয়েটারে আত্মনিয়োগ করেন। অভিনয়, নির্দেশনা ও নাটক লেখা—এই তিনটি ক্ষেত্রেই তিনি সমান দক্ষ। শহর থেকে জেলা, গ্রাম থেকে নগরের গ্রাম সর্বত্রই তিনি প্রণম্য ও আদরণীয় হয়েছেন। দুর্দান্ত ও একাধিক উজ্জ্বল শ্রেণির নাটক লিখেছেন তিনি একাধারে সময়োপযোগী মঞ্চসফল ও জনপ্রিয় নাট্যকার। কলকাতা, মফস্বল, অভিজাত, পাড়ার সৌখিন নাট্যদল, দেশ-বিদেশের সর্বত্রই তাঁর জনপ্রিয়তার পারদ ঊর্ধ্বমুখী। বঙ্গদেশের প্রতিযোগিতামূলক নাট্যমঞ্চে তাঁর স্বীকৃতি পুরস্কারেই প্রকাশ হয়েছে।

মনোজ মিত্র জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৮ সালের ২২ ডিসেম্বর—অবিভক্ত বাংলাদেশের খুলনা জেলার

পুলিশ। মুলজা এখন আর হয়ে গিয়েছে। পার্থসারথি পাকড়াশীরা ভোলার দু-তিন কিলোমিটার দূরে ধুলিহর। বাবা অন্নোকদুলাল মিত্র ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। অবিভাজিত পর্ব রাজার ছিলেন আরবীয় সুরাবাসে। ১৯৪৩ সালে এসেসল এসে মহাকরণে প্রবেশ করেছিলেন। মা রাজরানী দেবী। তিন ভাই ও এক বোনের মধ্যে তিনিই বড়। বাবার চাকরিতে ঘন ঘন বদলি হওয়ায় ক্লাস সেভেন থেকে স্কুল জীবন শুরু হয়। এর আগে অবিভক্ত আসিরমণ্ডাই-এর আরাধ্যই পড়াশুনা করেছেন। দেশভাগের পর এসেসল এসে পরিবারটির থাকে বর্ধমানহাটি স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৫৪ সালে কলকাতার ঝাড়িল হার্ট কলেজে ভর্তি হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বর্ণপরে এম. এ. পাস করে (১৯৬৬) অধ্যাপনা জীবিকাকুলন চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে গবেষণা শুরু করেন। তাঁর অকাল প্রয়াণে ড. সাধন ঝট্টিয়ার্জের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাতত্ত্বে গবেষণা করতে পারেন। ড. ঝট্টিয়ার্জের প্রয়াণে প্রথমার মেধাপাড়ায় এসে পড়ে। ১৯৭১ সালের জানিয়ারি কলেজে বর্ণপরের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। তিন বছর পর ভর্তি আসেন প্রফুল্লদল কোপারায় করেছেন। ১৯৮৬ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিক নিয়োগে যোগ দেন। ১৯৯৪ সালে ঘরী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশির কুমার ভাদুড়ি অধ্যাপক পদ অলঙ্কৃত করেন। শিক্ষক হিসেবেও তিনি অসাধিক ছাত্রছাত্রীর ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও সম্মান আদায় করে নেন।

১৯৪৭ সালে পার্থসারথি চৌধুরির সঙ্গে বাড়ে যোগেন 'মুক্তধরা' পরিবার। এই সালে 'পাথর পাঁচালি' ও 'চিঠি' পরিকে অভিনয় করেন। তিনি তাঁর প্রথম পরিক 'মুক্তার চোখে জল' (একাঙ্ক) পরিকটি লেখেন ১৯৪৮ সালে। 'চিলেন পত্রাবলী' পরিকায় পরিকটি প্রথম প্রকাশিত হয় (১৯৬৬)। ১৯৪৯-৪ 'মুক্তধরা' পরিবারের। পরিকটির প্রয়োজন করেন প্রফুল্ল সরকার মুক্ত অনেক মুক্ত নিয়ের ভূমিকায় মুক্তার অভিনয় করেন। আগে সাদের অন্তর্ণ প্রদর্শনায় তাঁকে মুক্তা বলে মেনেই যায়নি। তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন বৃন্দা নীহার চরিত্রে বন্ধু মোজাম্মি। নির্দেশক পার্থসারথি চৌধুরী নিজু চরিত্রে অভিনয় করেন। এ পরিকে বৃন্দা অভিনয় ও বৃন্দা নীহারের জীবনের কাল পরিণতি দেখানো হয়েছে। মুক্তা অভিনয় জীবনে হয়। সময় হয়ে আসে মৃত্যুর। এ নিয়ে পরিবারের অন্যান্যদের কাছে আসে নানা কল্পনা ও. পরিক খুলতে হয়। তার মাঝি মালা যোগে স্ত্রী নীহার তার মুক্তে পরিচয়ের যোগ যোগে যেন আর বলে—'জীবনে তুমি অনিয়ে পাক করেছ, আমরা মুক্তাকে এ-ঘরে একলা রেখে আসি।' এই মুক্তার ও অভিনয় পরিবারিতে মুক্তার চোখে জল আসে। বিভিন্নর অভিনেতাদের 'মুক্তধরা' দল থেকে কয়েক বছর নির্মিত ছিলেন। শ্যামল যোগের 'সপরি' পরিবারে অন্ধ বারোকলিন অভিনয় করেন। আরণ্য অন্যান্যদের কাছে হয়ে যান রবিনিকেন্দ্র। ফলে কলকাতার সাথে আগের সঙ্গে সম্পর্কিক মুক্তার ঘটে। ১৯৬৪-৫৫ কলকাতার নিয়ে বাড়ে যোগেন নিজস্ব পরিবার 'অভাগর'। ১৯৬৫-৭০ পর্যন্ত এ সংস্থার পরিচালনা করেন। পার্থসারথি চৌধুরী 'মুক্তধরা' প্রকাশে অসমর্থ হলে পরের সমস্যাটি তিনি গ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সাল থেকে আজ অবধি তিনি 'মুক্তধরা' পরিবারের নট পরিচালনার ও নির্দেশক। অভাগর ও মুক্তধরে নিয়ে আসার আগে তাঁর লেখা 'অভাগর' (১৯৬৩), 'অভাগরে মধু' (১৯৬৯), 'অভাগ মুলাকার' (১৯৭৫) পরিক সাফল্যের আগে নিয়েছিল বর্ণপরিচয়। 'অভাগর' ও 'অভাগ মুলাকার'-এর পরিচালনা অভিনয়ে তিনি আগে নিয়েছিলেন। তাঁর নিজের ভাষায়—"১৯৭৫ সালে আমার

'মুখরস'-এ ফিরে আসি। আরণ্যক থেকে এখন পর্যন্ত মুখরসেই কাজ করছি। আরাধন এবং মুখরসে গিয়ে আমার মঞ্চাভাবে 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ'-এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল নাটক নিয়ে। তারপর আমি 'চাকভাঙা মধু' নামে নাটকটি নিয়েছিলাম। আমি কখনও থিয়েটার ওয়ার্কশপ-এর সদস্য হইনি। তবে 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ'-এ একটি-দুটি নাটকে আমি অভিনয় করেছি। যেমন 'অন্ধযাদব', 'অনেক ঘুমঘোর'-এ অল্প কয়েকটি শো-তে অভিনয় করেছিলাম সেটা নিতান্তই বন্ধুত্বের কারণে—সেটা ঠিক অর্থের সঙ্গে থিয়েটার করার জন্য নয়।" (লেখকদের সেবন্তী ঘোষচৌধুরী, 'অন্যঅভিনয়' ত্রৈমাসিক পত্রিকা, আগস্ট ২০০৬)

'আরাধন' নাট্যদলে নিয়মিত লেখা নাটকে যেসব অভিনয় করেছেন, নির্দেশনা দিয়েছেন, পাশাপাশি যেহিত মট্টোপাধ্যায়ের 'পশ্চাদ্ধাবনের ব্যাকরণটি' (১৯৯৯) নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন। থিয়েটার ওয়ার্কশপ ছাড়া 'পশ্চর্ণ', 'মধুকরণী', 'অভিযুক্তরা' 'অন্ধাদলাদি', 'সবচা থিয়েটার' এর মতো অভিনীত নাট্যদলগুলি তাঁর নাটক মঞ্চস্থ করেছে। মফস্বলের অনেক নাট্যগোষ্ঠী তাঁর লেখা পুরস্কার ও একক নাটক মঞ্চস্থ করেছে। এই মুহূর্তে মিনার্ভা রেপার্টরি থিয়েটার গ্রুপের মট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় তাঁর লেখা 'শেষী সর্বনাশ' মঞ্চস্থ করছে। তাঁর মল 'মুখরস' মঞ্চস্থ করছে 'অতীন বাড়ুনি' তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য পূর্ণদৈর্ঘ্য নাটকগুলি হল 'অন্ধযাদব', 'অন্ধযাদব মধু', 'চেনাযাদব চেনাযাদব' 'নরকাদব', 'শিবের অসাধ্য', 'একক পুনরাদব', 'সাজানো বাগান', 'নাচাড়ী শিবে', 'পশ্চাদ্ধি', 'রাজনর্তক', 'টিনের চোরা', 'বিন্দু বাহাদুরের খেটাল', 'আলাপচারিতার পুরুষদল', 'দুটি রাজাদল', 'চৌরাস্তায়', 'দর্শনে শাসনশর্ত', 'গল্প হেরিফ যাহের', 'শেষী সর্বনাশ', 'ছায়ার রাজ্যে', 'অসমাপ্তিটা', 'দুটি ও সকল ট্রেটিকিলস', 'আলাদাদল চেনাযাদব', 'অন্যের ছবি', 'যা নেই আমাদের', 'আদ্যোপান্ত অন্ধুটিনি' ইত্যাদি। একাঙ্ক নাটকগুলির মধ্যে 'মুদুর হোপে জল', 'শাখি', 'টিপুর টুপুর', 'চশমা', 'আলবিদাদ', 'আমি তখন বলছি', 'আদালত পঞ্চায়েত', 'হোপে আদুল রাত', 'হেঁটুল বাবু', 'সন্ধ্যারাগ', 'সমিতি ভুতের গল্পে' 'বাদুরের হোপদুপুরে', 'একক প্রতিভ', 'আদে বিপাকে', 'অন্তর্দিন্দ্ব', 'রাজার সোটি রাজার পিটে', 'বাঁশি পাগল', 'চমৎকুমার', 'আদাদে বাদুরের', 'পশ্চাদ্ধাবন', 'আলবি আলবি', 'ঔরঙ্গাব' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাঁর লেখা 'আরাদো বাগান' নাটক 'পাশ্চাত্যাদের বাগান' নামে চলচ্চিত্রায়িত হয়ে বীরণ অন্তর্দিয়তা লাভ করেছে। এছাড়া 'চেনাযাদব চেনাযাদব' 'একক পুনরাদব', 'পশ্চাদ্ধি', 'দুটির রাজাদল' নাটকগুলির চলচ্চিত্রায়ণ হয়েছে। চলচ্চিত্র ও দূরদর্শনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান অভিনেতা হিসেবে দর্শকের মন জয় করে নিয়েছেন। যেমন বিন্দু বিজনেস নিয়েছেন। যেমন তাঁর নাটক 'পশ্চাদ্ধি' অবলম্বনে 'আরোদাদ', 'চেনাযাদব চেনাযাদব', 'আদে একটি ট্রিপলটি', 'দুটির রাজাদল' এবং পরমাদরের কাহিনী অবলম্বনে 'অনুরাধা', অনন্ত সিনেমের কাহিনী নিয়ে 'ঝিনচুপি', শিবরাত্রের গল্প নিয়ে 'হর্ষবর্ধন আবার বর' ইত্যাদি। লেখাদের তাঁর রচিত ও অভিনীত নাটক প্রচুর পরিদেশিত হয়েছে। তাঁর রচিত নাটক ইংরেজি, হিন্দি, অসমিয়া, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী ইত্যাদি ভাষায় অনুদিত হয়েছে। তাঁর লেখা গ্রন্থগুলি হল 'আধীক পুনরি রচনা', 'পাশ্চাত্যাদ থিয়েটার নিদেশনায়', 'অনেক কথা নাটিকাকার', 'অভিনয় নিয়েই কথোপকথন আদে' (ত্রৈমাসিক অনন্ত নিয়ের সঙ্গে একত্রে কথা-টিকোপাদের সূচিকথন), 'আদে নাটি 'আরাদো বাদি নিকেতন' ইত্যাদি। কারাদের স্বীকৃতি স্বরূপ লেখাদের আকৃকারাদের নাটিকা প্রবন্ধ মেলি নাটিকার হিসেবে নিরীশিতরূপ পুরস্কার (১৯৭৮), মেলি অভিনেতার জন্য বিন্দু লেখার পুরস্কার (১৯৮০), শশিভূষণ স্মারকাদের

শ্রেষ্ঠ নাট্যকার পুরস্কার (১৯৮২ ও ১৯৮৩), সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার (১৯৮৫), পশ্চিমবঙ্গ সরকার জাতীয় পুরস্কার (১৯৯১), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ নাট্যকার পুরস্কার (১৯৮৬), সত্যেন মিত্র পুরস্কার (...), এশিয়াটিক সোসাইটি প্রদত্ত স্বর্ণপদক পুরস্কার (২০০৫) ইত্যাদি। বর্তমানে তিনি পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সভাপতির পদে আসীন। চুয়াত্তর বছর বয়সেও থিয়েটারের নানা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। বিগত পঞ্চাশ বছর থিয়েটারের জগতে তিনি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছেন।

৯.৫ মনোজ মিত্রের মানসভূমি

মনোজ মিত্রের নাট্যভূমির কথা উল্লেখিতে যে অমিল আছে তার মূল উৎসস্থল সরলতা। অমিলের সরলতা বাংলার তাঁর নাটক কিছু অভিনবত্ব নয়। দেশ, কাল, ইতিহাস, সমাজ, ব্যক্তি সবকটি, অবহেলা সবই তাঁর নাটকে আলোড়িত। জীবন যেন এক যুগপৎ, মানসিক সম্পর্কগুলি যেন ভেঙে পড়ছে, কোথাও হয়েছে মানসিকতার ইত্যাদি প্রশ্নগুলি তাঁর নাটকে বার বার উঠে এসেছে। তাঁর নাটকে কখনো, প্রতীক, সহজেই ব্যবহারে আধুনিক ও মানসিক অবস্থান হয়ে ওঠে। এগুলির মাধ্যমে তিনি নতুন চেতনার পরিচয় প্রদান করেন। মেদিনী মানুষ ব্যক্তি বিশেষের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, ভালোবাসা, হিংসা, ক্রোধ ও ক্ষোভ সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে তাঁর, ঈর্ষা ও প্রেমের মাধ্যমে। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্য সমালোচক মতে 'মনোজ একটি গল্প নানা দেশকালে-সমাজে, লোককথা-পুরাণে, অতীত ইতিহাসে, এবং নানা মেজাজে—কান্নায়, হাসে, কৌতুকে, অকল্পিত হাস্য-লাস্যে করতে গিয়ে যেন নিজেকে বারবার নির্দিষ্ট হবার চেষ্টা করেন, নিজেকে বিস্তারিত করেন' নাট্যকার মনোজ মিত্র ভূমিকা নাটক সমগ্র (১ম খণ্ড)। মনোজ মিত্র নিজেই তাঁর সম্পর্কে বলেছেন—'আমি এই মুহূর্তে একটি নিরালম্ব অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখতে চাই, যেটা হলো টান মানুষ, দুর্বল মানুষ, অসহায় এবং লাঞ্ছিত মানুষ যার হিংসা আর দুর্বলতা, আর ভয়, ঘৃণা, সবার সাথে মানুষের মতো উঠে দাঁড়াচ্ছে। এতদিনে যে কোন শরীরের মধ্যে আমি এই মানুষকেই খুঁজি, মানুষের এই সত্তাকেই পেতে চাই।' এই বোধের মধ্যে অতিরেক দাঁড়াবার নেই, প্রেমাবেগের আতিশয্য নেই, আছে সমাজের বাস্তবতার আবেগ। তাঁর নাটকে যে কৌতুকের ছোঁয়া থাকে সেটি কৌতুকের চেয়ে খুনসুটির মতন মনে হয়। এর একটি অদ্ভুত রসায়ন আছে। খুনসুটি রসিকতা দুঃখ ভুলে থাকার বা কিছু সময়ের প্রকাশ করে। কখনও কখনও বিদ্রূপের ঝলক দেখা যায়। খুনসুটি মানুষ জটিল পরিস্থিতির মধ্যেও রসিকতা করতে জানেন। 'সাজানো বাগান'-এর বাঞ্ছারাম থেকে 'পাখনা'-এর পুষ্প, অথবা 'নৈশভোজ'-এর প্রেমিক সকলেই যেন খুনসুটির আনন্দেই গড়া। নাটকে সংলাপের ব্যবহার কত বুদ্ধিদীপ্ত হতে পারে, কত নিখুঁত হতে পারে তা তিনি দক্ষতার সঙ্গেই দেখিয়েছেন। ফলে নাট্যকার মনোজ মিত্র রাজনৈতিক দর্শক-পাঠকের মন সহজেই জয় করে নিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি অনন্যই অধিকারী, বলা যেতে পারে অপ্রতিরোধ্য।

৯.৬ মনোজ মিত্র রচিত অভিনীত নাটক

'মৃত্যুর চোখে জল (এ)'	১৯৫৮
পাখি (এ)	১৯৬০
নীলকণ্ঠের বিষ	১৯৬০
মোরগের ডাক	১৯৬১
[illegible]	১৯৬২
[illegible]	১৯৬৩
[illegible]	১৯৬৩
[illegible]	১৯৬৪
[illegible]	১৯৬৪
[illegible]	১৯৬৫
[illegible] (এ)	১৯৬৬
[illegible]	১৯৬৬
টাপুর টুপুর (এ)	১৯৬৭
[illegible] (এ)	১৯৬৭
[illegible] (এ)	১৯৬৮
চাকভাঙা মধু	১৯৬৯
কেনারাম বেচারাম	১৯৭০
[illegible]	১৯৭০
[illegible] (এ)	১৯৭০
[illegible] (এ)	১৯৭১
আমি মদন বলছি	১৯৭২,
নরক গুলজার	১৯৭৪
[illegible] (এ)	১৯৭৪
[illegible]	১৯৭৪
চোখে আঙুল দাদা (এ)	১৯৭৫
[illegible]	১৯৭৬
সাজানো বাগান	১৯৭৬
[illegible]	১৯৭৮
দম্পতি	১৯৭৮
[illegible] (এ)	১৯৭৯
মেষ ও রাক্ষস	১৯৭৯
[illegible] (এ)	১৯৭৯
[illegible] (এ)	১৯৮০
রাজদর্শন	১৯৮১
[illegible] (এ)	১৯৮১
[illegible] (এ)	১৯৮১
[illegible] (এ)	১৯৮২
[illegible]	১৯৮২
[illegible] (এ)	১৯৮৩
[illegible]	১৯৮৪
[illegible] (এ)	১৯৮৫
[illegible] (এ)	১৯৮৫
[illegible] (এ)	১৯৮৬
[illegible] (এ)	১৯৮৬
অলকানন্দার পুত্রকন্যা	১৯৮৮
কিনু কাহারের থেটার	১৯৮৮
[illegible] (এ)	১৯৮৮
[illegible]	১৯৮৮
পুঁটি রামায়ণ	১৯৮৯
[illegible] (এ)	১৯৮৯
[illegible] (এ)	১৯৯০
শোভাযাত্রা	১৯৯০
[illegible] (এ)	১৯৯১
দর্পণে শরৎশশী	১৯৯১
গল্প হেকিম সাহেব	১৯৯২
[illegible] (এ)	১৯৯২
[illegible] (এ)	১৯৯২
[illegible] (এ)	১৯৯৩

[illegible] (এ)	১৯৯৩	[illegible]	২০০৬
[illegible] (এ)	১৯৯৪	[illegible] (এ)	২০০৬
আত্মগোপন	১৯৯৪	[illegible] (এ)	২০০৬
দেবী সর্পমস্তা	১৯৯৪	[illegible] (এ)	
ছায়ার প্রাসাদ	১৯৯৭	[illegible] (এ)	
[illegible]	১৯৯৮	ভেলায় ভাসে সীতা	২০০৭
[illegible]	২০০০	[illegible] (এ)	২০০৮
মুন্নি ও সাত চৌকিদার	২০০১	[illegible]	২০০৮
[illegible]	২০০১	[illegible]	২০০৯
[illegible] (এ)	২০০২	[illegible] (এ)	২০০৯
[illegible]	২০০২	[illegible] (শিশুদের জন্য)	
[illegible] (এ)	২০০২	[illegible] (শিশুদের জন্য)	
[illegible]	২০০৪	[illegible]	২০১০
[illegible] (এ)	২০০৪	[illegible]	২০১১
[illegible]	২০০৪	[illegible] (এ)	২০১১
যা নেই ভারতে	২০০৫	[illegible] (এ)	২০১১

সুন্দরম নাট্যদলে মনোজ মিত্র রচিত, অভিনীত ও নির্দেশিত নাটক

[illegible] : অভিনীত ; নির্দেশনা — পার্থপ্রতিম চৌধুরী;
[illegible] : অভিনীত; রচনা—[illegible]; নির্দেশনা—পার্থপ্রতিম চৌধুরী
মৃত্যুর চোখে জল (১৯৫৯); রচিত; অভিনীত; নির্দেশনা—পার্থপ্রতিম চৌধুরী
নীলকণ্ঠের বিষ (১৯৬০); রচিত; অভিনীত; নির্দেশনা—পার্থপ্রতিম চৌধুরী
[illegible] (১৯৭৪); রচিত; অভিনীত; নির্দেশিত
সাজানো বাগান (১৯৭৭); রচিত; অভিনীত; নির্দেশিত
মেষ ও রাক্ষস (১৯৭৯); রচিত; অভিনীত; নির্দেশিত
[illegible] (১৯৮১); রচিত; অভিনীত; নির্দেশনা—[illegible]
[illegible] (১৯৮৩); রচিত; অভিনীত; নির্দেশিত
অলকানন্দার পুত্রকন্যা (১৯৮৬); রচিত; অভিনীত; নির্দেশিত
শোভাযাত্রা (১৯৯১); রচিত; অভিনীত; নির্দেশিত
গল্প হেকিমসাহেব (১৯৯৪); রচিত; অভিনীত; নির্দেশিত
ছায়ার প্রাসাদ (১৯৯৭); রচিত; অভিনীত; নির্দেশিত

[illegible] (এ) (২০০০); রচিত; অভিনীত; নির্দেশনা—বিমল দাস
[illegible] (এ) (২০০০); রচিত; অভিনীত; নির্দেশনা—বিমল দাস
মুন্নি ও সাত চৌকিদার (২০০১); রচিত; অভিনীত; নির্দেশিত
অপারেশন ভোমরাগড় (২০০৫); রচিত; অভিনীত; নির্দেশিত
সাজের বাতি (২০০৬); রচিত; অভিনীত; নির্দেশিত
যা নেই ভারতে (২০০৯); রচিত; অভিনীত; নির্দেশিত

অন্যান্য নাট্যদলে মনোজ মিত্র রচিত, অভিনীত ও নির্দেশিত নাটক

অবসন্ন প্রজাপতি (১৯৫৫); রচিত; অভিনীত; নির্দেশিত
মৃত্যুর চোখে জল (১৯৫৯); রচিত; অভিনীত; নির্দেশিত
[illegible] (১৯৬৭); রচিত; অভিনীত; নির্দেশিত
[illegible] (১৯৬৬); রচিত; অভিনীত; নির্দেশিত
নীলা (১৯৭০); রচিত; অভিনীত; নির্দেশিত
[illegible] (১৯৬৬); রচিত; অভিনীত; নির্দেশিত
[illegible] (১৯৬৬)— রচনা : [illegible], নির্দেশনা—সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিনীত
[illegible] (১৯৬৮); রচিত; অভিনীত; নির্দেশিত
[illegible] (১৯৬৬); রচনা ; মোহিত চট্টোপাধ্যায়, অভিনীত ও নির্দেশিত

সুন্দরম ও অন্যান্য নাট্যদল ব্যতীত অন্য দলে মনোজ মিত্র রচিত, অভিনীত ও নির্দেশিত নাটক

অশ্বত্থামা—রচিত ও অভিনীত, নির্দেশনা—বিভাস চক্রবর্তী, দল : থিয়েটার ওয়ার্কশপ
নরক গুলজার—রচিত ও অভিনীত; নির্দেশনা—বিভাস চক্রবর্তী; দল : থিয়েটার ওয়ার্কশপ
(তিনটি শো-এ অভিনয় করেন)
[illegible]—রচিত, অভিনীত ও নির্দেশিত; দল : [illegible]

মনোজ মিত্র অভিনীত চলচ্চিত্র

ছবি	প্রকাশকাল	পরিচালক	ছবি	প্রকাশকাল	পরিচালক
			ঘরে বাইরে	১৯৮৪	সত্যজিৎ রায়
			[illegible]	১৯৮৪	অঞ্জন চৌধুরী
বাঞ্ছারামের বাগান	১৯৮০	তপন সিংহ	বৈদুর্য রহস্য	১৯৮৫	তপন সিংহ
আদালত ও একটি মেয়ে	১৯৮২	তপন সিংহ	আতঙ্ক	১৯৮৬	তপন সিংহ
[illegible]	১৯৮২	উৎপলেন্দু চক্রবর্তী	[illegible]	১৯৮৬	[illegible]
গৃহযুদ্ধ	১৯৮৩	বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত	[illegible]	১৯৮৬	[illegible]
শত্রু	১৯৮৪	অঞ্জন চৌধুরী	[illegible]	১৯৮৬	[illegible]
[illegible]	১৯৮৪	[illegible]	আগুন	১৯৮৮	[illegible]

ছবি	প্রকাশকাল	পরিচালক	ছবি	প্রকাশকাল	পরিচালক
[illegible]	১৯৮৮	[illegible]	[illegible]	১৯৯৭	[illegible]
[illegible]	১৯৮৯	[illegible]	[illegible]	১৯৯৭	রাজা সেন
[illegible]	১৯৯০	[illegible]	[illegible]	১৯৯৭	স্বপন সাহা
[illegible]	১৯৯০	[illegible]	[illegible]	১৯৯৭	স্বপন সাহা
[illegible]	১৯৯০	[illegible]	[illegible]	১৯৯৭	[illegible]
[illegible]	১৯৯১	[illegible]	[illegible]	১৯৯৭	[illegible]
[illegible]	১৯৯২	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	১৯৯২	[illegible]	[illegible]	১৯৯৮	[illegible]
প্রেম পূজারী	১৯৯২	[illegible]	[illegible]	১৯৯৮	স্বপন সাহা
[illegible]	১৯৯২	[illegible]	[illegible]	১৯৯৮	[illegible]
[illegible]	১৯৯৩	[illegible]	[illegible]	১৯৯৮	[illegible]
[illegible]	১৯৯৩	[illegible]	[illegible]	১৯৯৯	[illegible]
[illegible]	১৯৯৪	[illegible]	[illegible]	২০০৭	[illegible]
[illegible]	১৯৯৪	[illegible]	[illegible]	২০০৭	[illegible]
[illegible]	১৯৯৪	[illegible]	[illegible]	২০০৭	
[illegible]	১৯৯৪	[illegible]	[illegible]	২০০৮	রাজা সেন
[illegible]	১৯৯৫	[illegible]	[illegible]	২০০৮	[illegible]
[illegible]	১৯৯৫	হরনাথ চক্রবর্তী	[illegible]	২০০৯	[illegible]
[illegible]	১৯৯৫	[illegible]	[illegible]	২০০৯	
[illegible]	১৯৯৫	[illegible]	তুমি যদি আমার হতে	২০০৯	
[illegible]	১৯৯৫	[illegible]	[illegible]	২০১০	[illegible]
[illegible]	১৯৯৬	[illegible]			[illegible]
[illegible]	১৯৯৬	[illegible]	[illegible]	২০১০	
[illegible]	১৯৯৬	[illegible]	[illegible]	২০১০	রাজা সেন
[illegible]	১৯৯৬	[illegible]	[illegible]	২০১০	[illegible]

মনোজ মিত্র অভিনীত দূরদর্শন ধারাবাহিক

[illegible]

মনোজ মিত্র অভিনীত টেলিফিল্ম

[illegible]

মনোজ মিত্র রচিত চিত্রনাট্য

চিত্রনাট্য		পরিচালক
অনুরাধা	কাহিনি : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	দিলীপ মুখোপাধ্যায়
কেনারাম বেচারাম	মনোজ মিত্র রচিত নাটক অবলম্বনে	অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়
শিবদুর্গা	কাহিনি : অমল মিত্র	রাজা সেন
দৌহিত্রের ঘর	কাহিনি : সমরেশ মজুমদার	রাজা সেন
কুমির হাতাহাতি	মনোজ মিত্র রচিত নাটক অবলম্বনে	দুলাল লাহিড়ী
ভালোবাসা	মনোজ মিত্র রচিত নাটক 'দম্পতি' অবলম্বনে	শমিত ভঞ্জ
হর্ষবর্ধন অ্যান্ড দল	শিবরাম চক্রবর্তীর কয়েকটি ছোটোগল্পের সূত্র ধরে	
আরো একটি চিত্রনাট্য	মনোজ মিত্র রচিত নাটক অবলম্বনে	

মনোজ মিত্র রচিত যে নাটকগুলির চলচ্চিত্রায়ণ হয়েছে

সাজানো বাগান, কেনারাম বেচারাম, নরক গুলজার, দম্পতি, কুমির হাতাহাতি

দূরদর্শনে মনোজ মিত্র রচিত যে নাটকগুলি পরিবেশিত হয়েছে

পাখি—নির্দেশনা : তুষি মিত্র, প্রযোজনা : বিভাস চক্রবর্তী
মনা ডাক্তার — ধারাবাহিক রূপে, প্রযোজনা : সুব্রত মুখোপাধ্যায়
কাকচরিত্র, টিপুস টুপুস, নন্দনকানন

আকাশবাণীতে পরিবেশিত মনোজ মিত্র রচিত ও অভিনীত বেতার নাটক

চোখে আঙুল দাদা—রচনা : প্র. না. বি.; অভিনয় : মনোজ মিত্র; প্রযোজনা : জগন্নাথ বসু
(নামটি প্র. না. বি.-র দেওয়া। সেটি ছিল অন্য গল্প। মনোজ মিত্র একটি নাটক লিখে ওই নামটি ব্যবহার করেন)

কুকুর থেকে জল—রচনা : মনোজ মিত্র; প্রযোজনা : জগন্নাথ বসু, পরিবেশনায় : রূপকার
পাখির চোখ—রচনা : মনোজ মিত্র; প্রযোজনা : জগন্নাথ বসু, পরিবেশনা : রূপকার
সহধর্মিণী—রচনা : নরেন্দ্রনাথ মিত্র; অভিনয় : মনোজ মিত্র, প্রযোজনা : জগন্নাথ বসু
আকাশ টুকরো—রচনা : মনোজ মিত্র, প্রযোজনা : ড. দীপক চন্দ্র পোদ্দার
কুমির হাতাহাতি— রচনা : মনোজ মিত্র; প্রযোজনা : সুব্রত মজুমদার
ইন্দিরা—রচনা : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়; অভিনয় : মনোজ মিত্র, প্রযোজনা : অরবিন্দ পণ্ডিত
একা একা—রচনা : বিমল কর, অভিনয় : মনোজ মিত্র, প্রযোজনা : অজিত মুখোপাধ্যায়
আরো একটি চিত্রনাট্য—রচনা : মনোজ মিত্র; প্রযোজনা : সুব্রত মজুমদার
কাকচরিত্র (এ)—রচনা : মনোজ মিত্র; প্রযোজনা : জগন্নাথ বসু
আবার ফিরে এসো—রচনা : মনোজ মিত্র; প্রযোজনা : সুব্রত মজুমদার

টাপুর টুপুর—রচনা : মনোজ মিত্র; পরিবেশনায় : সুন্দরম
অলীক সুনাট্য রঙ্গে—রচনা : মনোজ মিত্র; পরিকল্পনা ও প্রযোজনা : [illegible]
দর্পণে শরৎশশী—রচনা : মনোজ মিত্র; পরিবেশনা : প্রতিকৃতি
[illegible] — রচনা : মনোজ মিত্র
কেনারাম বেচারাম—রচনা : মনোজ মিত্র
[illegible]—রচনা : মনোজ মিত্র
রাজদর্শন—রচনা : মনোজ মিত্র; পরিবেশনা : বহুরূপী
[illegible]—রচনা : মনোজ মিত্র; একক অভিনয় : [illegible] (সামগ্রিকভাবে পরিবেশিত)
[illegible]—রচনা : মনোজ মিত্র; (সামগ্রিকভাবে পরিবেশিত)
[illegible] — রচনা : মনোজ মিত্র
[illegible] — রচনা : মনোজ মিত্র
[illegible] — রচনা : মনোজ মিত্র
মেষ ও রাক্ষস — রচনা : মনোজ মিত্র
পরবাস — রচনা : মনোজ মিত্র
গল্প হেকিম সাহেব — রচনা : মনোজ মিত্র
চাক ভাঙা মধু — রচনা : মনোজ মিত্র ; পরিবেশনা : থিয়েটার ওয়ার্কশপ
অশ্বত্থামা — রচনা : মনোজ মিত্র ; পরিবেশনা : থিয়েটার ওয়ার্কশপ
[illegible] — রচনা : মনোজ মিত্র ; আকাশবাণী পরিবেশিত

আকাশবাণীর জন্য লেখা আরও নাট্যরূপ

[illegible] — কাহিনি : [illegible]
[illegible] — কাহিনি : নরেন্দ্রনাথ মিত্র
এছাড়া নরেন্দ্রনাথ মিত্রের আরও তিনটি গল্প-এর নাট্যরূপ
[illegible] — কাহিনি : গজেন্দ্রকুমার মিত্র
[illegible] — কাহিনি : অন্নদাশঙ্কর রায়
[illegible] — কাহিনি : শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
[illegible] — কাহিনি : সুবোধ ঘোষ

এছাড়াও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, [illegible], বাণী বসু ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এর গল্প-র নাট্যরূপ দেন মনোজ মিত্র।

মনোজ মিত্র রচিত অন্য ভাষায় অনূদিত নাটক

ইংরাজি-অনুবাদ

সাজানো বাগান (Banchharam's Orchard — Seagull)

রাজদর্শন (Encounter with the King — Seagull)
ছায়ার প্রাসাদ (Palace in the shadows — Seagull)
গল্প হেকিম সাহেব (A Tale of Hakim Saheb — Seagull)
চাক ভাঙা মধু (Honey from the Beehive — Seagull)
প্রভাত ফিরে এসো (Come back Provat — Translated by Ajit Kumar Ghosh — Sahitya Academi)
দুই বিন এখান (Two in One — Translated by Ashok Mukhopadhyay

হিন্দি অনুবাদ

বৃষ্টির ছায়াছবি : এক বুন্দকী বাত
প্রভাত ফিরে এসো : লৌটি আও প্রভাত
অলকানন্দার পুত্রকন্যা : অলকানন্দা কে বালবাচ্চে; অনুবাদ : [illegible]
কেনারাম বেচারাম : কেনারাম বেচারাম
গল্প হেকিম সাহেব : কিস্‌সা হকিম সাহেব কা; অনুবাদ : সান্ত্বনা নিগম
চাক ভাঙা মধু : মধুমক্ষী গীত ; অনুবাদ : নূর জহীর
[illegible] : [illegible]
[illegible] : [illegible] ; অনুবাদ : [illegible]
দম্পতি : বীবী বেগম ; অনুবাদ : সান্ত্বনা নিগম
সাজানো বাগান : বাগিচা বাঞ্ছারাম কী
মেষ ও রাক্ষস
কুকুর ঢোকা বারণ
রাজদর্শন : রাজদর্শন ; অনুবাদ : প্রতিভা অগ্রবাল

অসমীয়া অনুবাদ

কেনারাম বেচারাম
সাজানো বাগান

ওড়িয়া অনুবাদ

কেনারাম বেচারাম
মেষ ও রাক্ষস

পাঞ্জাবি অনুবাদ

কুকুর ঢোকা বারণ

তামিল অনুবাদ

মৃত্যুর চোখে জল

মণিপুরী অনুবাদ

সাজানো বাগান

মনোজ মিত্র রচিত গ্রন্থ

অলীক সুনাট্য রঙ্গে। নিবন্ধ গ্রন্থ ১৯৮৪

বাঞ্ছারাম : থিয়েটার থিয়েটার

মনের কথা নাট্যকথা, প্রকাশক : আজকাল

অভিনয় থিয়েটারি কথোপকথন (মেঠোবাড়ি আমার মিত্রের সঙ্গে একত্রে নাট্য-উৎপলের স্মৃতিকথা)

যাত্রা নাট্য : যাত্রামো গতি নিয়ন্ত্রণ, প্রকাশক : দৃষ্টি

নিবন্ধ গ্রন্থ ২০০০

একাঙ্ক একশো বছর

নাটক সমগ্র (পাঁচ খণ্ড) মিত্র ও ঘোষ। ১৯৯৪-২০০৬ (নাট্য-সংকলন গ্রন্থ)

এছাড়া নাটকের বহু স্বতন্ত্র গ্রন্থ এবং

অনূদিত নাট্য গ্রন্থাদি প্রকাশ

মনোজ মিত্র সম্পাদিত গ্রন্থ

ছোটদের থিয়েটার, প্রকাশক : নব গ্রন্থ কুটির

নতুন নতুন নাটক, প্রকাশক : শিশু সাহিত্য সংসদ

পুরস্কার ও সম্মাননা

১৯৭৮ : অমৃতবাজার পত্রিকা প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসেবে গিরিশচন্দ্র পুরস্কার

১৯৮০ : শ্রেষ্ঠ অভিনেতার জন্য শিল্প মেলার পুরস্কার

১৯৮১ : পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের পুরস্কার

১৯৮৩ : পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের পুরস্কার

১৯৮৫ : শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের জন্য সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার

১৯৮৬ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের পুরস্কার

১৯৯১ : নান্দীকার জাতীয় নাট্যোৎসব সম্মাননা

আজকাল প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ [illegible] অভিনেতার পুরস্কার।

১৯৯৪ : পশ্চিমবঙ্গ ফিল্ম জার্নালিস্ট প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার

২০০৫ : এশিয়াটিক সোসাইটি প্রদত্ত স্বর্ণপদক

৯.৪ 'গঙ্গা বেকিমসাহেব' নাটকের সংক্ষিপ্তসার

প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য

[illegible]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[illegible]

তৃতীয় দৃশ্য

[illegible]

চতুর্থ দৃশ্য

[illegible]

পঞ্চম দৃশ্য

[illegible]

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য

দ্বিতীয় দৃশ্য

জ্যোৎস্না রাতে হেকিমের দাওয়ায় বসে হেকিম ওষুধ তৈরি করছে। তাকে সাহায্য করছে পদ্মাবতী। আব্দুলের পড়াশুনার জন্য সে আব্দুলকে ত্যাগ করে এসেছে। হেকিমের কাছে স্থায়ীভাবে থেকে কাজ করার আর্জি জানায়। হেকিম তাকে শিক্ষা দেয় যে, তার তৈরি ওষুধ খেয়ে জোয়ানরা শক্তি পায়, পীড়িত আরাম পায়, ফুলেরা সুরভি পায়, ফলেরা রসের পায়, মধু পায়, ফুলদানি পায়, বাগান সবুজ পায়, অনেক ক্ষুধা পায়। বিদ্যুতের ঝলকানি পায়। দুর্বল ব্যাধির সঙ্গে লড়তে হলে চাই শক্তি ও সৌন্দর্য। কালো চাদর মুড়ি দিয়ে প্রবেশ করে গোলাপবিবি। সে হেকিমের কাছে স্বীকার করে যে, হেকিমের অনুমানই ঠিক। কঠিন ব্যাধিতে সে আক্রান্ত। রাতে রাতে তার জ্বর হয়, সারা শরীর চুলকায়, চুলকানো স্থান ঘা হয়ে যায়, পায়ের দিকে কোনও সাড় নেই। মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে গোলাপ। হেকিম তাকে আশ্বস্ত করে বলে, দুনিয়ার বিপদের চেয়ে একটি ব্যাধির ক্ষমতা কখনও বেশি হতে পারে না। মধুর আহ্লাদ, সেবা, ভালোবাসা, মিঠে পানি, মিঠে হাওয়ার চেয়ে কোনো বীজাণুর তাকত বেশি হতে পারে না। তার রোগ সারিয়ে দেবে। তবে সেই রোগের কারণটি জানতে গেলে জন্য চাই বহুবিধ জ্ঞান। গোলাপবিবি হেকিমকে বলে, যে গোলাপ তার প্রাণ বাঁচাবে, সেই গোলাপকে সে খাইয়ে ফেলেছে। অনুশোচনায় গোলাপ কান্নায় ভেঙে পড়ে। নিজের দোষ স্বীকার করে বলে, সে পলাশপুরের চর। মুরাদকে সে মিথ্যে বিষ দিয়ে মেরেছে। উদ্দেশ্য হেকিমকে পরিবারশূন্য ছাড়তে বাধ্য করা। আড়াল থেকে সব শুনে ফেলে খালিদ খাঁ। মাস্তানকে সঙ্গে নিয়ে সে গোলাপের সামনে আসে। গোলাপকে অপমান করে, তার গা থেকে সব গয়না খুলে নিয়ে তাড়িয়ে দেয়। পাশাপাশি হেকিমকে সভাতে কাছে টেনে রক্তগোলাপ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।

তৃতীয় দৃশ্য

সময় রাত। পলাশপুরে পঞ্চুসর্দির দেওয়ানের বৈঠকখানা। অন্দরমহল থেকে ভেসে আসছে গোলাপবিবি-এর গান। হেকিমকে নিয়ে দুখী আসে পঞ্চুসর্দির কাছে। পঞ্চুসর্দি হেকিমকে দেখে খুব খুশি হয়। হেকিমকে সে বিরাট গোলাপ বাগিচা দিতে চায় তার ওষুধ আবিষ্কারের জন্য। হেকিম জানায়, গোলাপ সে পেয়েছে, আবিষ্কারটিও করতে পেরেছে। সে এসেছে গোলাপবিবি-এর সঙ্গে দেখা করতে। তার কঠিন ব্যাধির খবরটি নিতে। দুখী, পঞ্চুসর্দি কি রোগের খবরটি তা জানার জন্য হেকিমকে চাপ দিতে থাকে। হেকিম কিছু বলতে চায় না। সহসা সেখানে গোলাপ এসে জানায়, তার কোনও রোগ হয়নি। আসলে দুখি-গোলাপের দল হয়ে ব্যবহার করে সে তার সৎভাবকে, বাদশাহর খাতিরে পোষণ করতে চায়। হেকিম তাকে প্রতিশ্রুতি দেয়, সে একদিন সুস্থ হয়ে উঠবে। কিন্তু গোলাপের দেখায় আসলে রোগকে লুকিয়ে সভাকে দেখা উচিত নয়। দুখী সব বুঝতে পেরে পাঞ্জাবিটা ছিঁড়িয়ে কলকাতায় ফিরে যেতে বলে। গোলাপ দুপুরে নিয়ে পঞ্চুসর্দির টাকা-পয়সা গোপনে নিয়ে চলে যায়। যাওয়ার সময় হেকিমের কাছ থেকে ওষুধের বোতল ছিনিয়ে নিয়ে যায়। হেকিমকে পলাশপুরে আটকে রাখার কথাও বলে। পঞ্চুসর্দি হেকিমকে বলে, এখানে পলাশপুরে থেকে যেতে। বিকলাঙ্গই রোগে মহামারি ছড়িয়ে পড়েছে, যদি তাদের চিকিৎসা করে যায়। পঞ্চুসর্দির প্রস্তাবে হেকিমের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে।

চতুর্থ দৃশ্য

[illegible]

পঞ্চম দৃশ্য

[illegible]

বন্ধুর মেলে এসেছে। কারণ গল্পলেখকের ভাষায় আমরা জানতে পারি, এটি বন্ধুর মেলের লাভের নয়। ঘটনাটি হলো, মিথ্যা কথা। তার বন্ধুর মেয়ে মোহরমণি ভালো ঘরে গেছে। এ সংবাদে ফ্রেডির জীবন খুশি হয়। সে খুঁজতে থাকে পুঁথিটি। যে পুঁথিতে লেখা আছে বন্ধুর তৈরির প্রণালী। পুঁথির খুঁজে পায়না ফ্রেডিস। তারপর ঘরে, একদিন এই ঘরটি রক্তগোলাপ আবিষ্কারে তার অভিজ্ঞতার কথা বলে দিয়েছিল, আজ সেই বন্ধুর ঘরটির জীবন বাঁচানোর জন্য জরুরি হয়ে পড়েছে। ঘরটার বাঁ ফ্রেডিমকে অভিশাপ দিয়ে দিয়ে যায়। গল্পকথনি ফ্রেডি। ঐতিহ্যে আবার পুরস্কার সে পায়নি, পায়েলরা পুরস্কার দিয়েছে ঘরটির বাঁ-কে। ফ্রেডিস যাচ্ছেতাই সুরে বলে, হায় আল্লা। সে দোষে ঐতিহ্যে সেই সেয় ঐতিহ্যে আবার পুরস্কার। ফ্রেডিস বাঁচে বাঁচে ঘটিয়ে নুটিয়ে পড়েন। গল্পকথনি জীবন থেকে সেয় করে রক্তগোলাপ। ঘটির ঘিটোনে সে একটা গোলাপের ফাল খুঁজেছিল। গোলাপ ফোলে বন্ধু ঘরে সে ফুটিয়েছে লাল গোলাপ। ঘরের ঘরিয়ে বাবরা পুঁথি সেয় করে আনে। ঘালপাতায় পুঁথিটি সে খুব যত্ন করে লুকিয়ে রেখেছিল। তারা তখন নতুন ঘরে বিয়োর। ফ্রেডিমের আমপূর্ণ ঘরাকে সম্পূর্ণ করবে, অপূর্ণ ঘরাকে পূরণ করবে। তারা ফ্রেডিমের ঘরাকে ঘার্থ হতে দেবে না। ঘরালোকে ফেলে যাচ্ছে ফ্রেডিমের মিটি। গল্পকথনি ফোলমরা ঘরে ঘরে পারে। তারা ফোলমরা গোলমর বন্ধুর তৈরির অপনিলার করে। ফ্রেডিমকে ঘাকে গল্পকথনি চির ঘালা লেখার জন্য, চিনের ফোলমরি ঘরার জন্য। ফ্রেডির তখন চিরনিদ্রার শরিক। শরিক খুব খুশির তখন।

৯.৫ গল্প ফ্রেডিমাহেবের নামকরণ

সাহিত্য সৃষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তার নামকরণ। নামকরণের মধ্য দিয়েই সাহিত্যসৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়। শিল্পসাহিত্যের বিষয়ের প্রয়োজনে প্রতিকারি হল নামকরণ। নাটিককারের জীবন জিজ্ঞাসা বা জীবনবোধ প্রক্রিয়া হয় তাঁর সৃষ্টি নাটিক প্রসঙ্গে। নামকরণ সেই জীবনবোধের পরিচয় ব্যক্ত করে। পাঠক যখন কোনও নাটিক পাঠ করতে বসেন, তখন বিশ্বাসে বিন্দু কৌতূহল হয়েই তাঁর দৃষ্টি পড়ে নামকরণের দিকে। ফলে নাটিককারকে যথেষ্ট সতর্ক ও সচেতনভাবে তাঁর নাটিকে নামকরণ করতে হয়। নাটিশাস্ত্রে নাটিকের নামকরণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—নামকর্ম যা নিয়োগম নাটিকের আনুষ্ঠানিক আবশ্যকতাকে প্রস্ফুটিত করে। এই অভিমত নাটিককার যে কোনও পাশ্চা প্রসঙ্গে প্রযোজ্য হিসেবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় চরিত্র, বিশেষ চরিত্র বা স্থাননাম অনুযায়ী নামকরণ করার রীতিও প্রচলিত। আলোক সিংহের 'অন্ধকারে', 'কেশরাজ ফ্রেডারে', 'আমি মরব বলেই', 'অনন্তনগরের সুরক্ষায়', 'সিন্ধু আমাদের মেয়ের', 'দর্পণে পরপর্শী', 'শেষী সর্বনাশা', 'দুষি ও সময় প্রেডিকিয়ার', 'চন্দ্রমধুমাস', 'অন্তরাল অনুভবে', 'অপরাহ্নের ফোমফোপড়' ইত্যাদি নাটিকগুলির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। যে নাটিকগুলি নামকরণে নায়িকাদের বা স্থাননাম প্রাধান্য পেয়েছে। আবার 'নায়ক চুলকায়', 'চাকরাঙা মধু', 'দম্পতি', 'রাজদর্শন', 'পোস্টারাঙা', 'ঈশপোয়াস', 'ছায়ার প্রেমপ', 'সন্ধ্যেয় কথায়' ইত্যাদি নাটিকগুলির নামকরণ আনুষ্ঠানিক আবশ্যকতার ইঙ্গিতবাহী।

আমাদের বিচার বিশ্লেষণ করে দেখাতে হবে, আলোক সিংহের 'গল্প ফ্রেডিমাহেব' নাটিকের নামকরণ কোন রীতি মেনে করা হয়েছে। লক্ষণীয়, নাটিকের নাম 'গল্প ফ্রেডিমাহেব', 'ফ্রেডিমাহেবের গল্প' নয়।

অর্থাৎ দাম্পত্যজীবন অবশ্যই স্বাস্থ্যসম্মত ও আনন্দপূর্ণ। নিছক একজন হেকিমসাহেবের জীবনকাহিনি নয় বলে লেখিকাকে ধিক্কারও দেয়। এ লেখিকা লেখার শেষদিকে কাহিনি সম্পর্কে তাঁদের মতামত নিয়ে আমাদের জানিয়েছেন :

'অথচ লিখতে লিখতে প্রবীণ আত্মজের চিকিৎসকবন্ধু আমুর্তদেবতার জীবনকথা নিয়ে। অনেক দূর এগিয়ে গেছলাম, উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছি। লেখা ফেলে চলে গেছলাম বাংলাদেশে। বাংলাদেশ মুক্ত হিয়েছিল বেরাক্রোশনের অমানুষে অমুল মহিলাদের কর্মশিবির পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে।

সেখানে সমস্ত কাটাতে হেকিমি চিকিৎসাবিদির ভগ্নস্ত পড়ে পড়েছিলাম অমি। খায়, দরজাগুলি, দেওয়ালগুলো আর পশুপাখীর হাড় কলকে জড়ো ফুরিয়ে লাওয়াই খানাখার প্রতিদিন নিয়ে লেখা পড়িতে বেশি—রক্তচোলাচলের পাশটি থেকে কুর্ণবহারির নিরাময় ঘটে। আরো পীর ভগ্নস্ত উপকরণের সঙ্গে রক্তচোলাচ জ্ঞান নিয়ে মহিন মালনায় সেই ভগ্নস পশার্থ থেকে পেটে রাখবে ঘরে খোলা আকাশের নিচে, জোৎস্না রাতে। রাতজোর জোৎস্নার আলো পাবে পাওয়াই, পাবে রাতের দেহের না শিশির। দোকা যায়, হেকিমের লাওয়াই ঐতিহ্য পশ্চাতি হেমন আজিনব হোয়নি এই লাওয়াই খুবই মুলবি। অনেকে নিজের এই লাইনের হেকীম ঘরির হেকিম আজকের মানুষ নয়। হেড়শো বছর আগেকার মানুষ। এই লাইনের পুরু যখন পাঁচি, সন, নিরেকরাম হেকিমের খাটি মধ্যপথে, শেষ তার মৃত্যুতে। মাঝে তার অসাধারণ জনপ্রিয়তার ঈর্ষান্বিত পাশকলেগী (ওয়ালী খী ও পশুপাখি দোকার)। ক্ষুতাহারি, বধি-নাজর যন্ত্র যে কমুন, ইউনানী চিকিৎসার সরঞ্জাম দুখা ঐতিহি করলে এসব রোগ সারাবার উপায় থাকে। এই কমুন ঐতিহি করার জন্যই উপকরণ রক্তচোলাচ। এছাড়াও এক দুধারোগ্য মাইনি কমুন আধিকারের জন্য প্রয়োজন রক্তচোলাচ। অর্থাৎ রক্তচোলাচ শক্তি ও সঞ্জীবনীর প্রতীক। যুবার ও যৌনরোগ প্রতীক। লাহাড়া পাথার ভেদে হেকিম পাঁচে পাচ্ছে রোগী খুঁজে বেড়াচ্ছে। খা-পাঞ্জাব ছিল হেকিমের যৌরাড়। হেকিম রাজা তখন ইংরেজ, ইংরেজের চেলা আধিকার, আধিকারের আধিকারক আমুলমান, আহমীলমান পশ্চাদিমার ঐতিহ্যবাহী আশাপাড়ের সাধার মধ্যবয়ত্তোগী মুখর হেকিম পাচ্ছে। মানুষ মরছে মমুক, আরোগ্য হাচ্ছে। ফলে জ্বর-আরি-বীলকাশি-চক্ষুশীড়া-বক্ষচোলন সব রোগেরই লাওয়াই নিত হেকিম। নিজে হেকিমের দিন কাটিয়ে রোগী খুঁজে পাওয়াই হেমরাত পাচ্ছে। আর রাতে পালাবো পাওয়াই। হেকিমের লাওয়াই মুলোস মুরছি খায়, ফজরের হেরের খায়, মধু খায়, মুগনাভি খায়, মাসের সবুজ খায়, রাতজোর একটিনা জোগলা খায়, শীতল পাজাম খায়। আরোক ভুধা আর। আলমারোর কাচের মেরে বিমুকের মলকাটি টিংচার, সেই মলকাটির খায়। লাওয়াই-এর হেমন শক্তি হাই, সৌন্দর্য হাই। হাই ঐশ্বর্য, হাই জোলুমই। কিন্তু পাওয়াই-এর রাজার উপকরণ রক্তচোলাচ চলে যায় মহিরাগড়ের জোয়ারদারি-এর দখলে। যারদি খাঁদের মাটিতে খুবই সবুজ রক্তচোলাচ। আমরা পলাশপুরের আমুলমান পশুপাখি দোকানের মালিকী জোয়ে। চালাকি করে সে জোয়ারদারিকে পাঠিয়ে দিয়েছে মহিরাগড়ে। সে হেকিমকে এমন বিশ্বাস দেখাতে যাতে হেকিম চলে আসে পলাশপুরে। সে কারণেই জোয়ার রাজা সে কাজটি করে, যা হলো হেকিমের লাওয়াই আধিকারের পথকে বন্ধ করে দেয়। খুই রক্তচোলাচ আমুলমানের মাথার খুঁটি হয়ে যায় সবুজ, সতেজ, মুলস মানুষ হেকিম। হেকিমানের সন্ধানে সে চলে আসে পশুপাখি দোকানের আমুতে। সেখানেও আর কলকাতে জোয়ারি আলাদাস,

নদি। মঞ্চোপকরণের অভাবে মুক্তাঙ্গনের অভিনয় সচরাচর অনুষ্ঠিত হয় না। অনুষ্ঠানে থাকত গান আর আঙ্গিকের মহড়াটুকু দেখা পুঁথি, কিন্তু কখন দেখা যেত্তে বসিয়া। মাঝে মাঝে শ্রোতারা কখন জিজ্ঞাসিতে খুশিমত পড়ছে। খুড়ো হাতের আর গলাখানি নিয়ে থাকে শ্রেক্ষিমতে। মুক্তাঙ্গনে উপস্থাপন করে শ্রেক্ষিমের অনুকূল তৈরি করার অপরীক্ষায়। শ্রেক্ষাগৃহে নাটক আপেক্ষাকৃত পরিণতকে তুলে ধরার অনেকটি এ নাটিক দেখা হয় না। এ নাটিক ইতিহাস ও কালের সীমা শ্রেণীয়ে চলে আসে বর্তমান সময়ে। মুক্তকণ্ঠ প্রযোজিকা 'পঞ্চ শ্রেক্ষিম সাহেব' নাটিকের প্রথম পুস্তিকায় লেখা হয়েছিল। '...পঞ্চ শ্রেক্ষিম সাহেব আটি কখনোটি পঞ্চকন্যা বা শ্রেক্ষিম সাহেবের জীবনগাথা নয়, বরং আমাদের অতি চেনা অবচেতন মিছুর এক আত্মকথা।' মুক্তকণ্ঠের নাটির সঙ্গে অনুভাব সমস্যার সোপান করি। আজ আমাদের এক অতি চেনা অবচেতন মিছুর কাছাকাছি নামানো এসে হাজির হয়েছি। শ্রেক্ষিমের মতো অনেক বিশেষজ্ঞটি মুক্তাঙ্গনের নাটির উপস্থাপনের কাছাকাছি সাধারণ উপলব্ধি পাচ্ছ না। উপলব্ধি যোগাযোগ অভিজ্ঞতের নিজেদের অর্থ খোঁজে, পরীক্ষাসমূহ পরিচয়ে অন্ধ হয়ে ওঠে। প্রাক্ষ বিশেষজ্ঞের বল লালসার শিকার হয়। অপেক্ষ পরিচ্ছ সরকার যথার্থটি বলেছেন—'আজ থেকে শেকৃপেয় বছর আগেকার এক শ্রেক্ষিমের পঞ্চকে তিনি এমন এক মূলধের অর্থ বিচারেন যা ঐতিহাসিকভাবে পরিচিল ছিটিয়ে এসে আমাদের জিনগাণের এতেনাকে সমস্যার মধ্যে চুকে পড়ে এবং মুক্তাঙ্গনে পরিস্থিতি ও পোষাক-আশাকের আড়াল থেকে আজকের নিজের চৈতিকিমার একটা বড় অংশ এ নাটিকে আয়নার দিকে নিক্ষিপ্ত হয়।' ['আজকাল পত্রিকা', ০১.০৬.১৯৯৩]

এ নাটিকের নামকরণে আছে আরটি ইঙ্গিত। খুব সকালবেলাটেই নাটিকার এ নাটিকের নাম নিয়েছেন 'পঞ্চ শ্রেক্ষিমসাহেব'। পঞ্চ মানে অর্থাৎটিকে নাটিকার শ্রেক্ষিমের পঞ্চকে মিলিয়ে নেন প্রচীন কালের সঙ্গে আজকের জিনসত্তা সমন্বয়ে। পঞ্চ মানে তাৎপর্যটিও বটুন। শ্রেক্ষাগৃহে নাটকের শুরুতে কখনকে নিয়ে গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করে এক কলিন। তার হাতে ঝুলন্ত ত্রিশূল। কলিনের কথাটি পাঠকের মনেটি শেষ হয় নাটিকের কথাটি সুত্র। দশ পঞ্চক সম্পূর্ণ হলে সে ঝুলন্ত ত্রিশূলটি নাচিয়ে যাবে কখনের জিনত্রে। কলিন এ নাটিকে সূত্রধর, কখনক ও নিক্ষেপকের ভূমিকা পালন করেছে। সব মূলেটাই তার উপস্থিতি নেই। প্রথম অঙ্কের প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম মূলে এবং দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ ও পঞ্চম মূলে সরাসরি তাকে দেখা যায়। অন্যান্য মূলে সে চলে যায় নাটিকের অন্তরালে। তার কথি থেকে সে বের করে এনেছে শ্রেক্ষিম সাহেবের পঞ্চ। যে শ্রেক্ষিম সাহেবরা ইতিমধ্যেই পাথির অর্থটি বর্তমানে নিয়ন্ত্রি প্রকাশটি। অনুভব উপস্থ সমাজে পাকাপাকি পাকাপাকি যে বাস চলে শ্রেক্ষিমের পঞ্চ। জন্মে ওঠে সেই পঞ্চ। যে পঞ্চের আগমনে আছে সোকাচারে অকথী। কলিন কখনও নাটিকের নামে সূত্র পরিয়ে নিয়েছেন, কখনও বা নাটিকারের পঞ্চকাকে রাজিটিক করেছেন। সেখানে ও প্রকাশের সেতু নির্মাণ করেছেন তিনি। তার পঞ্চের কেন্দ্রে আছে শ্রেক্ষিম। শ্রেক্ষিমকে নিয়েই তার পঞ্চের শুরু, বিস্তার ও শেষ। পঞ্চ শ্রেক্ষিম সাহেবের কিন্তু পঞ্চ হলেও তা পরিচ। ত্রিকরন সমাপ্তিটি তুলে ধরে এ পঞ্চ। এ পঞ্চ মুক্তাঙ্গনের মঞ্চ সমস্যাটি মিলিয়ে যায়ন। যদ্য, মনের কোণে তেটি তোলে। শ্রেক্ষিম সাহেবের পঞ্চ যে শেষ হয়েও শেষ হয়না। তারা মনেও মনে না। তেঁটে থাকে মানুষের মনে, মানব সভ্যতার ইতিহাসের পাতায়। এ শ্রেক্ষিম সাধারণ। একজন প্রাচুত্বে চিকিৎসক নয়। সে চিকিৎসা নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, নিয়া নতুন অভিজ্ঞতে যোগে ওঠে। মানবের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করে। ফলে জীবিতকালেটি তাঁরা

বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে। ফলে তার এ ধরনের 'গল্প হেকিম সাহেব' খুবই সফল ও সার্থক। আবেগপূর্ণ বক্তব্যধর্মী ও গভীর অর্থবহ এই গল্পগুলো। এ গল্পগুলো কেরামতির হাকিমের মাধ্যমেরূপায়ণ হয়েছে। কিন্তু 'গল্প' শব্দটি ছুড়ে দিয়ে লেখকের অদ্ভুত এক ব্যঞ্জনা এনেছেন। সবেদল মিয়ের 'গল্প হেকিম সাহেব' লেখকের কেরামতি চরিত্র হেকিম। এক নিখাদ পরিহাসপ্রিয় আদুর হেকিম। কেরামত গল্পে আদের আদুর হেকিম আর ইন্দিলুইয়ে লাগিয়ে অবশ্যই বিদ্যুৎ চমকিয়ে। সে সময় দেশের রাজা ছিল ইংরেজ, ইংরেজের চেলা ছিল জমিদার, জমিদারের তল্পিবাহক ছিল আদুকবার, কবিরাজরা, পাঠশালার ও মহাজনকোটি। তারা খাজনা ছাড়া আর কিছু বুঝতো না। সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করার মনসিকতা ছিল না। ফলে পী-গঞ্জ ছিল রোগের সোঁয়াড়। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, সিলেজ্বর, টাইফয়েড, বসন্ত, সোনগাঁড়ুয়া ইত্যাদি রোগের বাস ছিল আদুদের ঘরে ঘরে। সে সময় হেকিম তার আলমের সহায়ে গায়ে হেকিমি সিটে ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াত। খুঁজে বেড়াত রোগী। হাঁক দিত 'কবরাজি চরি সো...সবরাজি...জ্বরজারি হাঁপানি চক্ষুপীড়া বক্ষরোগ সর্দিরোগের সবরাজি পাবে সো...সোজাসুজা সব ভালো আছে সো।' রোজগের ভালো রাখার জন্য, মূল্য রাখার জন্য সে নিয়মিত পরিশ্রম করতো। নিত্য নতুন কবরাজি আবিষ্কারে নিপুন ছিল। ঘাকলবাদী হেকিমের পরীক্ষাটি ছিল বেশ চমকপ্রদ। ঘাটো গাজরাজা, লম্বা ডোলা আলু, আদার গাঁড়া চুলি পরতো হেকিম। আর হাতে থাকতো আদুদের পাগিয়া, কাঁধে সেলিমেলি বস্তা। বস্তাটি মোটির সিটে থাকে। রোগের লোকেরা চিকিৎসার নিমিত্তে চাল, ডাল, কলা, সেদুল, মুলো, ডিম যা দেয়, তাতেই হেকিম সন্তুষ্ট। কারণ হেকিম জানে রোগের লোকের থাকবা ভোটে না, তারা হেকিমকে আর কি দেবে? হেকিমের পাঞ্জায় পড়ে তারা চিকিৎসা করাতে বাধ্য হয়। দিনান্তে হেকিম ফিরে আসে নিজের কুটিরে। রাতে তৈরি করে কবরাজি। আর আদুদ তৈরি করতে তার সেবকের সঙ্গে চলে রক্তপোলাপের লালড়ি। আর কবরাজি তৈরির লক্ষণিক অধিনায়। সব উপকরণ একত্রে মিশিয়ে রাতভোর চাঁদের জোসনা খাওয়াতে হবে। তার সঙ্গে পীচল বাতাস, ঘুমের ঘুমটি, মধু, ঘৃতলতি ও বিদ্যুতের ঝলমলি। আদুদে লাগবে ঘুমন্ত, রক্তদল জরিমুল। আদুদ বানাতে গিয়ে সে কোনও কীচক রাখে না, কীটি লক্ষন করে না। আর আদুদ তৈরি করতে সহায়তা করে বাসনি বাই, অতুল আকাশের পাই গঙ্গাবাসি। তাকে সে তার পাথর চাল-ডালের অর্থেকের বেশি দিয়ে দেয়। আর চরিত্রে উপস্থাপনা লক্ষণ পায় এখানে। অবশ্য শেষ করে সে গঙ্গাবন্দিতে, তারপরনে বৃদ্ধ চিকিৎসি হয়েছেন। গঙ্গাবন্দি মোটির ঘাল ফুলে ফেলে হেকিম তাকে ক্ষমা করে। কিন্তু পরবর্তে ঘুমন্ত রক্তপোলাপের পাপড়ি না দেওয়াই তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। এক্ষেত্রে সে কোনও আপোষ করে না। হেকিম ঘাল করে পরিহাসপ্রিয়, তারপি খী-র আদুকবারের অধীনে। তার সঙ্গে রয়েছে মোহাম্মদি গলাগলুয়ের আদুকবার পলুপটি সোমবারের। হেকিমটি পরিহাসপ্রিয় আর গলাগলুয়ের মালক ঘাড়িয়ে নিয়েছে অনেকখানি। হেকিমের অবর্তমানে গলাগলুয় জনরাতপ্রার দিক থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। তাই অবশ্য করে পলুপটি মোহাম্মদিকে পরিহাসপ্রিয় পরীক্ষেয়ে যাতে রক্তপোলাপ আবিষ্কিতে হেকিমের কবরাজি বানানোর লক্ষ্যকিতে আমাদের ঘরীয়ো যায়। মোহাম্মদ পরিহাসপ্রিয় না দিয়েই পোলাপ আনিয়া দেখানে যায়। পোলাপের অবর্তমানে হেকিম ছুটে আসে তারপি খী-র কাছে। তারপির মায়ের চর্মুকি হেকিমকে পাঞ্জাবর্ণ দেয়, পোলাপের পরশে পীসা ঘুম বাবহার করতে। তারপি প্রতিশ্রুতি দেয়, এই ছেলাপের জন্য আলাপনি

পারবে না। ফ্রেডিক ফোনে দিয়ে বলে, যান তাড়াতাড়ি করবেন তো—দুই মিনিট, তারপরে তারা সে কথা রাখে না। নিজের বিবেকের কাছে সে খাঁটি থাকতে চায়—'আমি তো আপনাদের সাবধানই আগের দিনটুকু বলি।' ফোনালাপটি দুজন ফ্রেডিকের মতো সিরিয়াস মানুষ পাওয়ায় স্বস্তিতে দুজন।

ফ্রেডিকের ফোন পেয়ে ওয়ালি খাঁ ও বন্ধুদলটি সোজা হয়ে বসে। ফ্রেডিককে পালাপালুরে নিয়ে আসার জন্য বন্ধুদলটি তাদের লরিটাকে মোহরবাজিকে। ফ্রেডিক যাবে ওয়ালির আগমনের অপেক্ষায় অধীর হয়ে পরিস্থিতি ভেড়ে চলে যায় তারজন্য মোহর এক অন্যরূপ পরিকল্পনা করে। সে তার ছিয়া মেয়েকে মুক্তার জন্য বন্ধুদের নিয়ে আসে ফ্রেডিকের কাছে। ডিনিসলার অধিক ফ্রেডিক মোশী মোহরী মোহ ডিনতে পারে। সে মোহরকে দেখেই বুঝে যায়, এক কালাজ্বর যারি বাসা বেঁধেছে মোহরের শরীরে। মোহরের লক্ষণ যাচাই করার জন্য মোহরকে জিজ্ঞাসা করলে সে নিজের রোগ স্বীকারে চায়। ফ্রেডিক মোহরকে বলে, 'ডিনিসলাকেরে দেখেছি, যাদের দরিয় রোগ হয়েছে তার বেশির ভাগই হয় মরি। যাদের দেহের যারি মরি...তারাই করে আত্মহারি।' মোহরের পীড়াপীড়িতে ফ্রেডিক নিরুপায় বন্ধুর মেয় ডিনতি, কিন্তু মোহরের যারি নিয়ে চল উদ্বিগ্ন হয়। বন্ধুর আত্মহারার ঘটনাতেও সে সন্তানদারে নিয়মনীতি মেনে চলার পক্ষপাতি। মরি মুক্তু মুক্তাকে একবার বন্ধুর আগমনে হয় না তা ফ্রেডিকের কাছে জানতে চাইলে সে বিরক্ত হয়। সে বলে—'মোটা না আগমনেও হয়।' ফ্রেডিকের বন্ধুর মুখে মিশিয়ে মিশিকে আগমনে হবে। এই সুযোগে মোহর মুখে দিল মিশিয়ে মুক্তাকে খেতে দেবে। সমস্ত রোগ চলাচলে হয় ফ্রেডিকের ধারণা। তার বন্ধুর খেয়েই মুক্তা অসুস্থ। মোহর সোলান অটিকিংসেরে বলে ফ্রেডিক মুক্তাকে মেরে অভিপ্রায় নিয়েছে—এমন অনুমান তাকে দেওয়া হয়। ফ্রেডিককে মোহরের বাড়ি টেনে নিয়ে যেতে ওয়ালি খাঁ-র উৎসাহদাতার নিয়ে আসে হয়। ফ্রেডিকের দৃঢ় বিশ্বাস, তার বন্ধুর মেয়ে মুক্তা মরতে পারে না। সে নিজেই সেই বন্ধুর মেয়ে চালান দেয়—বন্ধুরে দিল মেরি। এক্ষেত্রে তার উপস্থিত বুদ্ধির অতিক করতে হয়। পালাপালি সে অনুমান করে, মুক্তারই কিছু ছিল। খুব পরীক্ষা করা হোক। এমনকে সে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়। ওয়ালি আর শাহি মুক্তুল খরে মোহরের বাড়ি খোলার আয়োজন দেখ। মোহরের বাড়ি খোলা হয়ে বাহিরে জড়ো হওয়া জনতা আনন্দে মেতে পড়ে। ফ্রেডিকের এই জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয় ওয়ালি। তার থেকে তার একজন সাধারণ প্রজা মানুষের সম্মানের ঘনি হয়ে উঠেছে তা সহ্য করতে পারে না ওয়ালি। সে ফ্রেডিককে ফুলের মেলি পরে, গাঁয় করে মোহরবাড়ি-এর সাহের সাথে সাহে বন্ধ দিতে। নিরাপত্তার ফ্রেডিক সব আনন্দে, শাহি মেনে নেয়। নিরাপত্তিতে সাধারণ মানুষের সেবা করে সে নেশ ভালবাসে, নেশ মানসিক শীড়ন।

সহজ, নীতিনিষ্ঠাবিশ্বাস ও মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ফ্রেডিক সাহের। মানবিকতার কারণেই সে মোহরকে শীতলপাটি বিছিয়ে দেয় বলতে, যে মোহর তাকে মুক্তার হত্যার জন্য দায়ী করেছে, মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, সকলের সামনে হেয় করেছে, সেই মোহর যখন ডিনিসলার জন্য তার সাহায্য হয়েছে, তখন সে অতীতের কথা ভুলে গেছে। মোহরের যারি সমস্যাটি হয়ে উঠেছে। তার চিকিৎসা করতে উদ্যোগী হয়েছে। কারণ মোহরের অন্য কোনও পরিচয় তখন তার কাছে নেই। মোহরের পরিচয় তার রোগী, তার সেবা পেয়ে এসেছে। মোহর মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়লে তাকে সে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—'পরিশ্রমেরা সব মোহরেরই প্রতিবিধান আছে, আছে এই দুনিয়ায়। আমার দুনিয়ার বিশ্বাসের চেয়ে একটি তাবিজ সমস্যা

কখনো বেশি হতে পারে না বটে। এই সমুদ্র পাহপালা কেন ডোহরের মিঠে পানি মিঠে হাওয়ার এতে কটি পীরমুহুর আকব বেশি, এ কথাতে হয়।' সিপাহির মতি পরীর আশা আছে ডেহিমের, নিশান আছে চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর। রোগী দেখার আগাতে ডেহিমের আছে শত্রু নিয় ডোর নেই। তার তখন ও তখন শত্রু ডোগ। তার বিদুশেষই সে নিরাময় করতেই কতে পেরেছে। ডৌলদী তাকে পরিত্রাণপত্র ছেড়ে পলাশপুরে যেতে বলেছে, সন্তানেরদাদের জন্য, ডোমার তাকে সত্যেরিক কতেছে পলাশপুরে যেতে। কয়দিন ছুটের দেরি দেখে, ডোন ডাক্তারি ডোদের সে পরিত্রাণপত্র ছেড়ে যায়নি। কয়দি তাকে পরিবেহছে পলাশপুরে গেলে তাকে এখন আসতে, যাকে সে আর ফিরে দীড়াতে না পারে। ডেহিম সেদিন কয়দিনকে বলেছিল—'দুষ্কুর যা বলে, তাকুরোলাল যা দেখে আমার তাতি আমা ডোদেরে ডিকেই, কিন্তু...পরিত্রাণপত্র ছেড়ে যাবার কথা কখনো তাবি নাই।' পরিত্রাণপত্র ছেড়ে পলাশপুরে এসেছে। নিজের ডোদের বিদেশ প্রাপ্তির আশায় নিজে নিজের উন্নতির জন্য নয়। সে এসেছে তার রোগীর জন্য ডমুদ নিয়ে। একটি রোগের সন্ধানে, তার সত্যতাই পরীক্ষা করার জন্য। মোহাবাদি তার কাছে দীকার করেছে সে পলাশপুরের চর। তবু কেন সে মোহরদাদি-এর দৌড়ে পলাশপুরে এসেছে তা জানতে চাইলে ডেহিম বলে—'আগলে সেই হল যা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নাই। আমি পলাশপুরে আগতের জন্য আসি নাই, এসেছি একটি রোগের খোঁজে। আমার সত্যতাটি পাবার জন্য।' দুটি-ডোহরার বন্ধ হবার আগপ্রায় মোহর তার রোগটি ডেপে ধরতে চায়। ডেহিম তা ডেপে নিতে পারে না। আগতিনিদে রোগটি অন্যান্য আসার মেতে। মোহরের শরীরে দেখা দেবে বিস্ফোট। যে সাক্রামক রোগটি পরিত্রাণপত্র বা পলাশপুরে নেই, তাকে ছড়াতে দেবে না ডেহিম। চিকিৎসক হিসেবে তার এই দৃঢ়তা আমাদের মুগ্ধ করে। মোহরকে আশ্বস্ত করে ডেহিম বলে—'পরিত্রাণের আগতে সুস্থ হয়ে ফিরুন ডের গানপাজনা করবেন। মোহরদারের দেশায় এই ভয়ানক যাবি দুকিয়ে গজাতে দেশা মোনো আতের কথা নয়। আমার ধনার তারণ হাবেন পরিত্রাণের।' পরম যত্নে অমুদ তুলে দেন মোহরের হাতে। তার সেই মুতেই আশিনা পড়ে যায় পশুপতির আমুতে। পলাশপুর ছাড়ার আগে মোহর ডেহিমকে দীকৃতি দিয়ে যায়। ডেহিম পলাশপুরে থাকতে সাধারণ মানুষের তালো হয়ে—একথা জানিয়ে যায় পশুপতিকে। পশুপতির এক মাসের জন্য পালের অনুমোদন ডেহিম ডেলতে পারে না। এক মাসের আয়গায় ডোগে যায় দুই বছর। দুটি দীর্ঘমিয়াদ, কিন্তুসাধিতে। অমুদ মানুষের চিকিৎসার জন্য, তাদের সত্যতাই দেবার জন্য। সাধারণ মানুষের আগাধ্যন্ত সম্পর্কে সচেতন করতে চেয়েছে ডেহিম। মুতুরে পশুপতি তানুকুলাচরণ তার কর্তব্য পালন করছে না। পলাশপুরের রোগীদের নিয়ে তার নিলাম করিতে লাগলো। ফলে পশুপতি ডোগারোগের প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে ডেহিম। রাজা বিরোধে উপজ ডেলবার অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। সতোর পুজারী ডেহিম মিটিমি কটে বলে—'জি হাঁ। খাজনার দিকে, ইঁদিক থাকিলে...মুটি আরো পারে কি করে? আর খাজার পরিত্র যাবস্থা করা তো তানুকুলাচরেরই কাজ।' অর্থাৎ, রাজাদের দীঘি কাটিয়ে ও খাজনা বন্ধ করার আগে তো সে তো কোনক অপরাধ করেনি তা সে তোকাতে চেয়েছে। মুখী হখন তাকে বলে, পলাশপুরে তার আর মতলব নেই। শাল কথা আতোলাবাধি নতুন আক্রোশবানু এসে তোগে। ডেহিম এককোক চিকিৎসার সজা করা বলে। আক্রোশ ও তার মমুদ সম্পর্কে ডেহিমের কোনও অভিযোগ নেই। কিন্তু আক্রোশের পরিত্র কর্তব্য নিয়ে সে অভিযোগ তোলে। আক্রোশ সে আগে, এদের সাধারণ মানুষ, পরীব মানুষ পরী মমুদ

মিনতে পারে না। তার মতে, 'ঘড়ি বস্তুটি যেন কেমন। সারাদিন ঘড়ি দেখে একদিন মরে...তার চেয়ে সে হাঁটে না।...একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে বিনে...একুশের পাতায় ঢলা। লোকে এমন আস্তাকুড়ে ঘড়ি ফেলে!' পশুপতির ঘড়ি হারা মন ছেলিমকে। কারণ ছেলিমের মনমতোয়ার পশুপতির মুখোশ খসে যাচ্ছে। ছেলে ছলে আসছে নিখুঁত ঘুণ। তাই সে ছেলিমকে আস্তাবলে খাস ঘড়ির কাছে লাগাতে বলেন। ছেলিম দীর্ঘ প্রতিবাদ করে ওঠেন। সে সরাসরি পশুপতিকে জানিয়ে দেয়, অন্যের জোকারে সে যদি ঘড়ে দিতে পারবে, কিন্তু সে কাজটা তার নয়, তা সে করতে পারবে না। তার বন্ধুর ছেলে ঘোরতর্ষি মারা গেছে পুলিশ এলপাতাড়ি সে প্রতিবাদ করে। মৃত্যুবাড়ির ঘড়ে, বলিদানের মতে নয়। তার মন ছেলের শেষবার জন্য তারা মিনতার আবার নিচ্ছে। ছেলিম সহজে মনে যাবার মানুষ নয়। মানুষ মারা যাবে আর সে বন্দী হয়ে থাকবে আস্তাবলে তা হতে পারে না। তাই সে ছুটে গেছে ঝিকলগাছি, কীর্তনিয়ার, বলতলে। মানুষের ছেলার মানুষের পাঁচশ ঘোরাচ্ছে। মানুষগুলোর নাড়ির হাত ছেড়েছে না ছেড়েছে, মাথা ছেড়েছে তবু সে ছেড়ে। অবশেষে পলাশপুরের ছেলিমই তাকে নৌকার তুলে পরিয়াগাঞ্জের ঘাটে নামিয়ে দিয়ে গেছে।

নাড়িকের মুখুজ্যে ছেলিমের শরীর ছিল খুবই মজবুত। দুই মানুষগুলোর অত্যাচার, নিশীড়নের পীড়াকালে নাড়ে আর লম্বালম্বি ছেলার আর চেহি। নাড়িকের ছেলে ছেলি, সে ছেলবাগানে ছেলবাগে ছেলবাগ টেনে টেনে লাল হলে। অড়িক গলায় কথা বলে। তাকে আর ছেলা মুশকিল। তার ছোড়া ছিটেকে আগলে ছেলেরে ছিনাথী ঘাছেন। ঘাছেন অভিমানের সুরে বলে, একদিন তার বক্ষ ছুড়ে ঘাছেন পলাশপুর। ছেলিম জানায়, একদিনের জন্যও সে ছোলেনি পরিয়াগাঞ্জের মানুষদের। আসলে তার মনমতোয় বর্ণনীর ছোটোবেলিক শিক্ষার আলম ছিল না। ছেলাদের ছোলের লৌক ছেলেছে, ছেলাদেরই সে অভিক ছেলেছে ছোলির ছেলা করতে। গরীব, দুর্বল মানুষদের দুঃখ দুর্দশা মাথাতেই সে তার কাজ। মানুষের মঙ্গল করা, নাড়োনদার করার মধ্যেই সে জীবনের মহোল্লাস খুঁজে ছেলেছে। ফলে, পলাশবনালী থানাদি খী কালাচাঁদ মাঝিকে আক্রান্ত হলে, পঞ্চায়েতপ্রধান অনন্তলাল ছেলিমের কাছে উপস্থিত হয়। মাত্র ছোড় ঘড়ে ছেলিমের কাছে ঘীবনশিক্ষা পাবে। এক বুক যন্ত্রণা নিয়ে ছেলিম ফাগল, তার অভিমান করা বন্ধুর সে পলাশপুরে ছেলে এসেছে। আসল ছেলাদাদার আক্রান্ত হলেছে, তাই বন্ধুর ছেলেও কথা মনে হয় না। মহুরি ছেলিমকে বলে, তারা মিথ্যা কথা বলেছে। তার বন্ধুর ছেলেই ছেলেরাদি মুখ হয়ে উঠেছে। এ নগরে ছেলিম ঘীবন খুঁজি হয়। মহুরে উপায়ে সে থানাদি খী-কে বাঁচাতে চায়। আসার অভিমান করতে চায় বুদ্ধ পাতিত বন্ধুর। কিন্তু বন্ধুর ইতিহি ছোলী তার মনে পড়ে না। ছোলী লেখা আছে সে আলপাতার খুঁজিয়ে ছেটিক সে খুঁজে পায় না। অতীতাক্রান্ত হয়ে যায় ছেলিম। অবশে আসার ছেলি ঘরে অভিমানের কি কি নিদর্শন ছিল। খুঁজি ছাতাটিকে খুঁজে পায়—ছেলাদা মাস, মুখলাদি, মালাক, খুলোপেন্সা...। আসলে আর কিছু মনে পড়ে না আর। নিমেষে এক যন্ত্রণায় শিউরে ওঠে সে। থানাদি খী আর বন্ধুদার অনুরে যি ছেলে ছেল আছে 'ছেলিমদা' বলে। অভিমানে ঘুলে ওঠে ছেলিম। হাসে, ছোড়ে, অভিমানে সে থানাদি খীকে আক্রমন করে। তার ভাষায় মনে পড়ে আন্তুনের মুলনি—'ভালুকদার নামের আসল অভিধানটি নড় নিজের মনে বসী ছেলেন। ঐ অভিধানটির জন্য আমি ভালুকে ভালুকে আপনজনের পাড়ে ঘাসা খুঁজেছি। একটি ঘন্টাখুলোনের জন্য আমি শত শত ঘন্টুক ছেড়েছি। অথচ অভিধানটির কথা কারো মনে পড়ে নাই। আজ নিজের পায়ে খুঁজিতে আমি

চলার দেখিয়ে। যায়, কাসেম, সওদাগরী মাঠ...।' কাজটি কঠিন হলেও সহজ কথাকে সহজভাবে বলতেই অভ্যস্ত ছিলো হেকিম। হেকিমের অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করতে, অসম্পূর্ণ স্বপ্নকে পূরণ করতে এগিয়ে এসেছে পদ্মমণি ও হাসেম। তারাই হেকিমের অদ্ভুত তৈরি করার অঙ্গীকার করে দৃঢ় চিত্তে। অবশেষে জীবনমৃত্যুর দ্বারে, আর হেকিম হলে পড়েছে চিরনিদ্রায়। নাটকের সমাপ্তি এখানে। এই মুক্তি সে হয়তো চেয়েছিল। মহাকালের নিয়মেই হেকিমের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু সে বেঁচে আছে তার আবিষ্কারের মধ্যে। রসায়নবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, শিল্প, সাহস, সততার মূর্ত প্রতীক আমাদের হেকিম। হেকিমরা মরে না, মরতে পারে না। বরং তাদের মৃত্যু একটা চিরস্থায়ী চিহ্ন রেখে যায়। যেন হেকিমরা যুগের বেঁচে থাকে মানুষের মনে। মানুষের মুখে মুখে তাদের নাম ছড়িয়ে পড়ে। কীর্তিকলাপেই তারা হয়ে ওঠে চিরঞ্জীবী। আজকের এই ভোগবাদি, স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক জগতে হেকিমদের দেখা নেই। তারা আজ রূপকথার নায়কের মতো। আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এই বিরল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হেকিমকে কবিতার মতো আমরাও আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই। তার সৃজনশীল কর্মের জ্বেলে রাখি একটি প্রদীপ। তার আলোর উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে হেকিমসাহেবের জীবনসূত্র। সত্যিই, রায়ের ভাষা ধার করে বলা যায়, হেকিমসাহেবের তোমাকে পেলাম।

৯.৬ নাটকের চরিত্র বিশ্লেষণ

জমাদার খাঁ : দুর্দমিত এক খল চরিত্র

'গন্ধ হেকিমসাহেবের' নাটকের দুর্দমিত খল চরিত্র নাম বাহাদুর জমাদার খাঁ সাহেব। নবাবসাহেবের অনুচরদের তিনি। বয়স সত্তরের বেশি। হাঁটতে পারে। খুঁড়িয়ে কাজ করতে অসুবিধা হয়। শরীর মোটাসোটা থলথলে ভোগে টুইটুম্বুর। তার সর্বাঙ্গে ভুঁড়ি যেন সমুদ্র মতো কিলবিল করছে। লাঠিতে ভর দিয়ে উঠবস করে চলাফেরা করে। এ যেন বৃদ্ধ জমাদার খাঁ সবদিকে আচ্ছন্ন। বাবুজোর বাদশাহীর সঙ্গে ভুঁড়ি করার মানসিকতাও তার আছে। তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সাহেবের অনুচরের অনুচরার পদ্মমণি খোকার। তাকে টাকা দেবার জন্য সে মরা বাঁচে। পদ্মমণির সঙ্গে এক বিয়ে প্রতিবেশিনীর দেখেছে। পদ্মমণি একদম দেখেছে পুকুরে সে খেলে একদম নাচে। রক্তের আবার সম্পূর্ণ, আবরুহানি দেখেছে সম্ভার আবার। পদ্মমণি কিশোরী বিয়ে করার সে করেছে চারটি শাদি। পদ্মমণির ছোটোরানী হবে। তাই সে এমন অধিকার নষ্ট করে এসেছে তার সাথের সবগুলি নীরবিন। পদ্মমণির সঙ্গে লাঠালাঠি, মারামারি, ঠোকাঠুকি না করলে তার ঘুম আসে না। কলকাতা চলাচলে অজানা অজুহাতে সে নিয়োগ করেছে গঙ্গাসমুদ্রের খুন, ডাকাতি, ছিনতাইয়ের নানা পাঞ্জেগান পাঞ্জাবের জন্য। পদ্মমণির বাদিনী হোরা বাদিকে ছিনতাই করেও তার মনে শান্তি নেই। কারণ গঙ্গাসমুদ্রের সঙ্গে তার মামাবাড়ি হচ্ছে না। তাই পদ্মমণিকে উত্তেজিত করার জন্য সে বাদিনীর দেশের আহ্বান জানিয়ে পত্র লেখে। তার এই পত্র তার উন্মত্ত মানসিকতারই পরিচয় দেয়। বাদিনীর সান্নিধ্যে থাকবার জন্য তার লোলুপতা তার চরিত্রহীনতারই পরিচায়ক। শুধু তাই নয়, হাকিমের চাবুকের ঘায়ে, জোঁক, চুঁচি তার আঘাতে সে মূর্ছিত হয়, মূর্ছিত হয়। তার ভোগলিপ্সা ও কর্মকাণ্ডের বিকৃতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটি বাদিনী না পেলে তার অনুচরদের সে আসল থাকে না দেশবাসীর পর্বের সঙ্গে

বলে। পশুপতিকে সে প্রতিবেশিদের সাঁড়াশি আক্রমণ থেকে নিজের একটা আশ্রয়ে নিয়ে এসেছে। তা বাদে প্রবীণ জনসাধারণের বিশিষ্টজনদের। তার আনুগত্যেই বাদ করে প্রেমিকের মতো পুরী চিকিৎসার। নিয়ে গড়ন অনুযায়ী আশ্রিতার করে আনুগত্যের সেবায় সে নিয়োজিত। পারলিক প্রেসের বা জনসাধারণের ব্যবস্থা পুরোই অনুকূল পশুপতির আনুকূল্যে। মুখুয়ার আক্রমণের আগে যার পরবর্তিক আক্রমণ। পরিস্থিতিতে এই সমস্যা নেই। এখানে প্রেমিক সাহেব আছে। সে সাক্ষাৎই নিয়ে ভোগ সাধারণ। এ কারণ প্রেমিক না করলে অবশ্যিত পাহারা বন্ধ হয়ে যাবে। পশুপতি মোহরকে পাঠায় পরিস্থিতিতে। মোহর পরিস্থিতিতে এসেই প্রেমিকের সাক্ষাৎই-এর প্রথম দিশাকরণ ব্রহ্মচোলাল পরনে নিয়ে যেয়। ব্রহ্মচোলাল পাওয়ার আশায় প্রেমিক ভিনদিকে হয় অবশ্যিত চৈতন্যধারায়। অবশ্যি তাকে সাদরে সম্ভাষণ করে। প্রেমিকের দেখে আশ্রমে আক্রান্তরা হয়ে পড়ে পড়ে—'...এসে এসো আমার সোজ প্রেমিক এসে...আমার এসে...আমার মেয়ে এসে।' প্রেমিকের 'আজের মানুষ' বর্ণটি মানুষ হিসেবে সে স্বীকৃতি যেয়। কারণ সে জানে, তার আনুকূল্যে সারাটী পীড়ে আশ্রমরক্ষা করে প্রেমিক। প্রেমিক আশ্রমের মুখ্য রাখে বলেই তার প্রাপ্য পাহারা তার যায় না। আনুকূল্যের হিসেবে রাজাবাটী কথা, পরমেশ্বরী কথা, আশ্রমিক সাক্ষাৎই কথা, পাহারা শাসিত জন্য অন্যান্য বিধি ভাঙিয়ে। ইত্যাদি ভোগের সাহিত্যেই সে পালন করে না। তার আনুকূল্যে ভোগ ব্রহ্মচোলাল সে চিন্তা করে না। প্রেমিক সে সহযোগে ভোগ ঠেকাবার জন্য। তাই প্রেমিকের প্রতি তার আনুগত্য বজায় রয়েছে। পরবর্ত প্রেমিকাকে অবশ্যিতে যাওয়ার কথা বললে, অবশ্যি বলে—'না মা ও তোমার যাবে।...এসব ঝোপঝাড় কাঁকরাতে ঢেঁপে ভোলে চলবে? আনুকূল্যে মরে এসব্যি প্রেমিক আমার। না মা, এসব অকাজের দিকে তুমি মোটে কিছুতে না যেয়ো।' অথচ প্রেমিক যখন বলে, ব্রহ্মচোলাল না খেলে তার চিকিৎসা বন্ধ হয়ে যাবে তখন সে নির্বিকার থাকে। ব্রহ্মচোলাল নষ্টিকে নিয়েই হয়ে বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। ভোলাল ছাড়াই প্রেমিক অবশ্যিই আসাকে পরাজয় যেয়। প্রয়োজনে ভোলালের পরনে পীতাম্বরী পাওয়ার পরতে বলেন। এ কথাটা শুনে প্রথমের আশ্বাস দেন। অবশ্যির পরে অবশ্যি ঘটনাচক্রে কাজ পরতে প্রেমিকাকে প্রয়োজিত করে। প্রেমিক নিরুপায় হয়ে ব্রহ্মচোলালের জন্য পরাশস্যুরে পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে অবশ্যি ক্ষুব্ধ হন। প্রেমিকাকে ক্ষুব্ধি দিয়ে বলেন—'তার সাথে আমার কথিনদিন, তার বরিতার ফুলে হয়ে তোমার আধিকার।' আর এই সংলাপে কথনকারী পাওয়ার ব্রহ্মচক্ষুকে দেখে আমরা ঘাঁচতে ঘিটি।

এ নষ্টিকে অবশ্যি যাঁকে যখন আমরা প্রথম দেখি, তখন তোতাই তাকে বাক্তিত্বহীন, চেতনাবহীন পাওয়ার হিসেবেই দেখি। মোহরের, তোতানুসেরা তাকে নিয়ে আছে। ভোলাল মনোবৃত্তির আশ্রমেই কিনি সমস্তকিই তোলাও নিজ নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে না। পদ পদ তার পদ পদস্খলন। যে যা বলে তা সমস্তকিই বিশ্বাস করেন। প্রথম অংশের নিম্নোক্ত খুদ্রাংশ একটি মূর্তিক হিসেবে অবশ্যি চরিত্রের চালকক্ষ কিনটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে :

'মুক্তি : আজে তোলাল তোলাল আজ্ঞে কেন? পীতাম্বর নিয়ে আজ চলিয়ে যাব যে...

অবশ্যি : হাঁ, আমি যাব।

প্রেমিক : (মুক্তিকে) এটা কি অবশ্যি চালাতের ব্যাপার?

অবশ্যি : (প্রেমিকাকে মৃদু জবাব করে) না, না, এটা আজ চালাতের ব্যাপার নয় তা বলে।

ফ্রেডিক : আমাদের মতো মানুষের বাড়ি। পীরসাহেব হতে যা।

ওয়াসি : আহা না, হতে যা।

ফ্রেডিক : জগতের পাপে যদি আমারই হয় না, আর জন্য দোসুত পা-ই চাই।

ওয়াসি : (মুগ্ধদিকে) বীর, দোসুত পা-ই চাই।

মুগ্ধদি : আর যে দেশে দোসু নেই!

ওয়াসি : (মুগ্ধ সজল করে) বীর, সে দেশে দোসুই নাই।'

অর্থাৎ, কখনও মুগ্ধদির দিকে ঝুঁকেছে, কখনও বা ফ্রেডিকের কথায় সায় দিয়েছে। একপক্ষের সে কখনও মৌলবীর পক্ষ নিয়ে বলেছে, ফ্রেডিকের মতো আমারই তার সহানুভূতি। পরমুহূর্তেই মত বদল করে বলেছে, মুগ্ধদির মতো মহীয়সীর একজন পরিচারকের পা দিলেই সব জোর সেরে যাবে। মেহেরবানিয়ের বিবি মুখ ফুটে কোনও ওয়াসির আচার-ব্যবহারে আমরা বিরক্তিকর লক্ষ্য করি। মৌলবীর পরামর্শে সে ঠেঙিয়ে উঠে বলে, একটি মেয়ের নিয়ে এতো বাঁচাবেলের দরকার নেই। একটা মেয়েলের পেছনে যদি জোয়ান এক ছেলেপে পড়ে, তাহলে মজলিসে রব তাবলা করবে কখন? মেয়েলকে ঠেঙে বড়ি মেরে পাড়ে ফেলে আসার আবেগ বেশ পরিষ্কার। আবার মুগ্ধদি যখন আসে, মৌলবীর মতো একজন আর্দ্রিটেনের পরামর্শে কেন তিনি পুনরায়, তখন মৌলবীকে পাল্লা দিয়ে সরিয়ে মুগ্ধদিকে কাছে ডেকে নেন। পরক্ষণেই মুগ্ধদির উপর রাগও ঝেড়ে যায়। ফ্রেডিক কবুতে বিষ মিশিয়ে মুরাদকে মেরেছে—একথা সে বিশ্বাস করে না। ফ্রেডিকের নিজের কেন পরিচয় থাকলেও লুকিয়েছে তার ইতিহাস চায় মুগ্ধদির কাছে। ফ্রেডিকের মেজাজে বড়ি খাওয়া হয়েছে কেন তার কারণও চায়। বড়ি খেলার দুঃখের কেন। দুঃখ যখন আকে পরিয়েছে এই পর্যন্ত যে, পরিচারকের মত ফ্রেডিক থাকবে, সন্তুষ্ট থাকবে মোহরবানি। তখন ওয়াসি নিশ্চয়তার সুরে মুগ্ধদিকে বলে, 'এ তো বড়ই সাধারণিক মেয়েলের মেজে নিজের দুঃখ। ও মৌলবি, ফ্রেডিক কি বলি, মুরাদের কাছেই তো আসি ফিরতে পারব না। এখন এরা উভয়পক্ষে যদি মিলমিশ করে না থাকে, আমার পক্ষে তাদুক চালানোই মুশকিল।' ওয়াসির মো-মিলন যখন পরক্ষণেরকে তার আত্মবিশ্বাসেরই প্রকাশ করে।

ওয়াসি খাঁ এক মিষ্টুর শাসক। তার তাদুকে মেটে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় তা সে মনেপ্রাণে চায় না। সকলকে সে নমিয়ে রাখতে চায়। পরিক্রমার চরিত্রার্থ করতে সে রক্তপোলাপ আটিয়ে ফ্রেডিকের অভিজ্ঞান বন্ধ করে দিয়েছে। রক্তপোলাপের জন্য তার পাছে মাথা ঝুঁইয়েও তার মুখর উঠেনি। উপরন্তু ফ্রেডিককে তাদুক মেরে শায়েস্তা করতে চেয়েছে। ফ্রেডিক পরিচারক ছেড়ে পলাশপুরে চলে যাওয়ার সংকল্প জানালে তাকে কঠোর শাস্তি দেয়ার ছলে বলে তিনি পাঠিয়েছেন—'কিন্তু ফ্রেডিকি করেছ কি...বলেছ কি, এখন বাকলা তোর জন্মের আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না।' ফ্রেডিকের অনিচ্ছায় সে ঘিনঘিনে হয়ে ওঠে। নিজে আকে নিয়ে করে তোলে। প্রথম আক্রমণ পরাস্ত মুগ্ধদা আমরা ওয়াসির মুখরহীন, দৃপ্ত, আত্মবিশ্বাসী চরিত্রের পরিচয় পাই। মৌলবির মুক্তিকে মেনে নিয়ে ওয়াসি নিশ্চিন্তে আসে যে, মুরাদকে বিষ দিলে তোমরা, মুগ্ধদিরই নিয়েছে। মেহেরবান মহিলা মুত ফ্রেডিকের হাতে তুলে দিতে চলেছেন। ফ্রেডিকের মেজাজ মেজে বড়ি খেলার আবেগ

নিয়েছেন। যদি খোলা হলে হাঁটুতে হাতুড় ছেলিমের জারজনি করে। সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে ঘটে ওয়ালি। পাশবিক আক্রোশে খুন করে ছেলিমের জনয়। রাগে আরে কাছে ছেলে লাঠির শেষের দীকাগে মুক্তুটা ছেলিমের পেটে ঢেলে পরে যন্ত্রণা দেয়। তারপর ছেলিম মাটিতে পেলে নিষ্ঠুরভাবে লাঠি দিয়ে পেটাতে থাকে। চিৎ হাতুড় মতো দুপায়ে দিয়ে বলে—'ঈঁর জন্যই আমার ব্রত। আমার একটি ব্রতকে তাহি সাজা দিই, তাকে শেষ করে ফেলা ছোটো ছেলে। এতোবড় আলেমের কাছে হলো আমার এই প্রথমটি।' ছুরাকে মারার অভিযোগ চাপিয়ে দেয় ছেলিমের উপর। নিষ্ঠুরভাবে ছেলিম প্রকাশের শাস্ত করতে চাইলে ওয়ালির মাথার ভারা পড়েগলুন ছেড়ে যায়। ওয়ালি ভাবে পড়ে, তার অজুহাতে ছেলেটাই চলবে তার ছাত্রুক। অথচ ছেলিমের অনুরোধে লাঠারা শান্ত হয়। ওয়ালি এটা ভালভাবে করতে পারে না। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সে ছেলিমকে ছুরো পেটা করে। ছেলিমের মতো শীর্ণ পরলম্বকের গায়ে হাত দিতে সেই পৌলবির একথা শুনে পরক্ষণে ওয়ালি বলে—'আরে আমি, পরলম্বর যে রে! আমি যা ক। এ আলুকের অমার যে, আমি যা ও।' পৌলবির পালেও সে ছুরো মারে। অথচা হারাদের আক্রোশে সে আবার ছেলিমকে ছুরো মারতে পারে। ছেলিমকে শুধু শারীরিক আঘাতের কারণই সে মরে যায়নি। আরো আলাদা নির্যাতন করার জন্যই মারা করেছে মোহরালি-এ গায়ে মাকে থন দিয়ে। ঘৈয়ারাণী, একদরকারী পাশকের ভূমিকায় অবতীর্ণ ওয়ালি। মরিয় সে নিজেদের পক্ষপাত মোহরলালিকে কঠিন শাস্তিদান হাতে না—'খুশি তো খাবি, এবার খুশি হ' তোমু মেরে ছুরো মারার মধ্যেই সে ছেলিমের জন্য ফলফলটি পাঠায়। এ তার নির্লজ্জতার এক ভূত প্রকাশ। মোহরের মাটি তার একটা মানের ছিলটি। সে নিজের কানে শুনেছে মোহরের ঘীলতোক্তি—সে পলাশপুরের চর। অথচ সঙ্গে সে মোহরকে ফিরিয়ার করে লাঠির পেরা মেরে তাড়িয়ে দেয়। এক ঘটিকার মোহরের মা থেকে পরাণ ঘুলে যেত। পশুপতির কাছে এখানে তার চৈতিক পরাজয় ঘটে। পশুপতি যে ছলায় কথাই মোহরকে তার ভালুকে পাঠিয়েছে এ ব্যাপারে তার মনে খটিকা থাকলেও সে তা ধরতে পারেনি। মোহরের মাতৃত্বলাভে সে ছেলিমের উপর শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন চালায়। এই অপরাধে বিন্দুমাত্র এক মহাপার শিকার হয় ওয়ালি। ছেলিম যেন তাকে মাটিতে মিশে, সেন করতেই পরিত্রাণপত্রে আছে বলে তার মনে হয়। অথচার মর্মে মাকে সে প্রতিমুহূর্তেই পরিচয় রাখতে চেয়েছিল, অপমান করেছিল, অবজ্ঞা করেছিল, আজ সে নিজেই অপমানিত বোধ করলো। লজ্জায় তার মাথা হেঁট হয়ে গেল ছেলিমের কাছে।

ওয়ালির জীবনের সবচেয়ে বিপত্তির দিক হল, লাঠিয়ের পেছে আছে লক্ষলালু হাতে হয় ছেলিমের কাছে। তখন সে কলাগাছ কাটিতে আছাড়। হাতে পায়ে শরম, সারা গায়ে শুকনো ঘা। শিক্ষাগুরু তাকে অবসর দিতে দিয়েছে। লাঠি খেলার কলাকৌশল শেখি। পরক্রমক লাঠির জন্য তাকে পাঠায়ছে, বলে, অন্যান্য গাছগুলে পরামর্শ দিয়েছে শিক্ষকগণ। কিন্তু আলুক ছেড়ে সে কিভাবে থাকবে? ছেড়ে তাহি ছুটি এসেছে ছেলিমের বাড়িতে। হাত জোড় করে কাতর স্বরে জীবন-ভিক্ষা চেয়েছে ছেলিমের কাছে— 'ছেলিম সেটা তুই আমাকে দীক্ষা।' সে তার অনুজ ছেলেন এসেছে পলাশপুরে। অনুজ চৈতিক প্রশাসনীয় সে ভুলে গেছে। প্রশাসী ভেবা ছিল সে তালগাছের পুঁথিতে সেটিও সে খুঁজে পাচ্ছে না। তখনই তার অন্তরাত্মায় আঘাত লাগে। পরক্ষণাত্মক হাতের তার পরাক্রম যে যায়নি তা বোঝা যায়, যখন সে বলে—'আমি তাহি ছাড়ব না ছাড়ি।

আমি এর হাত্যা করিয়েছি। এর ভিটেমাটি আমি ক্রোক করে নেব।' আহত জন্তুর মতো প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে তৎপর হয়ে ওঠে। দুষ্টু ব্যক্তির মেজাজ অর্থাৎ দুষ্টু চরিত্রের ওয়াসিল খাঁ। রোকিয়াকে সে দারুণ অপমানিত করে। হতাশার দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে তার মুখ দিয়ে—'যে তালুকের তালুকদার মরে পড়ে থাকে রৌদ্রে, সে তালুকের রোকিয়ার ঘরে খোদার নেই, শয়তানের নেই। জমিদার যাক, প্রজার যাক—সব যাক।' উনিশশতকে অবক্ষয়ের পটভূমিতে ওঠা জমিদারের অভিজাত তালুকদারেরা সমাজের বুকে এক দুষ্ট ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল। তাদের অত্যাচারে, নিপীড়নে তালুকের প্রজাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছিল। নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন, লাম্পট্য, অত্যাচার, অমানবিকতা চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। এ নাটকে ওয়াসিল খাঁ এমনই এক তালুকদারের প্রতিনিধিত্ব করেছে। আচার-আচরণে, দুষ্টু-মানসিক ভাবে, চিন্তা-চেতনায়, হিংসায়-দ্বেষণায়, নিষ্ঠুরতায়-বুদ্ধিহীনতায় চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

পশুপতি পোদ্দার : আর এক নিষ্ঠুর চরিত্র

'রক্ত রোকিয়ানামার' নাটকে পশুপতি আর এক কূটকৌশলী, অত্যাচারী, অর্থলোভী দুষ্ট চরিত্র। পশুপতি পোদ্দার শরাফপুরের তালুকদার। ত্রিশ বছরের যৌবনে ভরপুর। তালুকদারি তার হাতে নেই। তার বাবার ছিল সোনারুপা বেচাকেনার কারবার। যাকে বলে পোদ্দারি। পরের দিকে পোদ্দারি তার পোষায়নি। তাই সে কিনে নিয়েছে তালুকদারী। খলিলনগরের মুসলিম তালুকদার ওয়াসিল খাঁ-র সঙ্গে এই হিন্দু তালুকদারের সাপে-নেউলে সম্পর্ক। সে নিজেকে উঁচু ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা করে। ওয়াসিল খাঁ-কে খাটি ঘোড়াই মনে করে। ওয়াসিলের তুলনায় তার তালুকদারি ছোট। সে একদেশে রেটের পুষেছে। সম্প্রতি ডাক্তার আছে তার। ওয়াসিলের তুলনায় তার বাড়িটি ছোট এ পাঁচটি ডাক্তার কম। ওয়াসিলের আছে ঠাকুরের অর্জুন বাগান। শরাফপুরে অর্জুন নামে উপনাম, অত্যাচারে চালায়। তার তালুকের সামনে কেউ দাঁড়াতে পারে না। পশুপতি কিছু অর্জুনকে নিয়ে চিন্তিত নয়। তার বিশ্বাস, ডাক্তার বেশি থাকায়, বিশেষ করে অর্জুনের মতো ডাক্তার থাকায় খলিলনগর একটু বেশি সুবিধা পাচ্ছে তিনটি কিন্তু, 'আর আমারও অর্জুন বাগানের মতো একটা দুধেলগু গাভী করতে পারলে সুবিধা পাবে।' পশুপতি তিনটে কিনে এনেছে। ছোটটির বড় দুর্গী গাভী। ওয়াসিল পাশি করেছে ভারী। তার ছোটটিনির মাসের আগেই পাঁচটি পাড়া পশুপতি ঝাঁঝ করে হঠাৎ বলে—'কলের মতন বেশে উঠিয়েছো তিনটি নিয়ে গেলেই তালুকদারী, বাকি কয়েকটি না হয় কালো মাসের মতন বেশেই সারা যাবে।' পশুপতি জানে, একটি যেকোনো শরাফপুর আর খলিলনগরের অধিক গড়ে দিয়েছে। সে হলো রেফিজ সাহেব। রেফিজের মতো দানবতারী, দক্ষ চিকিৎসক শরাফপুরে একটিও নেই। পারলৌকিক ওষুধ বা জলপাত্রেও সে অদ্বিতীয়ই পিছিয়ে আছে। সামান্য আঘাতে রোগে তার তালুকে কয়েক শত লোক মারা যায়। ফলে খলিলের কাছে সে দ্রাবনিষ্ঠায় হয়ে আছে। তাই সে রেফিজকে পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। ওয়াসিল খাঁ-র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে। কোনোভাবেই কৌশল করে সে-ই খলিলনগরে পাঠিয়েছে। তার স্থির বিশ্বাস ছিল যে, কলকাতার বাদিনীর মেয়েকে শরাফপুরে আনা শুনলে ওয়াসিল খাঁ তাকে ছিনিয়ে নেবে। বাস্তবে তাই ঘটেছে। পশুপতি নানা কলাকৌশলে রেফিজকে নিয়ে আসতে চেয়েছে শরাফপুরে। সে কাজে ব্যর্থ হলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। প্রতিহিংসা চরিতার্থ

করতে সে শিখছে মেয়ে, ফ্রেডিমকে সারা পড়ালিখা করতে হবে। তাকে মার খাওয়াতে হবে। তার জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে হবে। কার্যক্ষেত্রে সে তাই করেছে। মেয়েকে নিয়ে ফ্রেডিমের বন্ধুদের জন্য উপলক্ষ পোলাও খাসির মিলেছে। মেয়েদের আসরের বিজ্ঞান বুদ্ধিকে মেয়ে মেয়ে-বন্ধু সেপ করিয়ে নিয়েছে ফ্রেডিমের উপর। ফ্রেডিমের বন্ধুরা সেটেই খুশী মারা পেয়ে আসে আরা আসরে করেছে। ফলে ফ্রেডিমের একদিকে সম্মান হয়েছে, অন্যদিকে অবাধিত অনুযোগটি পেয়ে হয়েছে, মেয়েদের পাশে থাকে বসে দিতে হয়েছে। এসব পশুপতির নিকট খুবি ভালো লাগে। সেই সাথে ফ্রেডিম শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে বিশেষ হয়েছে। তার মোক্ষম চালে ঘায়েল হয়ে পড়েছে অবাধি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে পশুপতি মধুমিতা আসে মধ্যেদের বিশ্ব ফ্রেডে দিয়েছেন, তাকে ঈশ্বরমিত করে তুলতে ফ্রেডেছেন এই বলে যে, ফ্রেডিম এখন পলাশপুর হয়ে আসছে। ফ্রেডিম সম্পর্কে সে তখন মিথ্যার ফুলঝুরি ছড়াচ্ছে। ফ্রেডিমকে সে কত বিদেশ পলকলাড়ি, দিয়ে খুবি মেলে আছি, আসবাব, নানারকম গাছ আর একটি আছি মোড়া। মেয়ে বলে মধুমিতাকে খুশিয়ে মেয়। মধুমিতাকে বিস্মুল করে বলে—'মোলাকটি মেয়েদের আধুনিকতার ওপর বিশেষ মুগ্ধ। কী সব বলছিল, মোলাপমূল পাচ্ছে না, বমুল বানাতে পারছে না...কী সহি একটি আমিকার আসিছে আছে তার...।' ছাপার অক্ষরেই আমিকার করে পশুপতি। মধুমিতি অবাধমিত হয়ে চলে যায়। পশুপতি খুবি নিজেদের ভাবটি প্রতিপক্ষ অবাধিকে সাজানোমূল করতে মেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সে সফলও হয়েছে। এই সফলতার পিছনে তার বুদ্ধিমি, উপস্থাপনা মধুমতী, দীর্ঘ বিস্মুল ও সূক্ষ্ম অবলোকন কাজ করেছে। অবাধি খী-র আমন্ত্রণ পত্র পেয়ে সে অবশ্যই মেয় করলেও নিরুৎসাহিত হয়নি। বরং মুহূর্তেপলে সে পত্রবাহক মধুমিতাকে খুশিয়ে মেয়, আপ্যায়নিটিতে তার বিশেষ নজর আছে। তার মোটিভেশনটি ফোটোতে অলকারাম। বাসিন্দীনাড়ার অবন সে আপ্যায়ন করছে। আসের একজন আছ মোহা সে। পরমুহূর্তেই সে অবাধিত উচ্চেসের বিস্মুল-বল ছুঁড়ে মেয়—'আমার প্রতিবেশীর যে সাহীতে মন মেয়েছে, এটাই বড় কথা। তাঁর মত উচ্চমানীয় বিদুষী যেন সে অনেকদিন প্রতিবে আসর মেননি, এটাই বিস্ময়ের।' একপর্যায়ে সে মুদুস্বর মধুমতার মোমবাতী মতো মুখটিম মেয়। সেই মুখটিমে আর অহঙ্কার ও মূর্খতা যেন যৌথ হয়ে মেয় মেয় হয়ে আসে।

দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে ফ্রেডিমের সঙ্গে পশুপতির সাক্ষাৎ ঘটে। মেসমুহূর্তে পশুপতি ফ্রেডিমকে মেয়েই আন নজরের আসনে মুসলিল। আজ ফ্রেডিমকে কাছে পেয়ে সে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে। নিজের বিরাট মোলাপমূলের কথা মতে সে ফ্রেডিমকে বশ করতে চায়। কিন্তু হতাশ হয়, যখন মেয়ে ফ্রেডিম মহিমাপন্ন ছেড়ে চলে আসেনি। সে এসেছে অনুশ্য মোহনের জন্য তার অভিজিৎ বন্ধুর নিয়ে। কিন্তু পশুপতি অবধারণে চলে যায়। কিছে আসে, যখন মোলাপন্ন মোহন ও মুগুলকে তাড়িয়ে মেয় মুখী ফ্রেডিমের কাছে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে—আজকের এক প্রীয়তে মোর মেয়ে পলাশপুরকে পীরাসনের জন্য। তারপরেই ফ্রেডিমকে এক মাসের জন্য পলাশপুরে মেয়ে যাবার প্রস্তাব মেয়। ফ্রেডিমের মন পলাশার জন্য এক মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করে সে। ফলে, প্রথমবার গভীর রাতুপাড়ুলি মেয়েতে মারা যাচ্ছে শুনেও ফ্রেডিম চলে যাবে। ওরা কি এতটাই আঘাত তার কাছে। ফ্রেডিমের কাছে সে স্বীকার করে—'সত্যি মোহনকে পাবার জন্যে অনেক উৎপাত করিয়েছি আমরা।' পাশাপাশি একপাশ জানিয়ে মেয়, 'মন উদ্দেশ্য ছিল না আমাদের। যা করেছি আমার প্রয়োজনের মনাসনের জন্যে করেছি।' ফ্রেডিমকে সে অনুরোধ করে ফিরে আসতে

পরিচয় দিতে। আর সেদিনগুলি ফ্রেডিমকে বিশ্বাস করতে না পারার প্রতিক্রিয়াটি ছিল। এক্ষেত্রেও সে সফল হয়। ফ্রেডির থেকে যায় পশুপালপুরে। বিশ্ববিদ্যের একটি অংশ আর পুরণ হয়। অবশিষ্ট দীপকে চলার আমার শ্রেণী তার সফল হয়। এক যাত্রায় জন্য হলেও ফ্রেডিম তার আত্মীয়ে অনুভূতিকে জাগ্রত করতে পারবে—একথা ভেবে সে গভীর তৃপ্তি পায়।

এক বছর পরেই আমরা পশুপতির মুখোমুখি, কিন্তু তাহলেও মুখের পরিচয় নয়। শিরাদের মুখোশ নয়, হাজারো হিংসেরা তার মন লক্ষ্য করি। এক বছর আগে সে ফ্রেডিমকে পাগলপুরে পাঠানোর অনুরোধ করেনি আর অপমান করে তাড়িয়ে দিতে চায়। যার কাছে সে একদিন সকলকালু হয়ে ছিল, তাকে সে আজ লঘিষ্ঠ মানুষেরও নিচে করে না। তার খুড়তো বোনদের বাপটিই তুলে দিতে চেয়েছিল ফ্রেডিমকে, সেই ফ্রেডিমকে আর চিকিৎসার সুযোগ কেড়ে নিয়ে তাকে আন্তাকুড়ে নিক্ষেপ করতে চায়। এমন কি ফ্রেডিম মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করার জন্য জানিয়ে দেয় যে, তার মনুষ্য মেয়ে-মেয়ের মায়া নেই। ফ্রেডিম আজ তার কাছে অপরাধী। কারণ ফ্রেডিম তাকে লাভুকলাল হিসেবে তার কর্মসংকর্ম সম্পর্কে সচেতন করতে চেয়েছে। ফ্রেডিম তার আচরণ অমানুষ করে মেয়ীর সেবা করতে গেলে পশুপতির লঘিক আর হাত, পা ভেঙ্গে দিয়েছে, মাথা ফাটিয়েছে। টৈরবাহারী শালকের বন্ধ আর অমরার আস্ফালন নিয়ে সে ফ্রেডিমকে ঘিরে ধরে রেখেছে। ফ্রেডিমকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। লঘিকার মতোন ঘিন্ন সহজলভ্যতাকেই চরিত্রটির নাম দিয়েছেন পশুপতি। এক পাশব লঘির অধিকারী সে। মায়া জিনিষটি তুলো আর উপলব্ধি নেই। এই অন্ধ সমাজের মতোই তার পশুপ্রবৃত্তি মুক্তার দিয়ে উঠেছে। বিশ্লেষ করে, ফ্রেডিম প্রজাপতির তাদের লঘির সম্পর্কে সচেতন করছে—এ সমাজ শেখানো নয় তো আর ঘিরে দীক, মন তৈরি হয়ে আসছে। দীক্ষা পাবার প্রস্তাব করেছে ফ্রেডিমকে কেন্দ্র করেছে ফ্রেডিমের জন্য। এই নিষ্কাম, নিষ্ঠুর, মুখোশ চরিত্রটিকে লঘিকার সচিদানন্দবাবুই আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

পশুপতি ঃ সহজ ও মানসিকতার প্রতিমূর্তি

'পঞ্চ ' ফ্রেডিম সংবাদ' নাটকে পশুপতি চরিত্রটির খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রেডিমে অবকে সাজানোর ভুল ঘিরে পশুপতির উত্তোলন হয়। ফ্রেডিম সাহেবের অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করার কঠিন লঘির সে নীরে তুলে নেয়। ফ্রেডিমের অনিচ্ছাসত্ত্বেও, কাজটিকে অন্ধ অন্ধ পৌঁছে দিতে সে-ই এগিয়ে আসে। সরলতা ও মানসিকতার প্রতিমূর্তি সে। ফ্রেডিমের অবকে সে নিজের মতো অনিচ্ছা মেনেছে। সঙ্গী হিসেবে পেয়েছে ছাত্রেছাত্রীকে, বৃদ্ধ ভিখারী ছাত্রেছাত্রীকে। ছাত্রেছাত্রের কল্পনা আর প্রতিমে ছাড়া মেনেছে। কাজের মাঝখানে লঘিতে পাঁড়িয়ে আছে পশুপতি চরিত্রটি। লঘিকার মতোন ঘিন্ন লঘির মতোন মতে তুলেছেন পশুপতিকে।

পশুপতির প্রথম ও প্রধান পরিচয় সে ডাকাতের বংশ। ডাকাত অন্তুল সর্দারের নাতি, ঠাকুরাত অন্তুলের নাতি। অন্তুলকে সে মনেপ্রাণে ভালোবাসে, কিন্তু তার ঘিরে, তথাকথিত, অমানবিক মূল্যবোধকে সে মেনে নিতে পারে না। অন্তুলের আদর্শিক জীবনকে সে ঘৃণা করে। তবু সে তার আদর্শ তার মুখে তুলতে তার আর মেরে থাকা যায় না। আর মাঝে-মাঝে কারণ, সেটি মো একটি না, সন্তানটি মেরেছে। ঘৃণা হয়েছে, তবু

খেয়েছি। আর না... এর আর আর জীবন না।' এই সিদ্ধান্ত নেওয়াই সে কাজ নিয়েছে ফেব্রিকের বাড়িতে। ফেব্রিক মেয়েটার ইতিহাস জানে যা পড়ে তার সিদ্ধি আর গঙ্গাফড়িং লাগে। ফেব্রিক অবশ্য তাকে আর্থিক ক্ষতিই দেয়। পলাশপুরে একজন ঠ্যাঙাড়ে গোড়া পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে—এ সংবাদ শুনে গঙ্গাফড়িং আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। পাছে তাকুলের ফাঁসি হয়, গোরা পুলিশের পুলিশে তাকুল মারা যায়-এসব চিন্তায় সে উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। তাকুলের নিশানের কথা জানতে নিয়ে সে মেয়ের জন্য ধান কাটতে ভুলে যায়, ভুলে যায় ফেব্রিকের কথাগুলি শালবনে ঘুঘুরাতে প্রথম উপলব্ধন রক্তপোলাপ নিতে। ফলে সে ফেব্রিকের স্নেহের শিকার হয়। কারণটি ঠৈরি করতে তার নিজের আবার আছে-ফেব্রিকের এই অধিকারবোধকে সে অবশ্য স্বীকার করে না। অধিকারের আর প্রশ্ন আসে আগে ভাল-কাল-ভিত্তি-সবকিছু সব ফেলে সে চলে যায়।

গঙ্গাফড়িং গ্রামের সহজ সরল অশিক্ষিত মানুষ। কিন্তু জীবনের নানা অভিঘাতে সে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। সে সহজেই বুঝে যায় যে, ফাজিল বৌ আর পশুপতি সোনারের ষোগাষোগে নানার বুড়ী ঝিয়েরে আকড়ে ধরেই তার স্বামী তাকুল। বহিরাগত যে পলাশপুরে তার স্বামী ঠ্যাঙাড়েগিরি করছে — সেটাই সকলে বিশ্বাস করছে বলে তাকে কেন্দ্রাদের জন্য কেউ দায়ী করছে না। পশুপুলা ছাড়াদের কাছে তাই মনের কোণে টিপ্‌পে দেয় প্রশ্নে—'কত ডাকাতি দেখে দেখো না। একটা ঠ্যাঙাড়ে, সে পলাশপুর না পরিয়াপাড়ে মধুর ঠ্যাঙাড়ে — সেটাই হচ্ছে ছোড়াদের পক্ষপাতের বিচার্য।' দেখা যায়, গঙ্গাফড়িং প্রতিটি কঠোর আক্রমণের মতো দাঁড়িয়ে আছে। তাকুলের দুষ্কর্মকে সে দুষ্ট করলেও তাকুলকে ঘৃণা করে না। বরং স্বামীর প্রতি তার আবার ভালোবাসা আছে। আক্রমণের নিশানই সে তাকুলকে বিশ্বাস করেছে। বিশ্বাস করে ঠকেছে। তাকুল তাকে ভুল বুঝিয়েছে। তাকে বলেছে সে আসলটি ছেড়ে দিয়েছে। আর না ফুঁয়ে দিয়ে বলেছে, সে আর জীবনে মানুষ মারবে না। গঙ্গাফড়িং মন আবেগে ভেঙে উঠেছে। সে পরিপাটী করে চুল বেঁধেছে, আলতা পরেছে, কপালে সিঁদুরের এক মাপা ফোঁটা টেনেছে। সরলমনা গঙ্গাফড়িং চিনে উঠতে পারেনি স্বামী তাকুলকে। তাকুলের প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়ে নিজের ও ফেব্রিকের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। সে তাকুলের কথার মান দিয়ে ফেব্রিককে বলেছিল, পলাশপুরে আলুকদার পশুপতি সোনার তাদের বসতভিটের জমি নিয়েছেন, সেজন্যই তাকুল গঙ্গাফড়িং পরিবারকে নিয়েছেন। তারা পলাশপুরে গিয়ে খুব শান্তিতে বাস করবে। ফেব্রিকেরও তাদের সঙ্গে চলে যেতে আপত্তি থাকে। ফেব্রিক যাতে তাকুলের অনুগামী হয়ে ওঠে তার জন্য তাকুল অনুপুঙ্খ বর্ণনা করে। ফেব্রিককে শাসায়, তার সাথে ঠ্যাং ভেঙে দেয় বলেও ভয় দেখায়। গঙ্গাফড়িং বুঝতে পারে, তার স্বামী তাকে ভুল বুঝিয়েছে। রাগে, ক্ষোভে, অভিমানে সে বলে ওঠে—'আমারে ছল করেছো তুমি?' স্বামীর দিকে তাকাতে গিয়ে মাথার ঘোমটা খুলে যায়। স্বামীর বাক্যের ছিটকে পড়ে যায়। ভিতর থেকে আরও বের হয়ে আসে গঙ্গাফড়িং। স্বামীর প্রতি ভালোবাসা ঘৃণায় পরিণত হয়। স্বামীর অকল্পনীয় বিশ্বাস সে গঙ্গাফড়িং মন অভিমান হয়ে উঠেছে সেই গঙ্গাফড়িং এখন স্বামীর মৃত্যুকামনা করে। স্বামীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। শয়তান স্বামী, মধুর মায়া হাতে তাকে জড়িয়ে ধরলে তার নখীয়ের নিয়ে ভুলে মারতে ইচ্ছে করে। একটি তার, আতঙ্কে গঙ্গাফড়িকে ঠেলে সরে—'ঠেলো না, দিন না খালার কাজড়া ঠেলে ও আমার গঙ্গাফড়িকে হত্যা করে।' যা হিসেবে গঙ্গাফড়িং এই পুলিশরা আসবেনি, খুবই স্বাভাবিক। তাই সে ফেব্রিকের কাছে এসেছে, স্থানীয়ভাবে ফেব্রিকের বাড়িতে থাকা করতে। সে জানে, কাজ শেষে নিজের মতো বাঁচতে পারবে সে আর তার সন্তান। বিশ্বাসের আড়ালে সে তার স্বামীর দুষ্কর্মগুলোর জন্য ফেব্রিকের

কাছে সুখ আশা করে। অন্তুল যে আঘাত দিয়েছে, আবার ফেলিসাকেও দিয়েছে—সেজন্য সে দীপার করে। সবাইকে দীপার করতে শিখেছে পঞ্চাননি। তার চরিত্রের সরলতা ও নির্মলতা আমাদের মুগ্ধ করে।

ফেলিক সাহেবের সঙ্গে পঞ্চাননির সম্পর্ক বড়ই মধুর। পঞ্চাননি ফেলিসের সংসারটি মধুরভাবে নিয়ন্ত্রণ করছিলেন মা। উভয়ের সম্পর্ক যেন পিতা-পুত্রের মেহ - ভালোবাসা, সমবেদনা আর সহমর্মিতার সম্পর্ক। ফেলিসের প্রতি তার যেমন কঠোর আছে, তেমনি আশার আছে। সে গভীর মনোযোগ সহকারে ফেলিসের কাজগুলি নৈপুণ্যের সঙ্গেই নিজে নিজেরে। ফেলিস মোহনের অন্তরে যতগুলি খাঁ-ন উপেক্ষাবোধ জন্মগ্রহণ হলে, তার মোকে পঞ্চাননি ফেলিসকেই দোষারোপ করে। ঘটিটি মোহনকে ঘটিত করে শীতলপাটিতে বসিয়ে তার পিতামের জন্য অন্তুল নিয়ে ফেলিস ঠিক কাজ করেনি—একথা ফেলিসকে স্মরণ করিয়ে দেয় পঞ্চাননি। ঘটিটি সম্পর্কে ফেলিসকে সতর্ক করে দেয়—'এরা এরকমটি ছিল। জলাবসন্তর যারি মানুষেরে কলমবাবার খুতে মেলে।' ফিরিয়ার মোহন ফেলিসের কাছে নিজের জন্য অন্তুল নিতে এলে পঞ্চাননি মোহনে মেটি পড়ে। মোহনকে তীক্ষ্ণ ভাষায় ভর্ৎসনা করে, তিরস্কার করে, অপমান করে। আসলে পঞ্চাননির চরিত্রে এক প্রতিবাদিনী সত্তা আছে। অন্যায়, অবিচার, অসম আচরণ সে সবসময় বিরোধিতা করেছে। মোহন ফুলকলসর আসার ফেলিসকে দিগন্তে মেলাতে এসেছে মনে তার মনে হয়। তাই সে ফেলিসকেই ফেলিসকে সতর্কমান করতে চেয়েছে—'আলো চাল মোহ আপনা তারাতারি। মোহন মোহ আচরণ কারণ এরকমি পথ মেলে এসেছে একা একা। আপনারে বাসস্থানান ফুলাতে, হাঁ। আর এমন মোহমায়ুমের আশায়ে মেলে মোলে আপনারে মিটিয়ে মোহ মেলমেলন মোহ পাশে দাঁড়াবে না, হাঁ।' কিন্তু সে যখন বুঝতে পারে, মোহন আল আরিতে আছাড়ায়। অন্তুল মেলমায় ফিরেপেই সে ফেলিসের কাছে এসেছে, তখন মোহনের মরি আর সহ্যানুভূতি আগে। মোহনের আল দাঁড়ানোর জন্য উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে। ফিলফিল হয়ে ফেলিসের কাছে জানতে চায়, মোহনকে সে বাঁচাতে পারবে কি না? পঞ্চাননির এই আচরণগুলি আমাদের অভিভূত করে। আবার মোহন যে তার কৃতকর্মেরই ফলভোগ করছে, মোলমেলন সে নির্লিপ্ত স্বরে করিয়ে দেয় মোহনকে—'আমা আচরণ নষ্টিমাহেনা, যে খুনের আপনের আল বাঁচাবে, মরিয়াবন্ধু না নিয়ে সেই খুনখটিকেই কি না আপনে আগে আটিলাবেন।' মোহন যায়, অভিজ্ঞা পঞ্চাননির আচরণ কিছু মোহন নিয়েছে, কিন্তু মোহন নিয়ে পারেনি তার সমস্যা ও বিপদকে। জীবনের অভিজ্ঞতায় সে সহজ কথাকে সহজভাবেই বলতে শিখেছে।

পঞ্চাননি প্রতিবাদ করে। হাসি, ঠাট্টা, তামাশা, মজলায় সে নিপুণ। আহমেদ সঙ্গে, মোহনের সঙ্গে সে মাঝেমাঝে ঠাট্টা তামাশায় মেতে উঠেছে। ফিলিপি আহমেদকে সে আশা করে বলে—'সেই কথা ফিলিপির পাকলাই বাদনা, কী প্রয়োজন পাপিটির কলিজা ছিঁড়ে।' আবার ফিরিয়ার মাংসের ফিরিয়ার মূল্য, ফেলিস যখন আকে বলে, তার কাজগুলি মোহনা যায়, তখন সে মুচকি হেসে বলে—'কাজগুলি-এর অভিমকে মো কাজ না।' তার প্রতিবাদ যেন মোহনিকাদের ছুঁয়ে যায়। কখনও কখনও তার কথা মোহে যাবে পড়েছে, তীব্র শ্লেষ। যায় মুখুরে ফেলিসের সংসারে সে কি করেছে, মোহনের এই জিজ্ঞাসার উত্তরে সে তীব্রস্বরে মুখর বলে—'মোহনা পাকিয়ে... মোহনা মোহনা। ... মাঝে মাঝে বিমুখের পঞ্চাননিও পাই।' এই রসপ্রবণতাসম্পন্ন নারীর নিজেরিনী মূর্তিও আমরা মোহনে পাই। পশুপক্ষির সহজ জলনায়ের কাছ মোকে আমরা আরো পাই যে, পঞ্চাননি নিজের হাতে নিমুলনাকে ফাঁসী কাষ্ঠুলনাকে ধরা করেছে। তাইই আমরা তার গলায়

রেগে সে তফুলকে খুন করেছে। বলা যেতে পারে, খুন করতে বাধ্য হয়েছে। কারণ তফুল একদিন সন্ধ্যাবেলায় গঙ্গামণিকে বেধড়ক পিটিয়েছে। সেখানেই সে থেমে থাকেনি। তার দু' বছরের সন্তানকে মেরে ফেলতে গিয়েছিল। আর এখানেই গঙ্গামণি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। যে আশঙ্কায় সে ভীত হয়েছিল, সেই ঘটনা চোখের সামনে ঘটতে দেখে সে স্থির হয়ে ওঠে। স্বামীকে হত্যা করে দিনদিনের অত্যাচার, লাঞ্ছনার সে প্রতিশোধ নেয়। কিন্তু আদালত নিষ্ঠুর পরিহাসে আসল আসামীর বদলেই পুরস্কার সে পায় না। পায় সেই ব্যক্তি যে অন্যায় করেছে।

হেকিমের জীবনের শেষ দিনের হেকিমের পাশে থেকেছে গঙ্গামণি। গঙ্গামণির কোলে মাথা রেখেই হেকিম চিরনিদ্রায় শায়িত হয়। গঙ্গামণি এখন সাহসনায় থাকে তার সন্তানকে নিয়ে। স্বামীকে খুন করার অপরাধে সমাজ তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। গঙ্গামণি এখন হেকিমের দাওয়াই প্রস্তুতের প্রণালী শিখে ফেলেছে। কোন রোগে, কাওয়াই বানাতে হবে তিনের জোগাড়ই, বিদ্যুতের কলকাঠি তার আয়ত্তই বহুগোত্রান। আত্মসম্মানের উপর আর আঘাত করতে হবে না। নিজের আত্মমর্যাদাই সে লোকালয় গড়ে দাঁড়িয়েছে। সেই গাছ দোকানে বসে গেছে। নিজের আয়ের প্রতি বিশ্বাস ফেরেছে গঙ্গামণির। হেকিমের অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করার শপথ নিয়েছে সে। হেকিমের অসম্পূর্ণ কথাকে বাস্তব রূপ দিতে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দৃঢ় কণ্ঠে সে উচ্চারণ করে—'আমি দিন না হতে বুঝা, তোমার পারে বেরিয়ে পরে আমরা, বসে রাখব। আমাদের বিশ্বাস বিদ্যুতের কলকাঠি উঠেছে, সেই কলকাঠির বসে রাখব।' গঙ্গামণির এই সংলাপে নাটক শেষ হয়। কিন্তু শেষ হয়ে যায় না হেকিমের আবিষ্কার। হেকিমের স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন চালিত হয়ে গেছে গঙ্গামণির বুকে। গঙ্গামণির জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি সেটিই। তার আত্মজের সাহায্যে সে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। হেকিমের আবিষ্কৃত পথেই সে হয়তো আবিষ্কার করতে নিয়োজিত হয়। সঙ্গী হিসেবে পেয়ে গেছে বন্ধু হাসেমকে। সকল বাধাকে জেনেও যুদ্ধ করে গঙ্গামণি এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছে। এই স্বপ্নই গঙ্গামণির চরিত্রকে আলাদা একটা মাত্রা দেয়।

হাসেম : গুরুত্বপূর্ণ এক আকর্ষণীয় চরিত্র

'নব হেকিম সাহেব' নাটকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণীয় চরিত্র হাসেম আলি। হাসেমের প্রথম ও প্রধান পরিচয় সে ভিখারি। অসহায়ের বৃদ্ধ ভিখারি। নাটকের প্রথম দৃশ্যেই হেকিমের কুটিরে আমরা হাসেমের দেখা পাই। নাট্যকার হাসেমের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—'হাসেমের পিঠে ঝোলানো ঝুলির মধ্যে তার যাবতীয় সম্পত্তি-বোঁচকা বাঁধা আছে, কিন্তু গায়ে সাধারণ ধরনের একটা ছেঁড়া আলখাল্লা আছে। ভিখারি হাসে হাসে কাঁদো করে যাওয়া যায়।' লক্ষণীয়, ভিখারি হাসেম যাচ্ছে এ দৃশ্য দুটি মিলন। এ ব্যাপারে হাসেমের নিজস্ব একটা ব্যাখ্যা আছে। এ নাটকের অন্য একটি চরিত্র নছর তাকে বলে-দুনিয়ায় কোন ভিখারি ভিক্ষা করতে বসে আলখাল্লা গায়ে যাওয়া যায়? কোন দিয়ে? হাসেম সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়—'দিয়েছে নাই। কছরায় আছে। এককালে তো লোকই ছিলাম : সেই লোকগুলির একটা চিহ্ন ধরে রেখেছি যে [illegible]।' বোঝা যায়, হাসেম জাত ভিখারি নয়, অবস্থার বিপাকে পড়ে তাকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়েছে।

সহজ, সরল বুদ্ধির অধিকারী হারেম। আর অসাধারণ পাকস্থলীর ছিল। খাবারের দোষ-গুণের ধার ধারেন। ফলে খাবারে নির্মম পরাজয়ে সে অবলীলায় জিহাদ করে। ডেলিমের কথায় আমরা জানতে পারি, হারেমের হাত পায়ের শিরাগুলি জট পাকিয়ে গেছে, মেয়ের রক্ত চলাচলে ভীষণভাবে ব্যাঘাত ঘটিয়ে। এ রোগের চিকিৎসার জন্য রাই চড়াই পাখির মাংস। আজও তা দিয়ে ডেলিম তৈরি করতে হারেম জটিল ঘুম। ইউনানি চিকিৎসার একমাত্র অবলম্বন বন্ধুর। চল্লিশ বছরে ডেলিমের ঘটিকে হারেমে হারেম। কিন্তু ডেলিমকে সে সবসময় অনুযোগ করে—'... সে বাপ, আমার জিজ্ঞাসে সে। তোর মেজিন বাপ, পুরা জিজ্ঞাস না পুরা সেরাসে সেরাসে আর আমাকে জিজ্ঞাস দিতে না। আমার জিজ্ঞাসে বন্ধ চলুক, বাইরিয়া আমার এমনই আরাম থাক।' আসলে হারেম জানে, তাকে জিজ্ঞেস করেই মেয়েটির জ্বালা মেটাতে হবে। কিন্তু মুশকিল, সরল জিজ্ঞাসীটে মেটি জিজ্ঞাস মেয়েন। ফলে বাস্তবের সঙ্গে, সহানুভূতি আসার আকাশে হলে কখনও কখনও অনুপস্থাপনার আশ্রয় করতে হয়। সুতরাং জিজ্ঞাসে সুস্থ থাকলে সে সরল থাকবে, আর মাইয়ে অনুপস্থাপনার স্থান থাকলে জিজ্ঞাস জিজ্ঞাসে। সহানুভূতি যা আর হারেম জীবনের অভিজ্ঞতায় অনেকখানি মেয়েছে, অনেকখানি দিয়েছে। আমরা জিজ্ঞাসির আগে সে যে আরও দিন জিজ্ঞাসি, আরও বেশি অবহেলিত-এই বাস্তবতাও তার ছিল। গজনবিদের হাতায়ে স্বামী অনুজ তাকে পলাশপুরে মেয়ে বলে মেয়েদের পর পর জিজ্ঞাসি আগে অনুজের মুখে একথা শুনে হারেম সঙ্গে সঙ্গে বলে—'ঘুর য়। পর পর জিজ্ঞাসি থাকলে তো আমি মেয়াই সহানুভূত মেয়না।' মোক্ষ সত্য, অর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কেই হারেম জীবনবাস্তবে সচেতন।

হারেম ডেলিমকে আলোবাসে, ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, আর গজনবিদের প্রতি তীব্র নফরতপূর্ণ সহানুভূতি ও সহমর্মিতা আছে। গজনবিদের সঙ্গে তার সম্পর্ক সহজ অনুজ। গজনবিদি ডেলিমের সংসারেই মূল উপকরণ সরবরাহ হারেমই তৈরি করে। এই অসহায় ডেলিম তাকে জিজ্ঞাসার করে আড়িয়ে মেয়। গজনবিদির প্রতি ডেলিমের এই মুগ্ধ সহানুভূতি হারেমকে আহত করে। এক মুগ্ধ অভিমান নিয়ে সে ডেলিম অর্পণা করেছে পরোপকার দুই মেয়েটির মেজাসি। আর মুগ্ধতা পাবি মোক্ষায়। বীসমেয়ের আশিয়া তো মেয়া বী-বী। এজন্যেই সে আসল সত্য উপলব্ধি করে। ওয়াদি বী-র মেজাসে আশিয়া একা ওয়াদি বী-র আশিজির কথায়। আশিজির মেজাসে মেয় অসাধারণ। মোজাস ছাড়া তার এক দন্ড চলে না। তার হাতে, মাথায়, মুখে, বীয়ে মেজাস। ওয়াদির আশিজি হিসেবেই প্রথমতঃ সে উপলব্ধি করে। অর্থাৎ এ নাটকের মূল মনের আসল হারেমের কথাতেই স্পষ্ট হয়। মুখ মাজন কথা বলতে হারেম কখনও পিছপা হয়ে না। গজনবিদি তার স্বামীর অপরাধমূলক কাজ কর্মের সমালোচনা করলে হারেম তাকে সজন নসিহত মেয়-'আরে মসি, মানুষ চৌদ্দিনে অনুজ সে এতো এতো আর কথা আসে, মোক্ষা তো সেটি মিসি খায়।' ডেলিমের খাবারটি তৈরির জন্য খাসি মেজাস আসলে ডেলিম চিন্তায় আসায়। খাসি মুলে ডেলিমের খাবারটি তৈরি হয় না। ডেলিম ছালা কাই নিয়ে হারেমের দিকে মেয়ে যায়। নিজের কাজের সমর্থনে সে যুক্তি মেখায়-'ই, এই মেয়ে আমরা খাইকে খাসি ... আর, এক খাওয়াই নিলাপি হয়ে যায়। অনুজের মেয়ে খাওয়াই-এর কথা মেশি।' হারেম আসাদুক মেটা মেটার অনুজ মোক্ষায়। এটা পাকা মেটা মেজাসি, মেজাসি, মিরিয়াসি, খাস মেয়। কিন্তু তার আন্তরস্থান মেয় আছে। তাই ডেলিমের কাছে আর আসতে না মনে সে অভিমান করে চলে যায়। যাওয়ার সময় ডেলিমকে জানিয়ে যায়, তার মন খুব ছোটো হয়ে গেছে।

হারেমের কণ্ঠে সুর আছে, মনে মুর্তি আছে। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই গজনবিদির খুতনি মেড়ে সে

গান ধরে-'কলিতে যা ধরিলে কলি সে যায় না .... ।' দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের 'এ কথা সত্য সে কথা..' গান করে। তার গানে ও কথাবার্তায় আছে উঁচু শ্রেণি। ওরালি মেকিমকে ভুলোবেশী ভেবে তাকে ফলমূল পরিবেশন। হাবেমের ঘরে এটি 'ভুবি ভেবে কলমান।' ওরালি মেকিমের জন্য চিঠিতে—বন্ধুত্বের মূলে একথা পুনঃ হাবেম কর্তৃক করে—'এক পুড়ি চিঠিতে।' নিজের আত্মভূমির প্রতি হাবেমের গভীর ভালোবাসা আছে। তার ভালোবাসার আবাহনে অভিভূত করে। পরিব্রাজক ও পলাশপুরের অন্যান্য প্রতিবেশিদের সে পরিব্রাজক বলে ওরালি খাঁ-র পক্ষই নেয়। আকাশ অঙ্কুল পলাশপুরে ভুটিপাই, খুনখারাপি করে বলে পাঠালেও সে অঙ্কুলের কাজকে সমর্থন করে। ফলে পলাশপুরের পশুপতি অঙ্কুলকে খাঁচিয়েছে খুনে হাবেমই প্রথম সন্দেহ প্রকাশ করে। অঙ্কুল মেকিমকে পলাশপুরে নিয়ে যেতে চাইলে সে মেকিমকে সতর্ক করে দেয়-'ওরে মেকিম, তোমার মনুষ ভোরে এক ভালোবাসে। ভোর মেমরে বড়ি দিতে ছুটে যেন দিনু দিনু। সেই সব আনন্দময় ছেড়ে পলাশপুরে যেতে চাস? হাবেমের নিজের সন্তুর মেকিম পলাশপুরে যায়। নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়ে মৃত্যুর্যায় অবস্থায় ফিরে আসে পরিব্রাজক। আবার যৌবন ফিরে করে চলে যাওয়ার জন্য হাবেম মেকিমকে অনুনয় করে। মেকিমের পোস্টমর্টেমে সে পড়েছিল। মেকিম এলে তাকে পড়াবে তাকে। হাবেমের কাছে মেকিম সব গোপন করতে চায়। হাবেম কিন্তু মেকিমের সব ফলাফই জেনেছিল। তাসুকপাতের লিখিত তার হাত-পা ভেঙে দিয়েছে, তাকে আক্রান্তাবে নিয়েছে করেছে। তাই মেকিমকে সে মৃদু অনুনয় করে বলে—'যা যা, যেখানে ইচ্ছি সেখানে যা। একজন যদি ছেড়ে থাকতে পারলি তো পারি নিজে পারবি। পশুপতি ভোরে ফিরতে বলিয়ে ছেড়ে দিয়েছে, আমরা তোরে নিব কেন। কেন নিব?'—এখানে হাবেমের রাগ, অভিমান, ঘৃণা, মেকিমের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও অনাবিল স্নেহমমতার প্রকাশ লক্ষ্য করেছে। গলাধাক্কা তার ঐতিহ্যের স্বাধীনে খুন করে তখন পুলিশের পায় না। এ ঘটনায় হাবেম স্বাধী পেয়েছে। তার মনশ্চিকল্পনায় আমরা মুগ্ধ হই। ফিল্মের ঘানাটি উঁচুতে তুলে ধরে সে পরার ভোরে পড়ে।

এই নাটকে হাবেম এক মুহূর্তপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মেকিমের আসামান্য আচরণে সমাজ ও শপথ নেয় হাবেম। এ কাজে সে পাশে পেয়েছে পলাশবাসীকে। মেকিমের অন্যায়ে বাধাদে খুন দিয়ে এগিয়ে এসেছে হাবেম পলাশবাসী। মেকিমের সাফল্যে সবচিন্তু স্বার্থ ত্যাগে দেয়নি হাবেম। মেকিমের আজন্মলালিত পুঁথি যেখানে তার বাবাহাই-এর সব উপকরণ লেখা ছিল, সেই মূল্যবান পুঁথিটি সযত্নে লুকিয়ে রেখেছিল হাবেম। পরিব্রাজকের ওরালি খাঁ-র অন্যায়ক দাবির কথা শুনেও সে সেটি তুলে দেয়নি মেকিমের হাতে। একারণেই সে ওরালি খাঁ-র প্রতি প্রতিশোধ নিয়েছে। অত্যাচারী শাসককে ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুর মুখে। ওরালি চলে গেলে, মেকিমের দেহ নিথর হয়ে গেলে হাবেম পুঁথিটি দেয় করেছে। মেকিমের পলায়নীতে। তারই যে মেকিমের সাধনাটিকে বৃথা হতে দেয়নি। বাবাহাই সম্পূর্ণ করতে পুঁথিটির বড়ো প্রয়োজন। তাই সে পুঁথিটিকে আগলে রেখেছে। পাশা খুলের সমাধেশে পরিব্রাজক হাবেম প্রতিটি পরিবেশন শেষে আলাদা একটি মালা পেয়ে যায়। মেকিমের পুঁথির সংরক্ষক হাবেম যেন মেকিমের হাতের ঘানিনটির নিজের হাতে তুলে নেয়। তুলে নিয়ে শুরু করে টোড়। জীবনের নতুন টোড়। নতুন আবিষ্কারের জন্য, নতুন সাফাহাই-এর জন্য, নতুন সাফাহাই সালাবেশ ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

মোহরবাই : সামান্য বাইজি নয়

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

সে স্বীকৃতি দেয়। উপলব্ধি করে, তার যা করার তাতে সে হয়েছেই, কিন্তু হেকিম যদি গঙ্গাপদ্মপুরে থাকে, তাহলে দেশজনতার সাধারণ রোগীদের খুব উপকার হবে। গঙ্গাপদ্মপুরের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা প্রকাশ পায়। নাটকের শেষে হযুরির কথায় জানা যায়, হেকিমের ওষুধ খেয়ে মোহর সুস্থ হয়ে উঠেছে। এ সংবাদে আমরা খুশি হই। মোহর শাহজাদার সুস্থ হয়ে সুস্থ জীবনে ফিরে গেছে কি না সেকথা নাট্যকার আমাদের জানাননি। আমরা শুধু অনুমান করতে পারি যে, হাকিমের দাওয়াতেই হয়তো শরীরে বাসা করেছে মোহর। আফুকাহ্নের জোড়ার বন্দি হয়েছে সে। সাহজেব বিষ পান করেই সে হয়েছে বিষাক্ত। তার শরীর থেকে সেই বিষ বেরিয়ে গেছে জেনে, আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। মোহরবাই সুস্থ হয়ে সুস্থ জীবন ফিরে পাক—এটাই কামনা। নাট্যকার মনোজ মিত্র সেই কথাই ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। ফলে মোহর এ নাটকে সামান্য এক বারবণিতা নয়, অসহায়া নারী হৃদয়ের প্রতিনিধি।

৯.৭ গল্প হেকিমসাহেবের সংলাপ ও ভাষা

প্রখ্যাত ব্রিটিশ সমালোচক A. Nicoll তাঁর 'Theory of Drama' গ্রন্থে নাটকের সংলাপ সম্পর্কে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন— 'It is through the dialogue and through the dialogue alone as interpreted by the actors, that he can convey his story to the assembled audience.' অর্থাৎ সংলাপই হল নাটকের প্রাণ। নাটকের প্রধান আশ্রয় সংলাপ। কথাসাহিত্যের তুলনায় নাট্যকার অনেক বেশি পরাধীন। কোনো চরিত্র, ঘটনা কিংবা পরিবেশ নিয়ে খুব বেশি বর্ণনা করার স্বাধীনতা তার নেই। সুতরাং তিনি চরিত্রের মুখে সংলাপ বসিয়ে নাট্যকাহিনির উপস্থাপনা, অগ্রগতি, চরিত্রের ভেতরের অবস্থান, মনের মানসিকতা, দ্বন্দ্ব ইত্যাদি রূপায়ণ করে থাকেন। কিন্তু এ চরিত্র উপযোগী সংলাপ না হলে অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও নাটকটি ব্যর্থ হয়ে যায়। সংলাপ হতে হবে আকর্ষণীয়, তীক্ষ্ণ, স্বাভাবিক, নির্মেদ ও কৃত্রিমতাহীন। নাটকের একটি সংলাপের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে আরও অনেক সংলাপের বীজ। এই প্রেক্ষাপটেই মনোজ মিত্রের 'গল্প হেকিমসাহেব' নাটকের সংলাপ বিচার করতে হবে।

মনোজ মিত্রের নাটকের রচনা রীতিতে যে ভঙ্গি আছে তার মূল উপাদান সরলতা। ভঙ্গিতে সরলতা থাকলেও তাঁর নাটক কিন্তু জটিল হয়ে যায়। তাঁর নাটকে ভঙ্গিতে জটিলতা নেই, প্রেক্ষাপটের জটিলতা নেই, আছে সংলাপের সরলতা, চমৎকারিত্ব ও মাধুর্য। তাঁর নাটকে যে কৌতুকের ছোঁয়া থাকে সে কৌতুকের মূল আবেদন। তাঁর নাটকের সংলাপে একটা অদ্ভুত চমৎকারিত্ব আছে। তাঁর ক্ষেত্রে তাঁর সংলাপ যেমন পাঠক-দর্শকের মনে দোলা লাগায়, তেমনি বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপের অভিঘাতে আবেগ জাগায়। তিনি নিজে জীবনরস রসিক বলেই যে কোনো চরিত্র, ঘটনা, পরিবেশ নিয়ে সুন্দর রসিকতা করতে পারেন। তাঁর নাটক পড়তে পড়তে কিংবা দেখতে দেখতে আমরা হেসে উঠি ঠিকই কিন্তু পিছনে এসে পড়ে আবেগের মনোভাব। আমি থাকে মুক্ত ছিটে ফোঁটা বেদনায় কখনও কখনও ফুঁপিয়ে উঠি। তাঁর 'গল্প হেকিমসাহেব' নাটক সম্পর্কেও একথাগুলি সমানভাবে প্রযোজ্য। এ নাটকের শুরুতেই আমরা ফকিরের দেখা পাই। ফকিরের মুখে তিনি এমন সংলাপ বসিয়েছেন, যাতে প্রমাণিত হয় কত কম কথায়, কত গভীর ব্যঞ্জনায় সেকালের সমাজ, ইতিহাস, মানসিকতাকে ফুটিয়ে তোলা যায়। লোকমুখে শোনা হেকিমসাহেবের দুর্নামকে

সাধারণ কথোপকথনে অনায়াসে ফুটিয়ে তোলে অভিনয়। তার মুখে 'কালঝাড়ের' শব্দটির ব্যবহার খুবই আন্তরিক। অভিনয় চলাকালীন কথাকারের সঙ্গেই নাটকের কথক, বিশ্লেষক হিসেবে নাটকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। সেলিনের প্রায় শব্দগুলি তার মুখে বেশ মানানসই হয়েছে। যেমন 'বালসাড়া', 'উপুড়মুখ পাখি', 'খী-গন্ধ', 'ভোর', 'নিশব্দসাপে', 'লোকজ', 'একাকে' ইত্যাদি শব্দগুলির ব্যবহারে বাঙালমেশের গ্রামীন প্রাণে ও সাধারণ মানুষের মনি ফুটে উঠেছে। ছোটো ছোটো বাক্যগঠনে চিত্রকল্পটী বাক্যালঙ্কার ব্যবহারের সার্থকতায় ফুটে উঠেছে সর্বত্র—'সেদের বাজা হিয়ারে, হিয়ারের ভেলা অভিসারে, অভিসারের অভিসারক মানুষগুলার অহংশিক্ষার ভেলগুলিরে—চিরস্থায়ী বাক্যবন্ধের সাধারন মানুষ অন্ধকারেই...মুক্তক ভেবল বাজলা। মানুষ মরছে মানুষ, বাজনা হাসি।' নাটকের পরবর্তী অংশে যখনই অভিনয় চিত্রায়িত হয়েছে তখনই সে প্রায় আমার অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সুন্দর সেতু রচনা করেছে। তার সংলাপের সাধারণ সঙ্গতিপূর্ণ ভাষা আমাদের মুগ্ধ করে।

নাটকের ও নাটকে ব্যবহৃত খী ও পশুপাখি সেলিনের চীন প্রতিবেশিদের বেশ কিছু কৌতুককর ছবি অঙ্কিত করেছেন নানান অভিনয়ে। নরিয়াগাঙ্গের ও পলাশপুরের মানুষজনের অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে তিনি যেমন আনমনা বিরেছেন, পাশাপাশি তাদের ধর্ম, অন্ধবিশ্বাস বীমাসেবা টেনেছেন শাসক হাত ধরে। নরিয়াগাঙ্গের মানুষজনের ব্যবহৃত খী, তার ভোগাভোগ পরাক, নাচের ভঙ্গিমি, খাদ্যাভ্যাস অন্ধবিশ্বাস সংলাপে প্রচুর আঞ্চলিক-আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত বিশেষটি বোঝা যাবে। যেমন ব্যবহৃত সংলাপ—'তুমি হুধ কথাই ঘালক টেরিনি, হুধ কথা। মানুষের হিসাবে আমাদেরই কর্তব্য ভাড়াভাড়ি করা, পরামর্শসভা করা, আলোচনা সাপাই করা, বাবার পরিত্র কথা বিধি অভিযোগ...হুধ কথা।' সংলাপপুরের মানুষজনের পশুপাখি, খোদাকা দুর্গীয় সংলাপে সংক্রামকভাবেই ব্যবহার করেছেন সেলিন, তদ্ভব, অর্ধতৎসম, তৎসম শব্দ। পশুপাখি ব্যবহারিকে 'খীসাহেব' সম্বোধন করে মন্তব্য করে—'খুশি হয়েছি ঐতুকমশাই। আমার প্রতিবেশির যে সম্পত্তিতে মন লেগেছে, এটাই বড় কথা। তাঁর মত উচ্চমনীয় শিক্ষাবীর কেন যে এতকাল এখিনে সমান দেননি, এটাই বিস্ময়ের।...খী সাহেবকে আমার সমস্যা জানাবেন।' পশুপাখির কণ্ঠে 'ঐতুকমশাই' 'খুশিমশাই', 'ভোবমহান' 'মনান' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারে হিমুস্রাবিত রূপ স্পষ্ট হয়।

এ নাটকের কেন্দ্রিয় চরিত্র সেলিম সাহেব। সেলিমের সমস্যা, অন্ধকার, নিষ্ঠা, সাধনা, উপাসনা, সাধক মনটি সংলাপের মাধ্যমে প্রকাশিত। গল্পকথনিতে সেলিম নিজে আপের বয়ানে আমা আপ নিয়ে যায়, কিন্তু নিজের আমা আপ সে কি করে বোঝে? যখন সে বলে—'সমস্ত আপে আমার, মুক্তক ওয়াপস... (ভোবে) আমি নাই। সেটিরিটি তুমি হও। আমি তুমি সাধনে। সাধ, সাধ আমার যা মেরিয়েলে খুশি মনে সাধ...' বোঝা যায়, গল্পকথনির প্রতি সেলিম খুবই সচেতন। আমাদের সেলিমের সমুদ্র বোঝাপড়া। সেলিম অন্ধকারেই খুশি। কিন্তু এই সেলিমই গল্পকথনির সমাপ্তিতে অন্ধকারে ভেঙে যায় প্রতি ক্ষুদ্র ছায়া বলে—'তুমি পরমার যান না আমি নাই কমিলে, কিন্তু খুব আমাপাশেই যখন তোমার এসেছি আমাপাশি, যাও আলো ছায়ে আর আপনে না তুমি...' এখানে সংলাপের সরলতা নেই, আছে খুব্দ কঠিন আর। সেলিমের চরিত্রের ভিন্নমাত্রাকে ফুটে তোলার জন্য এ সংলাপ খুবই অনুকূল ছিল। সেলিম ভোগালতা না আপনের জীবন অভিজ্ঞতায় সাফ।

বন্ধুর হেরিটেজ তার মেনেজ কীভিনাভি নেই। বন্ধুর হৈরিত্ত ক্ষেত্রে তার একটি ঐতিহাসিক মন বাজ করছেন। বন্ধুর হৈরিত্ত প্রসঙ্গীর মধ্যে তাহেছে কবিতন আমেজ। হেনিম পন্ধাবর্দিকে বলে—'তারহোর একটিনা ক্ষেত্রেন বাহে, শীতল বাতাস বাহে...হেনিমের শরবাহি দুপলত দুরবি বাহ, ফলাহের মেহের বাহ...মনু বাহ, দুপলাদি বাহ, বাহের সমুক্ত বাহ...আহেন দুরা আহ। আমরাহের দিনাহহেরা কাহেন ক্ষেত্রে বিদুহেরন অনকটি টিহেলে, সেটি অনকটিন বাহ।' এ সমাদ মেনে আধুনিক কবিতার পাহি। বোঝা যায়, হেনিমের আহ্বাদে টিকি আহছে নাটিকার মনোরমিত্রের কবিমন। শব্দের ব্যঞ্জনায়, পদবাদিহেরা, ছন্দের তালে এ নাটিকের এরকম অনেক সংলাপই কাব্যধর্মীপূর্ণ হয়ে উঠেছে। হেনিমের বক্তব্যে নাহক খুন বিয়ে, তার আপস্পূর্ণ বাহকে সম্পূর্ণ করতে এগিয়ে এসেছে নাহকাহবি ও হাহেরা। আহের সংলাপে, কাব্যধর্মীয়তা মাঝে মাঝে কবিতে হয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। তারা কল্পনায় তাদের তর বাহে সংলাপ বলছে। কখনও কখনও এ নাটিকের সংলাপ হয়েছে মেনেটিম। নাটিকার অধিকাংশ মনোভাবনে তাঁর চরিত্রের মুখে সংলাপ বসিয়েছেন। মোহনবাঁশি তার কৃষ্ণকর্মের জন্য অনুতপ্ত। হেনিমকে সে লিখা অপরাধ নিয়ে অপমান করেছে, ক্ষুব্ধেছেন্টি পাঠিয়েছে, নাকে খত দিয়ে বাদা বাহছে। সেই হেনিমের কাছে এসেছে নিজে চিকিৎসার জন্য। বন্ধাবর্দির কাছে সে স্বীকার করেছে—'আমার মুর্খামির মোহন আহার সেই বহিন। কী মোহনবাঁশি বাহেছি মানুহরিকে!' এই অর্থে নাটিকার নায়কম হিসেন। মোহনবাঁশি-এর মুখে অতিরিক্ত সংলাপ বসানি। বসনে মেহনের অনুপোহনার নিবন্ধটি স্নান হয়ে অভিনয়ের বিনটি প্রাধান্য পেত। এ নাটকে নাটিকার অনেক ক্ষেত্রে বুদ্ধিদীপ্ত শাণিত সংলাপ বসহার করেছেন। হেনিম, বন্ধাবর্দি, নন্দুনন্দি, হৌলনিন্দ সংলাপে অনেকক্ষেত্রে বুদ্ধিদীপ্তভার স্নান আছে। এমনকি ছোটো একটি চরিত্র মোহনের ঘরানদী ফুপুর মুখেও আমরা এ ধরণের সংলাপ শুনি—'হেনেহিলাম নরিয়াপত্নের ভালুকনার মহিন মন্ন রাখতে আহেন। সেখানি মন দুরে বাক, আর ভালুকে স্নান পাঁচাবেটি পায়।' হেটিহাস মুখে এই বাদনিকমুলক সংলাপ আমাদের অভিভূত করে। নাটিকার সংলাপে ভিন্ন সমাদ, সমাজ, চরিত্রানুগিন চরিত্রিক হৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছেন যথাযথ সংলাপের মাধ্যমে। ফলে প্রতিটি চরিত্র জীবন্ত, প্রাণবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। এমনকি তাঁর বর্ণনা রীতিতে আমরা হয়েছে সহজ, সুন্দর ও আকর্ষণীয়। এ নাটকে নন্দুর চরিত্রে প্রসঙ্গে বলেছে—'দুধুর আসমানে চিলগুলি বাহেন পাখা দুধারা।' আর নাটকের শুরুতেই নাটিকার লিখছেন—'নদী-এর কলিজা মতো কালচে চিল আকাশে।' আর নাটিক শেষ করেছেন—'আকাশের ফেসে যাচ্ছে হেলিকপ্টারের বিটি। আসছে হেলান।' সমগ্র নাটকে ধীর, ফোহনা, হেলান, প্রবীন, চিত্রাহের প্রতিটি চিত্রকল্প তাঁর ভাষা ও সংলাপ, সুন্দর সহজভাবে ফুল সাজ তার ভাবী ও আকর্ষণী।

৯.৮ বিভিন্ন গ্রন্থ-পত্রিকায় 'গল্প হেলিকপ্টার সাহেব' সম্পর্কে নানা প্রতিক্রিয়া

'নাটকের হেলিকপ্টারের ও তাঁর আবির্ভাব ঘটনা ইতিহাসসম্মত যে ঘটা অনুচিত নয়। তবে মোদ্দা কথা, ঘটনা মোহনবাঁশীর আসলে মনোভাব ভিন্ন স্পর্শ করেছেন বর্তমানেরই এক সিদ্ধির বাস্তবতে, যার একদিকে

আজ সামাজিক সচেতনতা ও আন্দোলনের অঙ্গীকার, অন্যদিকে ধর্মীয় তথা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও সেই অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত।'

[বিনোদ পলিহর, 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ২৭.০৫.১৯৮৪]

'মনোজ মিত্রের নাটকে একটা স্থীর আবর্তন তৈরি হয়ে, সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল, আজ থেকে বেশ্যের বছর আগেকার এক প্রেক্ষিতের পটভূমে তিনি এমন এক মূল্যবোধ তথা দৃষ্টিকোণ নির্মাণ করেছেন, যা ঐতিহ্যসিদ্ধতার পরিধি ছিন্নভিন্ন করে আমাদের নিত্যদিনের আকাশের সমস্যার সমাধানের মধ্যে ডুবে পড়ে এবং পুরাকালের পটভূমি ও পোষাক-আশাকের আড়াল থেকে আমাদের বিচার বৈশিষ্ট্যকরণ একটা বড় প্রশ্ন এ নাটকে আমাদের নিকট নিক্ষিপ্ত হয়...মনোরঞ্জনের এই নাটক যে শুধু একটি অনুপম ঐতিহ্যিক গল্প ফুটিয়ে তুলে তা নয়, তা অন্তর্ধারিত, রসপরিপুষ্ট ও সম্পূর্ণ আত্মবিশ্লেষী উপায়ে অনাবশ্যকীয় আবেগের এক অবোধ্য ছবি তুলে ধরে—যা নতুন ও সাহসিক নাটকারদের সাহসের সেতু মজবুত করার জোগায়।'

[পবিত্র সরকার, 'আজকাল', ০১.০৬.১৯৯৪]

'...বিনোদের নির্মিতে যা প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল বেশ্যের বছর পিছিয়ে যাওয়া পটভূমিকে এক আশ্চর্যরূপ দীপ্তি, সত্য, বিশ্লেষণের ঐতিহাসিকের জীবনসঙ্গিনি। শুধু তখন প্রেক্ষিতের ঘটনি মহাগগনে, সেন তার মুহূর্তে। এমন এক চরিত্রের সৃষ্টি যাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভা (তরুণী খী এবং পশুপতি সেনগুপ্ত) বিভিন্নির করে তুলবে। অভিনেতার যে সম্পত্তি পাঠকের তথা দিয়ে নাটা উদ্ভাসিত হবে, তার প্রায় প্রতিটি মূলেই একটি করে নাটিক্ষিয়ার নাটকে নাটকটী মূলের ঠেলে সেবে।...আমাদের 'পক্ষ'-র প্রাণে প্রাণে আজ প্রেক্ষিত—দুটি পার্টিই মুখোমুখি হয়। প্রাক্তন আছে রোষ, সেটি প্রতিশোধ, চাই অন্নপূর্ণ, প্রেক্ষিতের আছে স্বার্থপরতা, ঔদ্ধত্য, লালসা, সেই অন্নপূর্ণ, চাই মুক্তি। কিন্তু মুক্তোপরই আছে স্বর্গীয়ের সমস্যাসুদ্ধি, মুক্তোরে। আর তাই সমস্ত কোরেই 'পক্ষ'-র সমস্যা। এই সমস্যার কথকথা আলোকোজ্জ্বল করে তোলেন নাটিকারের যার নাম মনোজ মিত্র, অনন্ত শেশব থেকে মুক্তে তাঁর যাপন পরিচিত পরিচিতে পরিচিতে আছেন পরিচালক যার নাম মনোজ মিত্র, মুক্ত থেকে যার কথা পীরমূর্তি এবং এবং লক্ষণীয় করে তোলার তোলায় চরিত্রিন হয়ে আছেন অন্য এক অভিনেতা যার নাম মনোজ মিত্র।'

[সন্তুষ্ণ ঘোষ পত্রিকার, 'নাটিশক্ষ সমাজ' তোতোরুম সংখ্যা, ১৯৯৭]

'...মুখবন্ধের পরি মতো এ নাটকের বিষয়বস্তুকে সামনে তোলে আমরা তোমাদের কলকে পরি এক ঘটি ঢেলা আলোকর নিপুণ ব্যবহারের সাথাে এসে হাজির হয়েছি। মাঝের প্রেক্ষিতের মতো আলোক বিশেষজ্ঞটি মুক্তোরোপ নাটির উপাদানের সাথাটি বলাবার উপকরণ পায় না। উপকরণ তোপাসনার অভিনেতা নিজেদের আর্থ মৌতাত, শক্তিমত্তার পরিচয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। আলো বিশেষজ্ঞের কল সালসার শিকার হয়। বাজারের পথা পুরান আর করার মতো মুক্তের শ্রেণী শেষটেই পরোটাস্ন করে তোলাতোর করে নাটিক। তেমন বহুত আলোর প্রেক্ষিত আলোর আটি আজকে প্রয়োজিত।'

[দর্শিত ঘটিয়ারে, 'মুক্ত থিয়েটার' পত্রিকা, নভেম্বর-জানুয়ারী, ১৯৯৪-৯৫]

৯.৯ গল্প হেকিম সাহেব : মঞ্চায়ন সম্পর্কিত তথ্যাবলী

গল্প হেকিম সাহেব নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়—৩১শে মার্চ ১৯৯৪ অ্যাকাডেমিতে

নাটকের কলাকুশলী

মঞ্চ ও শিল্প নির্দেশনা	: খালেদ চৌধুরী	আবহ	: গৌতম ঘোষ
মঞ্চনির্মাণ	: কৃষ্ণপদ দাস	শব্দ প্রক্ষেপণ	: [illegible]
আলোক পরিকল্পনা	: তাপস সেন	নেপথ্য কণ্ঠ	: [illegible]
আলোক সম্পাত	: বাবলু দাস	বাউলিক গানের কথা ও সুর	: অমল সিংহ
পোশাক পরিকল্পনা	: [illegible] গোস্বামী	রচনা ও নির্দেশনা	: মনোজ মিত্র
রূপসজ্জা	: [illegible] ঘোষ		

নাটকের কুশীলব

ফকির	: [illegible]	[illegible]	: [illegible] মিত্র
হেকিম	: দীপক দাস	[illegible]	: [illegible]
রাজেন	: তরুণ মুখোপাধ্যায়	[illegible]	: দেবাশিস ভট্টাচার্য
শঙ্কর	: সুভাষ চৌধুরী	অন্যান্য চরিত্র	: [illegible], [illegible], [illegible] সরকার
[illegible] খাঁ	: মনোজ মিত্র		
[illegible]	: অমিত মুখোপাধ্যায়		
[illegible]	: [illegible] সেন	[illegible]	: কাবেরী বসু
[illegible]	: [illegible] মিত্র	[illegible]	: মৌমিতা বিশ্বাস
[illegible]	: দীপক ভট্টাচার্য	[illegible]	: মায়া রায়
বুড়ী	: [illegible] রায়		

[illegible] প্রযোজিত গল্প হেকিম সাহেব নাটকের [illegible] অনুলিপি

এক ছিল হেকিম সাহেব। [illegible] গাধা, তার পিঠে [illegible] হেকিম সাহেব [illegible] ডাক দিয়ে বেড়াত—'[illegible]'

[illegible] হেকিম সাহেব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

৯.১০ প্রশ্নাবলী

বিস্তৃত প্রশ্ন

১। [illegible]

২। [illegible]

৩। [illegible]

৪। [illegible]

৯.১১ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১। [illegible]

২। [illegible]

৩। [illegible]

৪। [illegible]

৫। [illegible]

৬। [illegible]

৭। ছাত্রেম কে? তাকে দিয়ে নাটকের কোন উদ্দেশ্য সাধিত?

৮। হর্তুকি, বক্কর, তাকিয়া—চরিত্র তিনটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৯। এ নাটকে 'গোলাপ' কিসের প্রতীক?

১০।এই নাটকের নামে 'গল্প' কথাটি কেন প্রযুক্ত?

সহায়ক গ্রন্থ-পত্রপত্রিকা

১। *মনোজ মিত্র নাট্য সমগ্র (১ম খণ্ড)*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিকেশন

২। *গল্প হেকিমসাহেব : রূপকের আয়নায়*, ড. শম্পা মিত্র, রত্নাবলী

৩। *নাট্যব্যক্তিত্বের মুখোমুখি*, ড. অপূর্ব দে, দিয়া পাবলিকেশন

৪। *ব্রাত্যজন নাট্যপত্র* (শারদীয়া ২০১১) সম্পাদক ব্রাত্য বসু

৫। *নাট্যপত্র স্যাম্* ১০ ও ১৩ সংখ্যা সম্পাদক সত্য ভাদুড়ী

৬। *রূপ থিয়েটার পত্রিকা* নভেঃ-জানুঃ ১৯৯৪-৯৫ সম্পাদক রমন মহেশ্বরী